কিন্তু দ্বাপরযুগের শেষভাগে ঐ ক্ষত্রিয়সমস্যাকে পুনর্ব্বার ভীষণ আকার ধারণ করিতে দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রে যে ঐ সমস্যার ভঞ্জন হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এখন বিচার করিতে হইবে যে আমাদের সমাজে বারম্বার ঐরূপ সমস্যা যে দেখা দেয় তাহার কোনও আমূল প্রতীকার আছে কি না।

আমরা দেখিয়াছি, ভারতীয় প্রাচীন সমাজের বিশেষ একটী প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্ষত্রিয়শক্তি আবশ্যক হইয়াছিল। সে প্রয়োজন তিন ভাগে বিভক্ত,—১ম, বহিঃশত্রু হইতে সমাজকে রক্ষা করা, ২য়, সমাজের মধ্যে শান্তি রক্ষা করা, ৩য়, সমাজে সকলের স্বধর্ম্মপালনে অভিভাবকতার কার্য্য করা। যে প্রয়োজনসিদ্ধি ব্রাহ্মণের উপর নির্ভর করিয়াছে, তাহা মুখ্য হইলেও, এই তিনটী প্রয়োজনের পূরণ অবশ্যকর্ত্তব্য। মনু সেইজন্য বলিয়াছেন :—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের শ্রীবৃদ্ধি নাই, আবার ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি নাই; অতএব উভয়ে একত্র মিলিত হইলেই ইহপরলোকে উভয়েরই শ্রীবৃদ্ধি। এইরূপে ক্ষত্রিয়শক্তি সমাজের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য হইলেও, রাজসম্পদের মূলে একটী বিপদের বীজ নিহিত রহিয়াছে। আমাদের সমাজ যদি পরমার্থসাধনারূপ মূল প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া গঠিত না হইত, তাহা হইলে ক্ষাত্রৈশ্বর্য্যসম্ভূত বিপদের অস্তিত্ব থাকিত না। পৃথিবীর অপর কোনও সমাজে এরূপ বিপদের কথা শুনা যায় না। কিন্তু কথা এই যে এই চিরন্তন বিপদাশঙ্কার কি কোনও প্রতীকার নাই?

প্রতীকার খুঁজিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, যে প্রয়োজনের পূরণে ক্ষত্রিয় রাজার আবশ্যকতা, সে প্রয়োজনের পূরণার্থ অন্য কোনও ব্যবস্থা হয় কি না। আমরা দেখিয়াছি এই প্রয়োজন ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ কাজের আবার দুইটী দিক্ আছে,—যথা, নিয়োগ ও সম্পাদন,—deliberative এবং executive। আধুনিক জগতের ইতিবৃত্তে আমরা দেখিতে পাই যে রাজশক্তিকে সমাজের সকল অঙ্গ বা ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থার নাম সাধারণতন্ত্রতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ভাবটী যদি প্রাচীন ভারতে প্রয়োগ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্যমদজনিত সামাজিক সঙ্কটের একটা প্রতীকার পাওয়া যাইত। সে সম্বন্ধ

সমাজভুক্ত জনসাধারণ যদি যথোপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিত, তবে যে প্রয়োজনপূরণে ক্ষত্রিয়কে প্রভুত্ব অর্পিত হইত, সেই প্রয়োজনপূরণে নিয়োগের ভাগটী সেই সুযোগ্য জনসাধারণ অধিকার করিতে পারিত এবং কেবল সম্পাদনের ভাগই ক্ষত্রিয়ের হস্তে সংন্যস্ত থাকিত। সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় নিয়ন্তা ঋষি যদি এইরূপে একটা সুযোগ্য দায়িত্বাভিজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষত্রিয়ের সহিত ভাগাভাগি করিয়া সমাজের কাজে লাগাইতে পারিতেন, তবে সম্পদগর্ব্বে গর্ব্বিত ক্ষত্রিয় কোনক্রমেই হাত-ছাড়া হইয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু সেই প্রাচীন সমাজে এরূপ ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। তখনও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট ছিল। সেই ব্যবধান সত্ত্বে "পব্লিক" বলিলে যে সার্ব্বজনীন ভাব বুঝায়, তাহার সঞ্চার বা বিকাশ সম্ভব নহে, আবার গায়ের জোরে সেই ব্যবধান ঘুচাইয়া দিলে, সমাজের আদর্শরক্ষক উচ্চশ্রেণীকেই হীনদশায় পরিণত করা হয়, নিম্নশ্রেণীকে অভি-প্রায়ানুরূপ মহত্ত্বে মণ্ডিত করা হয় না।

কাজেকাজেই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সামাজিক প্রয়োজনের স্থানভাগী ক্ষত্রিয়-বলকে মাঝে মাঝে যথাসময়ে খর্ব্বিত করা ভিন্ন প্রাচীন সমাজের পক্ষে উপায়া-ন্তর ছিল না। ঐরূপ ক্ষত্রিয়শক্তির দমনের শেষ অভিনয় আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেখিতে পাই।

কুরুক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজের যেন একটী প্রকাণ্ড অধ্যায় সমাপ্ত হইল। তার পর আমাদের প্রাচীন সমাজের পরিণাম অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ইতিহাসের দৃষ্টিগোচর। এই সময় স্পষ্ট অনুমান হয় যে আর্য্য শব্দটী ঋষি-প্রবর্ত্তিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। সত্যযুগে দেব ও অসুর বলিলে যে রকম প্রভেদ বুঝাইত, কলিযুগের কিছু পূর্ব্বে ও পরে আর্য্য ও অনার্য্য বা ম্লেচ্ছ শব্দের দ্বারা সেইরূপ একটা প্রভেদ বুঝাইত। গীতায় "অনার্য্যজুষ্টং" শব্দের মত আর্য্যশব্দের ঐরূপ অর্থগত ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রের পর আর্য্যসমাজের অবস্থা কি? অবস্থা তীব্রোৎপাতহীনও বটে, আবার ঘোর সমস্যাসঙ্কুলও বটে। কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে যে বিরাট ক্ষাত্রবল বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সেই যুগে বসুন্ধরা ক্ষাত্রপ্রতাপবিহীনা। সেই জন্য যুদ্ধঘটিত প্রবল উৎপাত হইতে আর্য্যসমাজ অনেক কাল নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। কিন্তু ক্ষত্রিয়হীন হওয়া আর্য্যসমাজের পক্ষে সহজ দুর্ভাগ্য নহে,

আমরা উদ্ধৃত মনুবাক্য হইতে তাহা দেখিয়াছি। বাস্তবিকই ক্ষত্রিয়বীর্য্যের অভাবে আর্য্যসমাজের ক্রমেই রূপান্তর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু রূপান্তর ঘটিলেও কোন ক্ষতি নাই, যদি সমাজের মূল উদ্দেশ্য বজায় থাকে,—যদি সমাজের প্রাণ বা সূক্ষ্মসত্তাটী আপনার মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব রক্ষা করে।

কুরুক্ষেত্রের পরও আর্য্যসমাজের জীবনধারা অনবচ্ছিন্নভাবে যে বহিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ বেদগুপ্তি। আর্য্যসমাজ কি ভাবে, কি আদর্শে, কি প্রণালীতে কোন পথে চলিবে তাহা বেদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই বেদকে অনুসরণ করিয়া সমাজে স্মার্ত্তযুগ আবির্ভূত হইল। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এই স্মার্ত্তযুগের অধিকার। বেদোক্ত সাধনা আর্য্যসমাজ বিস্মৃত হইল না বটে, কিন্তু সে সাধনযোগ্য সাধক কোথায়? মনু বলিয়াছেন ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সমাজে অথচ প্রকৃত ক্ষত্রিয় ত নাই, তা' ছাড়া অনার্য্যজাতি চারিদিক হইতে সমাজের দ্বারে করাঘাত করিতেছে। পূর্ব্বে প্রতাপান্বিত ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে অনার্য্যকে যথাসম্ভব ধীরভাবে ও প্রতিহতগতিতে সমাজের একপাশে স্থান দেওয়া হইত, তখন অনার্য্যকে আর্য্যীকৃত করিবার যেটুকু ব্যবস্থা ছিল, তাহাও সমাজের সম্পূর্ণ করায়ত্ত। কিন্তু সমাজে যখন ক্ষত্রিয়প্রভাব বিলুপ্ত, তখন অনার্য্যের অভিসর্পণ প্রতিহত করিবার শক্তি সমাজের নাই। অরণ্যাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত ঘনিষ্টভাবে অঙ্গীভূত হইয়া শাস্ত্রবিধানের দ্বারা ব্যবধান রক্ষা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সমাজপ্রাঙ্গণে অনার্য্য আপনার স্থান যোগাড় করিয়া লইতে লাগিল এবং তাহাদের প্রবৃত্তিমূলক হীনাদর্শ সমাজকে রূপান্তরিত করিতে লাগিল। সমাজের আব-হাওয়া বদলাইয়া গেল এবং যজমানের প্রভাব যাজককেও সংক্রামিত করিল। সমাজ কেবলমাত্র কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয়ে আপনার বেদমূলকতা রক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড ও ব্রহ্মবিদ্যা সমাজের সহিত সংযোগ হারাইয়া অরণ্যে সন্ন্যাসের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ঋষির জীবনে সমন্বিত হইয়াছিল, কিন্তু স্মার্ত্তযুগে ক্রমশঃ আর্ষজীবনের আদর্শ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। সারস্ত যোগিভিঃ পীত-স্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ, সংসারী ব্রাহ্মণ কর্ম্মকাণ্ডের যাজনা করিতে লাগিল; সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞের আদর্শ রক্ষা করিতে লাগিল। গৃহস্থকে সংসার আপনার চক্রে জড়াইয়া লইবেই। অতএব এই যুগে সন্ন্যাসের অভ্যুদয়ে আর্য্যসমাজ একটী বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। কিন্তু

এ যুগের সন্ন্যাস সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন,—লোকালয়ের সহিত সকল-সম্বন্ধ-রহিত। বুদ্ধদেব বৌদ্ধযুগে সমাজের সহিত সন্ন্যাসের যোগ স্থাপন করেন।

প্রাচীন ক্ষত্রিয়বীর্য্যের অভাবে অনার্য্যসমস্তাব উদ্ভব। আর্য্য ও অনার্য্যের সংঘর্ষে সমাজে বৈদিক আদর্শ ম্লান হইয়া যাইতেছে। বেদ সত্যই স্মৃতিতে পরিণত, কারণ বেদমূর্ত্তি ব্রহ্মজ্ঞ নাই। এমন কি উত্তর ভারতে সমাজের বাহিরে যে সেই বেদ-মূর্ত্তি ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, এমন কথা বুদ্ধাবির্ভাবের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাই না। বৌদ্ধযুগের পরে দাক্ষিণাত্য ও নর্ম্মদার দিক হইতে ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক বুদ্ধদেব অনার্য্যসমস্তায় পূরণ করিলেন। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে অনার্য্যের ভিতরে প্রবল ত্যাগের আদর্শ সংক্রামিত করিয়া দিয়া তাহার প্রকৃতিকে আর্য্য-সমাজরূপ উচ্চস্তরে উত্থাপিত করিবার জন্য ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব। * তারপর আর্য্য ও বৌদ্ধের সংমিশ্রণে একটা নূতন ভাবত অধিষ্ঠিত হইলে, ভগবান শঙ্কর বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞান আবার সমাজে প্রচার করিলেন। তখন ভারতীয় জনসমষ্টির মধ্যে আবার অন্তর্হিতপ্রায় আর্য্যসমাজ আত্মপ্রকাশ করিল।

মনে সহজেই প্রশ্ন উঠে যে কুরুক্ষেত্রের পর প্রায় ত্রিশ শতাব্দী ধরিয়া ভাল মন্দ নানারকম পরিণামের মধ্য দিয়া আর্য্যসমাজ যে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার দ্বারা সুফল কি হইল? একটী পুষ্করিণীকে বিশেষ কোন গুণযুক্ত করিবার জন্য যদি তদ্গুণসম্পন্ন একখণ্ড দ্রবণযোগ্য পদার্থকে উহার জলে নিক্ষেপ করা যায়, তবে জলের আধিক্য এবং ঐ পদার্থগত পরমাণুর সূক্ষ্মতা হিসাবে অভীষ্ট ফললাভে বিলম্ব হয়। মনুষ্য-জীবনের যে উচ্চ আদর্শ লইয়া বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ঋষিসংঘ গঠিত হইয়াছিল, তাহার সহিত ঐরূপ একটী সূক্ষ্মপরমাণু-বিশিষ্ট স্বগুণসংক্রামক পদার্থের তুলনা করা যাইতে পারে এবং বিশাল ভারতবর্ষকে একটী জলাশয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বিশাল, বৈচিত্র্যময়, ভারতবর্ষের জীবন-ক্ষেত্রে বৈদিক ঋষিসংঘ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা কি কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী যুগে প্রাচীন ব্রাহ্মণপ্রধান আর্য্যসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ক্রমশই প্রসারতা লাভ করিতেছে না? অবশ্য যদি সেই আদর্শ পরমার্থমূলক না হইয়া ঐহিকতামূলক হইত, তবে আপনাকে সর্ব্বতঃসঞ্চারী

* জ্যৈষ্ঠের উদ্বোধনে "বুদ্ধোৎসব" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

করিতে এত বিলম্ব হইত না। তবে এতদিনে কোন যুগে ভারতেও নেশন গড়িয়া উঠিত। কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভারতের উপর অন্য ভাবে বর্ষিত হইয়াছে,—ভারত জগতে শ্রেষ্ঠ আদর্শপ্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাই প্রথম হইতেই ঘোষণা করিয়াছে, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

ঋষিপ্রচারিত পরম আদর্শের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ—এই উভয়বিধ কার্য্যের ভারই আর্য্যসমাজের উপর সংন্যস্ত। স্মার্ত্তযুগে সংরক্ষণের কাজেই সমাজ অভিনিবিষ্ট ছিল, কারণ আর্য্য ও অনার্য্যের ব্যবধান তাহার পক্ষে দুরতিক্রম্য ছিল। ভগবান বুদ্ধ ঐশীশক্তির দ্বারা সেই ব্যবধান লোপ করিয়া দেওয়ায় মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে সমাজে সম্প্রসারণের কার্য্য দ্রুত গতিতে চলিয়াছিল। এইখানে আবার জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ সম্প্রসারণের সাহায্যে কেন ভারতব্যাপী দৃঢ়সম্বদ্ধ নেশন গড়িয়া উঠিল না।

আমরা দেখিয়াছি, সমাজ প্রথম গড়িয়াছিল একটা মূল প্রয়োজনের সাধনায়, সে প্রয়োজন মানবের জন্য ব্রহ্মসাধনারূপ হোমাগ্নি বাঁচাইয়া রাখা। তার পর সংগঠিত সমাজকে রক্ষা করিতে করিতে সেই রক্ষাকার্য্যের জন্যই এমন সমস্ত প্রয়োজন উদ্ভূত হইতে লাগিল, যাহাতে পূর্ব্বকথিত আদর্শের সম্প্রসারণ বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া উঠিল। সমাজে আটাআঁটি না থাকিলে, নানা অবস্থার মধ্যে আদর্শকে রক্ষা করা যায় না, আবার সমাজে আঁটাআঁটি থাকিলে, আদর্শ যথোপযুক্তভাবে প্রসার লাভ করিতে পায় না। এই উভয় সঙ্কট মিটাইবার উপায় কি? আমরা বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যের নিকট হইতে ঐ উপায়ের ইঙ্গিত পাইয়াছি। পাশ্চাত্যে স্থূল ব্যবহারিক প্রয়োজন ধরিয়া সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রধান প্রধান দেশে সেই দেশবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা কমিউনিটী অতিক্রম করিয়াও আর একটী মিলনক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে। এই মিলনক্ষেত্রের নাম নেশন বা ন্যাশান্যালিটী; আমরা গত মাঘ মাসের উদ্বোধনে উহার স্বরূপ বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে নেশন বলিতে স্বরূপতঃ যাহা বুঝায় তাহার পত্তন ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই হইয়া আছে। অতএব যখন আমাদের ইতিহাসের প্রমাণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে আমাদের সনাতন সমাজের দ্বারা আদর্শের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ-রূপ উভয়বিধ লক্ষ্য সমভাবে সাধিত হইতেছে না, তখন সমাজাতিক্রমী একটা মিলনক্ষেত্রের ব্যবস্থা ভারতে গড়িয়া তোলা নিতান্ত আবশ্যক।

এইরূপ একটা ভারতব্যাপী মিলনক্ষেত্র গড়িবার প্রয়োজন যথাযুক্ত তীব্রভাবে অনুভূত হইত না, যদি মুসলমান ও খ্রীষ্টান আসিয়া আমাদের সমাজের পার্শ্বে ঘর না বাঁধিত। আপন আপন সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভিত্তির উপর, পরমার্থৈকলক্ষ্য হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজকে অতিক্রম করিয়া একটা ভারতব্যাপী সম্মিলনক্ষেত্র রচনা করাকেই আমরা নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নাম দিয়াছি।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের যুগে সমাজ আদর্শের সম্প্রসারণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেও ভারত-ব্যাপী নেশন গড়িবার সময় আসে নাই। আচার্য্য শঙ্কর সমাজের সনাতন প্রয়োজন ও লক্ষ্যের দিকে সমগ্র ভারতবর্ষকে আকর্ষণ করিলেন বটে, কিন্তু তখনও সমাজ সে চেষ্টার ফলভাগীমাত্র, সে চেষ্টায় সমব্রতী নহে। সামাজিক পরিণতির পূর্ণতা সেই অবস্থায় উপলক্ষিত হয় যখন সমষ্টির প্রয়োজন ব্যষ্টিতে নিজ প্রয়োজনরূপে অনুভূত হইতে থাকে,—যখন প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে সমগ্র সমাজের প্রয়োজন ও দায় পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন। এই অবস্থার সূত্রপাত সমাজপরিণামে একটী মহাসন্ধিযুগের অবতারণা করে। সেরূপ যুগের অবতারণা আচার্য্য শঙ্করের সময় হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

আমরা দেখিয়াছি, সনাতন সমাজের তিনটী প্রয়োজন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া সাধন করিয়া আসিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের পর হইতে ঋষির দায় যাজক সামাজিক ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মযাজী সন্ন্যাসীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ক্ষত্রিয়ের দায় যেমন ক্ষেত্র তেমনি ভাবে সাময়িক বন্দোবস্তের দ্বারা পূরিত হইত, ক্ষত্রিয়ের দায়-পূরণার্থ কোনও স্থায়ী পাকা বন্দোবস্ত হইয়া উঠে নাই। পূর্ব্বে যে ক্ষত্রিয়সমস্যার কথা বলিয়াছি, উহাই ইহার কারণ। ভারতকে সমাক্রান্ত করিয়া ইতিহাসে বারম্বার রাজশক্তির উদ্ভব হইয়াছে। সেই রাজশক্তির দ্বারা কখনও বা আমাদের প্রাচীন সমাজনির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়ের দায় পূরিত হইয়াছে, কখনও বা হয় নাই। জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষত্রিয়শক্তির অভ্যুদয় নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর, আমাদের দেশেও বারম্বার ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। সমাজ-নির্দ্দিষ্ট বৈশ্যের দায় অনিয়ন্ত্রিত থাকায় বাহিরের প্রয়োজন ও সুযোগ হিসাবে আপনা-আপনি বরাবর আত্মপূরণের পথ খুঁজিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে নিতান্ত অসহায় হইয়া ঐ দায়ও একপ্রকার লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু আবার নবযুগের নূতন বায়ুহিল্লোল অনুভূত হইতেছে। সনাতন

সমাজে সমষ্টির বেদনা ব্যষ্টির প্রাণ স্পর্শ করিতেছে, সমগ্র সমাজের প্রয়োজন ও দায়কে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও দায় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যাইতেছে। সমাজের অন্তরে যেমন সমন্বয়ের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে, বিভিন্ন সমাজের সহিত বিশ্বজনীন সাধনায় সম্মিলিত হইবার আগ্রহও তেমনি সমাজের অন্তরে সমুদিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আভাস পাইলাম, আমাদের সমাজগৃহ, কোন নক্সা, কোন স্থাপত্য অনুসারে আদিযুগ হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছিল। প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত, স্বামীজির পরামর্শ অনুসারে সমাজ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য ঐ গৃহনির্ম্মাণের কার্য্য সমাপ্ত করা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আমাদের সমাজের উৎপত্তি ও পরিণতির কতকগুলি মূলতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লইলাম. আগামীবারে সামাজিক উন্নতির উপায় সম্বন্ধে বিচার করা যাইবে। এখন আলোচিত মূলতত্ত্বগুলির একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিবদ্ধ করিয়া, আমরা আগামী প্রবন্ধের অবতারণার সুবিধা করিয়া রাখি,—যথা :—

১। মানুষের মূল লক্ষণ পরমার্থের হংস থাকা। জগতের জন্য সেই মনুষ্যত্বের আদর্শ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পরমার্থের সম্যক সাধনব্যপদেশে মহর্ষিগণ ভারতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

২। পরমার্থের সাধনাদর্শরক্ষণরূপ মূল প্রয়োজনের পূরণার্থ ঋষিসমাজকে আরও তিনটী প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেই প্রয়োজন-পূরণের উপায়স্বরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব।

৩। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়সমস্যার ব্যবস্থার উদয় এবং স্থায়ীভাবে তৎপূরণে বিফলতা আমরা দেখিয়াছি।

৪। স্মার্ত্তযুগে ঋষিপদবী বিভক্ত হইয়া সংসারী বেদযাজক ও সন্ন্যাসী পরমার্থসাধকে অনুবর্ত্তন করিল। পরবর্ত্তী যুগে ঘোর অনার্য্যসমস্যা হইতে সনাতন সমাজ ভগবান বুদ্ধের কৌশলে রক্ষা পাইল।

৫। পরমার্থের সাধনাদর্শ সম্বন্ধে সমাজের দুইটী কর্ত্তব্য—সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ। আদর্শের সম্যক সংরক্ষণার্থে সনাতন সমাজপ্রবাহকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতে হইবে। অথচ জগতে ঐ আদর্শের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ভাবতান্তর্বর্ত্তী বিভিন্ন সমাজ লইয়া ঐ পারমার্থিক আদর্শের সাধনায় নেশন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। "ভারতের সাধনা" শীর্ষক প্রবন্ধ-পর্য্যায়ে সেই মহৎ কর্ত্তব্যেরই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

৬। সমাজের পূর্ণ পরিণতির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে

অগ্রসর হইতে হইবে। সেই পরিণতির অবস্থায় সমগ্র সমাজের প্রত্যেক প্রয়োজন ও দায় সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিদ্বারা তাহার নিজের প্রয়োজন ও দায় বলিয়াও অনুভূত হইবে। বিশেষ ভাবে প্রত্যেক অঙ্গের স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, সাধারণভাবে সকলেরই ঐরূপ প্রয়োজন ও দায়বোধ থাকা সামাজিক পরিণতির চরম লক্ষ্য।

জীবন্মুক্ত।

জড় দেহ মাঝে যার চৈতন্য সঞ্চার
করে কর্ম্ম, কর্ম্ম-চক্র যাবে না ঘুরায়,
জন্ম মৃত্যু নাহি রচে শৃঙ্খল যাহার,
জীবনে সে জীবন্মুক্ত বিচরে ধরায়।
পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, কর্ত্তব্য যখন
পুষ্পদলগুলি সম বিলুণ্ঠিত হয়,
ঘন-রস পক্ক সে যে ফলের মতন
দেহ-বৃক্ষে চিত্ত-বৃন্তে লঘু-লগ্ন রয়।
আছে দেহ, দেহ-বুদ্ধি চির-বিগলিত,
আছে মন, কামনার নাহি আকর্ষণ,
মায়ার ভিতরে থাকি' মায়া-বিরহিত,
কর্ম্ম-রত, ফল তার ভুঞ্জে জগজন।
কণ্ঠ-লগ্ন কালকূট ভুজঙ্গে না জারে,
তেমতি বিষয়-বিষ না পরশে তারে।

২৩। ১১। ১৯১১ শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।
বসিরহাট

বুদ্ধদেব।*

(প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু।)

আজ জ্ঞানীজগতের চিরস্মরণীয় দিন। আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান্ বুদ্ধদেব পুণ্যভূমি ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজ জগতের একতৃতীয়াংশ ব্যক্তি সেই ভগবদবতারের জন্মোৎসব করিতেছেন। যাঁহার জ্ঞানালোকে একদিন সমস্ত ভারত প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, যিনি জ্ঞানালোকবিস্তারের জন্যই এই ভারতভূমে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ লোক আজও যাঁহার ভক্ত ও যাঁহার নামমাহিমা শ্রবণে কৃতকৃতার্থ ও ধন্য হইতেছেন, আজ ভারতবাসী কেন না সেই ভগবদ্-অবতারের পুণ্যময় জন্মোৎসবে যোগদান করিবেন? যাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া সুদূর দক্ষিণে সিংহল হইতে উত্তরে জাপান পর্য্যন্ত জ্ঞানী-জনসাধারণ আপনাদিগকে পূত ও ধন্য মনে করিয়া থাকেন, আজ সেই ভগবদ্ অবতারের জন্মভূমির অধিবাসী তাঁহার পবিত্রনাম স্মরণে কেননা গৌরবান্বিত ও কৃতার্থ হইবেন। যে ভারতসন্তানের পূজায় আজও সমস্ত বৌদ্ধজগৎ উৎফুল্ল, আমাদের ভারতের সেই জ্ঞানবীরের জন্য, আমরা হিন্দু সন্তান আজ এই স্মরণীয় দিনে কেননা ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিব?

এমন একদিন গিয়াছে, ভগবান্ তথাগতের জন্মোৎসবে সমস্ত ভারতবাসী আনন্দে যোগদান করিতেন। আমি ভারতে বৌদ্ধযুদ্ধের কথা বলিতেছি না, বৌদ্ধপ্রভাবের কথা বলিতেছি না, হিন্দুর আধিপত্য কালে আর্য্য হিন্দুসমাজের নিকট ভগবান্ বুদ্ধ কিরূপ পূজা পাইয়াছিলেন, আমাদের হিন্দু শাস্ত্র হইতে, হিন্দুর পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট তাহারই কিছু কিছু আজ এই মহতীসভায় প্রকাশ করিতেছি। সহস্র সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থে সকল দিক হইতে ভগবান বুদ্ধের যে মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমি তাহার আলোচনা করিতেছিনা। হিন্দুসমাজে একদিন তাঁহার কিরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল, হিন্দুসমাজ মধ্যে সম্প্রদায়বিশেষে তিনি কিরূপ পূজা পাইয়াছিলেন এবং অদ্যাপি পাইয়া আসিতেছেন, আজ আপনাদের নিকট সেই হিন্দুর ঘরের কথাই প্রকাশ করিব।

---

* কলিকাতায় বিবেকানন্দ-সমিতি কর্ত্তৃক ওভারটুন-হলে বুদ্ধোৎসবোপলক্ষে যে সভা আহূত হয়, তাহাতে এই প্রবন্ধটী পঠিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ বলিতে চান, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান্ বুদ্ধ হিন্দু-সমাজে ভগবদ্-অবতার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন. কিন্তু আমরা বলিতে চাই, তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতে শাক্যসিংহ হিন্দু সমাজে ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীর-ঐতিহাসিক কল্‌হন পণ্ডিত তাঁহার রাজতরঙ্গিণীর রচনা কালে যে "নীলমত পুরাণ" হইতে কাশ্মীরেব আদি ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বৈশম্পায়নপ্রোক্ত সেই নীলমত-পুবাণ কয়েক বৎসর হইল, আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই নীলমত পুবাণে আমবা পাইযাছি মহা-বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইযাছিলেন, এজন্য ঐদিন সর্ব্ব-সাধারণে তাঁহার জন্মোৎসব করিবেন। উক্ত পুবাণে ঐদিবস বুদ্ধ-প্রতিমা স্থাপন এবং শাক্যদিগেব মন্ত্রানুসারে তাঁহার পূজা কবিবাব বিধান বহিযাছে। সেই স্মরণীয় দিনে শাক্য ভিক্ষুদিগকে গোদান, বস্ত্রদান, অন্নদান ও ধর্ম্মগ্রন্থ দানেব ব্যবস্থাও রহিয়াছে।

নীলমত পুবাণ হইতে সম্পষ্ট আমরা জানিতে পাবিতেছি যে,আর্য্য হিন্দুসমাজ কেবল বিষ্ণুব অবতার বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বুদ্ধদেবকে তাঁহাদেব উপাস্য দেবতা মধ্যেও গ্রহণ করিযাছিলেন। সুতবাং আমাদেব পুবাণশাস্ত্রমতেও আজ আমাদের বড় উৎসবেব দিন। কপিলবাস্তু নগরে মহাবাজ শুদ্ধোদন এই শুভদিনে শাক্যসিংহকে লইয়া যে জন্মোৎসব কবিয়াছিলেন, একদিন সমস্ত ভারতবর্ষে সেই উৎসব প্রচলিত ছিল, তাহাই বহুরূপান্তরিত হইয়া বৈষ্ণব জগতে ভগবানের ফুলদোলরূপে পরিণত হইয়াছে। এই শুভদিনে ভগবান শাক্যসিংহ অশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন। সেই স্মরণীয় ঘটনা স্মরণ কবিয়া বঙ্গ উৎকলেব নানা স্থানে ধর্ম্মেব গাজন বা উড়া-পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে।

আজ ভগবান্ বুদ্ধদেব এই শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় নির্ব্বাণ লাভ কবিয়াছিলেন। সেই ঘটনা স্মবণ করিয়া কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৌড় ও বঙ্গেব কোন কোন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী গাজনপর্ব্বে প্রায়োপবেশন দ্বারা আত্মোৎসর্গ করিতে বিচলিত হন নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে,গৌড় ও উৎকলের অধিবাসীবৃন্দ তথাগতেব সেই স্মরণীয় দিন আজও বিস্মৃত হন নাই। ললিত-বিস্তর ও চীনপবিব্রাজকের প্রমাণবৃত্তান্তে লিখিত আছে শুভদ্বাদশীর দিন রাজা শুদ্ধোদন শিশু শাক্যসিংহকে পূজা দিবার জন্য শিব মন্দিরে আনিয়াছিলেন, মহেশ্বর সেই ভগবদ্-অবতারকে দর্শন করিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন। সেই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ কবিযা পরবর্ত্তীকালে হিন্দু-

সমাজ বুদ্ধদ্বাদশীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমাদের বরাহপুরাণে ৪৭ অধ্যায়ে এবং সুপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রিরচিত চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণির ব্রতখণ্ডে সেই শ্রাবণী শুক্ল পক্ষীয় বুদ্ধদ্বাদশীর বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

একদিন ভারতবাসী নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ এই বুদ্ধদ্বাদশী-ব্রত পালন করিতেন। অধুনা হিন্দুসমাজ হইতে অপরাপর বহু ব্রতানুষ্ঠানের ন্যায় এই বুদ্ধদ্বাদশীব্রতটি বিলুপ্তপ্রায় হইলেও গৌড়বঙ্গের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নিকট এই শুভ দ্বাদশী কৃত্য বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও পর্য্যন্ত গৌড় বঙ্গের নানা স্থানে যেখানে যেখানে ধর্ম্ম-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই সেই স্থানে শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশীর দিন ধর্ম্ম-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। স্কন্দ পুরাণের হিমবৎখণ্ডেও বুদ্ধমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শ্রাবণ মাসে বুদ্ধপূজার শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও আমরা এই বুদ্ধাবতারের প্রসঙ্গ পাইয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে ভগবানের অবতারের সংখ্যা একবিংশতি, এই কলিযুগে তিনি কীকটে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধনামে অবতীর্ণ হইবেন।

"বুদ্ধনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি"। অঞ্জন নাম শুনিয়া কেহ কেহ মনে করেন, অঞ্জনপুত্র বুদ্ধ শাক্যসিংহ হইতে ভিন্ন। কিন্তু আমরা ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানিয়াছি, শাক্য বুদ্ধের একটী নাম আঞ্জন। শাক্যসিংহই গয়াধামে বোধি-জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। গয়াপ্রদেশে প্রাচীন শিলালিপি হইতে আমরা জানিয়াছি, তথায় যেমন এক সময়ে বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ প্রচলিত ছিল, ব্রহ্মদেশেও সেইরূপ আঞ্জনাব্দ প্রচলিত। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কুমারিকা-খণ্ডে লিখিত আছে,—কলির ২৬০০ বৎসর অতীত হইলে মগধরাজ্যে বুদ্ধের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এখন ৫০১৩ কলির গতাব্দ চলিতেছে, এই অঙ্ক হইতে ২৬০০ শত বাদ দিলে ২৪১৩ অঙ্ক পাওয়া যায়। আজ এই শুভ পূর্ণিমায় ২৪৫৬ বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ আরম্ভ হইল। সুতরাং উক্ত অঙ্ক হইতে বুঝিতেছি যে হিন্দুপুরাণমতেও বুদ্ধ নির্ব্বাণের ৪৩ বর্ষ পরে সমগ্র মগধে তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত ছিল।

আমাদের বৈষ্ণব-কবি জয়দেব দশাবতারের স্তবপ্রসঙ্গে এই নবম অবতারের স্তব কালে লিখিয়াছেন—

> "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং। সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।
> কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥"

জয়দেবের এই উক্তি হইতে অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব বেদনিন্দা বা বেদবিরোধী মত প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, জয়দেব জানাইয়াছেন যে, যে সকল শ্রুতিতে জীবহিংসারূপ যজ্ঞবিধি আছে সদয়-হৃদয় ভগবান্ বুদ্ধ তাহারই নিন্দা করিয়াছেন, বাস্তবিক তিনি বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা পরাবিদ্যার কোথাও নিন্দা করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার-চরিত মধ্যে যিনি বুদ্ধাবতার প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছেন ভগবান্ বুদ্ধদেব বেদের জ্ঞানকাণ্ড প্রচার করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

উৎকলের সর্ব্বপ্রধান বৈষ্ণব কবি জগন্নাথ দাস তাঁহার ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে লিখিয়াছেন—

"প্রবুদ্ধ বুদ্ধ অবতারে।
জ্ঞান বিস্তারি এ সংসারে॥
বেদের কর্ম্ম ছাড়াইবে।
নির্গুণ ধর্ম্ম প্রচারিবে॥
কবণি ন কবিবে পুন।
এন্থু এ মায়ার ধেয়ান॥
পুন এমন্ত সময়রে।
সিদ্ধ অন্ন হেব ঘরে ঘরে॥
সকল বর্ণ এক ঠারে।
বসি ভুঞ্জিব সুগতরে॥"

চারি শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যেরূপ কবিবর জগন্নাথ দাস এ সংসারে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য ভগবান বুদ্ধের অবতারত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ উৎকল-কবি চৈতন্যদাসও শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তাহার নির্গুণ-মাহাত্ম্যে লিখিয়া গিয়াছেন,

"বহুত বুদ্ধ অবতারে।
হরি জন্মিলে এ সংসারে॥
যজ্ঞধর্ম্ম নিন্দা কলে।
ব্রহ্মজ্ঞান কি প্রশংসিলে॥
সকল ধর্ম্ম দূর করি।
কর্ম্মর ফল অনুসারি॥

অনেক কর্ম্ম ধর্ম্ম ফল।
যজ্ঞ তপ ব্রত ফল॥
যাগ তর্পণ আদি করি।
এ সর্ব্ব এক তুল্য ধরি॥
ধর্ম্ম তরু যে কলিযুগ।
আউকে ব্রহ্মজ্ঞান এক॥
সকল ধর্ম্ম আড করি।
আউকে ব্রহ্মজ্ঞান ধরি॥
সে ব্রহ্মজ্ঞান যউ আছে।
ভ্রমই ন ছাডন্তি দাডে॥
জনৈ আউকে খুডি তরু।
আব আউ যে জনৈ মরু॥
এ ভাবে তুঁহি রক্ষা করি।
ব্রহ্মজ্ঞানকু হৃদে ধরি॥
সকল ধর্ম্ম উপেক্ষিলে।
ব্রহ্মজ্ঞানকু সাধ্য কলে॥
যোগধ্যানরে স্থির মন।
রাখিলে ব্রহ্মজ্ঞানে মন॥"

বাস্তবিক যিনি বুদ্ধদেবের মহোপদেশপূর্ণ 'ধম্মপদ' নামক পালিগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন ভগবান্ বুদ্ধ বেদের সার, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানই সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই উপদেশমূলক পালিভাষায় রচিত "তেবিজ্জ সুত্ত" অর্থাৎ ত্রৈবিদ্যসূত্র ও বজ্রজ্ঞানসুত্ত প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থে ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে ভগবান্ বুদ্ধের ভক্তমণ্ডলী মধ্যে নানা মতভেদের সহিত, নানা সম্প্রদায় ও নানা উপধর্ম্মের উৎপত্তির সহিত ভগবানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কতকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং ঐ সকল সাম্প্রদায়িকগণের সহিত পরবর্ত্তী কালে নানা হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্ঘর্ষে হিন্দুসমাজে নানাপ্রকার নিন্দাবাদ প্রচারিত হইয়াছে. তাহারই ফলে ভগবান্ বুদ্ধের জ্ঞানধর্ম্ম হিন্দুসমাজের অনেকটা অজ্ঞাত হইয়া পড়িলেও হিন্দুসমাজ কোন দিন ভগবান্ বুদ্ধদেবকে ছাড়িতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমি Modern Buddhism নামক ইংরাজি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া

সাধারণকে সবিস্তার প্রমাণপ্রয়োগ সহ জানাইয়াছি, বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও পর্য্যন্ত ভারতের নানা স্থানে বিদ্যমান, কোন দিন ভারত হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। উৎকলের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশের নানা স্থানে প্রায় ৭৫০০০ বুদ্ধভক্ত এখনও বাস করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সুদূর মহীশূর রাজ্য, নিজামরাজ্য ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে আজও বহুতর বুদ্ধবৈষ্ণব বাস করিতেছেন, আজও তাঁহারা অতি গোপনে বুদ্ধদেবের পবিত্র নাম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আজও তাহারা এই মহাবৈশাখী পূর্ণিমার দিন মহোৎসব করিয়া থাকেন। চৈতন্য দাসের নির্গুণমাহাত্ম্য উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়াছি,

বহুত বুদ্ধ অবতারে।
হরি জন্মিলে এ সংসারে॥

বাস্তবিক উৎকলবাসী প্রচ্ছন্নবৌদ্ধগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভগবান হরি বুদ্ধরূপে বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। এমন কি, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধস্বামী একবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই অবতারকে লক্ষ্য করিয়া প্রায় ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে যশোমতীমালিকায় লিখিত হইয়াছে—

"মায়া কায়া ধরি অবধূত বুলাইবু।
অলেখ প্রভুঙ্ক আশ্রে সেবা করি থিবু॥
চতুর পাদে কলি আসি ঘুঠিলাক মহী।
মহাতেজ ব্রহ্ম উদে হেবে শূন্যদেহী॥
নব কল্পঠাকু প্রভু উদে হৈথিবে।
খণ্ডগিরি মনিনাগ কপিলসে ঠাবে॥
ফল পত্র ক্ষীর জল করিল আহার।
খেলু খেলুথিবে প্রভু ব্রহ্মাণ্ডে আকর॥
নব মনুষ্য যে আদি দেবলোক যাএ।
জানি ন পারিবে কোহি প্রভুঙ্ক উদয়ে॥
সে শূন্যপুরুষ মানে বিচার যে কলে।
নব সঙ্গ মঞ্চে খেলা করিবু বইলে॥
মহাঘোর পাতক হৈব অবনীর।
ভক্তজাত হইছন্তি আজ্ঞরে আম্বর॥
বুদ্ধরূপ ধরে গুরুরূপে জ্ঞান দেবে।
কুম্ভিপট দেই বানা প্রকাশ করিবে॥

উৎকলের বুদ্ধভক্তগণ বলিয়া থাকেন, দারুব্রহ্ম জগন্নাথই বুদ্ধস্বামীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুসমাজ কলিপাবন বুদ্ধ অবতারকে কখনই ভুলিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান ভারতীয় হিন্দুসমাজে ভগবান্ বুদ্ধদেবই দারুব্রহ্ম জগন্নাথরূপে বিরাজ করিতেছেন। সারল দাসের মহাভারতে মঙ্গলাচরণে দশাবতার স্তুতিপ্রসঙ্গে লিখিত আছে

নবমে বন্দই শ্রীবুদ্ধ অবতার।
ব্রহ্মরূপে বাঞ্ছে কলে শ্রীনীলকন্দর॥

তাই বিষ্ণুপুরের দশাবতার খেলার প্রাচীন তাসে এবং ভারতের নানা স্থানে দশাবতার মধ্যে নবমাবতার বুদ্ধদেব স্থানে দারুব্রহ্ম জগন্নাথের মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ভগবান্ বুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত্তি স্বরূপ বলিয়া তাঁহার দারুময়ী মূর্ত্তি দারুব্রহ্ম নামেই পরিচিত। আজও দারুব্রহ্ম জগন্নাথ হিন্দুসমাজে কলিকালের সর্ব্বপ্রধান উপাস্যরূপে পূজিত হইতেছেন। ভারতের বাহিরে সর্ব্বত্র বৌদ্ধসমাজ যেরূপ বুদ্ধের নানা অবতার বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং আশা করেন যে আবার পাপীতাপীর উদ্ধারের জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন, সেইরূপ উৎকলবাসী ভক্তগণ সেই বিশ্বাসে আশাপথ চাহিয়া আছেন, তাঁহাদের যশোমতীমালিকায় তাঁহাদের সেই আশার কথা পরিস্ফুট রহিয়াছে--

"চাহি কলি মধ্যরে ভকতে চলিবাই।
বুদ্ধ অবতাররূপ দর্শন না পাই॥
বিহারমণ্ডলে শূন্য গাদি তুলাইবে।
সে অলেখ প্রভু ধুনিকুণ্ডে গুপ্ত থিবে॥
মায়ারূপে বুদ্ধ অবতারে নরদেহি।
ভক্তজন হিতে ভক্ত উদ্ধারিবে পাই॥"

অর্থাৎ এই কলিকালে বুদ্ধ অবতাররূপ দর্শন না পাইয়া অর্থাৎ ভক্তগণ ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা আশা করেন, আবার বিহারমণ্ডলে শূন্যসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, আবার সেই অলেখ প্রভু অগ্নিকুণ্ডে প্রকাশ পাইবেন। আবার তিনি ভক্তগণের মঙ্গল ও উদ্ধারের জন্য মায়ারূপে নরদেহে বুদ্ধ অবতারে প্রকাশ পাইবেন।

সংবাদ।

বিগত ২৮শে এপ্রেল বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎস্বামী নির্ম্মলানন্দ মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের শৈলনিবাস উতকমন্দে প্রচারকার্য্যে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাকে চার দিবস বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। সভায় অপ্রত্যাশিতরূপে জনতা হইয়াছিল। প্রথম দুই দিবস বর্ত্তমান ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। শেষ দুই দিন প্রশ্নোত্তর সভাতেও খুব উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। সংবাদপত্রাদি হইতে জানা যায় যে উতকমন্দের জনসাধারণ স্বামী নির্ম্মলানন্দের সঙ্গ ও উপদেশ আরও কিছুদিন লাভ করিবার জন্য বিশেষভাবে উৎসুক হইয়াছিল।

কাছাড় দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড।

কাছাড় দুর্ভিক্ষে সাহায্যার্থ উদ্বোধন অফিসের ঠিকানায় নিম্নলিখিত চাঁদা প্রেরিত হইয়াছিল। মণি-অর্ডারের খরচাবাদে উহা, বাবু কৈলাশচন্দ্র দাস, হাইলাকান্দি, কাছাড়,—এই ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছে। সাহায্যদাতাগণের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা যদি সোজা কৈলাস বাবুর ঠিকানায় অর্থসাহায্য পাঠাইয়া দেন তবে দুইবার মণি-অর্ডারের খরচা লাগে না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ধর ও নেহারিচরণ দাস কর্ত্তৃক শিবপুর কলেজে সংগৃহীত	১০৲
ভাগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ, স্কুলছাত্রগণ	৪৷৹
খান্দারপাড়া, আর, সি ইনিষ্টিটিউসন ছাত্রবৃন্দ	৫৲
শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	৫৲

৷/৹ মনি-অর্ডার খরচাবাদে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪৩/৹
হাইলাকান্দিতে প্রেরিত হইয়াছে। ইতি

সম্পাদক, উদ্বোধন।

REGISTERED No. C 295

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

BENGAL LIBRARY
14 AUG 1912

সূচী।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।

মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সডাক ২৲ দুই টাকা।

প্রতি সংখ্যা ।• আনা।

… বর্ষ—৭ম সংখ্যা। শ্রাবণ ১৩১৯।

IMPERIAL

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্।

৩০-U নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

খাঁটী স্বদেশী দ্রব্য

কেবল আমাদের নিকটই পাইবেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা বিপুল আয়োজন করিয়াছি, খাঁটী জিনিষ লইবার ইচ্ছা থাকিলে সংবাদ লউন।

কাশী সিল্ক
বেনারসী সিল্ক
কাপড়, চাদর,
মুর্শিদাবাদ।
সিল্ক, কাপড়, চাদর,
তসর, গরদ।
আসাম এণ্ডি, মুগা,
তাঁতের,
ধুতি, সাড়ী ইত্যাদি

আমাদের নিকট পাইবেন, ক্যানানোর, শিকারপুর, প্রভৃতি সকল প্রকার জামা, কাপড়, গেঞ্জী, মোজা ইত্যাদি। তৈয়ারী ও
অর্ডারী
সার্ট, কোট, সেমিজ, বডিস্, ইত্যাদি

সকল প্রকার
মিলের—
কাপড়, থান, তোয়ালে বিছানার চাদর ইত্যাদি
ষ্টেসনারি—
গন্ধদ্রব্য ও কেশ-তৈল, সাবান, চিরুনী, বুরুস, পাউডার ইত্যাদি

মফঃস্বলের ভদ্র ও ব্যবসায়ী মহোদয়গণ যাহাতে সকল সময় কলিকাতায় বড় বাজারের পাইকারী ও খুচরা দরে সকল প্রকার বস্ত্রাদি; চাঁদনীর দরে জামা, কাপড় ইত্যাদি ও সুলভ মূল্যে দেশী বস্ত্রাদি পাইতে পারেন তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছি। আর কলিকাতায় বাজার করিতে আসিতে হইবে না, ঘরে বসিয়া পছন্দসই জিনিস পাইবেন, পছন্দ না হইলে ফেরত দিতে পারেন। পাইকারদিগের আর দোকান ফেলিয়া ছুটাছুটি করিতে হইবে না।

জাতীয় বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রেরিত—

আমেরিকা যাত্রী শিক্ষার্থীদিগের সুট, সাজ, সরঞ্জাম আমরাই দিয়া থাকি; আমাদের কাট ছাট সাহেবদিগের মত, দর তাহার অর্দ্ধেক।

ছাত্রগণের জামা, সার্ট, কোট, সুটে আমরা টাকায় দুই পয়সা কমিশন দিয়া থাকি পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

14 SEP 1912

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

[স্বামী সারদানন্দ]

উন্মত্ত ব্যাকুলতা, ভগবদ্দর্শন ও বিবাহ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে পাঠককে ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি কথা এখানেই বলিয়া রাখা ভাল। কারণ, উহা জানা থাকিলে তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী অনেকগুলি ঘটনা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব। আমরা দেখিলাম, অষ্টপাশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেবলমাত্র মনে মনে ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু শরীরের দ্বারাও ঐ সকলকে যতদূর ত্যাগ করা যাইতে পারে তাহা করিয়াছিলেন। এইরূপ পরেও দেখিব।

জাত্যভিমান নাশ করিয়া মনে যথার্থ দীনতা আনয়নের জন্য তিনি, অপরে যে স্থানকে অশুদ্ধ ভাবিয়া সর্ব্বথা দূরে পরিহার করে, সে স্থান বহুপ্রযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিতেছেন!

'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ' না হইলে, সংসারে সর্ব্বদা বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রস্তর সকলকে মৃণ্ময় ইষ্টকখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান না করিতে পারিলে, মানব-মন ঐ সকল পদার্থের সহায়ে নশ্বর দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-লাভরূপ উদ্দেশ্য হইতে আপনাকে এককালে বিযুক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে সম্পূর্ণ ধাবিত হয় না এবং যথার্থ যোগীও হইতে পারে না—একথা শুনিয়াই ঠাকুর কয়েক খণ্ড মুদ্রা ও লোষ্ট্র হস্তে গ্রহণ করিয়া বারম্বার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছেন!

সর্ব্ব জীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য কালীবাটীতে কাঙ্গালীদের ভোজন সাঙ্গ হইলে দেবতার প্রসাদ বলিয়া তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন কিঞ্চিৎ গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মস্তকে ধারণ করিতেছেন; পরে উচ্ছিষ্ট পত্রাদি মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গা-তীরে নিক্ষেপ করতঃ স্বহস্তে মার্জ্জনী ধরিয়া ঐ স্থান ধৌত করিতেছেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের দ্বারা দেবসেবা যৎকিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেছেন!

ঐরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকল স্থলেই দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে প্রতিকূলবিষয়সকলকে কেবলমাত্র মনে মনে ত্যাগ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কিন্তু স্থূলভাবে ঐ সকলকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া অথবা নিজ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গকে ঐ সকল বিষয় হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানসকল করিতে উহাদিগকে বলপূর্ব্বক নিয়োজিত করিতেন। আর দেখা যায়, ঐরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার মনের পূর্ব্ব সংস্কারসকল যেন এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং তদ্বিপরীত নবীন সংস্কারে অনুপ্রাণিত হইয়া মন এমন দৃঢ় ভাবে উহা ধারণ করিত যে, কখনই সে আর উহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারিত না। এইরূপে কোন নবীনভাব মনের দ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়া শরীরেন্দ্রিয়াদির দ্বারা কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও যতক্ষণ না অনুষ্ঠিত হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের মনে উহার যথাযথ ধারণা হইয়া উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইয়াছে, একথা তিনি কখন স্বীকার করিতেন না।

পূর্ব্ব সংস্কারসমূহ তিলমাত্র ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ আমরা ভাবি, ঠাকুরের ঐরূপ আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। তাঁহার ঐরূপ আচরণসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ কখন কখন বলিয়াও বসিয়াছেন—অপবিত্র কদর্য্য স্থান পরিষ্কৃত করা, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া মৃত্তিকা-সহ মুদ্রা-খণ্ড গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী তাঁহার নিজ মনঃকল্পিত সাধনপথ বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব উপায়সকল অবলম্বনে তিনি মানসিক যে সকল ফল পাইয়াছিলেন তাহা অতি শীঘ্রই তদপেক্ষা সহজ উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে। উত্তরে বলিতে হয়—উত্তম কথা, কিন্তু ঐ বিষয়ের সহায়ক কোনরূপ শারীরিক অনুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে বিষয়-ত্যাগরূপ তোমাদের তথাকথিত সহজ উপায়ের অবলম্বনে কয় জন লোক এ পর্য্যন্ত পূর্ণভাবে রূপরসাদি-বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া ষোল আনা মন ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? উহা হইবার নহে। মন একরূপ চিন্তা করিয়া একদিকে চলিবে এবং শরীর ঐ চিন্তা বা ভাবের বিপরীত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া অন্য পথে চলিবে এই প্রকারে কোন মহৎ কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ঈশ্বরলাভ তো দূরের কথা। কিন্তু রূপরসাদি-ভোগলোলুপ মানব তাহা বুঝে না। মনে কোন বিষয় ত্যাগ করা ভাল বলিয়া বুঝিয়াও পূর্ব্বসংস্কারবশে শরীরেন্দ্রিয়াদির দ্বারা উহা ত্যাগ করিতে

পারে না এবং ভাবিতে থাকে, শরীর যে ভাবের কার্য্যই করুক না কেন, তাহাতে কি আসে যায়, মনে তো আমি অন্যরূপ ভাবিতেছি! যোগ ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে ভাবিয়াই সে আপনি আপনাকে ঐরূপে প্রতারিত করিয়া থাকে। কিন্তু আলোকান্ধকারের ন্যায় যোগ ও ভোগরূপ দুই পদার্থ কখন একত্রে থাকিতে পারে না; কামকাঞ্চন-ময় সংসার ও ঈশ্বরের সেবা যাহাতে একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পারা যায় এরূপ সহজ পথের আবিষ্কার, আধ্যাত্মিক জগতে এপর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই।* শাস্ত্র সেজন্যই আমাদিগকে বারম্বার শিক্ষা দিতেছেন, যাহা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা কায়-মন-বাক্যে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও ঐরূপ কায়-মন-বাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই সাধক ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইবেন। সেজন্যই বলিয়াছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠান রহিত তপস্যা সহায়ে,—"তপসাবাপ্যলিঙ্গাৎ",—মানব কখন আত্মসাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ হয় না। যুক্তিও বলে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতেই মানব-মন ক্রমশঃ কারণে উপস্থিত হয়—"নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়!"

সে যাহা হউক, দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্রজের মৃত্যুর পরে ঠাকুর, শ্রীশ্রী-জগদম্বার পূজায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের-জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছেন তাহাই বিশ্বস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজা সমাপনান্তে ৺দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদ-প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করান তিনি পূজাঙ্গের মধ্যেই অন্যতম বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন—রামপ্রসাদপ্রমুখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন; জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না? ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেন—"মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্; আমায় তবে কেন দেখা দিবি না? আমি ধন জন ভোগসুখ কিছুই চাহি না, আমায় দেখা দে!"—প্রার্থনা করিতে করিতে নয়ন-ধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত এবং ঐরূপ কাতর ক্রন্দনে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া ৺দেবীকে প্রসন্না

* Ye cannot serve God and Mammon together.—Jesus. (Holy Bible).

করিতে উদ্যত হইতেন। এইরূপে পূজা ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিল।

অদ্ভুত পূজকের দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দ্দিষ্ট কালও এই সময় হইতে দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কারণ, পূজা করিতে বসিয়া তিনি ব্যবস্থামত নিজ মস্তকে একটি পুষ্প দিয়াই হয়ত দুই ঘণ্টাকাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীন ভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন, অন্নাদি নিবেদন করিয়া মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যুষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া ৺দেবীকে সাজাইতেই কত সময় ব্যয় করিলেন অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। আবার অপরাহ্নে বা আরতির অন্তে জগন্মাতাকে যদি গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথা বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে আরাত্রিক বা সান্ধ্য শীতলাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইল।—এইরূপে কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল।

ঐরূপ নিষ্ঠা ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটীর জনসাধারণের দৃষ্টি যে, এখন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। সাধারণে সচরাচর যে পথে চলিয়া থাকে তাহা ছাড়িয়া নূতন ভাবে কাহাকেও চলিতে বা কিছু করিতে দেখিলে লোকে প্রথম বিদ্রূপ পরিহাসাদি করিয়া থাকে। কিন্তু দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি যতই দৃঢ়তা সহকারে নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হয় ততই সাধারণের মনে পূর্ব্বোক্ত ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং উহার স্থল শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করে। ঠাকুরের ভাগ্যেও যে ঐরূপ হয় নাই, তাহা নহে। কয়েক মাস ঐরূপে পূজাদি করিতে না করিতেই তিনি অনেকেরই বিদ্রূপভাজন হইলেন।

আবার কেহ কেহ কিছুকাল পরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্নও হইয়া উঠিল। শুনা যায়, মথুর বাবু এই সময়ে ঠাকুরের পূজাদি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, "যেরূপ পূজক পাইয়াছি তাহাতে ৺দেবী শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।" লোকের ঐরূপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোন দিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাগরগামিনী নদীর ন্যায় তাঁহার মন এখন হইতে অবিরাম এক ভাবেই শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদোদ্দেশে প্রধাবিত হইয়াছিল।

দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল ঠাকুরের মনের অনুরাগ ব্যাকুলতা ও

ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, মনের ঐ প্রকারে অবিরাম একদিকে গতি তাঁহার শরীরে নানাপ্রকার বাহ্যিক লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার কমিয়া গেল, নিদ্রা কমিয়া গেল, শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা, 'কি করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিন্তা মনে নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যান পূজাদি কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব সদাই লক্ষিত হইতে লাগিল।

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, 'মা, এত যে ডাকৃচি তার কিছুই তুই কি শুন্‌চিস্ না, রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েচিস্, আমাকে কি দেখা দিবি না?' ঠাকুর বলিতেন—

"দেখা পাইলাম না বলিয়া হৃদয়ে তখন অসহ্য যন্ত্রণা, জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে মনে হইল, ভিতরে হৃদয়-মনটাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে। মার দেখা বোধ হয় কোনকালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তাহারই উপর পড়িল। উহার সাহায্যে এই দণ্ডেই ইহার অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা হস্তে লইয়াছি, এমন সময়ে সহসা মার অদ্ভুত অপূর্ব্ব দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্ দিক্ দিয়া সে দিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানি না। অন্তরে অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের ও মার সাক্ষাৎ প্রকাশ বহিয়াছে, এইটুকু মাত্রই হুঁস্ ছিল।"

জগদম্বার কিরূপ দর্শন যে এখন তিনি পাইয়াছিলেন তাহা বিশেষ ভাবে ঠাকুরের নিকটে শুনিবার আমাদের অবসর হয় নাই। কোন কারণে সেদিন সহসা অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা আসিয়া পড়ায় ঐকথার পরিসমাপ্তি হয় নাই। পরে অন্য এক দিন তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলে কথায় কথায় তিনি

আমাদিগকে কালীমন্দিরের অদ্ভুত দর্শনের কথা বিবৃত করিয়া বলেন। ঐ দর্শনই যে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রথম দর্শন এ কথা জানিয়া লইবার আমাদের তখন অবকাশ না হইলেও পাঠককে উহা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। ঠাকুর বলিলেন—"ঘর, দ্বার মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই। —আর দেখিতেছি কি?—এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যে দিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল উর্ম্মি-মালা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহা উপরে নিপতিত হইয়া কোথায় তলাইয়া দিল! হাপাইয়া, হাবুডুবু খাইয়া এককালে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।" উহাই কি ঠাকুরের প্রথম দর্শন? এবং চৈতন্য-ঘন, জ্যোতিঘন, জগদম্বার বরাভয়করা মূর্ত্তি?—ঠাকুর কি এখন তাহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? কে বলিবে? তবে শুনিয়াছি প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখনি আসিয়াছিল তখনি তিনি কাতরকণ্ঠে 'মা,' 'মা' শব্দমাত্রই কেবল উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন পূর্ব্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্ত্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য তাঁহার প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। বাহ্যিক ক্রন্দন ও নয়ন-ধারায় সকল সময় প্রকাশিত না হইলেও উহা অন্তরে সকল সময়েই বিদ্যমান থাকিত, এবং কখন কখন উহা এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে 'মা আমায় কৃপা কর্, দেখা দে'—বলিয়া এমন চীৎকার ক্রন্দন করিতেন যে, চারি পার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত!—ঐরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে, এ কথার বিন্দুমাত্রও তখন আর তাঁহার মনে আসিত না। তিনি বলিতেন, চারি দিকে দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্ত্তির ন্যায় (অবাস্তব) মনে হইত, (এবং তজ্জন্য) মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা ভয়ের উদয় হইত না! ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় বাহ্যিক সংজ্ঞাশূন্য হইবার পরেই কিন্তু দেখিতাম, মার ঐ বরাভয়করা চিন্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি!—দেখিতাম, ঐ মূর্ত্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে!"

পূর্ব্বোক্ত দর্শনের পরে ঠাকুর, কিছুকালের জন্য একেবারে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেন। মন্দিরে যথারীতি পূজাদি কার্য্য নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হৃদয় যতটা পারে স্বয়ং উহা অন্য এক

ঠিকা ব্রাহ্মণের সহায়ে কোনরূপে সম্পাদন করিতে লাগিল। মাতুল বায়ু-রোগগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়া সে তাঁহারও চিকিৎসায় সবিশেষ মনোনিবেশ করিল। শুনিয়াছি, ভূকৈলাসের রাজবাটীতে নিযুক্ত এক সুযোগ্য বৈদ্যের সহিত ইতিপূর্ব্বে কোনও সূত্রে পরিচয় হওয়ায় হৃদয় তাঁহারই দ্বারা এখন ঠাকুরের চিকিৎসা করাইতে লাগিল, এবং দুই চারি দিনে রোগের উপশম হইতে না দেখিয়া কামারপুকুরে ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতার নিকটেও সংবাদ পাঠাইল।

ভগবদ্দর্শনের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতায় ঠাকুর, যেদিন একেবারে অস্থির হইয়া না পড়িতেন সেদিন পূর্ব্ববৎ নিয়মিতভাবে পূজা ও ধ্যানাদি করিতে অগ্রসর হইতেন। ধ্যানাদি করিবার কালে ঐ সময়ে তাঁহার যেরূপ দর্শন হইত তদ্বিষয়েও ঠাকুর আমাদিগকে কখন কখন কিছু কিছু বলিতেন। বলিতেন—"মার নাটমন্দিরের ছাদের আলিশায় যে ধ্যানস্থ ভৈরব মূর্ত্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম 'ঐরূপ স্থির নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া মার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে।' ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকলে পায়ের দিক হইতে উর্দ্ধে খট্ খট্ করিয়া আওয়াজ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, কে যেন ভিতরে ঐ সকল স্থানে তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে। আর, যতক্ষণ ধ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে, একটুও নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরিবর্ত্তন করিয়া লইব, অথবা ইচ্ছামাত্রেই তখনি ধ্যান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন বা অন্য কর্ম্মে লিপ্ত হইব তাহার সামর্থ্য থাকিত না। যতক্ষণ না পুনরায় পূর্ব্ববৎ খট্ খট্ করিয়া (এবার উপরের দিক হইতে পা পর্য্যন্ত) আওয়াজ হইয়া ঐ সকল গ্রন্থি খুলিয়া যাইত ততক্ষণ একভাবে কে যেন জোর করিয়া বসাইয়া রাখিত। ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতির্বিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম, পরে কুয়াষার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম, পরে গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গে সমগ্র পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম, আবার চক্ষু চাহিয়াও অনেক সময় ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহা বুঝিতাম না, ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ তাহাও জানিতাম না। সুতরাং মার (জগন্মাতার) নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম—'মা, আমার কি হচ্ছে, কিছুই জানি না, তোকে

ডাকিবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না, যাহা করিলে তোকে পাওয়া যায় তুইই তাহা আমাকে শিখিয়ে দে। তুই না শিখালে আমাকে কে আর শিখাবে মা, তুই ছাড়া আমার গতি ও সহায় আর কেহই যে নাই।' এক মনে ঐরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় কাতর ক্রন্দন করিতাম।"

রামকুমারের মৃত্যুর পরে এক বৎসর কাল যাইতে না যাইতেই ঠাকুরকে ঐরূপে বায়ুরোগাক্রান্ত হইতে শুনিয়া জননী চন্দ্রমণি দেবী এবং শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। লোকে বলে, মানবের অদৃষ্টে যখন দুঃখ আসে তখন একটিমাত্র দুর্ঘটনায় উহার পরিসমাপ্তি হয় না, কিন্তু নানাপ্রকারের দুঃখ চারিদিক হইতে এককালে উপর্য্যুপরি আসিয়া তাহার জীবনাকাশ আচ্ছন্ন করে—ইহাদেরও এখন ঐরূপ মনে হইতে লাগিল। বিশেষতঃ শ্রীযুত গদাধর আবার চন্দ্রাদেবীর পরিণত বয়সে প্রাপ্ত, আদরের কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি শোকে দুঃখে অধীরা হইয়া পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং নিকটে আসিলে পুত্রের পূর্ব্বোক্ত উদাসীন, উন্মনা, চঞ্চল ভাব দেখিয়া এবং সময়ে সময়ে তাহার 'মা' 'মা' বলিয়া কাতর ক্রন্দন শুনিয়া উদ্বিগ্ন মনে নানারূপে প্রতীকারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ঔষধাদি ব্যবহারের সহিত শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়্‌ফুক্ প্রভৃতি নানা দৈব প্রক্রিয়ারও অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

বাটীতে ফিরিয়া ঠাকুর অনেক সময় সাধারণ সহজভাবে থাকিলেও মধ্যে মধ্যে ভাববিহ্বল হইয়া পড়িতেন এবং যখন ঐরূপ হইতেন তখন তাঁহার চাল চলন ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যাইত। আবার গাত্রদাহের জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। এইরূপে একদিকে তাঁহার সকলের সহিত সরল অমায়িক ব্যবহার, দেবভক্তি, মাতৃভক্তি ও বয়স্য-প্রেমের যেমন পূর্ব্ববৎ প্রকাশ ছিল, অপর দিকে আবার তেমনি সময়ে সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীনতা, লজ্জা, ভয় ও ঘৃণারাহিত্য, সাধারণের অপরিচিত একটা অনির্দ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতা এবং নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথের সকল বিঘ্ন বাধা নির্ম্মূল করিবার জন্য অনাশ্রব চেষ্টা তাঁহাতে এক অপূর্ব্ব বিপরীত প্রকাশ উপস্থিত করিয়া লোকের মনে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের উদয় করিয়াছিল। লোকে ভাবিয়াছিল তিনি উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন।

ঠাকুরের মাতা, সরলহৃদয়া চন্দ্রাদেবীর প্রাণেও ইতিপূর্ব্বে ঐ কথা কখন

কখন উদিত হইয়াছিল। এখন অপরেও ঐরূপ আলোচনা করিতেছে শুনিয়া তিনি পুত্রের কল্যাণের জন্য ওঝা আনাইতে মনোনীত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন—"একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্রপূত পল্‌তে পুড়াইয়া শুঁকিতে দিল, বলিল, যদি ভূত হয় তো পলাইয়া যাইবে, কিন্তু কিছুই হইল না!" পরে বিশিষ্ট কয়েকজন ওঝার সাহায্যে পূজাদি করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামান হইল। চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া ওঝাকে বলিল, 'উহাকে (ঠাকুরকে) ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধিও হয় নাই'—পরে সকলের সমক্ষে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও গদাই, তুমি সাধু হতে যাচ্ছ, তবে অত সুপারী খাও কেন? সুপারীতে যে কামের বৃদ্ধি হয়।" ঠাকুর বলিতেন—"বাস্তবিকই ইতিপূর্ব্বে আমি সুপারী খাইতে বড় ভালবাসিতাম এবং যখন তখন খাইতাম, চণ্ডের ঐরূপ কথাতেই উহা তদবধি ত্যাগ করিলাম।"

কামারপুকুরে কয়েক মাস এইরূপে থাকিবার পরে ঠাকুর অনেকটা পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার বয়স তখন একবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। সেটা সন ১২৬৩ সাল, ইংরাজী ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দ * এবং ঠাকুর তখন ইতিপূর্ব্বে প্রায় এক বৎসর কাল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রকৃতিস্থ হইবার এবং ব্যাকুল ক্রন্দনের ভাবটা তাঁহাতে অনেকটা প্রশমিত হইবার নিশ্চিত কোন বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার কোনরূপ অদ্ভুত দর্শনাদি-লাভেই নিশ্চিত তিনি এখন অনেকটা শান্ত হইতে পারিয়াছিলেন। উহা কিন্তু আমাদের সবিশেষ জানা নাই। তবে কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত ভূতীর খালে এবং বুধুই মোড়লের জনশূন্য শ্মশানদ্বয়ে দিবা ও রাত্রির অনেক ভাগ তাঁহাকে এই সময়ে একাকী অতিবাহিত করিতে দেখিয়া এবং এই কাল হইতে সময়ে সময়ে তাঁহাতে অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশের কথা জানিতে পারিয়া আমরা ঐ বিষয় বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারি। তাঁহার আত্মীয়দিগের

* গত মাসের প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পরে আমরা অনুসন্ধানে নিশ্চিত জ্ঞাত হইয়াছি, রাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত রামকুমার ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু ঐ সালের শেষ ভাগেই হইয়াছিল। অগত্যা ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলীর বর্ষ তারিখাদি নির্দ্দেশের ইতিপূর্ব্বে যে ভ্রম হইয়াছে তাহা 'লীলাপ্রসঙ্গ' পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার সময় সংশোধিত হইবে।

নিকটে শুনিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত শ্মশানদ্বয়ে অবস্থিত উপদেবতা-দিগকে বলি দিবার জন্য নানাপ্রকার খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া নূতন হাঁড়ীতে পুরিয়া লইয়া গৃহ হইতে কখন কখন নিষ্ক্রান্ত হইতেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, ভূতবলি নিবেদন করিয়া দিবার পরে ঐ হাঁড়ি বায়ুভরে উর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে লীন হইয়া গিয়াছে, এবং ঐ সকল উপদেবতাকে তিনি অনেক-বার স্বচক্ষে দেখিতেও পাইয়াছেন। কোনও কোন দিন আবার রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ, শ্রীযুত রামেশ্বর শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইয়া ভ্রাতার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুরও ডাক শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিতেন, "যাচ্চি গো দাদা, তুমি এদিকে আর অগ্রসর হই'ও না, তাহা হইলে ইহারা (উপদেবতারা) তোমার অপকার করিবে।" ভূতির খালের পার্শ্বের শ্মশানে ঠাকুর এই সময়ে একটি বিল্ববৃক্ষও স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন এবং শ্মশান মধ্যে যে প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল তাহার তলে বসিয়া অনেক সময় জপ ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন।

ঐরূপে ভূতবলি এবং শিবাবলি দিবার কথাই যে আমরা এইকালে ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিয়াছি তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ-দর্শন বিষয়ক অন্য একটি যোগ-বিভূতির কথাও জানিতে পারিয়াছি। হৃদয় এবং কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর অনেকে ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের শ্রীমুখেও ঐকথা আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন। উহাই এখন আমরা পাঠককে এখানে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী হইতে একথা বেশ অনুমিত হয় যে, জগদম্বার দর্শন-লালসায় ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে ভিতরে যে বিষম অভাব অনুভব করিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক রাজ্যের কতকগুলি অপূর্ব্ব দর্শন ও উপলব্ধি উপস্থিত হইয়া এই সময়ে তাহা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছিল। মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার অসি-মুণ্ডধরা, বরাভয়করা, সাধকানুগ্রহকারিণী চিন্ময়ী মূর্ত্তির দর্শন, তিনি এখন হইতে মধ্যে মধ্যে লাভ করিতেছিলেন এবং সরলহৃদয় বালকের ন্যায় মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যখন যাহা প্রশ্ন করিতেছিলেন অনেক সময় তাহার উত্তরও পাইয়া তদনুযায়ী নিজ জীবন চালিত করিতেছিলেন। শুধু তাহাই নহে, মনে হয়, এখন হইতে তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, জগদম্বার পূর্ণদর্শন লাভ তাঁহার কৃপায়, তাঁহার ভাগ্যে অচিরেই উপস্থিত হইবে।

অপর দিকে তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার মাতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গ দেখিতেছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি সহসা যে বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন দৈবকৃপায় তাহার অনেকটা শান্তি হইয়াছে, তিনি পূর্ব্ববৎ যখন তখন ব্যাকুল ক্রন্দন করেন না, আহারাদিও পূর্ব্ববৎ যথাসময়ে করিয়া থাকেন, তাঁহার অন্য সকল আচরণাদিও তদ্রূপ, তবে যে বলিবে—তিনি যখন তখন শ্মশানে যাইয়া বসিয়া থাকেন, কখন কখন পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নির্লজ্জভাবে ধ্যান পূজাদি করিতে বসেন, পূজা অনুষ্ঠানাদি যাহা করিবেন ভাবিয়াছেন তাহাতে বাধা পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠেন ও কাহারও নিষেধ মানেন না এবং সর্ব্বদা ঠাকুর-দেবতা লইয়াই আছেন—সেটা তো তাঁহার আবাল্য স্বভাব, তাহাতে বায়ুরোগের পরিচয় পাইবার বিশেষ কোনই কারণ নাই।

কিন্তু সর্ব্বপ্রকার সাংসারিকবিষয়েই ঠাকুরের পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা এবং বাহ্য ব্যাপার হইতে দূরাপসৃত সতত উন্মনাভাবের জন্য তাঁহারা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। দৈনন্দিন সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া যতদিন না ঐ উন্মনা ভাবটা প্রশমিত হইতেছে ততদিন বায়ুরোগে পুনরাক্রান্ত হইবার তাঁহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে—একথা তাঁহাদের মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে চিন্তাসাগরে মগ্ন করিত, এবং উহার হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরের স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রজ নানা উপায়োদ্ভাবনেও অনেক সময় নিযুক্ত হইতেন। অশেষ চিন্তা ও আলোচনার পর মাতা ও পুত্রে পরামর্শ স্থির হইয়াছিল যে, উপযুক্তা পাত্রী দেখিয়া ঠাকুরের এখন বিবাহ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সদ্বংশীয়া সুশীলা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা পড়িলেই ঠাকুরের দৃষ্টি ও মন আর অত ঊর্দ্ধসঞ্চরণশীল থাকিবে না। নতুবা যৌবনে পদার্পণ করিলেও তিনি সকল বিষয়ে মাতা ও ভ্রাতার মুখাপেক্ষী হইয়া যে বালক সেই বালকই রহিয়াছেন, স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে নিজ সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা বা 'আঁট' তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয় নাই। ঘাড়ে স্ত্রীপুত্রাদি পোষণের ভার না পড়িলে উহা কেমনেই বা আসিবে?

আবার দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে পণ দিয়া গৃহে কন্যা আনয়ন করিতে হইবে। দশ বার বৎসর বয়স্কা কন্যার পণে যত টাকা লাগিবে তত টাকা দিবার তাঁহাদের সামর্থ্যই বা কোথায়? সাংসারিক নানাবিধ বিপৎপাতে

ঐ টাকার যোগাড় হইয়া উঠে নাই বলিয়াই ত 'গয়ং গচ্ছ' করিয়া এতদিন গদাধরের বিবাহ দেওয়া হয় নাই। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার সহিত তখন বিবাহ দিয়া ফেলিলে সে এতদিনে বড় হইয়া পতির মনাকর্ষণ ও সংসারের কায কর্ম্মের কত ভার লইতে পারিত। সে যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, আর কাল বিলম্ব উচিত নহে। চারিদিকে পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে এজন্য মাতা ও পুত্রে পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইলেও চতুর ঠাকুরের উহা জানিতে বড় বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু জানিয়াও তিনি ঐ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। বরং বাটীতে ঐরূপ কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালক বালিকারা যেরূপ রঙ্গরস ও আনন্দ করিয়া থাকে তিনিও কখন কখন তদ্রূপ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট ঐ বিষয় নিবেদন করিয়া এবং কিং-কর্ত্তব্য জানিয়াই তিনি কি এই সময়ে ঐরূপ নিশ্চিন্ত আনন্দের ভাব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন? অথবা বালকের ন্যায় ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও চিন্তাবাহিতাই তাঁহার ঐরূপ আনন্দ-প্রকাশের কারণ? সাধারণে দ্বিতীয়টিকেই উহার কারণ বলিয়া নির্ণয় করিলেও আমরা ঠাকুরের নিকটে উহার যথার্থ কারণ শুনিয়া অন্যত্র উহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। *

সে যাহা হউক চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইলেও কোথাও মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল না। কারণ, যে কয়েকটি পাওয়া গেল তাহাদের পিতা মাতা অসম্ভব অধিক হারে পণ যাচ্ঞা করায় ঠাকুরের অগ্রজ রামেশ্বর সে সকল স্থানে বিবাহ স্থির করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার গ্রামস্থ বন্ধুগণও তাঁহাকে অত অধিক পণ দিয়া ঐকার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন না। ঠাকুরের মাতা চন্দ্রাদেবী বিশেষ চিন্তিতা হইলেন। কারণ, দেবতুল্য স্বামী ও জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের অবর্ত্তমানে তিনি অনাবিল সুখের আশায় গদাইয়ের উদ্বাহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কিন্তু ঐ কর্ম্মে কনিষ্ঠ পুত্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভাবিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং পাত্রী পাইলেন না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার তাঁহার উপায় ছিল না। পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া পাত্রীর অনুসন্ধান চলিল।

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ঐরূপ অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ন হইয়াছেন

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায় ১৩০—১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

তখন সহসা একদিন তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'হেথায় হোথায় অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে খুঁজিয়া দেখগে, বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হইয়া সেখানে রক্ষিতা আছে!'

ঠাকুরের ঐ কথায় সহসা বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতা ঐ স্থানে একবার অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া সংবাদ আনিল, অন্য সকল বিষয়ে যাহাই হউক পাত্রী কিন্তু নিতান্ত বালিকা, বয়স—মাত্র পঞ্চম বর্ষ। অন্য কোথাও হইতে অপর কোন পাত্রীর সন্ধান না আসায় ঠাকুরের মাতা অগত্যা ঐস্থানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃতা হইলেন। অল্প দিনেই সকল কথা বার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। অনন্তর শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্ত দেখাইয়া শ্রীযুত রামেশ্বর নিজালয় হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম বর্ষীয়া একমাত্র কন্যার সহিত শুভ-পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া আসিলেন। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(২)

প্র। আপনি যে অদ্বৈত অবস্থার কথা বলেন, উহা কি কেবল আদর্শমাত্র, না, কেহ ঐ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিয়াছেন?

উ। আমরা বলি, উহা প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার—আমরা বলি, ঐ অবস্থা উপলব্ধি করিবারই বিষয়। যদি উহা কেবল কথার কথা হইত, তবে ত উহা কিছুই নয়। বেদ ঐ তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য তিনটী উপায়ের কথা বলিয়া থাকেন—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। এই আত্মতত্ত্ব প্রথমে শুনিতে হইবে, শুনিবার পর ঐ বিষয় বিচার করিতে হইবে—যেন অন্ধভাবে বিশ্বাস না করা হয়, বিচার করিয়া জানিয়া শুনিয়া যেন বিশ্বাস করা হয়, এইরূপে নিজ স্বরূপ বিচার করিয়া তবে উহার ধ্যানে নিযুক্ত হইতে হইবে—তখন উহা সাক্ষাৎকৃত হইবে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই যথার্থ ধর্ম্ম। মতপোষণ ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। আমরা বলি, এই সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থাই ধর্ম্ম।

প্র। আপনি যদি কখন এই সমাধি-অবস্থা লাভ করেন, তবে আপনি কি উহার সম্বন্ধে বলিতে পারিবেন?

উ। না, কিন্তু সমাধি-অবস্থা বা পূর্ণ জ্ঞানভূমি যে লাভ হইয়াছে, তাহা আমরা জীবনের উপর উহার ফলাফল দেখিয়া জানিতে পারি। একজন মূর্খ নিদ্রাগত হইল—নিদ্রাভঙ্গে সে যে মূর্খ, সেই মূর্খই থাকিবে, হয় ত আরো খারাপই দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু কেহ সমাধিস্থ হইলে সমাধিভঙ্গের পর—সে একজন তত্ত্বজ্ঞ, সাধু, মহাপুরুষ হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতেই বুঝা যায়, এই দুই অবস্থা কতদূর বিভিন্ন।

প্র। আমি অধ্যাপক—র প্রশ্নের অনুসরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আপনি এমন সব লোকের বিষয় জানেন কি না, যাঁহারা আত্ম-সম্মোহনতত্ত্বের (self-hypnotism) কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন ভারতে নিশ্চিত এই বিদ্যার খুব চর্চ্চা ছিল—এখন আর ততদূর নাই। আমি জানিতে চাই, যাঁহারা এখন উহার চর্চ্চা করেন, তাঁহারা হালে ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং উহার কিরূপ অভ্যাস বা সাধন করিয়াছেন।

উ। আপনারা পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে সম্মোহনবিদ্যা (Hypnotism) বলেন, তাহা আসল ব্যাপারের সামান্য অঙ্গমাত্র। হিন্দুরা উহাকে আত্মাপ-সম্মোহন (Self-de-hypnotization) বলেন। তাঁহারা বলেন, আপনারা ত সম্মোহিত (Hypnotized) রহিয়াছেনই—এই সম্মোহিত ভাবকে দূর করিতে হইবে, বিগত-মোহ (De-hypnotized) হইতে হইবে।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমাবিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

তথায় সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারাও নহে, বিদ্যুৎও তথায় প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।

ইহা ত সম্মোহন (Hypnotization) নহে,—অপসম্মোহন বা বিগত-মোহীকরণ (De-hypnotization)। আমরা বলিয়া থাকি, অন্য সকল ধর্ম্মই এই প্রপঞ্চের সত্যতা শিক্ষা দেয়, অতএব তাহারা একপ্রকার সম্মোহন

প্রয়োগ করিতেছে। কেবল অদ্বৈতবাদীই সম্মোহিত হইতে চান না। একমাত্র অদ্বৈতবাদীই অল্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন যে, সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতবাদ হইতেই সম্মোহন বা মোহ আসিয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, এমন কি, অপরা বিদ্যা-জ্ঞানে, বেদকে পর্য্যন্ত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, সগুণ ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডটাকে পর্য্যন্ত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি, তোমার নিজের দেহ-মনকে পর্য্যন্ত ফেলিয়া দাও—কিছুই যেন না থাকে—তবেই তুমি সম্পূর্ণরূপে মোহ হইতে মুক্ত হইবে।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥"

যেখান হইতে মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া আর কোন ভয় থাকে না।

ইহাই অপসম্মোহন।

"ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন যন্ত্রং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥"

আমার পুণ্য নাই, পাপ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, আমার মন্ত্র, যন্ত্র, বেদ বা যজ্ঞ কিছুই নাই, আমি ভোজন, ভোজ্য বা ভোক্তা নহি। আমি চিদানন্দরূপ শিব—আমিই শিব (মঙ্গলস্বরূপ)।

আমরা সম্মোহনবিদ্যার (Hypnotism) সমুদয় তত্ত্ব অবগত আছি। আমাদের যে মনস্তত্ত্ববিদ্যা আছে, তাহা পাশ্চাত্য দেশ সবে জানিতে আরম্ভ করিয়াছে, তবে দুঃখের বিষয়, এখনও সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে নাই।

প্র। আপনারা Astral body কাহাকে বলেন ?

উ। আমরা উহাকে লিঙ্গশরীর বলিয়া থাকি। যখন এই দেহের পতন হয়, তখন অপর দেহপরিগ্রহ কিরূপে হয় ? শক্তি কখন ভূত ব্যতীত থাকিতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, দেহত্যাগের পরেও সূক্ষ্মভূতের কিয়দংশ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া যায়। অভ্যন্তরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গণ ঐ ভূতসূক্ষ্মের সাহায্য লইয়া আর একটী দেহ গঠন করে—কারণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেহ গঠন করিতেছে—মনই শরীর গঠন করিয়া থাকে। যদি আমি সাধু হই, তবে

আমার মস্তিষ্ক জ্ঞানী সাধুর মস্তিষ্কে পরিণত হইবে। আর যোগীরা বলেন, এই জীবনেই তাঁহারা নিজ দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন।

যোগীরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন। রাশি রাশি মতবাদের অপেক্ষা সামান্য একটু অভ্যাসের মূল্য অনেক অধিক। সুতরাং আমি নিজে এটা-ওটা হইতে দেখি নাই বলিয়া সেগুলি মিথ্যা, এরূপ আমার বলিবার অধিকার নাই। যোগীদের গ্রন্থে আছে, অভ্যাসের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতি অদ্ভুত ফললাভ করিতে পারা যায়। নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা অতি অল্পকালের ভিতর অল্প স্বল্প ফললাভ করিতে পারা যায়—তাহাতে জানিতে পারা যায়, এ ব্যাপারের ভিতর কোনরূপ জুয়াচুরি নাই। আর সর্ব্বশাস্ত্রেই যে সকল অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে, এই যোগীরা সেইগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সব অলৌকিক কার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে কিরূপে? যে বলে, এ সমুদয় মিথ্যা, উহাদের ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে যুক্তিবাদী বা বিচারপরায়ণ বলিতে পারা যায় না। যত দিন না সেগুলিকে ভুল বলিয়া আপনি প্রমাণ করিতে পারিতেছেন, ততদিন সেগুলিকে অস্বীকার করিবার আপনার অধিকার নাই। আপনাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, এ গুলির কোন ভিত্তি নাই—তখনই আপনি ঐগুলি অস্বীকার করিবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু তাহা ত আপনারা করেন নাই। অন্য দিকে যোগীরা বলিতেছেন, সেগুলি বাস্তবিক অদ্ভুত ব্যাপার নহে, আর তাঁহারা আজকালও ঐ সব করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন। ভারতে আজ পর্য্যন্ত অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে—কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনটীই অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা সাধিত হয় না। এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে। আর যদি এ বিষয়ে আর কিছুই সাধিত না হইয়া থাকে, কেবল বৈজ্ঞানিকভাবে মনস্তত্ত্ব আলোচনার পক্ষে চেষ্টামাত্রও হইয়া থাকে, তবে উহার সমুদয় গৌরব যোগী-দেরই প্রাপ্য।

প্র। যোগীরা কি কি ব্যাপার দেখাইতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত আপনি দিতে পারেন কি?

উ। অন্যান্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে হইলে তাহার উপর যতটা বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়, যোগী তাঁহার যোগবিদ্যার উপর তাহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতে বলেন না। কোন বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য

ভদ্রলোকে যতটুকু বিশ্বাস করিয়া থাকে, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতে বলেন না। যোগীর আদর্শ অতি উচ্চ। মনের শক্তি দ্বারা যে সব ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, তন্মধ্যে নিম্নতর বিষয়গুলি আমি দেখিয়াছি, সুতরাং উচ্চতম ব্যাপারগুলি যে হইতে পারে, এ বিষয় অবিশ্বাস করিবার আমার অধিকার নাই। যোগীর আদর্শ—সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার সহায়তায় শাশ্বত শান্তি ও প্রেমের অধিকারী হওয়া। আমি একজন যোগীকে জানি—তাঁহাকে গোখরো সাপে কামড়াইয়াছিল—দংশনমাত্র তিনি অচৈতন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁহার আবার চৈতন্য হইল। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কি হইয়াছিল, তিনি বলিলেন, "আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে একজন দূত আসিয়াছিল।" এই ব্যক্তির সমুদয় ঘৃণা, ক্রোধ ও হিংসার ভাব একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই তাঁহাকে অনিষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট, বৈরের পরিবর্ত্তে বৈরে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। তিনি সদাকাল অনন্ত প্রেমস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, আর প্রেমের শক্তিতে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। আর এই সব শক্তির প্রকাশ—নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার সংসাধন—এগুলি গৌণমাত্র। ঐগুলি লাভ করা যোগীর প্রকৃত লক্ষ্য নহে। যোগীরা বলেন, যোগী ব্যতীত আর সকলেই দাসবৎ খাদ্যের দাস, বায়ুর দাস, নিজ স্ত্রীর দাস, নিজ পুত্রকন্যার দাস, টাকার দাস, স্বদেশীয়দের দাস, নামযশের দাস, আর এই জগতের ভিতরকার সহস্র সহস্র বিষয়ের দাস। যে ব্যক্তি এ সকল বন্ধনের কোন বন্ধনে আবদ্ধ নহে, সেই যথার্থ মানুষ, সেই যথার্থ যোগী।

"ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥"

"এখানেই তাঁহারা সংসারকে জয় করিয়াছেন, যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।"

প্র। যোগীরা কি জাতিভেদকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন?

উ। না—জাতিবিভাগ অপরিণত চিত্তসমূহের শিক্ষালয়স্বরূপমাত্র।

প্র। এই সমাধিতত্ত্বের সহিত ভারতের গ্রীষ্মের কি কোন সম্বন্ধ নাই?

উ। আমার ত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সমুদ্র-

সমতলের পনর হাজার ফিট উপরে প্রায় সুমেরুতুল্য আবহাওয়াসম্পন্ন হিমালয় পর্ব্বতে এই যোগবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল।

প্র। ঠাণ্ডা জলবায়ুতে কি যোগবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব?

উ। খুব সম্ভব—আর জগতের মধ্যে ইহা যেমন কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব, আর কিছুই তেমন নহে। আমরা বলি, আপনারা—আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই—জন্ম হইতেই বৈদান্তিক। আপনাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনারা জগতের সকল বস্তুর সহিত আপনাদের একত্ব ঘোষণা করিতেছেন। যখনই আপনাদের হৃদয় সমগ্র জগতের কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়, তখনই আপনারা অজ্ঞাতসারে প্রকৃত বেদান্তবাদী হইয়া থাকেন। আপনারা নীতিপরায়ণ—কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইতেছেন, তাহার কারণ আপনারা জানেন না। বেদান্তদর্শনই নীতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া মানবকে জ্ঞানপূর্ব্বক নীতিপরায়ণ হইতে শিখাইয়াছে। উহা সকল ধর্ম্মের সারস্বরূপ।

প্র। আপনি কি বলেন যে, আমাদের পাশ্চাত্য জাতিদের ভিতর এমন একটা অসামাজিক ভাব আছে, যাহাতে আমাদিগকে এত বহুবাদী ও অনৈক্যপ্রবণ করিয়াছে, আর যাহার অভাবে প্রাচ্যদেশীয় লোক আমাদের অপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন?

উ। আমার মতে পাশ্চাত্য জাতি অধিকতর নির্দ্দয়-স্বভাব আর প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বভূতের প্রতি অধিকতর দয়াসম্পন্ন। কিন্তু তাহার কারণ কেবলমাত্র এই যে, আপনাদের সভ্যতা খুব আধুনিক। কোন স্বভাবকে দয়াবৃত্তির বশে আনিতে গেলে, তাহাতে কিছু সময়ের আবশ্যক করে। আপনাদের শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু শক্তিসংগ্রহ যে পরিমাণে চলিয়াছে, সেই পরিমাণে হৃদয়ের শিক্ষা চলে নাই। আর বিশেষতঃ মনঃসংযমের শক্তিও খুব অল্প পরিমাণেই অভ্যস্ত হইয়াছে। আপনাদিগকে সাধু ও ধীরপ্রকৃতি করিতে অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে এই ভাব প্রবাহিত। যদি আমি ভারতের কোন গ্রামে গিয়া তথাকার লোককে রাজনীতি শিখাইতে চাই, তাহারা তাহা বুঝিবে না, কিন্তু যদি তাহাদিগকে বেদান্ত উপদেশ করি, তাহারা অমনি বলিবে, "হাঁ স্বামিন্, এখন আপনার কথা বুঝিতেছি—আপনি ঠিক বলিতেছেন।" আজ পর্য্যন্তও ভারতের সর্ব্বত্র সেই বৈরাগ্য বা অনাসক্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে খুব ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও বৈরাগ্যের প্রভাব এত অধিক বিদ্যমান যে,

রাজারাজড়াদের পর্য্যন্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিনা সম্বলে দেশের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান সম্ভবপর।

কোন কোন স্থানে সাধারণ গ্রাম্য বালিকা পর্য্যন্ত চরকার সূতা কাটিতে কাটিতে বলিয়া থাকে, "আমাকে দ্বৈতবাদের কথা বলিও না—আমার চরকা পর্য্যন্ত 'সোঽহং' 'সোঽহং' 'আমিই সেই ব্রহ্ম' 'আমিই সেই ব্রহ্ম' বলিতেছে।" এই সব লোকের সহিত গিয়া কথাবার্ত্তা কহুন, আর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে অথচ ঐ পাথরটাকে প্রণাম করিতেছে কেন। তাহারা বলিবে, আপনারা ধর্ম্ম বলিতে মতবাদমাত্র বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা ধর্ম্ম বলিতে বুঝি, প্রত্যক্ষ অনুভূতি। তাহাদের মধ্যে কেহ হয়ত বলিয়া উঠিবে, "আমি তখনই যথার্থ বেদান্তবাদী হইব, যখন আমার সম্মুখ হইতে সমগ্র জগৎ অন্তর্হিত হইবে—যখন আমি সত্যদর্শন করিব। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন আমার সহিত সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তির কোন প্রভেদ নাই। সেই জন্যই আমি এই সব প্রস্তরমূর্ত্তির উপাসনা করিতেছি, মন্দিরে যাইতেছি, যাহাতে আমার প্রত্যক্ষানুভূতি হয়। আমি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি সেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বকে দেখিতে, উহার প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে, ইচ্ছা করি।"

"বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥"—শঙ্কর।

'অনর্গল শব্দোদ্গারণময়ী সদ্বাক্যযোজনা, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল—এ সব কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, উহার দ্বারা মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।"

যদি আমরা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারি, তবেই আমরা মুক্তিলাভ করিব।

প্র। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের এই স্বাধীনতার সহিত জাতিভেদ-সংস্কারের কি বিরোধ নাই?

উ। অবশ্যই বিরোধ আছে। লোকে বলিয়া থাকে, জাতিভেদ থাকা উচিত নহে। এমন কি, যাহারা বিভিন্ন জাতিভুক্ত, তাহারাও বলে, জাতি-বিভাগ একটা খুব উঁচুদরের জিনিষ নয়। কিন্তু তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলে যে, আমাদের ইহা অপেক্ষা ভাল অন্য কোন জিনিষ দাও, তবে আমরা উহা ছাড়িয়া দিব। তাহারা বলিয়া থাকে, তোমরা ইহার বদলে আমাদিগকে

কি দিবে? জাতিভেদ কোথায় নাই? তোমাদের দেশে তোমরাও ত এইরূপ একটা জাতিবিভাগ গড়িবার ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছ। কোন ব্যক্তি কিছু অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলেই বলিয়া বসে, আমিও ঐ বড় মানুষ কয়েক শতের মধ্যে একজন। আমরাই কেবল একটা স্থায়ী জাতিবিভাগ গঠনে সমর্থ হইয়াছি। অপর দেশীয়েরা উহার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সফল হইতে পারিতেছে না। আমাদের সমাজে অবশ্য কুসংস্কার ও মন্দ জিনিষ যথেষ্ট আছে। তোমাদের দেশের কুসংস্কার ও মন্দ জিনিষগুলি আমাদের দেশে চালাইয়া দিতে পারিলেই কি সব ঠিক হইয়া যাইবে? জাতিভেদ আছে বলিয়াই এই ত্রিশ কোটি লোক এখনও খাইবার এক টুকরা রুটি পাইতেছে। অবশ্য রীতিনীতিহিসাবে ইহা যে অসম্পূর্ণ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতিবিভাগ না থাকিলে আপনারা পড়িবার জন্য একখানিও সংস্কৃত বই পাইতেন না। এই জাতিবিভাগের দ্বারা এমন একটী দৃঢ় প্রাচীরের সৃষ্টি হইয়াছিল যে উহার উপর বহিরাক্রমণের শত প্রকার তরঙ্গাঘাত আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ কোন মতেই উহাকে ভাঙ্গিতে পারে নাই। এখনও সেই প্রয়োজন দূর হয় নাই, সেই জন্য এখনও জাতিভেদ রহিয়াছে। সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে যেরূপ জাতিবিভাগ ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। যতই উহার উপর আঘাত লাগিয়াছে, ততই উহা দৃঢ়তর আকার ধারণ করিয়াছে। এটী কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে একমাত্র ভারতই কখন পররাষ্ট্রবিজয়ে নিজ দেশের বাহিরে বহির্গত হয় নাই। মহাসম্রাট অশোক বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কেহ যেন পররাষ্ট্রবিজয়ের চেষ্টা না করে। যদি অপর জাতি আমাদের নিকট শিক্ষক পাঠাইতে চায়, পাঠা'ক —কিন্তু তাহারা যেন আমাদের বাস্তবিক সাহায্য করে, আমাদের জাতিগত ধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধে অনিষ্টসাধনের চেষ্টা না করে। প্রাচীনযুগে বিভিন্ন জাতিরা হিন্দু জাতিকে জয় করিতে আসিল কেন? হিন্দুরা কি অপর জাতির কোন অনিষ্ট করিয়াছিল? তাহারা যতটুকু সাধ্য, জগতের উপকারই করিয়াছিল। তাহারা জগৎকে বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্ম শিখাইয়াছে এবং পৃথিবীর অনেক অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়াছে। কিন্তু তাহারা উহার পরিবর্ত্তে প্রতিদান পাইয়াছিল—রক্তপাত, অত্যাচার ও দুষ্ট কাফের,—এই অভিধান। বর্ত্তমান কালেও পাশ্চাত্য জাতীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক লিখিত ভারতসম্বন্ধে গ্রন্থাবলী এবং তথায় যাঁহারা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদের লিখিত গল্পগুলি পড়ুন—দেখিবেন তাঁহারাও হিন্দুদিগকে

"হিদেন" (অপদেবতার ঘৃণ্য উপাসক) বলিয়া গালি দিয়াছেন। কোন্ অনিষ্টের প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারতবাসীদের এখনও এইরূপ অযথা নিন্দাবাদ করা হইয়া থাকে?

প্র। সভ্যতাসম্বন্ধে বৈদান্তিক ধারণা কিরূপ?

উ। আপনারা দার্শনিক—আপনাদের মতে অবশ্য এক তোড়া টাকা থাকা না থাকা লইয়া মানুষে মানুষে কখন প্রভেদ হইতে পারে না। এই সব কলকারখানা ও জড় বিজ্ঞানের মূল্য কি? উহাদের একটীমাত্র ফল এই যে উহারা চতুর্দ্দিকে জ্ঞানবিস্তার করিয়া থাকে। আপনারা অভাব বা দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণ করিতে পারেন নাই, বরং অভাবের মাত্রা আরও বাড়াইয়াছেন মাত্র। কলকব্জায় কখন দারিদ্র্যসমস্যার সমাধান হইতে পারে না—উহাদের দ্বারা কেবল সংগ্রাম বাড়িয়া যায় মাত্র। প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়া থাকে। জড় প্রকৃতির কি স্বতন্ত্র কোন মূল্য আছে? কোন ব্যক্তি যদি তারের মধ্য দিয়া তাড়িতপ্রবাহ চালাইতে পারে, আপনারা অমনি গিয়া তাহার স্মৃতিচিহ্নস্থাপনে উদ্যোগী হন কেন? প্রকৃতি কি লক্ষ লক্ষ বার এই ব্যাপার সাধন করিতেছেন না? সবই কি প্রকৃতিতে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান নাই? উহা আপনি পাইলে তাহাতে কি লাভ হইল? উহা ত পূর্ব্ব হইতেই তথায় রহিয়াছে। উহার একমাত্র মূল্য এই যে, উহা আমাদের ভিতরকার উন্নতি বিধান করিয়া থাকে। এই জগৎটা একটা ব্যায়ামাগারতুল্য—ইহাতে জীবাত্মাগণ কর্ম্মের দ্বারা আপনাদিগেরই উৎকর্ষসাধন করিতেছে, আর এই উৎকর্ষসাধনের ফলেই আমরা দেবস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকি। সুতরাং কোন্ বিষয় ভগবানের কতটা প্রকাশ, ইহা জানিয়াই প্রত্যেক বিষয়ের উন্নতি বা সারবত্তা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সভ্যতা—মানবের মধ্যে ঈশ্বরত্বের এইরূপ প্রকাশ।

প্র। বৌদ্ধদের কি কোন প্রকার জাতিবিভাগ আছে?

উ। বৌদ্ধদের কখনই বড় বিশেষ জাতিবিভাগ ছিল না, আর ভারতে বৌদ্ধসংখ্যা অতি অল্প। বুদ্ধ একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। তথাপি আমি বৌদ্ধ দেশসমূহে দেখিয়াছি, তথায় জাতিবিভাগসৃষ্টির জন্য প্রবল চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ঐ চেষ্টা সফল হয় নাই। বৌদ্ধদের জাতিবিভাগ কার্য্যতঃ কিছুই নহে, কিন্তু তাহারা আপনাদের মনে মনে উচ্চ জাতি বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে।

বুদ্ধ একজন বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি একটী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন, যেমন আজকালও অনেক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে সব ভাবগুলি এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত, সেগুলি তাঁহার নিজের নহে। সেগুলি তাঁহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন—ঐ ভাবগুলির মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব উহার সামাজিক ভাগ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরাই চিরদিন আমাদের আচার্য্যের আসন অধিকার করিয়া আসিয়াছেন—অধিকাংশ উপনিষদ্ই ক্ষত্রিয়গণের লেখা—আর বেদের কর্ম্মকাণ্ডভাগ ব্রাহ্মণদের কীর্ত্তি। সমগ্র ভারতে আমাদের যে সকল বড় বড় আচার্য্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয় ছিলেন—তাঁহাদের উপদেশও উদার ও সার্ব্বজনীন, কিন্তু দুইজন ছাড়া ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের মধ্যে সকলেই অনুদারভাবাপন্ন। ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ—ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

প্র। সম্প্রদায়, অনুষ্ঠান, শাস্ত্র—এ সকল কি তত্ত্বসাক্ষাৎকারের সহায়ক?

উ। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে লোকে সব ছাড়িয়া দেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়, অনুষ্ঠান ও শাস্ত্র যতটা সেই অবস্থায় পঁহুছিবার উপায়স্বরূপ হয়, ততটা উহাদের উপকারিতা আছে। কিন্তু যখন উহাদের দ্বারা ঐ সহায়তা না পাওয়া যাইবে, তখন অবশ্য উহাদিগের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বান্ তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং॥"

অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীদের অবস্থার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন না, আর তাহাদের নিজ নিজ সাধনপ্রণালীতে তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট করিবেন না, কিন্তু যথার্থ ভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন, এবং তিনি স্বয়ং যে অবস্থায় অবস্থিত, সেই অবস্থায় পঁহুছিবার পথ প্রদর্শন করিবেন।

প্র। বেদান্তে আমিত্ব * ও চারিত্রনীতির কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে?

---

* ইংরাজিতে individual শব্দটী আছে। ঐ শব্দে "অবিভাজ্য" ও "ব্যষ্টি" এই দুইটী ভাব নিহিত। স্বামীজি যখন উত্তর দিতেছেন যে "ব্রহ্মই প্রকৃত individual" তখন প্রথম ভাবটী অর্থাৎ উপচয়-অপচয়হীন অবিভাজ্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তারপর বলিতেছেন যে সেই সত্তা মায়ায় পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির আকার ধারণ করিয়াছেন।

উ। প্রকৃত অবিভাজ্য আমিত্বই সেই পূর্ণব্রহ্ম—মায়া দ্বারাই উহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির আকার ধারণ করিয়াছে। কেবল আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতেছে মাত্র—প্রকৃতপক্ষে উহা সদাই সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এক সত্তাই বর্ত্তমান—মায়া দ্বারাই উহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মায়াতেই এইরূপ ভেদ বোধ হইয়াছে। কিন্তু এই মায়ার ভিতরেও সর্ব্বদাই সেই একের দিকে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতির চারিত্রনীতির ভিতর ঐ চেষ্টাই অভিব্যক্ত হইয়াছে কারণ, ইহা জীবাত্মার প্রকৃতিগত প্রয়োজন। সে ঐরূপ চেষ্টা-বলে ঐ একত্ব লাভ করিতেছে—আর একত্বলাভের এই চেষ্টাকেই আমরা চারিত্র নামে অভিহিত করিয়া থাকি। অতএব আমাদের সর্ব্বদা নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

প্র। চারিত্রনীতির অধিকাংশই কি বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধ লইয়াই ব্যাপৃত নহে?

উ। চারিত্রনীতির সবটাই ঐ। পূর্ণব্রহ্ম কখন মায়ার গণ্ডীর ভিতর আসিতে পারে না।

প্র। আপনি বলিলেন, 'আমি'ই সেই পূর্ণব্রহ্ম—আমি আপনাকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম—এই 'আমি'র জ্ঞান আছে কি না?

উ। আমিটা সেই পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ, আর এই ব্যক্ত অবস্থায় তাহাতে যে প্রকাশশক্তি কার্য্য করে, তাহাকেই আমরা 'জ্ঞান' বলি। অতএব সেই পূর্ণব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপে 'জ্ঞান' শব্দের প্রয়োগ যথাযথ প্রয়োগ নহে, কারণ, পূর্ণাবস্থা আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত।

প্র। আপেক্ষিক জ্ঞান কি পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত?

উ। হাঁ—এক ভাবে আপেক্ষিক জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিতে পারা যায়। যেমন একটা মোহর ভাঙ্গাইয়া তাহা হইতে পয়সা সিকি দুয়ানি টাকা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মুদ্রা করিতে পারা যায়, তদ্রূপ ঐ পূর্ণ অবস্থা হইতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান উৎপাদন করা যাইতে পারে। উহা অতিজ্ঞান, জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা—সাধারণ জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই উহার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থা লাভ করে, আমাদের পরিচিত 'জ্ঞানাবস্থা'টীও তাহার সম্যক্‌রূপে থাকে, যখন সে জ্ঞানের এই অপর অবস্থা, অর্থাৎ আমাদের সাধারণ জ্ঞানাবস্থার ন্যায় অবস্থা, অনুভব করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে এক ধাপ নামিয়া আসিতে হয়। এই সাধারণ

জ্ঞান একটী নিম্নতর অবস্থা—মায়ার ভিতরেই কেবল এইরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভব।

ওঙ্কারনাথে শঙ্কর।

[শ্রীমতী—]

গোবিন্দপাদের আদেশে শঙ্কর ওঙ্কারনাথেই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমোচিত নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া অবশিষ্ট সময় গুরুসেবাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। গোবিন্দযোগী এ সময় অধিকাংশ সময় ধ্যানস্থ থাকিতেন, পূর্ব্বের ন্যায় আর সমাধিস্থ হইতেন না। বালক শঙ্কর জানিতেন বহুদিন সমাধি-অবস্থায় থাকিয়া সহসা উত্থিত হইলে যোগীমাত্রেরই শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল থাকে, এই অবস্থায় নানাবিধ ভেষজ দ্রব্য এবং যোগীজনসেব্য লঘুপথ্য প্রয়োজন হয়, এজন্য তিনি গোবিন্দপাদের উপদেশানুসারে এই সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অতি যত্নে গুরুদেবের সেবাশুশ্রূষা করিতেন।

শঙ্করের সেবায় গোবিন্দপাদ দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। তাঁহার কঙ্কালসার শুষ্ক দেহ ক্রমে মসৃণ এবং সবল হইল।

এইরূপে মাসাধিক কাল গত হইবার পর একদিন গোবিন্দপাদ নির্জ্জন দেখিয়া শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস শঙ্কর! তোমার সেবায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। আইস বৎস, আজ আমি তোমায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা যোগবিদ্যা প্রদান করিব। তোমার গুরুসেবা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তুমি এখন যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ কর। আমি তোমায় যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে বলি এক্ষণে তুমি তাহাই করিতে থাক। আমার সেবার জন্য তুমি আর অত ব্যস্ত হইও না, আমি এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি।"

গোবিন্দপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময় বাক্য শুনিয়া শঙ্করের হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব নানাভাবের সঞ্চার হইল। যে জন্য তিনি বৃদ্ধা অসহায়া জননীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, যে জন্য তিনি ইহপরলোকের সর্ব্ববিধ সুখলালসা বিসর্জ্জন করিয়াছেন, গুরুকৃপায় আজ তাঁহার সেই মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে চলিল, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে, বাক্য অসমর্থ

হইল, কেবলমাত্র তাঁহার সবিনয় সাগ্রহ দৃষ্টিই গোবিন্দপাদের কথার উত্তর প্রদান করিল। শঙ্কর নীরবে গুরুদেবের মুখকমলপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

গোবিন্দপাদ ক্ষণকাল শঙ্করকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "দেখ বৎস! মলই "বন্ধের হেতু," মল দূরীকরণই সাধনা। এই মল আবার ত্রিবিধ, যথা:— শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক। শরীরে ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, ব্যাধি, মনো-মধ্যে ইহা বাসনা এবং বাক্যে ইহা অশুদ্ধ বাক্য নামে অভিহিত হয়। বৎস, তুমি সদাচার, ভগবদর্চ্চন, ও বিদ্যাভ্যাস দ্বারা এই ত্রিবিধ মল বহুল পরিমাণে অপনয়ন করিয়াছ, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে এখনও অপনীত হয় নাই। ইহা অপনীত হইলে তোমার নির্ম্মল মোক্ষলাভ হইবে। মোক্ষভূমি হইতে তুমি আর কখনই বিচ্যুত হইবে না। ব্রহ্মবিচার, ব্রহ্মধ্যান প্রভৃতি জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ এবং ধ্যানযোগাদির দ্বারা সাধক মধ্যে মধ্যে সেই পরমতত্ত্বের রসাস্বাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ মল তাহাতেও সম্পূর্ণরূপে যায় না, উহা প্রায়ই সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়। এজন্য বৎস, তাঁহারা সেই ব্রহ্মতত্ত্বে ইচ্ছামত, অথবা চিরদিনের মত, অবস্থিতি করিতে পারেন না, এইজন্যই মধ্যে মধ্যে তাঁহারা মোক্ষভূমি হইতে স্খলিত হইতে বাধ্য হন। এ নিমিত্ত আমি তোমাকে এমন পথ প্রদর্শন করিব যাহাতে তুমি মোক্ষফল করায়ত্ত করিতে পারিবে। ইতিপূর্ব্বে বৎস! তুমি যে আত্মপরিচয় দিয়াছ, তাহাতে বুঝিয়াছি তোমার জানিবার বা বুঝিবার আর কিছুই নাই। তথাপি দেখ তুমি পরিতৃপ্ত হইতে পার নাই। ভাব দেখি এত কষ্ট করিয়া কেন তুমি এতদূরে এখানে আসিয়াছ? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল তুমি এখনও তোমার প্রকৃতির বশীভূত রহিয়াছ, প্রকৃতি এখনও তোমার দাসী হন নাই। অতএব বৎস! আমি তোমাকে যেরূপে এই যোগক্রিয়াগুলি প্রদর্শন করিতেছি তুমি এক্ষণে তাহাই অভ্যাস কর।"

এই বলিয়া পরমযোগী গোবিন্দপাদ হঠযোগোক্ত 'নেতি' "ধৌতি" "যম" "নিয়ম" "আসন" "মুদ্রা" "প্রাণায়াম" এবং ষট্‌চক্রসম্বন্ধীয় কয়েকটী ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া শঙ্করকে তাঁহার অনুকরণ করিতে বলিলেন।

এই সময় শঙ্করের উদ্যম ও আগ্রহ দেখিয়া গোবিন্দপাদ মনে মনে যারপর-নাই আনন্দিত হইলেন। তিনি শঙ্করকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন "দেখ বৎস! এইরূপ যত্নসহকারে যদি তুমি ইহার অনুষ্ঠান করিতে থাক তাহা হইলে আমি আশা করি, তুমি সম্বৎসরের মধ্যেই সমাধি-অভ্যাসের উপযুক্ত

হইবে। একবারমাত্র দেখিয়াই তুমি যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র ইহার অনুষ্ঠানে সক্ষম হইলে, এরূপ ইতিপূর্ব্বে আর কাহাকেও আমি করিতে দেখি নাই, তুমি নিশ্চয়ই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন।"

গুরুমুখে আত্মপ্রশংসা শুনিয়া শঙ্কর লজ্জিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। গোবিন্দপাদের ঐরূপ বাক্যে শঙ্করের উৎসাহ যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি নবীন উৎসাহে যোগানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর যোগসাধনে রত হইলেন বলিয়া আশ্রমধর্ম্মোচিত আচারে উদাসীন অথবা গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি সন্ন্যাসোচিত সন্ধ্যাবন্দনা, বেদ-পাঠ প্রভৃতি যাবতীয় নিত্যকর্ম্ম যথাসময়ে যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতেন। আলস্য, ক্লান্তিবোধ, বা বিক্ষেপ, তাঁহার শরীর ও মনকে পরিত্যাগ করিয়া যেন কোথায় পলায়ন করিল। তিনি যেন সংযম, উৎসাহ এবং দৃঢ়তার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন।

এদিকে যোগীবরের সমাধিভঙ্গের আশায় যে সকল সাধু সন্ন্যাসী এতদিন গুহাদ্বারে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা এতদিন যে বস্তু-লাভে সমর্থ হন নাই আজ একজন বালককে আসিয়া তাহা লাভ করিতে দেখিয়া সকলেই শঙ্করের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। সাধুসঙ্গের এমনি মহিমা যে ইহাতে কেহই শঙ্করকে ঈর্ষানেত্রে দেখিলেন না। ফলতঃ তাঁহাদেরও যেন আজ নবজীবন আরম্ভ হইল। গোবিন্দপাদ এই সকল সাধুগণের শিক্ষার ভার শঙ্করের উপরই প্রদান করিলেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই সর্ব্বদা গোবিন্দপাদ এবং শঙ্করের সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। ইহাতে শঙ্করের সাধনার পক্ষে বড় সুবিধা হইতে লাগিল। যোগীজনোচিত আহার্য্য-সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে আর ভিক্ষায় গমন করিতে হইল না। শুধু ইহাই নহে, আরও সুবিধা এই যে এ সময় গোবিন্দপাদ সম্মুখস্থ গুহাতে বাস করিতেন, সুতরাং তাঁহার পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র গুহাটী শঙ্করের সাধনার বড় উপযোগী হইল। ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয় তখন নানাদিকেই সুবিধা হয়, আজ যেন শঙ্করের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল।

এইরূপে শঙ্কর যথাবিধি যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এখন প্রতিদিন রাত্রির শেষ প্রহরে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমেই গুরুবন্দনা করেন। তৎপরে নর্ম্মদাতীরে একটী নিভৃত স্থানে গুরু-উপদেশক্রমে শরীরের মল-শোধক 'নেতি' 'ধৌতি' ক্রিয়া সমাপন করিয়া নর্ম্মদাস্নানান্তে তৎতীরে বসিয়াই সন্ধ্যাবন্দনা ও তর্পণ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

শঙ্করের এই সকল কর্ম্ম সমাপ্ত হইতে না হইতে বালার্কারুণ ওঙ্কারনাথের নৈশাবরণ উন্মুক্ত করিয়া ফেলিতেন। নর্ম্মদাদেবী যেন পতিসেবার জন্য অতিমাত্র ব্যাকুলা হইয়া, ভক্ত সন্তানগণের কলস এবং কমণ্ডলু মধ্যে প্রবেশ করিয়া ওঙ্কারনাথের অঙ্গ ধৌত করিতে যাইতেন। জীবকুলও নিদ্রালস্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত।

ইহার অনতিপরেই শঙ্কর নর্ম্মদাতীর পরিত্যাগ করিয়া গুহা-মধ্যে প্রত্যাগত হইতেন।

গুরুদেবের গুহামধ্যে শঙ্কর কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া মৃগচর্ম্মোপরি একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া একটী উত্তম আসন রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে উপবেশনপূর্ব্বক মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত যোগাভ্যাস করিতেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে তিনি উত্থিত হইতেন এবং পুনরায় নর্ম্মদায় অবগাহন করিয়া যথাবিধি মধ্যাহ্ন কৃত্য সম্পন্ন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন। পরে গোবিন্দপাদের ভক্ত দর্শকগণ প্রদত্ত, অথবা শিষ্যগণের দ্বারা আনীত ফলমূলাদি গুরুদেবকে নিবেদন করিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন।

আহারান্তে শঙ্কর গোবিন্দপাদের চরণপ্রান্তেই উপবিষ্ট থাকিয়া কখন শিষ্যগণসহ ব্রহ্মবিচারে নিযুক্ত, এবং কখন বা গুরুদেবের পাদসম্বাহনে প্রবৃত্ত হইতেন। পরে সন্ধ্যা সমাগত হইলে পুনরায় সন্ধ্যাবন্দনা এবং যোগাভ্যাসে নিমগ্ন হইতেন, এইরূপে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যোগানুষ্ঠান করিয়া যোগী শঙ্কর নিশাকালে দুগ্ধাদি যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যে ক্ষুন্নিবারণ করিতেন।

বিশিষ্টাদেবীর একমাত্র সন্তান বালক শঙ্কর এখন এইরূপে কঠোর অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। সাধনাবস্থায় তাঁহার হৃদয়ের ভাব আমরা সামান্য মানব কি বুঝিব? তবে তিনি এই সময়ে যে সকল গভীর ভাবব্যঞ্জক কবিতা ও উপদেশাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহা দেখিলে তাঁহার সে ভাব কতকটা বুঝা যায়। জগতের হিতের জন্য যাঁহার জন্ম, তাঁহার সে ভাব কি কখন লুক্কায়িত থাকিতে পারে? আমরা তাঁহার এ সময়ের রচিত নানা নিবন্ধের মধ্যে একটীমাত্র প্রদান করিলাম। ইহা সাধনপঞ্চক নামে সাধারণতঃ সর্ব্বত্র পরিচিত, যথা :—

"বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং
তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্।

পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তা
মাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্ ॥১
সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢা ধীয়তাং
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢতরং কর্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।
সদ্বিদ্বানুপসর্পতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং
ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণতাম্ ॥২
বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।
ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাং
দেহেঽহংমতিরুজ্ঝতাং বুধজনৈর্ব্বিবাদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩
ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।
শীতোষ্ণাদি বিষহ্যতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাং
ঔদাসীন্য মভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্য মুৎসৃজ্যতাম্ ॥৪
একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্।
প্রাক্কর্ম্ম প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাং
প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতা মথপরব্রহ্মাত্মনা স্থীযতাম্ ॥৫"

এই ভাবে সম্বৎসর অতীত হইল, শঙ্কর একে একে হঠযোগের অনেকগুলি ক্রিয়াতে সিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দপাদ সর্ব্বদাই শঙ্করের অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি বুঝিলেন শঙ্করের আর হঠযোগের আবশ্যকতা নাই, এখন তিনি ব্রহ্মধ্যান-মূলক রাজযোগ অভ্যাস করিলে সেই "নির্ম্মল" "কেবল" ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহার চিত্ত, মন, প্রাণের চাঞ্চল্য আর নাই; শরীর নীরোগ নির্ম্মল হইয়াছে, সত্যলাভের নিমিত্ত হঠযোগের যতটুকু প্রয়োজন তাহা হইয়াছে।

একদিন অপরাহ্নে শঙ্কর একমনে গুরুদেবের পদসেবাতে রত রহিয়াছেন, নিকটে শিষ্য-সেবক কেহই নাই, গুরুশিষ্যেও কোন কথাবার্ত্তা হইতেছে না, উভয়েই নীরব—যেন গভীর ধ্যানমগ্ন। গোবিন্দপাদ সুযোগ বুঝিয়া শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "বৎস শঙ্কর! এখন হইতে তুমি হঠযোগের

সঙ্গে রাজযোগ অভ্যাস কর। ইহা অভ্যাস করিতে পারিলে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার হৃদয়ে বিকশিত হইবে। দেখ—বিচার ও অধ্যয়ন দ্বারা যে ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়, তাহা পূর্ণ উপলব্ধি নহে, তাহাতেও সন্দেহবীজরাশি বর্ত্তমান থাকে। সময় পাইলেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সাধকের হৃদয়-প্রান্তরে সন্দেহারণ্যের সৃজন করিয়া থাকে। বৎস! তুমি শ্রুতিমধ্যে অবগত হইয়াছ, ব্রহ্মতত্ত্বের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের পর সাক্ষাৎকার হওয়া আবশ্যক। বিচার ও অধ্যয়নের দ্বারা শ্রবণ মনন পর্য্যন্ত হয়, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি দ্বারা নিদিধ্যাসন এবং সাক্ষাৎকার-লাভ ঘটে। তুমি এতদিন হঠযোগের অনুশাসন অনুসারে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে ষট্‌চক্র ও তন্মধ্যস্থ দেবতাতত্ত্বের ধ্যান করা হইয়াছে, আর তাহার ফলে উক্ত দেবতাতত্ত্বেরও তোমার সাক্ষাৎকার-লাভ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্বধ্যান করা হয় নাই, সেকারণ শাস্ত্রীয় দেবতাতত্ত্বের মূল ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে নাই। আইস বৎস! আজ তোমায় আমি ব্রহ্মতত্ত্বধ্যানমূলক রাজযোগ শিক্ষা দিব। ইহা তুমি তোমার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কতিপয় হঠযোগের ক্রিয়ার সহিত অনুষ্ঠান কর; ইহার ফলে তুমি নীরোগ শরীরে ব্রহ্মতত্ত্ব-রসাস্বাদন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে।

"দেখ বৎস! হঠযোগ বলিতে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই আটটী অঙ্গবিশিষ্ট যোগ বুঝায়। রাজযোগের অঙ্গ কিন্তু ওরূপ নহে। ইহার পনরটী অঙ্গ, যথা:—১। যম, ২। নিয়ম, ৩। ত্যাগ, ৪। মৌন, ৫। দেশ, ৬। কাল, ৭। আসন, ৮। মূলবন্ধ, ৯। দেহসাম্য, ১০। দৃক্‌স্থিতি, ১১। প্রাণসংযম, ১২। প্রত্যাহার ১৩। ধারণা, ১৪। ধ্যান, ১৫। সমাধি। আমরা যে সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহারা এই যোগবিদ্যা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে অতি শীঘ্র সাধক নিদিধ্যাসন-সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করে।

"হঠযোগে 'যম' বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ বুঝায়, রাজযোগে কিন্তু যম বলিতে "সমস্তই ব্রহ্ম" একথা ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্রিয়সংযম করাকে বুঝায়। সেইরূপ হঠযোগে নিয়ম বলিতে শৌচ, সন্তোষ তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানকে নির্দ্দেশ করা হয়। রাজযোগে নিয়ম বলিতে "আমি অসঙ্গ, অবিক্রিয়, সর্ব্বগত ব্রহ্ম" এই প্রকার ধারণার প্রবাহ বুঝিতে হয়। হঠযোগে নিয়মের পরই আসন উপদিষ্ট হইয়াছে, রাজযোগে কিন্তু

নিয়মের পর এবং আসনের পূর্ব্বে "ত্যাগ," "মৌন," "দেশ" ও "কাল" নামে কতিপয় ধ্যানানুষ্ঠান করিতে হয়। উক্ত "ত্যাগ" অভ্যাস কালে ভাবিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই নাম ও রূপ সাহায্যে ব্রহ্মে কল্পিত, এজন্য আমার লাভ করিবার যোগ্য আর কি থাকিতে পারে। ত্যাগের পর মৌন; ইহাতে, ব্রহ্ম বাক্য-মনের অগোচর, এইরূপ ধ্যানের অভ্যাস করিতে হইবে। মৌনের পর "দেশ" সাধনা করিতে হয়। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের আদি মধ্য অন্ত কিছুই নাই এবং ব্রহ্ম দ্বারাই অনন্ত দেশ সতত ব্যাপ্ত এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে। দেশের পর "কাল" রাজযোগে শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু যে কাল তাহা ব্রহ্ম, এই প্রকার চিন্তার অভ্যাস বুঝায়। ইহার পর ৭ম "আসন" সাধন। এতদ্দ্বারা যে সুখস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তা করিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা থাকে না সেই ব্রহ্ম-চিন্তা বুঝায়। হঠযোগে আসন-সাধনে যেরূপ হস্তপদাদি এক এক প্রকারে স্থাপন করিয়া রাখিতে হয়, ইহাতে আর তাহা করিতে হয় না। তাহার পর দেখ বৎস! হঠযোগে আসনের পর প্রাণায়াম ব্যবস্থিত হইয়াছে, রাজযোগে কিন্তু আসনের পর আরও তিনটী ক্রিয়া আছে, যথা:—মূলবন্ধ, দেহসাম্য ও দৃক্‌স্থিতি। এই "মূলবন্ধ" রাজযোগের অষ্টম সাধন। ইহার অর্থ ব্রহ্মকে সর্ব্বভূত এবং অজ্ঞানের মূল কারণরূপে চিন্তা করা। মূলবন্ধের পর "দেহসাম্য" তাহার অর্থ যাহা স্বভাবতঃ বিষম পদার্থ, তাহাও ব্রহ্মেতে লয় হয়, এইভাবে ব্রহ্মের ধ্যান। তাহার পর রাজযোগের ১০ম সাধন "দৃক্‌স্থিতি।" ইহার অর্থ ব্রহ্মকে দৃষ্টি, দর্শন ও দৃশ্যের বিরাম-স্থানরূপে ধ্যান করা। দৃক্‌স্থিতি সিদ্ধ হইলে ১১শ অঙ্গ প্রাণায়াম বা "প্রাণসংযম" অভ্যাস করিতে হয়। ইহাদ্বারা "প্রপঞ্চ মিথ্যা" "এক ব্রহ্মই আছেন" এইরূপ চিন্তা-সাহায্যে বিষয়াদির প্রতি উপেক্ষা অভ্যাস করিতে হয়। হঠযোগে প্রাণায়াম রেচক-কুম্ভক-পূরক নামক বায়ুসংযম ভিন্ন আর কিছু নহে। রাজযোগের দ্বাদশ অঙ্গ "প্রত্যাহার"। ইহাতে সমুদয় বিষয়ে আত্মদৃষ্টি করিয়া চিন্মাত্র-স্বরূপে ডুবিয়া যাইতে হয়। হঠযোগে কিন্তু ইহা তুমি অন্য প্রকারে সাধন করিয়াছ, তথায় চক্রমধ্যে ধ্যান করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গণ ইতস্ততঃ গমন করিলে তুমি কেবল তাহাদিগকে পুনরায় ধ্যেয় বস্তুতেই আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছ, এস্থলে কিন্তু ব্রহ্মধ্যানে সেই কার্য্য করিতে হইবে। ত্রয়োদশ "ধারণা", ইহার অর্থ যেখানেই মন গমন করিবে সেইখানেই ব্রহ্মদর্শন করা। ১৪শ "ধ্যান", ইহাতে ব্রহ্মই আছেন এই প্রকার ঐকান্তিক বৃত্তিবশতঃ নিরালম্ব

ভাবে অবস্থিতি বুঝায়। ১৫শ "সমাধি"—ইহার অর্থ অন্তঃকরণকে নির্ব্বিকার ও ব্রহ্মাকার করিয়া সম্যক্‌রূপে বৃত্তি-বিস্মরণ। হঠযোগের সহিত এই ধারণা, ধ্যান, সমাধির পার্থক্য ধ্যেয় বিষয়-ভেদে। রাজযোগে যাহা ধ্যেয় বিষয় তাহাই ব্রহ্ম, কিন্তু হঠযোগে উহা, ব্রহ্মভিন্ন দেবতাসমূহ প্রভৃতি। ইহার ফলে হঠ-যোগের সমাধিভঙ্গের পর মানব পূর্ব্ববৎ বিষয়ে আসক্ত হইতে পারে, কিন্তু রাজযোগে সে সম্ভাবনা থাকে না। রাজযোগে তাহার সমুদয়ে ব্রহ্মদর্শন ঘটায়, আসক্তির বিষয়ের অভাব হয়। সুষুপ্তিভঙ্গের পর সাধারণ মানব যেমন পূর্ব্ব সংস্কার লইয়া জাগরিত হয়, হঠযোগের সমাধির পর প্রায় সেইরূপ কতকটা ঘটে। এজন্য, বৎস, তুমি এক্ষণে এই রাজযোগে অধিক যত্নবান্ হও।

"দেখ বৎস! এই রাজযোগে অতি সহজে ব্রহ্মতত্ত্বে নিদিধ্যাসন সিদ্ধ হয়। আর তাহাতে সাধক তৈলধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মে মিলিত হয়। এই নিদিধ্যাসন না হইলে প্রকৃত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না। রাজযোগে এই প্রকারে নিদিধ্যাসন অতি সত্বর লাভ হয় বলিয়া উহাই আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে অতিশয় আদৃত হইয়া থাকে। আবার ইহা সকলকে সহজে প্রদান করা হয় না। যাহারা হঠযোগে সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধাই ব বিভূতির প্রতি অনাসক্ত হয়, সর্ব্বাবস্থায়ির মূল এক অদ্বৈততত্ত্বের অনুসন্ধানে অনুরাগ প্রদর্শন করে, আমরা ইহা তাহাদিগকেই দিয়া থাকি, অথবা যাহারা স্বভাবতঃই নির্ম্মল ও অচঞ্চলচিত্ত, যাহারা যথাবিধি বর্ণাশ্রমাচারসম্পন্ন, বৈরাগ্যবান্, নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকী এবং শান্তপ্রকৃতি, তাহাদিগকে আমরা অনেক সময়ে ইহা প্রথম হইতেই প্রদান করিয়া থাকি। তুমি বৎস! সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং তোমার দ্বারা ভবিষ্যতে জগতে অনেক কার্য্য হইবে, এজন্য আমি হঠযোগেও তোমাকে অভ্যস্ত করিলাম। কারণ, জগতের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বিভূতির আবশ্যক হয়, সাধারণ লোককে সৎপথে আনিতে হইলে যোগবল বা অদ্ভুত কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। সুতরাং বৎস, এখন হইতে তুমি এই নূতন পথের পথিক হও এবং সিদ্ধ হইয়া জগতের কল্যাণ কর।'

* দৈব-শক্তি।

[শ্রীমতী সরলাবালা দাসী]

জগৎ শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

সাধারণ ভাবে দেখিলে এই শক্তি কেবল দেশ-কাল-নিমিত্তে নিয়মিত হইতেছে। প্রত্যেক কার্য্যই যেন কোন একটী কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে ও সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছে। সেইজন্য এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার ভিতর শক্তির যে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে নিয়মাবদ্ধ যান্ত্রিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানালোকে যতই আমাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে ততই আমরা ক্রমশঃ স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাই যে, বিশ্ব-জগৎ যে কেবল একটী যন্ত্রের ন্যায় ইচ্ছাহীন অন্ধশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহা নহে, জড়জগতে যে সকল খণ্ডশক্তি নানাস্থানে নানাভাবে প্রকাশিত হইতেছে সেই সমস্ত শক্তিই মহান্ জ্ঞানময় এক শক্তির প্রয়োগে বিধৃত রহিয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জগদ্বিকাশে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে শক্তির পরিচালনের বিষয় বিজ্ঞানানুসারে আলোচনা করিয়া দেখিলে কোন এক মহান্ পরিচালক শক্তিসত্তা স্বতঃই অনুমিত হয়।

জড় ও চৈতন্যময়ী শক্তি।

জড় জগতের পরিচালনে উত্তাপ ও মাধ্যাকর্ষণ এই দুইটীই প্রধান নিয়ামক শক্তি। সৌরজগতের আদিম অবস্থায় উত্তাপাতিশয্য-বশতঃ সমস্ত সৌরজগৎ একটী অখণ্ড বাষ্পমণ্ডলের আকারে ছিল। তাহার পর, তাপবিকীরণে, যখন ক্রমশঃ উত্তাপ হ্রাস হইতে লাগিল, তখন প্রচণ্ড উত্তাপে যে মাধ্যাকর্ষণশক্তি এতদিন আচ্ছন্ন ছিল তাহা পরিস্ফুট হইল, এবং প্রশমিত উত্তাপ ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি এই উভয়ের সংযোগে অখণ্ড বাষ্পময় সৌরজগৎ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। এই বিভাগে বিশৃঙ্খলা ছিল না। সুন্দর সুশৃঙ্খল বিভাগে বাষ্পময় সৌরজগতের খণ্ডীকৃত অংশসকল সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহরূপে পরিণত হইল। আমাদের এই পৃথিবীও সেই বিভক্ত সৌরজগতের একটী অংশ।

উত্তাপ ও মাধ্যাকর্ষণ।

পৃথিবীও প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। উত্তাপের বিকীরণে ক্রমশঃ

* চুঁচুড়া সাহিত্যসম্মিলনীতে পঠিত।

অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে যখন পৃথিবীর উপরিভাগে জল ও অঙ্গারজানাদি বাষ্প উৎপন্ন হইল এইরূপ সময় কেন্দ্রাতীগ গতিতে ইহার একটী টুক্‌রা ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আর একটী উপগ্রহ সৃষ্টি করিল, সেটী চন্দ্র। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এখন যেখানে এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর অবস্থিত, ঐ স্থান হইতেই পৃথিবীর কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া চন্দ্র-উপগ্রহে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলে, পৃথিবীর চারিদিক জলময় না হইয়া যেখান হইতে পৃথিবীর কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানেই সমুদায় জল আসিয়া একত্রিত হইল, তাহাতে সেই অংশে মহাসাগরের সৃষ্টি হইল ও অপরাংশে স্থলভাগ দেখা দিল। এইরূপে পৃথিবী ক্রমশঃ জীববাসোপযোগী হইতে লাগিল।

চন্দ্রের উৎপত্তি এবং সমুদ্র ও স্থল সৃষ্টি।

সৃষ্টিরহস্যে জীবসৃষ্টি একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার। পৃথিবী যখন অতি উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল, তখন তাহাতে কোন জীব থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। উত্তাপ কমিয়া জীববাসোপযোগী হইলে প্রথমে কি প্রকারে প্রাণী-হীন পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হইল এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ অনেক গবেষণা ও তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। বোধ হয়, জড়শক্তির বহির্ভূত অপর এক চেতনশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে চিরকালই এইরূপ বিচার-বিতর্ক চলিবে, সিদ্ধান্ত কোন কালেই স্থির হইবে না। ঐ বুদ্ধ্যনুমেয়, জড়ের পরিচালক, চেতনশক্তিকেই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দৈবশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

প্রাণীহীন জগতে প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব।

পৃথিবীর আদিম অবস্থায় সমুদ্রের জলে অত্যন্ত চূণ ছিল, এবং বায়ুতে অঙ্গারজান বাষ্প (Carbon-di-oxide) এত অধিক ছিল যে তাহাতে উন্নত অবস্থার প্রাণীর প্রাণধারণ সম্ভব ছিলনা। সেইজন্য, যাহা-দের দ্বারা পৃথিবীর এই দোষ সংশোধিত হইয়া পৃথিবী উন্নত প্রাণীর বাসোপযোগী হইতে পারে, সেই সময় পৃথিবীতে সেই প্রকার জীবের সৃষ্টি হইল। উদ্ভিদ্‌ই এই শ্রেণীর জীব, ইহারা ক্রমাগত বায়ু হইতে পূর্ব্বোক্ত বাষ্প টানিয়া লইয়া বায়ু বিশুদ্ধ করিতে থাকিল। সে কালের উদ্ভিদ্ এত বৃহৎ এবং তাহার শাখা প্রশাখা এত বিস্তৃত ছিল যে তাহার তুলনায় আধুনিক সময়ের বড় বড় বৃক্ষসকল আদিমযুগের সামান্য তৃণ হইতে কিছু বড় হইতে পারে। আদিম যুগের উদ্ভিদের দ্বারা কেবল যে বায়ু

পৃথিবীর ক্রমবিকাশ ও জগৎ-রচনায় সুনিপুণ কৌশল।

বিলুপ্ত হইল তাহা নহে, সেই সকল উদ্ভিদ্‌দেহের ধ্বংশাবশেষ পাথুরিয়া কয়লার আকার ধারণ করিয়া ভবিষ্যৎ যুগের মানবের প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে খনিগর্ভে সংগুপ্ত রহিল। বর্ত্তমানকালে পাথুরিয়া কয়লাই সভ্যতার উত্তরসাধক। দ্রুতগামী বাষ্পরথ, বাষ্পীয় পোত, কল-কারখানা এ সমস্ত পাথুরিয়া কয়লার উপর নির্ভর করিতেছে। জগৎ-রচনায় এইরূপ সুনিপুণ কার্য্যকৌশল সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। আবর্জ্জনা বলিয়া কিছুই পরিত্যক্ত হয় না, আমরা যাহাকে পরিত্যাজ্য ভাবি সেই আবর্জ্জনাই আবার সুদূর ভবিষ্যতের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইতে থাকে।

সমুদ্রের জলে সে সময় যে সকল প্রাণী উৎপন্ন হইল তাহাদের জল হইতে চুণ আকর্ষণ করিয়া লইবার ক্ষমতা ছিল। এই শ্রেণীর প্রাণী বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলে তাহাদের সমবেত চেষ্টায় অধিকাংশ চূর্ণ সমুদ্রগর্ভের নিম্নভাগে পতিত হইয়া একত্রে জমাট বাঁধিয়া চুণ প্রস্তররূপে পরিণত হইয়া গেল।

ডারউইন-প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ যুক্তির দ্বারা "প্রাণী, ক্রমবিকাশে নিম্নতম অবস্থা হইতে উচ্চতর জীব-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে" এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। ইঁহাদের এই ক্রমবিবর্ত্তন-সিদ্ধান্ত প্রকৃতিবাদ অথবা জড়বাদের উপরেই স্থাপিত হইয়াছে, অথচ জড়বাদ সর্ব্বত্র ইহার মীমাংসা যে করিতে পারে না ডারউইন নিজেও একথা স্বীকার করিয়াছেন। এক শ্রেণীস্থ জীবের অল্পাধিক পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে ডারউইন বলিয়াছেন, "আমরা একদল কুক্কুট পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, উহাদের পক্ষের বর্ণ-বৈচিত্র্য অগণ্য। এই বিচিত্রতার অবশ্যই পৃথক্ পৃথক্ প্রবর্ত্তক কারণ আছে। যদি একই কারণ একই ভাবে একাধিক কুক্কুটের বংশ-পরম্পরার উপর ক্রিয়া করে, তবে উহারা সম্ভবতঃ একই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইবে।" এই পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে ডারউইন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের কারণ এখনও সম্যক্ অবগত নহি।" ডারউইন তাঁহার "Origin of Species" নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমাংশে বলিয়াছেন,—"আমি এতক্ষণ জীবশ্রেণীর অল্পাধিক পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এরূপ ভাবে বলিয়াছিলাম, যেন উহা যদৃচ্ছাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। এইরূপ বলায় প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণ-সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।" আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন, "জীবদেহে এমন অনেক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, যাহাকে স্থূল দৃষ্টিতে অহেতুক

ক্রম-বিবর্ত্তন ও জড়বাদ।

বলা যাইতে পারে, যেহেতু ঐ সকলের প্রকৃত কারণ-সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ। যাহা হউক, এই সকল পরিবর্ত্তন ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত পার্থক্যই হউক, জাতিগত পার্থক্যই হউক অথবা গুরুতর আকস্মিক গঠন-বৈচিত্র্যই হউক, উহা জীবের অন্তঃপ্রকৃতির উপর যেরূপ বিশেষভাবে নির্ভর করে বাহ্যাবস্থার উপর তদ্রূপ নহে।" ডারউইনের কথার ভাবে অনেকটা এইরূপ বুঝায় যে, যে শক্তির দ্বারা জীবদেহের এই সকল গঠন-বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় সে শক্তি দেশকালনিমিত্তের সম্পূর্ণ অধীন নহে। আরও বুঝা যায়, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনগুলি কোন ভাবী বৃহৎ পরিবর্ত্তন সূচিত করে।

Correlated variation অথবা যুগপৎ পরিবর্ত্তন।

জীবদেহের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের সমস্যা মীমাংসা করা যদিও আমাদের পক্ষে দুরূহ, তথাপি এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে ইহা উদ্দেশ্যহীন ও বিশৃঙ্খলভাবে ঘটিতেছে না। এই সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর আমরা একটী শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই, যেমন "correlated variation" অর্থাৎ যুগপৎ পরিবর্ত্তন। মানব ও মানবেতর জীবগণের ভিতর অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, দেহের একাংশ অথবা কোন একটী যন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইলে অপর কোন অংশও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। চক্ষুকর্ণ, দন্তকেশ, কেশের এবং দেহের বর্ণ, দেহের বর্ণ ও ধাতু, ইহারা অল্পাধিক যুগপৎ পরিবর্ত্তনশীল। অর্থাৎ সাধারণ ভাব হইতে যদি একটীর কিছু পরিবর্ত্তন হয় তবে অপরটীরও সেই সঙ্গে পরিবর্ত্তিতভাব দেখা যায়। অধ্যাপক স্যাফ্‌হোসেন্ বুঝাইয়াছেন, যে, বলিষ্ঠ দৃঢ়পেশীক দেহ এবং ভ্রূতলস্থ অস্থিরেখার উচ্চতা এতদূর একত্রে পরিবর্ত্তিত হয় যে একের প্রাধান্য অপ্রাধান্যের সহিত অপরের সংযোগ দেখা যায়। অসভ্য মানবে এই পরিবর্ত্তন অধিক পরিস্ফুট হয়। "Origin of Species" গ্রন্থে এইরূপ একত্রে পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে,—"যে সকল মার্জ্জার সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ ও নীলচক্ষু—তাহারা বধির। কাষ্ঠবর্ণ মার্জ্জার প্রায়ই স্ত্রী-জাতীয়। ক্ষুদ্রচঞ্চু পারাবতের পদও ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘচঞ্চুগুলির পদও দীর্ঘ।

জীবস্রষ্টা ইচ্ছাময়-শক্তি।

এইরূপ পরিবর্ত্তনের সহিত প্রাণীগণের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধিরও যে বিশেষ সংযোগ আছে ডারউইন তাহাও লক্ষ্য করিয়াছেন। কোন কোন পরিবর্ত্তনে উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস আবার কোন পরিবর্ত্তনে উহার বৃদ্ধি হয়, অন্যবিধ পরিবর্ত্তনে ঐ শক্তির উপর কোন ক্রিয়াই করে না; অর্থাৎ কতকগুলি পরিবর্ত্তন সৃষ্টি হইতে

পরিত্যক্ত হয় ইহাই যেন স্রষ্টার ইচ্ছা, এইজন্য সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত জীবের উৎপাদিকা শক্তিও কমিয়া যায়, আবার অন্যবিধ পরিবর্ত্তনে বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে।

জীবদেহের এই সকল পরিবর্ত্তনের ডারউইন যে সর্ব্বপ্রধান নিয়ামক হেতু আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাই "Natural Selection" অথবা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধি। এ বিষয়ে ডারউইনের অভিমত তাঁহার পুস্তক হইতেই অনুবাদিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। "জীব-শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে, তাহা যে কারণ বশতঃ ও যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, যদি তাহা ঐ জীবগণের পক্ষে উপকারী হয় তবে কালসহকারে উহা স্থায়িত্ব লাভ করিবে, এবং ঐ শ্রেণীভুক্ত সকল জীবের মধ্যে বিস্তৃত হইবার করূপ প্রবণতা লাভ করিবে। পক্ষান্তরে, যে সকল পরিবর্ত্তন উহাদের উপকারে অথবা অপকারে আসে না তাহার উপর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধির কোন আধিপত্যই নাই, ঐ সকল পরিবর্ত্তন অনির্দ্দিষ্টরূপে সেই জীবশ্রেণীতে কোথাও অল্প কোথাও অধিকভাবে প্রকাশ পাইবে। আর যে সকল পরিবর্ত্তন এই জীবগণের পক্ষে অপকারী তাহা ক্রমে প্রত্যাহৃত হইবে। কারণ, তাহার ফলে সেই সকল জীব বিনষ্ট হইবে।"

পরিবর্ত্তনের ভিতর ভবিষ্যৎ সূচনা।

ডারউইনের এই আবিষ্কারে সৃষ্টিরহস্যের ভিতর সৃষ্টির মূল-স্বরূপিণী শক্তির উদ্দেশ্যের এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, যে উদ্দেশ্য প্রথমতঃ বাষ্পমণ্ডল হইতে গ্রহের সৃষ্টিতে এবং গ্রহগুলিকে জীববাসোপযোগী করিবার জন্য নানা উপায়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, জীবদেহের এই সকল পরিবর্ত্তনেও সেই একই মহান্ উদ্দেশ্য প্রকটিত হইতেছে।

প্রাণীকে জগতে স্থায়িত্ব-লাভের জন্য যে সকল বিবিধ প্রকার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়, ডারউইন তাহার এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন,—

১ম। আহার্য্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় উপকরণের নিমিত্ত অপর জীবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

২য়। জল, বায়ু ও শত্রু প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া।

৩য়। বংশবৃদ্ধির সুবিধা ও অসুবিধা।

যদি কোন জীবের এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন হয় যাহা তাহার জীবন-সংগ্রামের পক্ষে উপযোগী, তাহা হইলে অন্য যে সকল প্রাণী সেইরূপ পরিবর্ত্তনের সুবিধা

লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদের সহিত জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া ঐরূপে পরিবর্ত্তিত জীবের পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত স্থায়িত্ব-লাভের সম্ভাবনার আধিক্য হয়, এবং সে ভাগ্যক্রমে যে পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে তাহাও তাহার বংশাবলীর ভিতর বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে পৃথিবীতে স্থায়িত্ব-লাভের সুযোগ প্রদান করে। তাহাদের বংশাবলীর ভিতর পরেও আবার এইরূপ একই ভাবের আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, এইরূপ ক্রমশঃ পবিবর্ত্তিত হইতে হইতে এক নূতন শ্রেণীর প্রাণী সৃষ্ট হয়।

ডারউইনের এই যুক্তি সকল সময় যে খাটে না তাহা, পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বাবা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায়। ডাবউইন নিজেও স্বীকার কবিয়াছেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্তে যে জীবতত্ত্বের সকল বিষয়েরই বিশদ ব্যাখ্যা হয় এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপে জিরেফের কথা আলোচনা করা যাউক। এই জন্তুর গ্রীবা দীর্ঘ হইবার কারণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-মুখে ডারউইন এইরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন :—

"একশ্রেণীস্থ জন্তুগণের মধ্যে পবস্পরের কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছু কিছু ছোট বড হইয়াই থাকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা আছে। তাহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, এই নিয়মাধীনে যে সকল জিরেফের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছু দীর্ঘায়তন হইয়াছিল প্রায় তাহারাই জীবন-সংগ্রামে রক্ষা পাইয়াছিল। ইহাদের বংশজাতগণ পিতৃমাতৃধর্ম্মানুক্রমবশতঃ ঐ অঙ্গের দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইবে, অথবা এইরূপ দৈর্ঘ্যপ্রাপ্তির প্রবণতা লাভ করিবে। আর যাহারা ঐ বিষয়ে হীন তাহারা গো-মহিষাদি অপব পশুর সহিত জীবন-সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া বিলুপ্ত হইবার পথে অগ্রসর হইবে। ইহাব ফলে জিরেফের গ্রীবা-পদাদি অসাধারণ দীর্ঘ হওয়া স্বাভাবিক।"

এইরূপ বিচারে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঐ কাবণ বশতঃ কেবল যে জিরেফই লম্বদেহ হইবে তাহা নহে, জিরেফের সমাবস্থ অন্যান্য জন্তুও তদ্রূপই হইবে। আফ্রিকার জিরেফ অসাধারণ লম্বগ্রীব, জগতের অন্য কোথাও এরূপ লম্বগ্রীবের দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। জিরেফশ্রেণীস্থ অপর জীব জগতের অন্যত্র ঐ ভাবাপন্ন হয় না কেন, ডাবউইন তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। ঐ তর্কের এবং ঐরূপ অনেক তর্কের মীমাংসা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা করা যায় না। আর তাহা হইতেই বুঝা যায়

যে, শুধু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধির সাহায্যে বিবর্ত্তনবাদ সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

যদি ডারউইনের মত মানিয়াই লওয়া যায় তাহা হইলেই বা কি প্রমাণ হয়? ক্রম-বিবর্ত্তনবাদের মতে জীব যখন নিম্নতম অবস্থায় থাকে তখন তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা অথবা বাক্‌শক্তি কিছুই থাকে না। সেই জড়পিণ্ডবৎ প্রাণীর যৎসামান্য স্পর্শশক্তি হইতেই ক্রমশঃ ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বাক্‌শক্তির বিকাশ হয়। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া যে তাহারা এই শক্তি লাভ করে একথা বলা যায় না, কেন না এই সমস্ত শক্তি তাহাদের পক্ষে অভূতপূর্ব্ব এবং তাহাদের ধারণারও অতীত। তাহাদের এই নবশক্তি যদি আবহমান কাল পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান কোন শক্তির ক্রমবিকাশ না হয়, তবে তাহারা এই শক্তি কোথা হইতে লাভ করিল? অতএব এই নবলব্ধ শক্তি তাহারা যোগ্যতানুসারে দানস্বরূপ জীববিবর্ত্তনে অধিষ্ঠিতা প্রকৃতির নিকট প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপ অনুমানই এখানে যুক্তিযুক্ত।

অধুনা সভ্যজগতে ডারউইন-কথিত "জীবনসংগ্রাম"-রূপ মতেরই অতিশয় প্রাধান্য। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে একস্থলে বলিয়াছেন "সংসারের সঙ্গে চিরন্তন সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করায় য়ুরোপীয় জাতি একটা বিশেষ বললাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। ইহার বিপরীত অবস্থাকে ইহারা morbid অর্থাৎ রুগ্নাবস্থা বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রেরা এমন করিয়া মানুষ হইবে যাহাতে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ বলে লড়াই করিতে পারে। জীবনকে ইহারা সংগ্রাম বলিয়া জানে। বিজ্ঞানও ইহাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, জীবিকার লড়াইয়ে যাহারা জিতে তাহারাই এই পৃথিবীতে টিকিয়া যায়।"

কিন্তু অতি নিম্নস্তরের জীবশ্রেণীর মধ্যেও পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের ভিতর জীবনসংগ্রাম ব্যতীত আরও একটী ব্যাপার নিগূঢ়ভাবে বিকশিত হইতেছে, তাহা প্রেম ও পরার্থ-পরতা। এই শেষোক্ত ভাবটি জীবনসংগ্রামের বিপরীতাভিমুখী অর্থাৎ ইহার বিকাশ জীবনসংগ্রামের কার্য্যকরী শক্তিকে খর্ব্ব করিতেছে।

জীবন-সংগ্রাম ও তাহার বিরোধী ভাব।

জীবের বংশ-বিস্তৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও বুঝা যায়, কেবল জীবন-সংগ্রাম নহে,—তাহা অপেক্ষা আরও এক উচ্চতর বিধান জীবমণ্ডলীর বিবর্ত্তনে

সহায়তা করিতেছে। নিম্নতম শ্রেণীস্থ জীবগণের মধ্যে কাহারও দেহ খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া, কাহারও বা দেহাংশ স্ফীত ও পরিত্যক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি-কার্য্য নিষ্পন্ন করে। এই উপায়ে একটী জীব হইতে দুইটী উৎপন্ন হয়। ইহাই বংশবৃদ্ধির প্রাথমিক ও সরলতম বিধান। যদি জীবনসংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ক্রম-বিবর্ত্তনে একমাত্র নিয়ামক শক্তি হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত সরল ও সহজ বিধানের পরিবর্ত্তে উচ্চতর জীবশ্রেণীর ভিতর বংশবৃদ্ধি-বিষয়ক জটিল বিধান প্রবর্ত্তিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ, বংশবৃদ্ধির প্রণালী যতই জটিল হইবে, বংশবিস্তারের প্রাচুর্য্য ততই কমিয়া আসিবে, এবং ঐরূপে বংশ-হ্রাসে ঐ জীবশ্রেণীর পক্ষে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া জগতে স্থায়িত্ব-সম্ভাবনাও কমিয়া আসিবে।

জীব ও উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি-প্রণালী।

উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিপ্রণালী সবিস্তারে আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের ভিতর হইতেই এই নিয়ম জটিল পথ অবলম্বন করিয়াছে। কোন কোন বৃক্ষে একই ফুলে পরাগরেণু ও গর্ভকেশর দৃষ্ট হয়। কিন্তু অনেক সময়ই ঐ উভয় বীজের একটি পুষ্টিলাভ করিলেও অপরটী অপুষ্ট থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় সেই ফুলের অভ্যন্তরস্থিত গর্ভকেশর ও পরাগের সংযোগে তাহার বংশবৃদ্ধির উপায় নাই। ডারউইন এই সম্বন্ধে বলেন যে, "ইহা অতি বিস্ময়কর। পরাগরেণু ও গর্ভকেশর পরস্পরের এত সন্নিহিত তথাপি উহা এক সময়ে পরিপুষ্ট না হওয়ায় উহাদের মিশ্রণে ফল উৎপন্ন হইতে পারিল না।" যে সকল পুষ্পের গর্ভকেশর ও পরাগরেণু একত্রই পুষ্টিলাভ করে, পতঙ্গগণ আসিয়া তাহাদিগেরও একের রেণু অন্যের কেশরে সংযুক্ত করিয়া বংশ-বিস্তারের উপায় করিয়া দেয়। পতঙ্গগণ সঞ্চিত মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে ঐ পুষ্পের ভিতর সহজে প্রবেশ করিতে এবং উহার রেণু বহন করিয়া উড়িয়া যাইতে পারে তাহার বিধান ঐ পুষ্পমধ্যেই বিদ্যমান। পতঙ্গগণের আগমন ইহাদের বংশবিস্তারের পক্ষে এতই আবশ্যক যে, উহা নিবৃত্ত করিলে ঐ সকল পুষ্পের বীজোৎপাদন-শক্তি কমিয়া যায়। যদি প্রকৃতি এক পুষ্পের পরাগরেণু অপরের গর্ভকেশরে সংযুক্ত করিবার নিয়ম না করিতেন তাহা হইলে পুষ্পমধ্যে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিবার যে সকল উপায় আছে, এবং পতঙ্গের সহজে আগম-নির্গমের জন্য যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। শিশির এবং বৃষ্টিপাত পুষ্পের বীজোৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তথাপি শিশির ও

বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক পুষ্পের পরাগ ও গর্ভকেশরের উপরে আত্মরক্ষার কোনরূপ আবরণ নাই। পতঙ্গের আগম-নির্গমের সুবিধার নিমিত্তেই যে তাহারা ঐরূপে আবরিত হয় নাই একথা বেশ অনুমিত হয়।

পরস্পর সম্মিলনাকাঙ্ক্ষা।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, জীবশ্রেণীর নিম্নস্তর হইতেই আত্ম-সর্ব্বস্ব ভাবের প্রতিকূল অপর একটী ভাব তাহাদের ভিতর ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। একের সহিত অন্যের মিলিবার ইচ্ছা বা আবশ্যকতাতেই ঐ ভাবের সূত্রপাত। এইরূপে উচ্চমনোবৃত্তিসম্পন্ন মানবসমাজে পবিত্র প্রেম ও পরার্থে আত্মত্যাগের যে সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় নিম্নস্তরস্থ জীবশ্রেণীর মধ্যেই ঐভাবে সেই সকলের অঙ্কুর দেখা যায়।

জড় জগৎ হইতে অধ্যাত্ম জগতে পদার্পণ।

এ পর্য্যন্ত আমরা জীবন-সংগ্রামরূপ ক্রমোন্নতির মূল সূত্রেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। ডারউইন-প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহাকেই ক্রমবিকাশের একমাত্র হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার ইচ্ছাতেই জীব জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহারা জয়ী হয় তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়া যায়, অতএব জীবের পক্ষে এই আত্ম-সর্ব্বস্ব-ভাবই স্বাভাবিক। পরস্পর মিলনের ইচ্ছা এবং মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আত্মক্ষতি-স্বীকার অথবা পরার্থে আত্মত্যাগ, এই ভাবগুলি আত্মসর্ব্বস্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি জড়শক্তির সাহায্যে যন্ত্রের মত বিশ্বসংসার পরিচালিত হইত, তাহা হইলে, এইরূপ একটী অজড় আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ আমরা সৃষ্টিমধ্যে দেখিতে পাইতাম না।

বিরোধী প্রবৃত্তিদ্বয়ের সমন্বয়।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আত্মসর্ব্বস্বত্ব ও আত্মত্যাগ এই উভয়ের ভিতরে আত্মসর্ব্বস্বত্বের ভাবই জগতে জীবের স্থায়িত্ব-লাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং পরার্থে আত্মক্ষতি-স্বীকার করারূপ ভাবটি তাহার ধ্বংসের কারণ ও পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে হয়। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে কেন, ইহার উত্তরে ক্রমবিকাশবাদী বলিতে পারেন যে তাহা কেবল আত্মরক্ষার্থে। একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকিলে অন্য শত্রু হইতে তাহাদের ভয় অনেক কম থাকে, সেই জন্য তাহারা ক্রমশঃ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এই নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণীর ভিতরেই অনেক সময় এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে

পাওয়া যায়, এই যুক্তি অনুসারে চলিলে যাহাদের সম্বন্ধে কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। একবার কোন জাহাজে অত্যন্ত ইন্দুর হইয়াছিল। ইন্দুরের উৎপাত নিবারণের জন্য গর্ত্তের ভিতর গন্ধকের ধূম দেওয়াতে ইন্দুরেরা দলে দলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সময় এক যুবা ইন্দুরকে অপর একটী বৃদ্ধ অন্ধ ইন্দুরকে পৃষ্ঠে লইয়া পলায়ন করিতে দেখা গিয়াছিল। যদিও সে পৃষ্ঠে ভার লইয়া অন্য ইন্দুরের মত দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে পারে নাই, তথাপি আত্মরক্ষার সুবিধার জন্য বৃদ্ধ ও অন্ধ ইন্দুরটীকে পরিত্যাগ করে নাই। বানরী আপনার শিশু সন্তানকে রক্ষা করিতে গিয়া গুলির আঘাতে প্রাণ দিয়াছে, অনেক স্থলে এইরূপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে। পশুদের ভিতর এইরূপ ভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বস্তুতঃ কেবল আত্মরক্ষার্থে পরস্পরের সাহায্য প্রার্থী হইয়া প্রাণীদিগের সমাজবদ্ধ থাকা সম্ভবপর নহে। কারণ কেবল স্বার্থের অনুরোধেই যাহারা অন্যের সান্নিধ্য স্বীকার করে তাহারা আপনার বিপদের সময়ই পরের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করে, পরের বিপদের সময় তাহার সাহায্যার্থে আত্মপ্রাণ বিপন্ন করিতে ইচ্ছুক হয় না। এই জন্য সমাজ-স্থাপনে কেবল স্বার্থের নহে, স্বার্থ ও প্রেম উভয়েরই প্রয়োজন।

স্বার্থ ও প্রেম।

অতএব পরার্থে আত্মত্যাগে যে মহত্ত্ব, সেই মহত্ত্বের অনুভব করা যে মানব সৃষ্টির নিম্নতম স্তরসমূহে বিকশিত আত্ম-সর্ব্বস্বভাব হইতে শিক্ষা করে নাই একথাই যুক্তিযুক্ত, এবং কেমন করিয়া উহা ঐভাব হইতে মানব হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল ইহা ভাবিয়া অজ্ঞেয়বাদের প্রবর্ত্তক পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হাক্স্‌লী যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

আবার মনুষ্যের শরীর যেমন Proto-plasm অথবা জৈববস্তুর সমষ্টিতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেইরূপ এক একটী জাতিকেও এক একটী জীবসমষ্টি বলিয়া পরিগণনা করা যাইতে পারে। প্রাণীতত্ত্ববিদের চক্ষে দেখিতে গেলে জাতি একটী বৃহৎ প্রাণী এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রাণীগণ তাহার দেহস্থিত জৈববস্তুসমষ্টি বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। উচ্চতর প্রাণীর দেহস্থিত জৈববস্তুগুলির অপেক্ষা নিম্নস্তরস্থ জীবের দেহস্থিত জৈববস্তু সবল হয় এবং তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনভাবও অধিকতর থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর জীবের দেহস্থিত জৈববস্তুগুলি ঐরূপে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও আবার সমষ্টির ভিতর আপনাদিগের ব্যক্তি-

ব্যষ্টি ও সমষ্টি।

গত অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দেওয়ায় উহাদিগকে ঐ দেহের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। জাতির ভিতর জনবর্গ যেমন নানাশ্রেণীতে বিভক্ত, মানব-দেহস্থিত জৈববস্তুও সেইরূপ উচ্চ নীচ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। উচ্চনীচ শ্রেণীপরম্পরাক্রমে এক শ্রেণী আবার অন্য শ্রেণীর আদেশানুবর্ত্তী, এবং ঐরূপ শ্রেণী-বিভক্ত সমস্ত জৈববস্তু আবার যে দেহে বাস করে সেই দেহের পোষণ ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ঐ দেহের পুষ্টির জন্য যাহা কর্ত্তব্য আপনাদিগের ধ্বংস স্বীকার করিয়াও তাহারা তাহা করে। অন্যপক্ষে ঐ জৈববস্তুগুলি যাহাতে নিরাপদে রক্ষিত হয় সে বিষয়ে দেহেরও কর্ত্তব্যের ত্রুটি লক্ষিত হয় না।

জৈববস্তু ও প্রাণীদেহ এইরূপভাবে পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ। উহাদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিলেও প্রাণীদেহের অস্তিত্বেই তাহাদের সমষ্টির অস্তিত্ব ও প্রাণীদেহের বিলয়ের সঙ্গেই তাহাদের বিলয়। প্রাণীদেহের আশ্রয় ভিন্ন জৈব-বস্তু বাঁচিতে পারে না, আবার উহাদিগের সমষ্টি ভিন্ন প্রাণীদেহের অস্তিত্ব থাকে না।

প্রাণীদেহ যেমন জৈববস্তুর সমষ্টি, জাতি যেমন জনসমষ্টি, সেইরূপ বিশ্ব-জগতের যদি একটী আকার কল্পনা করিয়া উহাকে একটী বস্তু বলিয়া ধরিয়া লই তাহা হইলে আমরা সেই দেহের অন্তর্ব্বর্ত্তী অতি ক্ষুদ্রতম জৈববস্তুরূপে কল্পিত হই। জগতে জ্ঞানের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, যে যতটুকু আয়ত্ত করিতে পারে তাহার জ্ঞানের সেই পর্য্যন্ত সীমা। ব্যক্তিগত মানবের ভিতরেও জ্ঞানের নানা শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়, জড-যান্ত্রিক জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া চেতনা বা অহং জ্ঞান পর্য্যন্ত উহাকে আমরা ক্রমশঃ স্তরে স্তরে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে পারি।

জ্ঞানের স্তর-বিভাগ।

প্রথমতঃ Mechanical Consciousness অথবা যান্ত্রিক জ্ঞান। যন্ত্র যেমন অচৈতন্য অবস্থাতেও নিয়মিত ভাবে কার্য্য করিয়া যায় এ জ্ঞানও তদ্রূপ। মানবদেহও যন্ত্রের মত স্নায়ুপ্রভৃতির শক্তিতে নিয়মিত ভাবে চালিত হয়। চোখে ধুলা কি বালী পড়িবার উপক্রমেই আমরা চোখ বন্ধ করি। তখন চোখে কিছু পড়িবে ভাবিয়াই যে চোখ বুজি তাহা নহে, আমাদের সে বিষয় বুঝিবার অগ্রেই চক্ষুপল্লব স্নায়ু-চালিত হইয়া যন্ত্রবৎ তাহার কর্ত্তব্য করিয়া যায়। চক্ষু-পল্লবের এই জ্ঞানকে যান্ত্রিক জ্ঞান বলা যাইতে পারে। ব্যাংএর মাথা কাটিয়া ফেলিবার পরেও তাহার পায়ে

কোন দাহ্য বস্তু লাগাইয়া দিলে সে অপর পা দিয়া সেই স্থান মুছিবার চেষ্টা করে, যদিও মস্তক ছিন্ন হওয়ায় তাহার কিছু বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না, তথাপি সদ্যমৃত ব্যাংএর স্নায়ুর কার্য্যকরী ক্ষমতা তখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকাতে তাহারা যন্ত্রবৎ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। যান্ত্রিক জ্ঞানের পরবর্ত্তী স্তর Subliminal Consciousness অথবা অনুভূতিশূন্য জ্ঞান। হিষ্টিরিয়া রোগে অনেক সময় রোগীর স্পর্শানুভূতি লোপ পাইয়া হাত পা অসাড় হইয়া যায়, তখন তাহার হাতে কি পায়ে ছুরি দিয়া আঘাত করিলেও সে তাহা বুঝিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় তাহার পক্ষে হাত পা কাটিয়া অথবা পুড়াইয়া ফেলা খুবই সম্ভব। কিন্তু তখন অনুভূতি না থাকিলে তাহার আর একরূপ জ্ঞান থাকে, যাহার সহায়ে সে হাত পা সহজে কাটিয়া অথবা পুড়াইয়া ফেলে না। অনুভূতি-শূন্য জ্ঞানের পর Ordinary consciousness অথবা সাধারণ জ্ঞান।

সাধারণ জ্ঞানের পর আরও এক শ্রেণীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে প্রতিভামূলক জ্ঞান বলা যাইতে পারে (Supraliminal consciousness)। এই জ্ঞান ডারউইন আবিষ্কৃত ক্রমোন্নতির সম্পূর্ণ বিপরীতাভিমুখী।

প্রতিভা। প্রতিভার উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট হেতু নির্ণয় করা যায় না। প্রতিভা বংশানুক্রমিক অথবা শিক্ষালব্ধ হয় না, স্থির সমুদ্রবক্ষে অকারণে উত্থিত তরঙ্গের মত সে আপনি উঠিয়া আবার আপনিই মিলাইয়া যায়। প্রায় সকল সমাজেই অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকসমূহ সাধারণ জনগণের বংশে সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং যে প্রতিভা তাঁহাদের ভিতর প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহাদের পুত্র পৌত্রেরা কেহই তাহার উত্তরাধিকারী হয় নাই। প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে অসাধারণ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহা কখনও বা অতি শিশুকাল হইতেই প্রকাশ পায়, আবার কখনও বা পরিণত বয়সে অকস্মাৎ প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জন্মাবধি গণনাশক্তিসম্পন্ন কতকগুলি শিশুর Calculating boy) কথা এখানে বলা যাইতে পারে। তাহারা নিরক্ষর, অথচ মনে মনে অঙ্কসকলের গুণভাগ করিয়া তাহার ফল, বর্গমূল ও ঘনমূল স্থির করিয়া দিতে পারে। আমেরিকার এক অধ্যাপকের দশবৎসরবয়স্ক পুত্রের বিনা অভ্যাসে অঙ্কশাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে যে, সে সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য বস্তুর (Fourth dimension) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছে। এক হইতে নয়লক্ষ পর্য্যন্ত সকল সংখ্যার বিভাজক (factor) বাহির করিয়া ড্যাণ্টন

নামে এক ব্যক্তি ফ্রান্সের "একাডেমী অব্ সায়েন্স" নামক সভা হইতে স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌গণ যেরূপ নিয়মে সংখ্যাসকলের বিভাজক নির্ণয় করেন সেরূপ নিয়মে সকল সংখ্যার বিভাজক বাহির করিতে গেলে একজন লোকের সমগ্র জীবনেও কুলাইয়া উঠে না। ড্যাল্‌টনের ক্ষমতা ইহাতেই বুঝা যায়, অথচ সেই ড্যাল্টনই এক সময়ে জ্যামিতির প্রথম পুস্তকের কুড়িটীর অধিক প্রতিজ্ঞা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

অনন্ত জ্ঞান ও মানব-বুদ্ধি।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে এক জীবন্ত বিরাট-সমষ্টি, বিজ্ঞানের দ্বারাও তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ব্যষ্টি গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি হইতে জাতি, প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় অণু পরমাণু পর্য্যন্ত সমস্তই এক অপূর্ব্ব অন্যোন্যাশ্রয়ী সামঞ্জস্যের সূত্রে গ্রথিত। সর্ব্বত্রই ব্যষ্টি সমষ্টির উপাদান, সর্ব্বত্রই একের সহিত অপরের যোগ আছে। আবার একটী পরমাণুকে যে নিয়মাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় সমগ্র বিশ্বজগতের সম্বন্ধেও সেই একই নিয়ম প্রচলিত। মানবের অধিকৃত জ্ঞানের ভিতর কতটুকুই বা তাহার দেহস্থ প্রত্যেক জৈববস্তুর আয়ত্তাধীন। সম্ভবতঃ জড়-যান্ত্রিক জ্ঞান পর্য্যন্তই তাহার অধিকারের সীমা, কেননা, মানবের জড় দেহেরই সে উপাদান-মাত্র। আবার জৈববস্তু যেমন মানবাধিকৃত জ্ঞানের যৎসামান্য অংশমাত্রকেই নিজস্ব রূপে আয়ত্তে পায় মানবও তেমনি বিশ্বজগতের সমগ্র জ্ঞানের সহিত তুলনায় ঐরূপ এক সামান্য অংশেরই অধিকারীমাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। অনন্ত সমুদ্রে একটী কলসী ডুবাইলে কলসীর ভিতরের বারির সহিত তুলনায় বাহিরে যেমন অনন্ত বারিরাশি রহিয়া যায় সেইরূপ বিশ্বজগতের জ্ঞানের কতকাংশে মানব অধিকারী হইলেও বিরাট সমষ্টির অধিকাংশ জ্ঞানই তাহার আয়ত্তের বাহিরে থাকিয়া যায়। এইজন্য জগতে এমন অনেক ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় যাহার হেতু মানব-বুদ্ধি খুঁজিয়া পায় না। সে গুলিকে দৈবশক্তির প্রকাশ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

প্রতিভা দৈবশক্তিরই বিভূতি বা প্রকাশ।* এক দিক দিয়া দেখিলে, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের ভিতর দিয়া ঐ দৈবশক্তি যে ভাবে

---

* যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্॥
গীতা ১০।৪১।

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহারই ইতিহাস বলিয়া বিবেচিত হইবে। ধর্ম্মজগতে, রাজনীতি-পরিচালনায়, সমাজে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে যখন যেখানে কোন মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তখনই তাহার মূলে অসাধারণ প্রতিভার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বহুসংখ্যক লোকের সমবেত চেষ্টায় যে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না, তাহা নহে, কিন্তু ঐরূপ স্থলেও অসাধারণ প্রতিভাই সমবেত চেষ্টার পবিচালক হইয়াছে। পৃথিবীব ইতিহাস এই ভাবে দেখিলে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে মানব ও মানবসমাজ, উত্থান-পতন ও ঘটনা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া যে উন্নতিব পথে অগ্রসর হইতেছে, দৈবশক্তিই তাহার সেই উন্নতি-পথে অগ্রসর হইবার প্রধান সহায়, উহাব সাহায্য না পাইলে মানবকে পথভ্রষ্ট হইয়া, বহুদিন বিপথে ঘুবিতে হইত।

মৃত্যু।

মৃত্যুও আব এক ভাবে পরিবর্ত্তনেব হেতু ও উন্নতিব সহায়ক। প্রাণীব উৎপত্তি ও বৃদ্ধিব ন্যায় মৃত্যুও একটী অবস্থান্তব। জন্ম ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি যে যে কারণে হয় যুক্তির দ্বারা তাহা অনেকটা বুঝান যাইতে পাবে, কিন্তু মৃত্যু ঘটিবাব কারণ কি ?

মৃত্যুর কারণ কি ?

জড পদার্থ হইতে প্রাণীগণেব বিশেষত্ব এই যে তাহাবা বাহিব হইতে কতকগুলি জডদ্রব্য আহার্য্যভাবে গ্রহণ কবিয়া স্বীয় দেহেব উপাদান গঠিত কবে, এবং খাদ্যে পবিণত জডদ্রব্যগুলিব ভিতরে যে জডশক্তি সঞ্চিত থাকে তাহা গ্রহণ কবিয়া দৈহিক শক্তিরূপে ব্যয় কবে। হঠাৎ এই প্রক্রিয়া কেন বন্ধ হইয়া যায় বিজ্ঞান তাহাব কোন উত্তর দিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য শরীরে যে যে উপাদান প্রয়োজন সকলই যখন বর্ত্তমান, যখন শরীরস্থ কোন একটী জৈববস্তুর ক্ষয় হইলেই অপর একটী সুস্থ জৈববস্তু আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ কবিতে পাবে, তখন প্রাণী মরিবে কেন ? আকস্মিক আঘাতে অথবা রোগে একসঙ্গে কতকগুলি জৈববস্তু নষ্ট হইলেও অন্য একদল তাহার স্থান অধিকার করিয়াও দেহ রক্ষা করিতে পাবে। বিষ, দুঃসাধ্য ব্যাধি, অস্ত্রাঘাত প্রভৃতিতে প্রাণী যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার একটা কাবণ থাকিলেও বিনা রোগে ক্রমশঃ জরাগ্রস্ত হইয়া কেন যে প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ভগবান্ বুদ্ধদেবের সময় হইতে উত্থাপিত হইয়া এই প্রশ্নের এখনও কেহ উত্তর দিতে পারেন নাই। কাবণ শরীরের ভাণ্ডারের যেখানেই ব্যয় হইতেছে দেখা যায় সেই স্থানেই নূতন আয়ে ভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে। শরীরযন্ত্রের কোন

অংশ পুরাতন হইলেই তাহা প্রকৃতির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া নবীনত্ব লাভ করিতেছে, তবে প্রাণীদেহে চিরযৌবন স্থায়ী হয় না কেন? রোগ হইলে চিকিৎসা দ্বারা তাহা আরোগ্য করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত, একাল পর্য্যন্ত কেহই তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে নাই। জড়বাদে যদি ইহাই স্থির হইয়া থাকে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাণীদেহের ক্রমোন্নতি হইতেছে, তাহা হইলে রোগাক্রান্ত ও অসম্পূর্ণ শরীরযন্ত্রসকলের আবহমান কাল হইতে সংসারে পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হইতেছে কেন? প্রাকৃতিক নিয়মে উন্নীত হইয়া এতদিনেও সংসার হইতে ঐরূপ অসম্পূর্ণতার লোপ হইল না কেন? ঐ সকলের উন্নতি তো দূরের কথা, এক হিসাবে দেখিলে বরং পূর্ব্ববিকশিত সুস্থ বলিষ্ঠ শরীরযন্ত্রসকলেরও অবনতি লক্ষিত হয়। প্রাণীসৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবীতে উদ্ভিদই প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে সময় উদ্ভিদ্ যেরূপ দীর্ঘজীবী হইত ও উদ্ভিদদেহ যেরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, আধুনিক উদ্ভিদদেহ তদপেক্ষা অবনতির অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। অতএব ক্রমোন্নতিবাদ মৃত্যুরূপ সমস্যার কোন মীমাংসাই করিতে পারে না। কিন্তু মৃত্যু আছে বলিয়াই ক্রমোন্নতির নিয়ম জগতে কার্য্যকরী হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, এই জন্য মৃত্যুকেও ক্রমোন্নতিবাদের মত দৈবশক্তির অভিপ্রায় সাধিত করিবার অন্যতম উপায় বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

মৃত্যুর ভিতর দৈব-শক্তি।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। প্রাণীমাত্রই জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু এই অবস্থাত্রয়ের অধীন। গ্রহ প্রভৃতিও তাপের বিকীরণে শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে জড়পিণ্ডমাত্রে পরিণত হয়। জীবের এই যে মৃত্যুরূপ অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, ইহার কারণ কি? জগদ্বিকাশের জন্য প্রকৃতির প্রত্যেক চেষ্টা ও পদার্থান্তর্গত অতি সামান্য পরিবর্ত্তনও যখন নিরর্থক অথবা উদ্দেশ্যহীন নহে, তখন মৃত্যুর ন্যায় সুবৃহৎ পরিবর্ত্তনের যে কোন উদ্দেশ্য নাই ইহা কখনও স্বীকার করা যায় না।

মৃত্যুর উদ্দেশ্য বিচার।

জড়বাদের মতে কিন্তু মৃত্যুতেই বিলয়, যেহেতু উহার পরে জীবের যে অস্তিত্ব থাকে এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। জড়বাদী এই জন্যই মৃত্যুর সঙ্গেই প্রাণীর অস্তিত্বের অবসান মানিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু মৃত্যুতেই লয় একথা ধরিয়া লইলে, একটি পরমাণুরও যাহাতে অপচয় লক্ষিত

হয় না, বিশ্ব-প্রকৃতির সেই সুশৃঙ্খল গৃহস্থালীতে একটা বৃহৎ অপচয় বা ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ঐকথা মানিয়া লওয়া কি বিজ্ঞানেরই অনুমোদিত হইতে পারে?

হিন্দুশাস্ত্র পরজন্মবাদী। হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যু পরিবর্ত্তন অথবা অবস্থান্তরমাত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্রের পরজন্মবাদ।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।১৩।

দেহী এই দেহেই যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দেহান্তর-প্রাপ্তিও সেইরূপ একটী অবস্থাবিশেষ মাত্র। ধীর পুরুষগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হ'ন না।

দেখা যায় সংসারে সমভাবে স্থিতিই উন্নতির প্রতিরোধক। জড়তার উহাই লক্ষণ। পরিবর্ত্তনই সর্ব্বকাল উন্নতির হেতু। বিশ্বজগৎ চিরপরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই চির-নবীন। পরিবর্ত্তনের কর্ম্মশালায় নিত্য ভাঙ্গাগড়ায় পুরাতন প্রতিদিন জগতে নবীনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। গলিতপত্র বৃক্ষচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইয়া মাটীর সহিত মিশিতেছে, তাহাই আবার নব উদ্ভিদ্‌দেহের উপাদানস্বরূপ হইতেছে। তাপের বিকীরণে গ্রহগুলি শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জড়পিণ্ডে পরিণত হইতেছে, আবার ধূমকেতুর সংঘর্ষে অথবা পরস্পর সংঘর্ষণে বাষ্পময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় নবীন গ্রহের আকার ধারণ করিবার উপাদানে পরিণত হইতেছে।*

পরিবর্ত্তনের কর্ম্মশালায় পুরাতনের নবীনত্ব প্রাপ্তি।

নদীর পুরাতন তটভূমি স্রোতের আঘাতে ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, সেই মৃত্তিকার কণাগুলি আবার অপর দিকে স্রোতে বাহিত হইয়া নূতন দ্বীপের আকারে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। প্রাণী-জগতেও জীব সেইরূপ বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া নিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, হিন্দুশাস্ত্রের পরজন্মবাদে আমরা এই তথ্য প্রাপ্ত হই।

* কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের মতে আকাশে এমন অংশ আছে, যেখানে সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কনিঃসৃত তেজ কেন্দ্রীভূত-ভাব প্রাপ্ত হয়, কোন গ্রহ সেই কেন্দ্রীভূত তাপরাশির নিকটস্থ হইলে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,মৃত্যুতেই কি বিনাশ ? পবজন্মবাদ না মানিলেও মৃত্যুকে বিনাশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। প্রাচীন বৃক্ষ ধ্বংসমুখে পতিত হয়, কিন্তু সে যে বীজ রাখিয়া যায় তাহা হইতেই আবার নবীন তরুব উৎপত্তি হয়। যাহা যায়, তাহা একেবারে যায় না, জগতে এতদিন স্থান অধিকার কবিয়া সে যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার সমস্ত জীবনেব সেই সফলতা জগৎবে দান কবিয়া যায়।

মৃত্যুতেই কি বিনাশ ?

জড়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীব ন্যায় সমাজ এবং জাতিবও মৃত্যু আছে। আজ যে জাতি সৌভাগ্যেব শেষ সীমায় উপস্থিত কাল সে পরপদানত অধঃপাতিত। আজ যাহার কীর্ত্তিসূর্য্যেব মধ্যাহ্ন-প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত, কাল সে বিস্মৃতির অন্ধকাবে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাব আব কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহাব স্থানে আবাব কোন এক অজ্ঞাত পূর্ব্বাপরিচিত নবজাতিব অভ্যুদয় হইয়াছে।

সমাজ ও জাতির মৃত্যু।

বস্তুতঃ জীবনেব ও ভোগেব যে, একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে একথা প্রাণী, মনুষ্য ও জাতি সকলেব পক্ষেই সমভাবে খাটে। জগতে সকলেবই সমান অধিকাব। আজ আমি যে স্থান অধিকাব করিয়া উন্নতির শিখবে আবোহণ করিয়াছি ও যে সম্পদ সম্মান উপভোগ কবিতেছি, সে স্থানে যে আমার চিরদিনেব অধিকার তাহা নয়, সময় হইলে আবাব অন্যের উন্নতির জন্য আমাকে সেই স্থান ছাড়িয়া নব-পথেব পথিক হইতে হইবে। এইরূপে পৃথিবীব আবর্ত্তনে দিবা ও বজনীব ন্যায়, জগতেব আবর্ত্তনে সুখ দুঃখ, সম্পদ দাবিদ্র্য, জীবন মৃত্যুরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ভিতব দিয়া মানবজীবনের গতি নিয়মিত হইতেছে।

আবর্ত্তনের ভিতর জীবনের গতি।

আর্য্যশাস্ত্রে সত্ত্ব বজঃ ও তমঃ রূপ গুণত্রয়েব যে ব্যাখ্যা আছে, তাহাকেই ক্রমবিবর্ত্তনবাদের ভিত্তি বলিলে বলা যায়। তামসিকভাব—আত্মবোধহীন অভিভূত অবস্থা, বাজসিক ভাব— চেষ্টাত্মক অবস্থা অর্থাৎ ব্যষ্টিরূপে প্রকাশোন্মুখ অবস্থা, এবং সাত্ত্বিকভাব—সমষ্টিরূপে প্রকাশোন্মুখ অবস্থা। *

* স্বর্গীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব তাঁহার Hindu System of Moral Science নামক পুস্তকে এই গুণত্রয়ের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া নীতিবাদের যেরূপে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে এই গুণত্রয়ের সঙ্কোচ ও বিকাশ যে ভাবে দেখা যায়, জাতীয় জীবনে তাহা অপেক্ষা আরও স্পষ্টতর বুঝা যায়। সকল জাতিরই প্রথমে অসভ্য অর্থাৎ অজ্ঞানাভিভূত অবস্থা থাকে, তাহার পর তাহাদের ব্যষ্টি ভাবের বিকাশ হয়, অর্থাৎ ক্রমশঃ তাহাদের ভিতর যোদ্ধা, বীর, কবি, সংস্কারক ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তখন এক চরিত্রের উন্নত ভাব অন্যে সংক্রামিত হইয়া ক্রমশঃ ব্যক্তিগত চিন্তা, কার্য্য ও আকাঙ্ক্ষা একতাসূত্রে গ্রথিত হয় ও তাহা জাতীয় চিন্তা, জাতীয় কার্য্য ও জাতীয় ভাবরূপে পরিণত হইবার অভিমুখী হয়। এইরূপে প্রত্যেক জাতির জাতীয় আদর্শের সূচনা হয়। সমষ্টি ভাবেব প্রথম বিকাশে নবজীবনপ্রাপ্ত উদ্বোধিত জাতি নব উদ্যমে উদ্দীপিত হইয়া কর্ম্ম জীবনে নানা দিকে নানা ভাবে নিজ জীবনের সফলতা অর্জ্জন করে। অবশেষে যখন সেই জাতি ঐরূপ সাফল্যের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে, তখন মহৎ আদর্শেব দিকে অগ্রসর হইবার তাহার যে প্রবল আগ্রহ তাহা ক্ষীণ হইযা যায়,এবং নিশ্চিন্ততাহেতু তাহার জীবনে চেষ্টার ভাবও শিথিল হইয়া আসে। ক্রমে শৈথিল্যের সঙ্গী প্রমোদলিপ্সা ও বিলাসিতা আসিয়া তাহাদেব প্রভাব উহার উপব বিস্তার করে, এবং ঐ সকলের অবশ্যম্ভাবীফলস্বরূপ জড়তা আসিয়া সেই জাতির জাতীয় জীবনকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়।

জাতীয় জীবনে গুণত্রয়ের অভিব্যক্তি।

ইতিহাসে এইরূপ জাতীয় উত্থান ও পতনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ঐ সকল পাঠে মনে হয় প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় জাতির উত্থান-পতনও যেন প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। যখনই যে জাতি নবজীবন লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, দেখা যায়, তখনই সে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দৈবশক্তির চরমোদ্দেশ্যের সহকারী বিশেষ কোন মহান্ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং সেই জন্য, কোন বাধাই যেন তখন তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। দৈব যেন প্রতি পদে তাহার সহায় হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় সেই জাতীয় উদ্দেশ্য বিকাশে একদিকে যেমন তাহাতে উচ্চভাবের প্রেরণা আছে, অপর দিকে আবার তদ্রূপ তাহাতে স্বার্থানুসন্ধিৎসা ও অহঙ্কারের প্রেরণা রহিয়াছে। জাতীয় জীবনের নব বিকাশের সময় পূর্ব্বোক্ত মহৎ ভাবের অন্তরালে ঐ সকল হীন বৃত্তিগুলি প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু সাফল্য লাভের সঙ্গে

ইতিহাসের শিক্ষা।

সঙ্গে অহঙ্কার আসিয়া একাগ্রতার স্থান অধিকার করে এবং আত্মত্যাগ ও প্রেমের স্থানে স্বার্থানুসন্ধিৎসা দেখা দেয়। জাতি শরীরের পীড়াস্বরূপ এই শেষোক্ত বৃত্তিগুলি অবশেষে প্রবল হইয়া সেই জাতির ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

জাতীয় জরা।

বহু প্রাচীন কালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, পৃথিবীতে এইরূপ ভাবে কত কত জাতির উত্থান-পতন ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের প্রথমে আমরা গ্রীসের কথা উল্লেখ কবিতে পারি। প্রতীচ্য সভ্যতা-অরুণ প্রথমে গ্রীসেব আকাশেই উদিত হইয়াছিল। শৌর্য্যে ও বীর্য্যে গ্রীসই তৎকালে অদ্বিতীয় হইয়াছিল। দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের জ্ঞানে গ্রীস যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় সে যেন তখন কোন দৈবশক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্লেটো আরিষ্টটেল প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিসকল ঐতিহাসিক যুগের পর প্রতীচ্যের আর কোন দেশে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন কিনা সন্দেহস্থল। কিন্তু যখন পতন আরম্ভ হইল তখন যে গ্রীসেব সেকন্দার-দর্পে অল্পদিন পূর্ব্বেই অর্দ্ধ পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, বীরধাত্রী সেই গ্রীসের পতনও কেহ নিবারণ করিতে পারিল না।

গ্রীস।

বিদ্যা, বুদ্ধি, বীরত্ব ও অস্ত্রকৌশলে রোমও এককালে অপর সকল জাতিব শীর্ষস্থানীয় ছিল। কিন্তু কালে তাহার গৌরবভাস্করও মধ্যগগন হইতে সহসা অস্তের পথে ঢলিয়া পড়িল। কেন যে রোমেব অকস্মাৎ ঐরূপে পতন হইল, সেই বিষয় লইয়া এখনও অনেকে বিচার করিয়া থাকেন।

রোম।

মহম্মদের আবির্ভাবের পর আরব দেশে খালিফা ওমার প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মবীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাবা রাজদণ্ড ধারণ করিয়াও নিষ্কাম সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সিংহাসন ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের নিস্বার্থ ধর্ম্মানুচরণ ও প্রজানুরাগ চিরদিনের জন্য আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। যে সকল বিলাসী সম্রাট্‌ পরবর্ত্তী কালে ঐ রাজ মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন, উদার ও ন্যায়-মূলক নীতির পরিবর্ত্তে চক্রান্ত ও গুপ্তহত্যাই যাহাদের নিকটে রাজনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্‌গণের তুলনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রাণ অধিনেতাগণের তপস্যায়

ইস্‌লাম গৌরব।

যে মোস্লেম গৌরব-প্রভা জগৎসমাজে উজ্জ্বল হইয়াছিল, পরবর্ত্তী আত্মপরায়ণ বিলাসী সম্রাট্গণের কালে তাহা স্তিমিত হইয়া আসিল।

স্পেন।

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেন আমেরিকার বহুশতাব্দি-সঞ্চিত স্বর্ণরাশি হস্তগত করিয়া পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রতাপবান হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ঐ পরভাণ্ডারলুণ্ঠিত অর্থরাশি ও ধনগৌরবের প্রতাপ উল্কার মত একবার প্রখর দীপ্তি প্রকাশ করিয়াই শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। লাভের মধ্যে আমেরিকার ধনে ধনী হইয়া স্পেনের জনসাধারণের যে অমিতব্যয়িতার অভ্যাস হইয়াছিল, সেই অভ্যাসটুকুই চিরদিনের মত রহিয়া গেল। এক রাত্রির ঝড়ে বিখ্যাত "Spanish Armada,"র ধ্বংসও দৈবপ্রতিকূলতার একটী উদাহরণ। *

প্রতীচ্য জগতে উন্নতির মূল।

ইউরোপের অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ সভ্যতাপ্রাপ্তি ও উন্নতিলাভের মূলই মহাত্মা যীশু খৃষ্টের প্রচারিত উদার নীতি। যীশু যে "প্রতিবেশীর সহিত আপনার ভ্রাতার মত ব্যবহার করিবে"—"অন্যের নিকট তুমি যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে"—"শত্রুকেও আত্মতুল্য ভালবাসিবে" প্রভৃতি বাণীসকল প্রচার করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্ম্মের উপরেই ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাত্মা খৃষ্ট প্রচারিত এই নবধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই ইউরোপ দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

ভাঙ্গা গড়ায় দৈব শক্তি।

কিন্তু ধনসম্পদের মহিমায়—আভিজাত্যের গৌরবে যখন এই ভ্রাতৃভাব নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, যখন একদেশবাসী ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ উপস্থিত হইল, তখন হইতেই ইউরোপে নানা আকারে নানা ভাবের বিপ্লবের উৎপত্তি হইতে থাকিল। ফ্রান্সে যখন সাম্যনীতি একেবারে পদদলিত হইতেছে, সেই সময়েই ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুদয় হয়। ঐরূপে ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, যেখানে অসহায় দুর্ব্বল শক্তি প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তথায় তাহাদের আত্মচেষ্টার কার্য্যকারিতা অপেক্ষা দৈবানুকূল্যই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

---

* Motly তাঁহার History of Dutch Republic নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'ঝড়ে স্পেনীয় নৌসেনা ধ্বংস না হইলে পরদিন প্রভাতে ইংলণ্ডকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় জাগরিত হইতে হইত।

কার্লাইলের "ফ্রেঞ্চরেভল্যুসন" পাঠে জানা যায়, ফরাসী বিপ্লবের প্রথমাবস্থায় ফ্রান্স যখন সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা হস্তে লইয়া ইউরোপের সমবেত রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহাদের দেশে একটু বারুদ ছিলনা, অথবা কামান গড়িবার মত এক টুক্‌রা লোহাও ছিল না।

মহাবীর নেপোলিয়ানের উত্থান ও পতনের ভিতরেও আমরা দৈবানুকূল্য ও দৈবপ্রতিকূলতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। দৈবযোগে একদা তিনি যদি সংকল্পিত আত্মহত্যা হইতে রক্ষা না পাইতেন, তবে পাশ্চাত্য ইতিহাসের গতিই অন্যরূপ হইত। ফরাসীজাতির জাতীয় বিপ্লবের মহান্ উদ্দেশ্য নেপোলিয়ানের অভ্যুদয়কালে তাঁহার জীবনে ব্যক্তমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যই তখন তাঁহার জীবনস্বরূপ হইয়াছিল, নিজের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র ছিল না। দেখা যায়, সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া নেপোলিয়ান তখন যে দুর্গমপথে চলিয়াছেন, যে দুঃসাধ্য কার্য্যের ভার লইয়াছেন সেই সকল বিষয়েই দৈবের সহায়তায় সফল হইয়াছেন। অসম্ভবও তখন তাঁহার নিকটে সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু যেমন তিনি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হইতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার জীবনে প্রকাশিত মহান্ জাতীয় আদর্শের প্রতি একাগ্র লক্ষ্য খর্ব্ব হইয়া নিজ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য দেখা দিল। সাম্য-মন্ত্রের পুরোহিত নেপোলিয়ান তখন নিজেই সম্রাট্ পদবী গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার সাম্রাজ্য যাহাতে বংশানুক্রমিক স্থায়িত্ব লাভ করে এই আশায় পতিব্রতা জোসেফাইনকে ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয় সম্রাট্‌দুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন। পরিশেষে, যে নেপোলিয়ানের নামে একদিন ইউরোপের রাজবৃন্দের হস্তের দণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িত, ওয়াটার্লু যুদ্ধে এক পশ্‌লা বৃষ্টিই তাঁহার পরাভবের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

নেপোলিয়ান।

দৈবশক্তির ঐরূপ প্রভাবের দৃষ্টান্ত ফ্রান্সের ইতিহাসে উহা অপেক্ষাও প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্স যখন অন্য এক সময়ে আপদ-সাগরে ডুবিতে বসিয়াছিল তখন সপ্তদশবর্ষীয়া এক কৃষককুমারী ঐ মরণোন্মুখ দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করিয়াছিল। ধ্বংস-সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া যখন দেশ ডুবাইয়া দিতেছে তখন সপ্তদশবর্ষীয়া একটী বালিকা যে সেই নিমগ্নপ্রায় দেশকে টানিয়া তুলিয়াছে, এ কথা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে? কিন্তু এইরূপ অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল। জোয়ান

জোয়ান অব্ আর্ক।

অব্ আর্ক মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, "আমি ভগবানের আদেশ-বাণী শুনিয়াছি। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, যাও, তোমার দেশকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা কর।" ভগবানের সেই বাণী জোয়ানের জীবনে সফল হইয়াছিল, বাস্তবিকই তিনি তাঁহার দেশকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

চীন।

জরাগ্রস্ত মৃতপ্রায় জাতিও যে আবার নবজীবন প্রাপ্ত হইতে পারে সম্প্রতি চীনের অভ্যুত্থানেই আমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ইউরোপের শক্তিবৃন্দের ভিতর বহুদিন হইতেই চীনকে বিভক্ত করিয়া লইবার জল্পনা চলিতেছিল, পরস্পর পরস্পরের ঈর্ষাই সেই জল্পনাকে এতদিন কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় নাই। চতুর্দ্দিকে এইরূপ লোলুপ শক্তিবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া মাঞ্চুবংশীয় নরপতির আবহমান প্রচলিত শাসন-নিগড়ের কঠিন বন্ধন পরিয়া চীন, ধরাশয়নে শায়িত ছিল। উভয়দিকে এইরূপ বিরুদ্ধশক্তির বাধা অতিক্রম করিয়া মৃতপ্রায় চীন যে আবার আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে চীনের স্বীয় ক্ষমতা অপেক্ষা দৈবানুগ্রহই অধিকতরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। চীনের পুরুষকার মানিয়া লইলেও তাহারা যে প্রচুর পরিমাণে দৈবানুকূল্য পাইয়াছে এ কথা স্বীকার করিতে হয়।

ইউরোপ ও বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

বিজ্ঞানের সেবায় নিরত প্রতীচ্য জাতিই বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানের সহায়তায় তাঁহারা অসম্ভবও সম্ভব করিতেছেন। বাষ্প, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিও বিজ্ঞান বলে তাঁহাদের বশীভূত হইয়া তাঁহাদের কর্ম্মশালার পরিচারক রূপে পরিণত হইয়াছে। ইউরোপের সমৃদ্ধিশালী নগরগুলি ক্রমাগতই কল কারখানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব উদ্ভাবনীতে নিত্য নূতন নূতন ধরণের যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। জড় জগতে উন্নতির সহায়ক যাহা কিছু উপাদানের প্রয়োজন নিয়ত কর্ম্ম-তৎপর উন্নতিশীল প্রতীচ্য জাতি বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা সমুদায়ই সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু পার্থিব উন্নতির দিকে মনোযোগ অধিক আকর্ষিত হইলে আধ্যাত্মিকতা অথবা ধর্ম্মভাবের শৈথিল্য অবশ্যম্ভাবী। খৃষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্রের যে সকল মহান্ নীতির উপর ইউরোপীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা সে সকল নীতিতে আর কাহারও তেমন শ্রদ্ধা নাই। প্রতিবেশীকে ভ্রাতৃবৎ প্রেম করা দূরে থাকুক, বরং পরস্পর পরস্পরের অভ্যর্থনার জন্য সৈন্য, যুদ্ধোপকরণ ও রণতরী ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিতেছেন। এই সকলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে দেশের অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। কিন্তু তথাপি ইউরোপ যে

এখনও খৃষ্টপ্রচারিত নীতি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই, হেগের শান্তি সভা প্রতিষ্ঠাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষকের শস্যক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে ধন-কুবেরগণের তৃপ্তির জন্য ক্রীড়ারণ্যে এবং ময়দানে রূপান্তরিত হইতেছে। পল্লীবাসী কৃষিজীবিগণ দলে দলে নগরে আসিয়া কারখানার মজুরদিগের সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতেছে। পূর্ব্বে যে সকল সুস্থদেহ সরলহৃদয় কৃষক সমস্ত দিন মাঠে মুক্তবাতাসে পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে পুত্রকন্যা-পরিবারে বেষ্টিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া সমস্ত দিনের শ্রান্তি দূর করিত, এখন তাহারাই কারখানার শ্রমজীবিরূপে পরিণত হইয়া সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলায় কোন এক পানালয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। রুদ্ধ গৃহের দূষিত বায়ুতে যেমন তাহাদের শরীরের স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তি নষ্ট হইতেছে, কারখানার দূষিত সঙ্গে তাহা-দের মানসিক স্বাস্থ্যও সেইরূপ নষ্ট হইতেছে। পারিবারিক জীবনের মধুরতা স্নেহ, প্রেম দুর্ল্লভ হইয়া আসিতেছে। বিগত আদম স্নমারীর গণনায় বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমার আধিক্য ও বিবাহের অল্পতায় তাহাই প্রমাণিত হয়। রমণীগণের ভিতরও বিলাসিতা ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ভাব প্রবল হওয়াতে তাহারা এখন আর পারিবারিক বন্ধন স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হয় না। পোষা কুকুর ও বিলাসসজ্জা লইয়া জীবনযাপন করা রমণী-সমাজে স্পৃহনীয় বলিয়া বিবে-চিত হইতেছে। অপর দিকে, বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় লাভের দিকে অধিক দৃষ্টি পড়ায় সাধুতার স্থানে ব্যবসা চাতুর্য্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া বুদ্ধির সরলভাব কৌটিল্যের বক্রতা প্রাপ্ত হইতেছে। ফরাসী জাতির জাতীয় সাহিত্য এককালে জগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। অধুনা বিলাসিতার সংক্রামক সংস্পর্শে তাহা ক্রমশঃ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে। বিবাহের অল্পতা ও বিলাসিতার আধিক্যে ফ্রান্সের লোকসংখ্যাও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এই উন্নতির যুগেই ইউরোপীয় সমাজের সভ্যতার মুকুট-মণি ফ্রান্সের যখন এইরূপ অবস্থা ঘটিতেছে তখন পরিণামে কতদূর কি ঘটিবে কে বলিতে পারে ?

সভ্যতার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ও তাহার কুফল।

বহুদিন হইল প্রাচীন ভারতের ধ্বংস হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল কীর্ত্তিমুকুট বিভূষিত জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, ভারতকে তাহার সর্ব্বাগ্র-গণ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারত স্বর্ণপ্রসূ বলিয়া তাহার এ গৌরব নহে, বীর-প্রসবিনী বলিয়াও এ গৌরব

প্রাচীন ভারত।

নহে, এ গৌরব তাহার ধর্ম্মপ্রাণতায় *। মহাত্মা যীশু জগতে ভ্রাতৃভাব প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষ প্রাণীমাত্রকেই নারায়ণের অংশ জ্ঞান করিয়াছে। ভারতবর্ষে গৃহী গৃহকে মুক্তি বা ঈশ্বর দর্শনের সহায়ক তপস্যার আশ্রম বলিয়া জানিতেন, এবং গৃহস্থের প্রতিদিনের কর্ত্তব্য পালনই গার্হস্থ্য ধর্ম্মাচরণ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতের রাজা প্রজাহিতার্থে দণ্ড ধারণ করিতেন, বীর ধর্ম্মার্থে যুদ্ধে নরশোণিতপাত করিতেন। সিদ্ধিলাভোদ্দেশে তপস্যায় প্রাণ উৎসর্গ করা জগতে দুর্লভ নহে, কিন্তু দুর্ব্বল জীবকে সহায়তা করিবার জন্য দুষ্কর তপস্যালব্ধ করতলগত সিদ্ধি প্রসন্ন মনে পরিত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র ভারতবর্ষই প্রাচীন যুগে জগৎকে দেখাইয়াছেন। রাম ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় নরপতি, বশিষ্ঠ ও ধৌম্যের ন্যায় কুল পুরোহিত, এবং চাণক্যের ন্যায় কট রাজনীতিজ্ঞ একাধারে ভারতেই সম্ভব হইয়াছিল। ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের,—ভোগের সহিত ত্যাগের বিরোধ ভারতবর্ষেই ভঞ্জিত হইয়াছিল। তাই জনকরাজা রাজা হইয়াও ঋষি ছিলেন, তাই কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই শ্রীভগবান ঐ যুদ্ধের নায়ক অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা দিবার যোগাপাত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন।

জাতিভেদই কি অবনতির মূল?

তথাপি ভারতের পতন হইল। যে ভারত ধর্ম্মের ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহারও পতন হইল। এই প্রাচীন বিখ্যাত জাতির পতনের কারণ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্য ও সামাজিক কুনিয়মই ইহার পতনের কারণ। যাঁহারা এই মতের পরিপোষক তাঁহারা বলেন "জাতিভেদই (অর্থাৎ বর্ণভেদ) এই জাতির অবনতির প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণেরা সমাজের সর্ব্বোচ্চ অধিকার আপনাদিগের করতলগত করিয়া যে সকল অনুশাসন প্রচার করিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল। জাতিভেদের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া সাম্য পীড়িত হইল, মানব মানবকে ঘৃণা করিতে শিখিল, একতার মিলন বন্ধন ছিন্ন হইল

* কয়েক পংক্তি উপরে যে ধ্বংস শব্দটীর ব্যবহার হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের ভাষা; নচেৎ ধর্ম্মরূপ প্রাণটী লুপ্ত না হইলে মরা বলা যায় না। ভারতেরই নিকটে যে শিক্ষা পাইয়া আমরা ভারতকে চিনিব, ইতিহাস বুঝিব, সে শিক্ষা এখনও প্রচার হয় নাই। উঃ সঃ।

এবং তাহা হইতেই, ভারতবর্ষের জাতীয় পতনের সূচনা হইল।" এই মতের প্রতিকূলে অথবা অনুকূলে বলিবার এস্থলে আমাদের অতি সামান্যই আছে। কারণ জাতিভেদের ভালমন্দ লইয়া এ পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এবং আলোচনার পূর্ব্বে এ বিষয়ে যেরূপ মতভেদ ছিল, পরেও সেইরূপ মতভেদই রহিয়া গিয়াছে।

তবে জাতিভেদের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে "জাতিভেদ" এই কথাটীর অর্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রেণী, পর্য্যায়, অথবা ভাগ এগুলি সুনিয়মেরই একটী অঙ্গ। বহুকে সামঞ্জস্যের সহিত একত্রে পরিচালিত অথবা রক্ষিত করিতে হইলে, শ্রেণী ও পর্য্যায়ের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতির বিভিন্নতাহেতু সমষ্টিকে স্বভাবভেদে শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী ভাবে চালিত করিলে অথবা চলিবার সুযোগ প্রদান করিলেই যে তাহাদের ভিতর একতার মিলনবন্ধন ছিন্ন করা হয় এরূপ অনুমান করিবার কারণ দেখা যায় না। একটী বৃক্ষের অস্থি, ত্বক্, নির্য্যাস, পত্র ও পুষ্প প্রভৃতির যেমন পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য আছে, কিন্তু মূলতঃ সমস্ত অঙ্গগুলি এক বৃক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত, সমাজ শরীরেও জাতিভেদ সেইরূপ বিভেদ মাত্র। "ব্রাহ্মণ" অর্থে বিশেষ কোন জাতি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই * "যো ব্রহ্মবিদ্ সঃ ব্রাহ্মণঃ।" শ্রীমদ্ভাগবতগীতা হইতে এই বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল,—

বর্ণভেদ প্রণালী ও তাহার কারণ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুর্ণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

---

* ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভি বর্ণতাং গতং॥
মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণ।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দান প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণা নাম কল্পয়ৎ॥
মনুস্মৃতি।

কৃষি গোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্ব কর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

প্রবল স্রোতের বিপরীত দিকে নৌকা চালাইতে গেলে যেমন তাহা ফলপ্রদ হয় না, মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। অতএব, স্বভাবানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্মদ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করিবে, ভগবদ্গীতার ঐরূপ অভিপ্রায়ানুসারে স্বাভাবিক জাতিভেদ স্বীকার করাকে আমরা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

আবার প্রকৃতপক্ষে যাহাকে জাতিভেদ বলা যায়, তাহা সকল দেশেই বর্ত্তমান। ভারতবর্ষীয় সমাজে প্রথম যখন জাতিভেদ প্রচলিত হইয়াছিল, তখন তাহা সম্প্রদায়বিশেষের প্রভুত্ব পরিচালনের উপায় স্বরূপে প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। সমাজের হিত সাধনোদ্দেশেই এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। সমাজান্তর্গত জনগণের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও বিভিন্ন কর্ম্মে পটুতার ভেদেই এই শ্রেণীবিভাগ উপস্থিত হইয়াছিল।

জাতিভেদ কোথায় নাই?

আধুনিক যুগে, সাম্যসাধনার দিনেও সমস্ত সভ্য জগতে আমরা কি কেবল বৈষম্যই দেখিতে পাইতেছি না? প্রভু ও ভৃত্যে, জেতা ও বিজেতায়, ধনী ও দরিদ্রে যে জাতিপার্থক্য তাহা ব্রাহ্মণ শূদ্রের জাতিপার্থক্যের তুলনাতেও অনেকাংশে গুরুতর। একজন সুসভ্য সম্ভ্রান্তবংশীয় ইউরোপীয় কুকুরের মুখচুম্বন করিতে ঘৃণা বোধ করেন না, কিন্তু তাঁহারই স্বজাতি মানবকে দরিদ্র বলিয়া, দুরবস্থাপন্ন বলিয়া, বিজিত বলিয়া কুকুরেরও অধিক ঘৃণা করেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্বাধীনতার লীলা-ভূমি আমেরিকার অনেক কারখানাবাড়ীকে দাসত্বের আবাস বলা যাইতে পারে। প্রতীচ্য সমাজে উচ্চস্তর মধ্যস্তর ও নিম্নস্তর গুণভেদে গঠিত হয় নাই, অধিকাংশ স্থলেই ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাভেদে গঠিত হইয়াছে। ধনবান বণিক্, দরিদ্র শ্রমজীবির আজীবন পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করিয়া সমাজে উন্নতির

চূড়ায় আরোহণ করিতেছেন, আর দরিদ্র শ্রমজীবি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও উদর পুরণের উপযোগী অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, কেন না ক্ষমতাভেদে ধনবান উচ্চশ্রেণীস্থ এবং শ্রমজীবি নিম্নশ্রেণীস্থ। সৌখীন সমাজের বিলাসী ও বিলাসিনীগণ যাহাদের প্রাণপণ আয়াসে প্রস্তুত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সভাসমিতি ও নিমন্ত্রণ গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছেন, দুর্দ্দান্ত শীতে তাহারাই ছিন্নবস্ত্রে কোনরূপে শরীর আবরণ করিয়া দিন কাটাইতেছে, অনশনে ও শীতে মরিয়া গেলেও অন্নার্থী অথবা আশ্রয়প্রার্থী হইয়া ধনীর সুদৃশ্য প্রাসাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবার অধিকার তাহাদের নাই। ইউরোপের সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহে এক দিকে যেমন ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়, অপর দিকে সেইরূপ এমন অনেক পল্লী আছে যাহাকে দারিদ্র্যের আবাসভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রাচীন ভারতে ধনগৌরব সমাজের উচ্চাসন অধিকার করিতে পারে নাই। তথায় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ধূলি-মলিন পদতলে রাজ্যেশ্বরেরও শির অবনত হইত। বাহুবলও ভারত সমাজে উচ্চাসন পায় নাই, "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং ব্রহ্মবলং বলং বলং" ব্রহ্মবলই বলের বল মহাবল, তাহার নিকট ক্ষত্রিয়ের বাহুবলও ধিক্কৃত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবলে যাঁহারা বলী, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ সেই ব্রাহ্মণগণকে সমাজ নেতারূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কেননা ব্রহ্মানন্দ-রূপ পরম সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া পার্থিব সম্পদে তাঁহারা নিষ্কাম এবং জন হিতার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও স্বয়ং তাঁহারা অনাসক্ত ছিলেন। তাঁহাদের চিত্ত পরদুঃখকাতর ও বুদ্ধি তপস্যাপূত ছিল, এইজন্য উদ্ধত ক্ষত্রিয়বলকে সংযত করিয়া পরিচালিত করিবার তাঁহারাই উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ছিল, আশ্রিত পালন, প্রবলের গ্রাস হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা। অতএব আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা ক্ষত্রিয় প্রকৃতিপুঞ্জের প্রভুপদ বাচ্য হইয়াছিলেন। সাধারণ জন ক্ষত্রিয়ের আশ্রিত হইয়াই কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিবাদে সংসার পালন করিতেন। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি জীবদেহে যেমন কালক্রমে জরার অনুসঙ্গী নানারূপ ব্যাধি দেখা দেয়, জাতীয় শরীরেও সেইরূপ প্রাচীনতার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের অনুচররূপে স্বার্থানুসন্ধিৎসা, অহঙ্কার, আত্মপরায়ণতা ও কুটিলতা প্রভৃতি নানারূপ পীড়া প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষীয় সমাজেও কালক্রমে সেই সকল ব্যাধি দেখা দিল। পূর্ব্বে বর্ণভেদ প্রভৃতি যে সকল নিয়ম সমাজ ও জাতির হিতোদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা শ্রেণী বিশেষের

প্রভুত্ব পরিচালনের উপায় হইয়া দাঁড়াইল। সমাজ পরিচালনের সরল প্রণালী স্বার্থকৌটিল্যের জটিলতায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভারত-বর্ষীয় বীরগণের মহত্বমণ্ডিত বীর্য্যপ্রভাকর আত্মসম্মান-লালসার মেঘে আবৃত হইয়া হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। অকারণ রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতা, স্বজনকলহ, এই গুলিই বীরত্বের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইল। যে রাজপুত বীরগণ জাতীয় স্বার্থের নিকট নিজের ধন মান গৌরব সকলই অনায়াসে বলি দিতেন সেই রাজপুত-কুলোদ্ভব কনোজরাজ জয়চাঁদ আত্মসম্মান-গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া স্বজাতির বিরুদ্ধে, ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সহায় হইবার জন্য মাতৃভূমির শত্রুকে মাতৃভূমিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, আর সেই অহঙ্কারের ফলস্বরূপ স্বয়ংও চিরদিনের জন্য দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ হইলেন।

ভারত বর্ষের পতন।

ভারতের অতীত দিন কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, সে দিন আর ফিরিবে না। কিন্তু তবু আমরা ভুলিতে পারিব না—এই ভারত ব্যাস বাল্মিকীর তপোবন, এই ভারত সীতা সাবিত্রী মৈত্রেয়ী গার্গীর জন্মভূমি, এই ভারত রাজর্ষিগণের রাজধানী। প্রাচীন ভারত কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতের বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ এখনও অমর হইয়া আছে। যে সত্যব্রতা সাবিত্রীর প্রভাব সম্মুখে মৃত্যুর বুদ্ধিও জড়ভাব ধারণ করিয়াছিল, এখনও বয়োজ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে সেই সাবিত্রীর নামোচ্চারণ করিয়া "সাবিত্রী সমা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ভারতবর্ষের ধ্বংসক্ষেত্রের প্রতি পরমাণুতে এখনও মহত্বের বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ভারতবর্ষের আকাশে এখনও বহুদিনের যজ্ঞধূম সঞ্চিত আছে, তাহা হইতে দেবপ্রসাদবারি বর্ষিত হইয়া আর কি নব-মহত্ব তরু অঙ্কুরিত করিবে না? আর কি মদালসার ন্যায় জননী ভারতে জন্ম গ্রহণ করিবেন না, যিনি পার্থিব ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া প্রাণাধিক সন্তানকে তপস্যার পরম কল্যাণ পথে চলিতেই শিক্ষা দিবেন, আর কি ভীম জননী কুন্তীর মত জননী দেখা দিবেন না, যিনি পার্থিব জীবন হইতে পরহিতার্থে মৃত্যুর অমর পথই সন্তানকে নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন? যিনি যাদব সমরে অর্জ্জুনের রথরজ্জু ধারণ করিয়াছিলেন সেই সুভদ্রার মত পতিসহচরী আর কি দেখা যাইবে না? আর কি রামানুজ ভরতের মত সন্ন্যাসী নৃপতি ভারতের ক্রোড় অলঙ্কৃত করিবেন না, যিনি পূজ্যের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ভোগা-সক্তি রহিত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিবেন? আর কি ভবিষ্যৎ হোমানলের মূর্ত্তিকাস্বরূপ গুরুসেবানিরত তপস্যাপরায়ণ তরুণ ব্রহ্মচারীর দল ভারতে

দেখা দিবে না ? "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই ভগবদুক্তিই ইহার একমাত্র উত্তর। আমরা যতই ক্ষুদ্র হই, আমাদের সামর্থ্য যতই অল্প হউক, তথাপি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বালুকণা যেমন, অনন্ত জগতের উপাদান আমরাও তদ্রূপ। অতএব আমরাও যেন ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া বিশ্ববীণার স্বরের সহিত নিজ জীবন বীণার স্বর মিলাইয়া—মহান্ সমষ্টির সহিত আমাদের ক্ষুদ্র ব্যষ্টিত্ব মিশাইয়া—অনন্ত কল্যাণের পথেই নিয়ত চলিতে থাকি।

শকতি বিভূতি যাঁর, চৈতন্য যাঁহাতে সমাবেশ,
সব শাস্ত্র সব জ্ঞান যাঁরে করে একান্ত নির্দ্দেশ,
সতে যাঁর অধিষ্ঠান অসৎ যাঁহাতে পায় লয়,
আনন্দ স্বরূপ যিনি, নিরঞ্জন অক্ষয় অব্যয়,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যাঁর করে ধৃত বীণা একখানি,
ছন্দে ছন্দে স্বরে স্বরে বাজে এক কল্যাণ রাগিণী
জীবনের অন্তে মৃত্যু, মৃত্যুমাঝে নবীন জীবন,
তপস্যা যাঁহার দ্বারী, সিদ্ধি যাঁর কৃপা বিলোকন,
তাঁর স্বরে বাঁধি বীণা, একান্ত নির্ভর তাঁরে করি,
কর্ম্ম পাবাবার মাঝে আনন্দে বাহিয়া চল তরী।
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

যাঁহার কৃপায় মূক বক্তা হয়, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করে সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি।

গ্রীকদর্শনের ইতিহাস।

সক্রেটীক সম্প্রদায়।

এরিষ্টিপাস (Aristippus)

(শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাল এম, এ)।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সক্রেটীক সম্প্রদায় মোটামুটী তিন ভাগে বিভক্ত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে মেগারা ও সিনিক সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, একণে অবশিষ্ট সম্প্রদায়টীর কথা আলোচনা করিব। এই সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতৃ

এরিষ্টিপাস (Aristippus) আন্দাজ ৪৩৫ খৃঃ অব্দে সিরিনী (Cyrene) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মতস্থাপয়িতার জন্মস্থানের নামানুকরণে এই সম্প্রদায় সিরিয়ানিক (Cyreanic) সম্প্রদায় নামে অভিহিত। ইনি ধনাঢ্য লোকের সন্তান ছিলেন এবং প্রথম জীবন পূর্ণ ভোগবিলাসের মধ্যে অতিবাহিত করেন। এই ভোগবিলাসের প্রভাব তাহার মতামতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ইনি সোফিষ্টগণের নিকট প্রথম শিক্ষালাভ আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের মত তাহার দার্শনিক চিন্তার গতি নিরূপণ করে,কিন্তু সোফিষ্ট-মত মোটামুটী ভাবে অবলম্বন করিলেও তাঁহার জীবনে সক্রেটীসের শিক্ষার ফল একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। (এ সকল কথা আমরা তাহার দার্শনিক মতালোচনায় ব্যক্ত করিব)। এথেন্সের ওলিম্পিক উৎসবে (Olympic games) যোগদান করিতে আসিয়া, এরিষ্টিপাস সক্রেটীসের অমানুষিক চরিত্রবলে ও জ্ঞানগরিমায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে সখ্যভাবের বিকাশ হয়। ফলে সক্রেটীসের শিক্ষার ফল তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত মতামতকে পরিবর্ত্তিত করে। পাঠকবর্গ জানেন (Cynic) সিনিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা (Antisthenes) এন্টিস্থিনিসও এই আকর্ষণ বলেই চিরদিনের জন্য সক্রেটীসের শিষ্য হইয়া সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। অমানুষী প্রতিভা কিরূপে বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোককে এমন কি বিপরীতকে বশীভূত করে, সক্রেটীস তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরিষ্টিপাস শুধু যে সক্রেটীসের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি সোফিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইলেও আপনাকে সক্রেটীস সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে বিশেষ গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন। ইহাতে সক্রেটীসের মহত্বই প্রকাশ পায়। উভয়ের মধ্যে সখ্যবন্ধন থাকিলেও, সে বন্ধন কতদূর সুদৃঢ় ছিল তাহা চিন্তার বিষয়, কারণ, কোন কোন দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসলেখক বলেন এরিষ্টিপাসের সুখসম্ভোগলিপ্সুতা ও বিত্ত গ্রহণে শিক্ষাদান ব্যাপারে সক্রেটীস তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এই কারণে উভয়ের মধ্যে একটী ব্যবধান বর্ত্তমান ছিল। উভয়ের মতামত আলোচনা করিলে এই ব্যবধানের অপরাপর কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শুনা যায় এরিষ্টিপাস (Aristippus) সুখভোগের নিমিত্ত Cicilyর নরপতি (Dionysis) ডায়োনিসের নিকট হীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং এই সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ বাক্য কথিত আছে. Lais লায়াস নামক জনৈক বেশ্যার সহিত লিপ্ত থাকায় অনুরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে। যাক্‌,—দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে সে সব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধীয় এই সমস্ত গল্প সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও ইহা হইতে তাহার মত আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি, বুঝিতে পারি—উপভোগ তিনি সারসর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সুখসম্ভোগকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া স্থির করিলেও তিনি ভোগব্যাপারে সংযমী ছিলেন। সক্রেটীসের শিক্ষাগুণে তিনি বুঝিয়াছিলেন যথেচ্ছাচারী হইলে সুখলাভ দুরাশামাত্র। ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব লাভ না করিতে পারিলে ক্ষণিক সুখের পর দুঃখের

উদয় অবশ্যম্ভাবী। চরিত্রবল ভিন্ন সুখলাভ অসম্ভব। এখানে সক্রেটীসের সহিত তাহার মত সাদৃশ্য বুঝিতে পারি; তবে প্রভেদ এই যে এক জন ত্যাগী, অপর জন পরিমিতভোগী,—একজন আনন্দলাভের অধিকারী, অন্য জন কেবল সুখোপভোগমাত্রেই সক্ষম। দেশপর্য্যটন এরিষ্টিপাসের একটী প্রধান কার্য্য ছিল এবং সেই উপলক্ষে তিনি বিত্তগ্রহণে শিক্ষাদান করিতেন। এই উপায়ে তাহার চিন্তা শক্তির স্ফূর্ত্তি পাইত। কথিত আছে এই চিন্তার ফল তিনি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান, কিন্তু সে সকল গ্রন্থের প্রামাণিকতা সন্দেহস্থল, সুতরাং সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দর্শন:—প্রথমেই মনে রাখা উচিৎ এরিষ্টিপাসের মত তাহার জীবনের অনুরূপ ছিল। প্রথম জীবনে সক্রেটীসের নিকট শিক্ষালাভ করায় তিনি বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের অসম্ভাবনা ঘোষণা করেন। ক্যাণ্ট (Kant) এর ভাষায় বলিতে গেলে তিনি বস্তুসত্তা (Noumenon) ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Phenomenon) অত্যন্ত বিভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির কারণস্বরূপ বস্তুসত্তাকে জ্ঞানের অগম্য বলিয়া স্থির করেন। অনুভূতিই আমাদের জ্ঞানের বিষয়, এই অনুভূতি ভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে অপর কোন জ্ঞান হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের উপর ঘাতপ্রতিঘাতে এই অনুভূতির উদয় হয়। ভিন্ন লোকের একই বস্তুবিষয়ক ইন্দ্রিয়ানুভূতি একই নামে অভিহিত হইলেও এরূপ বুঝায় না যে সকলের অনুভূতি একই, কারণ আমি যাহা অনুভব করি অপরের ঠিক সেই অনুভূতি কিরূপে হইবে? অনুভূতিমাত্রেই আপেক্ষিক এবং ব্যক্তিগত। আমাদের ব্যবহারের জন্য ভিন্ন লোকের এক বিষয়ক অনুভূতিকে এক নামে অভিহিত করি মাত্র। ইন্দ্রিয়ানুভূতি সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলে, তত্ত্ববিচার নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। ইন্দ্রিয় আঘাত প্রাপ্ত হইলে অনুভূতি জন্মে, সেই আঘাতের তারতম্যে ভিন্ন প্রকারের বোধ উদয় হয়। প্রচণ্ড আঘাতে কষ্ট মৃদু আঘাতে সুখ লাভ হয়—যাহা প্রবলও নয় মৃদুও নয় একপ আঘাতে সুখ বা দুঃখ কিছুই উদয় হয় না। মানুষ মাত্রেই সুখানুভূতি প্রার্থনা করে সুখবোধই মানবের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সুতরাং সুখলাভই মানবের একমাত্র লক্ষ্য।

প্রয়োজন বিচারে অগ্রসর হইয়া সক্রেটীস "কল্যাণকে" জগতের আদর্শ বলিয়া স্থির করেন এবং এই "কল্যাণ"সাধনেই মানব আনন্দ লাভ করে এই কথা তিনি ব্যক্ত করেন। কিন্তু "কল্যাণ" কি, একথা সক্রেটীস বিশদরূপে ব্যক্ত না করায় এরিষ্টিপাস কল্যাণের স্থলে সুখকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মানুষ নিরর্থক কোন কাজ করে না, সুখলাভই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই সুখ আবার অনুভূতির উপর নির্ভর করে সুতরাং যে শাস্ত্রের জ্ঞানলাভে এই সুখলাভের সহায়তা হয় তাহাই একমাত্র আলোচ্য, আর যাহা কিছু আছে তাহার শিক্ষা নিষ্ফল। বস্তুর স্বরূপ অজ্ঞেয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতিই একমাত্র জ্ঞানের বিষয়, সুখ সাধনই জীবনের লক্ষ্য, এ সকল কথা খাঁটী সোফিষ্টের মত। সুতরাং বিজ্ঞানচর্চ্চা দর্শন-চর্চ্চা নিষ্প্রয়োজন, অঙ্কশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্রের

শিক্ষা অনাবশ্যক। একমাত্র নীতিশাস্ত্রই সার্থক। কারণ মানবচরিত্র গঠনে এই শাস্ত্রই পথ প্রদর্শন করে, আর সেই চরিত্রবল ভিন্ন সুখলাভ অসম্ভব। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি সুখবাদী হইলেও সক্রেটীসের শিক্ষাগুণে তিনি সংযমের উপযোগিতা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। তাই বুঝি নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাহাই নয় চরমপন্থীর ন্যায় সকল শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া নীতিশাস্ত্রকে একমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও ন্যায়শাস্ত্রকে বাদ দেওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যুক্তির সাহায্য ভিন্ন মানুষকে পদে পদে ভ্রমে পতিত হইতে হয়, যুক্তিকে উপেক্ষা করিলে প্রকৃত সুখলাভও সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রকারান্তরে ন্যায়চর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চা তাহাকে বজায় রাখিতে হইয়াছিল। আমরা আরও দেখিতে পাই তাহার এই চরমপন্থা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবং শাস্ত্র যতটুকু মানবের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে ততটুকু প্রয়োজনীয়, এ কথা তাহারই মত মধ্যে দৃষ্ট হয়।

এরিষ্টিপাস সিদ্ধান্ত করিলেন, সুখলাভই জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু এই সুখ কি? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি—মৃদু আঘাত জনিত বোধ মাত্র। কিন্তু ইহাতে এই সুখবাদ সম্যক বুঝা যায় না, সুতরাং একটু বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করিতে আমরা প্রয়াস পাইব। প্রথমেই মনে রাখা উচিৎ এই সুখ বলিতে কোন ব্যক্তি বিশেষের সুখকে তিনি বুঝিতেন না। "সকলেই সুখ অন্বেষণ করে" এই কথার মধ্যে যে সাধারণ ভাবটী নিহিত রহিয়াছে, এই সুখ সেই "সাধারণ"কে লক্ষ্য করে। সোফিষ্টদিগের ন্যায় ইহা (Individual) ব্যক্তিগত ভাব নয়, ইহা general সর্ব্বমানব সাধারণের লক্ষীভূত (of man)। সোফিষ্টগণের সহিত এই পার্থক্যটুকু মনে রাখিতে হইবে। এইস্থলে আরও মনে রাখা উচিৎ এই সুখ দুঃখের অভাব নয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতিই সুখের একমাত্র কারণ। এই সুখ শুধু বর্ত্তমানেই লভ্য, কারণ, একমাত্র বর্ত্তমানই আমাদের করায়ত্ত, বর্ত্তমানকালেই আমাদের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব। অনাগত ভবিষ্যতের উপর কোনও কর্তৃত্ব নাই, আর যাহা অতীত তাহাও বর্ত্তমানে পাওয়া যাইবে না, সুতরাং সুখ লাভ করিতে হইলে বর্ত্তমানেই তাহা উপভোগ করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হইতে বিভিন্ন প্রকারের সুখ ভোগ হইতে পারে কিন্তু সুখ হিসাবে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সেই সুখ কোন বস্তু বিশেষের উপর নির্ভর করে না বা এই সুখ কার্য্য বিশেষের অধীন নয়, এমন কি নিন্দার্হ কার্য্য হইতে যে সুখ পাওয়া যায় তাহাও সুখ হিসাবে বাঞ্ছনীয়। সুখ মূলে এক হইলেও স্থায়িত্ব ও গভীরত্ব হিসাবে তাহাদের তারতম্য স্বীকার্য্য। কিন্তু এই চরম মতও অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এরিষ্টিপাস দেখিলেন অনেক সময় ক্ষণিক সুখের পর গভীরতর দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কার্য্যের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন যে, যে কার্য্যে বর্ত্তমানে সুখের পর ভবিষ্যতে গভীরতর দুঃখ জন্মে, তাহা দুঃখের নামান্তরমাত্র, তাহা বর্জ্জনীয়। কার্য্যের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত

হওয়ায় তাহাদের মধ্যে সৎ ও অসতের প্রভেদ স্বীকার করিতে হইল, অতীত ও ভবিষ্যৎকে উড়াইয়া দেওয়া চলিল না। চরমবাদ কিরূপে পরিবর্তিত হইল পাঠকবর্গ বুঝিয়া দেখিবেন।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিন্ন সুখ অসম্ভব, একথাটীর অর্থ একটু সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ না করিলে এই দার্শনিকের মত ভুল বুঝা হইবে। মানসিক সুখ বলিয়া একটা পদার্থ আছে, সেটীর অস্তিত্ব তিনি লোপ করেন নাই। তিনি মানসিক সুখকেও শারীরিক উত্তেজনার মধ্যে পরিগণিত করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু অবশেষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন।

বস্তুবিশেষের উপর সুখ নির্ভর করে না এই সিদ্ধান্তটীরও সংশোধন আবশ্যক। ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপরই যদি বোধ নির্ভর করে তবে একই প্রকার ইন্দ্রিয় ব্যাপারে বিভিন্ন অনুভূতি কেমন করিয়া উদয় হয়? রঙ্গমঞ্চে হতব্যক্তির দৃশ্য ও বাস্তবিক হতব্যক্তির দৃশ্য—ইন্দ্রিয় ব্যাপারে এক, অথচ কত বিভিন্ন, সুতরাং ইন্দ্রিয় ব্যাপার ছাড়া বোধের অপর একটী অজ্ঞাত কারণ স্বীকার করিতে হয় এবং সেই অজ্ঞাত কারণই বস্তুর স্বরূপ।

চরমবাদ কিরূপ ভাবে পরিবর্তিত হইল আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। স্বতঃই মনে হয় ইহার কারণ কি, সক্রেটীসের শিক্ষাই কি ইহার অন্যতম কারণ নয়?

এই চরমবাদকে Aristippus এর মত বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল বুঝা হয়। আর তাহা হইলে তাহার মতবাদে সংযম স্থান পায় না। কিন্তু আমরা জানি ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া সুখ উপভোগ করাই তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, সংযম ভিন্ন সুখ লাভ হয় না। পাশব বৃত্তি চরিতার্থতায় ক্ষণিক সুখের পর দুঃখ উপস্থিত হয়। মনের উপর আধিপত্য লাভ না করিলে ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়িতে হয়। দাসের কোন সুখ নাই। সুখভোগব্যাপারে স্বাধীনতা না থাকিলে সে সুখ সুখ-নামেরই যোগ্য নয়। এই সুখ লাভ করিতে হইলে নীতিপথে চলিতে হইবে, চরিত্রবল অর্জ্জন করিতে হইবে, অজ্ঞতা দূর করিয়া জ্ঞানালোকে পথ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। (পাঠকবর্গ মনে রাখিবেন এ জ্ঞানের অর্থ নীতিশাস্ত্রের সহায়ক জ্ঞান মাত্র।) অজ্ঞানী লোক সুখ কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম। চরিত্রহীন সুখ ভোগ করিতে অনধিকারী; তাহারা সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই ভোগ করে। সাক্রেটীসের অমানুষী প্রতিভা এই ভয়ঙ্কর সুখবাদকে কি আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে চিন্তা করিলে ভক্তিভরে মাথা নত হইয়া পড়ে,—আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

Wanting no. 8

REGISTERED No. C 395

উদ্বোধন

1/12/62
1849

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

সূচী।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।

মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সডাক ২৲ দুই টাকা।

প্রতি সংখ্যা।• আনা।

১৪শ বর্ষ—৯ম সংখ্যা। আশ্বিন ১৩১৯।

IMPERIAL

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্।

৬ নং কর্পরেসন ষ্ট্রীট।

ব্রাঞ্চ ১৮৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

খাঁটী স্বদেশী দ্রব্য

কেবল আমাদের নিকটই পাইবেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা বিপুল আয়োজন করিয়াছি, খাঁটী জিনিষ লইবার ইচ্ছা থাকিলে সংবাদ লউন।

কাশী সিল্ক
বেনারসী সিল্ক
কাপড়, চাদর,
মুর্শিদাবাদ।
সিল্ক, কাপড়, চাদর,
তসর, গরদ।
আসাম এণ্ডি, মুগা,
তাঁতের,
ধুতি, শাড়ী ইত্যাদি

আমাদের নিকট পাইবেন, ক্যানানোর, শিকারপুর, প্রভৃতি সকল প্রকার জামা, কাপড়, গেঞ্জী, মোজা ইত্যাদি। তৈয়ারী ও
অর্ডারী
সার্ট, কোট, সেমিজ, বডিস্, ইত্যাদি

সকল প্রকার
মিলের—
কাপড়, থান, তোয়ালে বিছানার চাদর ইত্যাদি
ষ্টেসনারি—
গন্ধদ্রব্য ও কেশ-তৈল, সাবান, চিরুনী, বুরুস, পাউডার ইত্যাদি

মফঃস্বলের ভদ্র ও ব্যবসায়ী মহোদয়গণ যাহাতে সকল সময় কলিকাতায় বড় বাজারের পাইকারী ও খুচরা দরে সকল প্রকার বস্ত্রাদি; চাঁদনীর দরে জামা, কাপড় ইত্যাদি ও সুলভ মূল্যে দেশী বস্ত্রাদি পাইতে পারেন তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছি। আর কলিকাতায় বাজার করিতে আসিতে হইবে না, ঘরে বসিয়া পছন্দসই জিনিস পাইবেন, পছন্দ না হইলে ফেরত দিতে পারেন। পাইকারদিগের আর দোকান ফেলিয়া ছুটাছুটি করিতে হইবে না।

জাতীয় বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রেরিত—

আমেরিকা যাত্রী শিক্ষার্থীদিগের সুট, সাজ, সরঞ্জাম আমরাই দিয়া থাকি; আমাদের কাট ছাট সাহেবদিগের মত, দর তাহার অর্দ্ধেক।

ছাত্রগণের জামা, সার্ট, কোট, সুটে আমরা টাকায় দুই পয়সা কমিশন দিয়া থাকি পরীক্ষা প্রার্থনীয়—



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে গত দুই বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছিল তাহাই এখন সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ) মূল্য—১।০ আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৲ টাকা। ২য় খণ্ড অর্থাৎ গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ ১৷।০ আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৷৴০ আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ-প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন সে ভাবটী বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত। পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়গুলি ঐ পৃষ্ঠার পার্শ্বে মার্জ্জিন্যালনোটরূপে দেওয়া হইয়াছে। আবার ঐ নোটগুলি সম্বলিত প্রত্যেক অধ্যায়ের বিস্তারিত সূচীপত্র গ্রন্থের প্রথমে দিয়া পুস্তকমধ্যগত কোনও বিষয় খুঁজিয়া লইতে পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বার্দ্ধে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীমাকালীর, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিকের তিনখানি হাফটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে; এবং উত্তরার্দ্ধে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির এবং বিষ্ণুমন্দির সম্বলিত সুন্দর ছবি, এবং মথুর বাবু, সুরেন্দ্র বাবু, বলরাম বাবু এবং গোপালের মা প্রভৃতি ভক্তগণের ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়,

১২,১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতে বিবেকানন্দ।

অর্থাৎ স্বামীজির আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার ভারত-ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অভিনন্দন ও তাহার উত্তরসমূহ, তাঁহার ভারতীয় সমুদয় (কুড়িটি) বক্তৃতার উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রভৃতি। স্বামীজির একখানি সুন্দর হাফটোন্ ছবি ও কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে স্বামীজির অভিনন্দনের গ্রুপ ফটোর হাফটোন্ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। ২য় সংস্করণ। ডিমাই আট পেজি মূল্য ২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৸৹ সিকা।

এই গ্রন্থ প্রধানতঃ From Colombo to Almora নামক পুস্তক অবলম্বনে বিরচিত। তদ্ব্যতীত ইহাতে তদানীন্তন আলমবাজার মঠে ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের নিকট প্রদত্ত "গীতাতত্ত্ব" নামক বক্তৃতা, স্বামী অচ্যুতানন্দ নামক জনৈক ভক্তের ডায়েরি অবলম্বনে স্বামীজির আলমোড়া হইতে কাশ্মীর হইয়া লাহোর পর্য্যন্ত ভ্রমণবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, শিয়ালকোটে "ভক্তি" নামক বক্তৃতা, স্বামীজির জনৈক শিষ্য প্রদত্ত লাহোর ও রাজপুতনায় অবস্থানকালীন নানা ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সহিত নানাবিধ আলাপের বিবরণ, খেতড়ি বক্তৃতা এবং ঢাকায় স্বামীজির বক্তৃতা ও ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ প্রভৃতি নূতন নূতন বিষয় নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া সংযোজিত হইয়াছে।

যে স্বদেশী সমস্যার সমাধানে আজকাল মনীষিবৃন্দের মণ প্রাণ নিয়োজিত, বহুকাল পূর্ব্বে স্বামীজি তাঁহার নিজভাবে কিরূপে উহার অপূর্ব্ব সমাধান করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রকটিত. প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে, ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য স্বদেশে বিদেশে ধর্ম্ম ও বিদ্যার প্রচার কিরূপে করিতে হইবে, জাতীয় শিক্ষা, হিন্দুধর্ম্ম, বেদ, উপনিষদ্ গীতা, পুরাণ তন্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণাদি অবতারগণের জীবনী ও উপদেশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম, গোপীপ্রেম প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও পরস্পর সামঞ্জস্য সাধন, সমগ্র ভারতে শক্তি সঞ্চারের উপায় প্রভৃতি আমাদের জ্ঞাতব্য যাবতীয় তত্ত্ব অতি সরল ও মধুর ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই পুস্তকের বর্ণনা অসম্ভব। না পড়িলে কেহ ইহার আস্বাদ পাইবেন না। ইহাতে পাঠের সুবিধার জন্য আদ্যোপান্ত মার্জ্জিন্যাল নোট ও স্থানে স্থানে ফুট নোট সংযোজিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়,

১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

পুরাতন বাঁধান উদ্বোধন।

৮ম, ৯ম ও ১৩শ বর্ষের প্রত্যেক
খণ্ডের মূল্য ২।০, পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

অর্দ্ধ মূল্য! অর্দ্ধ মূল্য!

৫ম, ৬ষ্ঠ, ১২শ বর্ষের
কয়েক খানি মাত্র আছে,
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য—১৶০,
পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

Just Out! *Just Out!*

The Hindu System of Moral Science.

With an introduction by Swami Saradananda.

3rd Edn. Double Cr. 16mo., pp. 230, Excellent Get-up, Price Rs. 2/-

BY

Kishori Lal Sarkar, M.A., B.L., *Vakil, High Court.*

Rt. Hon. Prof. Max Muller :—The best proof I can give you that I valued your book is that I actually took it with me to Italy where I have passed the cold season on account of my health. I think your book will be useful as showing that your philosophers have not neglected the study of ethics.

Prof. E. B. Cowell, Cambridge :—It is altogether a new point of view to a western reader.

The Hon'ble P. Ananda Charlu:—The book deserves to be made a first text book of religious teaching in every school. I will ask every Hindu to read it. I want every young man to be taught it. I cannot do better justice than to proclaim it as a manual worth its weight in gold deserving to be read by every Hindu parent and by him to be taught to his sons and daughters.

Sj. Bal Gangadhar Tilak :—I earnestly desire its place in every Hindu Home. I request every man to make it his constant companion, etc.

Sir Gooroo Das Banerjee, Kt. :—The book gives a compendious but clear view of the cardinal doctrines of the Hindu System of Morals.

To be had of the Udbodhan Office.
12, 13, Gopal Chandra Neogi's Lane
BAGBAZAR, CALCUTTA.

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। নিম্নে দ্রষ্টব্য :—

সাধারণের পক্ষে।

	Rs.as		
Rajayoga (2nd Edition)	1-	বাঙ্গালা কর্ম্মযোগ (৪র্থ সংস্করণ)	৸০
Jnanayoga ”	1-8	” চিকাগো বক্তৃতা (৩য় সংস্করণ)	।/০
Karmayoga ”	12	” ভাব্‌বার কথা (২য় সংস্করণ)	।৵০
Bhaktiyoga ”	10	” পত্রাবলী (২য় সংস্করণ)	॥০
Chicago Address (4th Edi.)	6	” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৪র্থ সং)	॥০
The Science and Philosophy of Relgion	1-	” বীরবাণী (৪র্থ সং)	।০
” A Study of Religion	1--	” মদীয় আচার্য্যদেব	।৵০
” Religion of Love	10	” পওহারী বাবা	৶০
” My Master (2nd edition)	8	” ধর্ম্মবিজ্ঞান	১৲
” Pavhari Baba	3	” বর্ত্তমান ভারত (৩য় সং)	।০
” Thoughts on Vedanta	10	” ভক্তিরহস্য	॥৵০
” Realisation and its Methods	12	” ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সং)	২৲
” Christ, the Messenger	3	” পরিব্রাজক (২য় সং)	৸০
বাঙ্গালা রাজযোগ (৩য় সংস্করণ)	১৲		
বাঙ্গালা জ্ঞানযোগ (৩য় সং)	১৲		
” সন্ন্যাসীর গীতি (৩য় সং)	/০		
” ভক্তিযোগ (৪র্থ সংস্করণ)	॥৵০		

উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে।

	Rs.as		
Jnanayoga	1-3	বাঙ্গালা রাজযোগ	৸০
Rajayoga	12	” কর্ম্মযোগ	॥০
Karmayoga	8	” চিকাগো বক্তৃতা	।০
Bhaktiyoga	6	” ভাব্‌বার কথা	।০
Chicago Address	5	” পত্রাবলী	।৵০
The Science and Philosophy of Religion	12	” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	।৵০
A Study of Religion	12	” বীরবাণী	।০
Religion of Love	8	” মদীয় আচার্য্যদেব	।০
My Master	6	” পওহারী বাবা	৵০
Christ, the Messenger	2	” ধর্ম্মবিজ্ঞান	৸০
Pavhari Baba	2	” বর্ত্তমান ভারত	।০
Thoughts on Vedanta	8	” ভক্তিরহস্য	॥০
Realisation and its Methods	10	” ভারতে বিবেকানন্দ	১৸০
বাঙ্গালা জ্ঞানযোগ	12	” পরিব্রাজক	॥০
” বাং ভক্তিযোগ	6		

"Paramahansa Ramkrishna" by Protap Chandra Majumder. ৵০ উদ্বোধন গ্রাহকের পক্ষে /০, My Master পুস্তকখানি ॥০ আনায় লইলে "Paramahansa Ramkrishna" বিনামূল্যে একখানি পাইবেন। সকলের পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১২,১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার পোঃ অঃ, কলিকাতা।

Just out ! Just out !

Swami Vivekananda's

New Book.

Christ, the Messenger.

A beautiful halftone picture of the Swami Vivekananda in a new posture with a smiling face has been given at the begining of the book. Price three annas. For the subscribers of Udbodhan two annas.

Swami Vikananda

MY MASTER.

The second edition of the book is ready for sale. In this edition, the book has been thoroughly revised and re-edited comparing with the original manuscript. Moreover the concluding portion of this book has been supplied from the original report of the lecture delivered at New York; so no pain was spared to make the book as accurate as possible Any one who will pay *eight annas* for the book will also get free a copy of "Paramahansa Ramakrisna" by P. C Mozumdar.

Price Eight annas only For the subscribers of The Udbodhan, six annas. Postage extra.

Apply to the Manager, Udbodhan.

Northern Tirtha :

A Pilgrim's diary.

The diary that Sister Nivedita kept during her pilgrimage to Kedarnath and Badrinath with her characteristic avidity for historical relics and sources of peculiar sanctification, is published in the form of this book. No doubt the book will prove highly useful to pilgrims and highly instructing to the reading public. Price five annas, V. P. and postage extra.

To be had of the Udbodhan office.

12, 13 Gopal Chandra Neogi's Lane.

Baghbazar, CALCUTTA.

The Sister Nivedita's New Book

"Civic and National Ideals"

(*AUTHORISED EDITION.*)

This is the first of a series of volumes to be published to comprise all the writings of Sister Nivedita as yet unavailable in book form. The present volume deals with the problem of Indian Nationalism, its basis and the resources to be developed. People interested in the Indian problem should eagerly welcome this publication from the Sister's pen. The book with a handsome get-up and a nice portrait of the Sister is to be had at the price of Re.1 exclusive of postage of

The Udbodhan Office

SISTER NIVEDITA'S MASTERPIECE.

"The Master as I Saw Him"

The book can have no truer or better introduction to the public, than the following citations, one from Indian and the other from European appreciation :—

"How great Vivekananda was we can realise—as far as is now possible—in his every words as faithfully recorded by his desciple. Of his many words, his varied teachings and his yearnings and struggling, a full history is impossible. But in the volume before us, we can feel that he was a Master indeed, a living fountain of inspiration."

PROF. JADUNATH SARKAR.

"* * it (this book) may be placed among the choicest religious classic, below the various scriptures, on the same shelf with *the Confessions of St. Augustine* and Sabatier's *Life of St. Francis.*"

PROF. T. K. CHEYNE
Of Oxford University.

Price—paper Bound Rs. 2-8. Postage extra.

To be had of the Udbodhan Office.

12, 13. Gopal Chandra Neogi's Lane
BAGBAZAR, CALCUTTA.

বেদান্তানুরাগীর পাঠ্য নূতন গ্রন্থ

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ

জীবনী ও তুলনা ;

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত ।

এই দুই মহাপুরুষের মতে সমগ্র হিন্দুসমাজ চলিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত অল্পই জানি ; আর যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এই সকল কারণে ইহার গ্রন্থকার আজ সাত বৎসর, আচার্য্যদ্বয়-পদার্পিত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই গমন করিয়া—তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রেরই, ইহা অবশ্য-পাঠ্য।

এ গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা এই ;—(১) আচার্য্যদ্বয়কে তুলনায় প্রয়োজনীয়তা, (২) তুলনার নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ, (৩) তুলনার ত্রিবিধ ফল ও তাহার প্রয়োগ (৪) তুলনার কুফল নিবারণ, (৫) সমগ্রভাবে তুলনার জন্য নানা মতান্তর সহ উভয়ের সম্পূর্ণ জীবন-চরিত, (৬) বিশেষ ভাবে তুলনার জন্য দোষ, গুণ ও অন্যান্য নৈসর্গিক ৮০ প্রকার বিষয় অবলম্বন করিয়া চরিত্র বিচার। ইহাতে উক্ত প্রত্যেক বিষয়ের সংশ্লিষ্ট উভয়ের জীবনের যাবতীয় অনুকূল ও প্রতিকূল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। (৭) বিবিধ উপায়ে উভয়ের জন্মকাল নির্ণয়, (৮) সূর্য্য সিদ্ধান্ত সাহায্যে উভয়ের কোষ্ঠী গণনা। এই বিষয়টী মনোযোগ সহকারে পড়িলে সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তির গ্রহসংস্থান নির্ণয় করিতে পারা যাইবে। (৯) কোষ্ঠীর ফল বিচার পূর্ব্বক উভয়ের তুলনা, (১০) কোষ্ঠীসাহায্যে আচার্য্যদ্বয় সম্বন্ধে নূতন বিষয় আবিষ্কার। (১১) কোষ্ঠী-সাহায্যে আচার্য্যদ্বয়ের চরিত্র সম্বন্ধে নানা মতভেদ মীমাংসা। (১২) আদর্শ দার্শনিকের পক্ষে সপ্তদশবিধ প্রয়োজনীয় গুণাবলী নির্ণয় করিয়া প্রত্যেক গুণ অবলম্বনে তাঁহাদের চরিত্র তুলনা, (১৩) উভয়ের সাধারণ আদর্শের বিংশতি প্রকার গুণাবলী নির্দ্ধারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ চরিত্র তুলনা, (১৪) উভয়ের নিজ নিজ আদর্শের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রায় শতাধিক গুণাবলী নির্ণয় করিয়া পূর্ব্ববৎ চরিত্র তুলনা। এই প্রসঙ্গে নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ, রামানুজ-সম্মত ভক্তিযোগ, চৈতন্যদেব-সম্মত ভক্তিমার্গ, শঙ্কর-সম্মত ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। (১৫) পরিশেষে আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধির প্রকৃতি, জীবনের ঘটনাবলি, এবং তাঁহাদের আবির্ভাব-কালে তদবলম্বনে তাঁহাদের দার্শনিক মত যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা নির্ণীত হইয়াছে (১৬) এতদ্ব্যতীত আচার্য্য-শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠে পূজিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি এবং রামানুজের জীবিতাবস্থায় নির্ম্মিত, শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির দুইখানি হাফটোন ছবি এবং ডাবলক্রাউন সম্বলিত উভয়ের কোষ্ঠীচক্র প্রদত্ত হইয়াছে।

৪৯১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান,—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

১২,১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্‌

কৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত

প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। এ পুস্তকের পরিচয় উদ্বোধনের পাঠকবর্গ মাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন, এজন্য আর এ বিষয়ে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা মাত্র। পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

স্বামী বিবেকানন্দের নূতন

হাফটোন ছবি।

চেয়ারে বসা, টেড়ী কাটা, বাবরী চুল ⁄৹ আনা।

হাসিমুখ—বাষ্ট ⁄৹ আনা।

বীরবেশে—⁄৹ আনা। প্রথমোক্ত দুইটী একেবারে নূতন, ঐ দুইটী পূর্ব্বে আর কখনও বাহির হয় নাই।

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীকালী মাতার ছবি—⁄৹ আনা।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ছবি—⁄৹ আনা।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত নূতন পুস্তক।

ভারতে শক্তি পূজা।

এই পুস্তক যাহা পূর্ব্বে প্রবন্ধ রূপে উদ্বোধনে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং উদ্বোধনের গ্রাহকবর্গের অনুরোধ সত্ত্বেও নানা কারণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, এবার তাহাদের মনস্কাম পূর্ণ হইল। উদ্বোধনে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি ছাড়া ইহাতে ঐ সম্বন্ধে গ্রন্থকার আরও অনেক নূতন বিষয় অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূল্য ৷৷৹ আনা। উদ্বোধনের গ্রাহকবর্গের পক্ষে ৷⁄৹ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের

ভক্তিরহস্য।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহা স্বামীজীর ইংরাজী Religion of Love নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। স্বামীজির ১খানি নূতন ছবি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডঃ ক্রাউন, ১৬ পেজি। পাইকা অক্ষরে ছাপা উৎকৃষ্ট কাগজ। মূল্য ৷⁄৹ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ৷৷৹ আনা পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

14 FEB 1913

[স্বামী সারদানন্দ]

সাধনার প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা।

সময়—সন ১২৬৩—৬৬ সাল, ইংরাজী ১৮৫৬—৬০।

ঠাকুরের বয়স—২৪, ২৫ বৎসর।

ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে, আমাদিগকে তিনি ঐ কাল সম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে তাহাই স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐ কালের একটা সময় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হইবে না। পাঠককে আমরা ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার বলিয়াছি যে, আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল নিরন্তর নানা মতের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। রাণী রাসমণির মন্দির-সংক্রান্ত দেবোত্তর দানপত্র এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি লইয়া আদালতে পরবর্ত্তীকালে যে সকল মকদ্দমা হইয়াছে ও হইতেছে সেই সকল কাগজ পত্র দেখিলে ইহা নিশ্চয় সাব্যস্ত হয় যে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠে, ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সন ১২৬৩ সালে ঠাকুর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সন ১২৬৩ হইতে ১২৭৪ সাল পর্য্যন্তই যে তাঁহার সাধনকাল, একথা সুনিশ্চিত।

ঐ বার বৎসরকে আমরা তিনভাগে ভাগ করিয়া উহার প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম, ১২৬৩ হইতে ১২৬৬ চারি বৎসর—যে কালের কথা আমরা এতদিন আলোচনা করিয়া আসিতেছি। দ্বিতীয়, ১২৬৭ সালে ব্রাহ্মণীর আগমনের পর হইতে ১২৭০ পর্য্যন্ত, চারি বৎসর—যে কালে ঠাকুর, ব্রাহ্মণীর নির্দ্দেশে গোকল ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধন যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃতীয়, ১২৭১ হইতে ১২৭৪ পর্য্যন্ত, চারি বৎসর—যে কালে তিনি 'জটাধারী' নামক রামাইত সাধুর নিকট হইতে রাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও শ্রীশ্রীরামলালা বিগ্রহ লাভ করেন, বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত সখীভাব লাভের জন্য ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া সাধনায় নিযুক্ত থাকেন—আচার্য্য শ্রীতোতাপুরীর নিকট হইতে বৈদিক

মহাবাক্য গ্রহণ করিয়া সমাধির নির্ব্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দের নিকট হইতে ইস্‌লামী ধর্ম্মে উপদেশ গ্রহণ করেন। কর্ত্তাভজা নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সহিতও তিনি এইকালেই যে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাও তাঁহার নিকট বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী প্রভৃতির আগমনেই স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব সাধনকালকে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনভাগে ভাগ করিবার স্বাভাবিক একটা কারণও বিদ্যমান আছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ তিনটি ভাগের প্রত্যেকটিতে অনুষ্ঠিত ঠাকুরের সাধনপ্রণালীর মধ্যে একটা বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আমরা দেখিয়াছি—সাধনকালের প্রথম ভাগে ঠাকুর, বাহিরের সহায়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়াই সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য অন্তরের একান্ত ব্যাকুলতাই ঐকালে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিল এবং ঐ ব্যাকুলতাই ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর ভাব ধারণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহার শরীরমনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আশাতীত নবীন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, উপাস্যের প্রতি অসীম ভালবাসা আনিয়া উহা বৈধী-ভক্তির কঠোর বহিঃশাসন উল্লঙ্ঘন করাইয়া তাঁহাকে রাগানুগাভক্তির পথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে ধন্য করিয়া তাঁহাকে যোগ-বিভূতিসম্পন্নও করিয়া তুলিয়াছিল।

পাঠক হয়ত বলিবেন—'তবে আর বাকি রহিল কি?—ঐকালেই ত ঠাকুর যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তবে পরে আবার সাধন কেন?' উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হয়—একভাবে ঐকথা যথার্থ হইলেও পরবর্ত্তীকালে সাধনার প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন—'বৃক্ষ ও লতা সকলের সাধারণ নিয়ম, আগে ফুল, পরে ফল হইয়া থাকে, উহাদের কোন কোনটি কিন্তু এমন আছে যাহার আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল দেখা দেয়।' সাধনক্ষেত্রে ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক ঐরূপভাবে হইয়াছিল। এজন্যই আমরা পাঠকের পূর্ব্বোক্ত কথাটা এক ভাবে সত্য বলিতেছি। কিন্তু সাধনকালের প্রথম ভাগে ঐরূপে দর্শনাদি হইলেও ঐ সকলকে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সাধককুলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন, শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া যতক্ষণ না নিজ পূর্ব্বোপলব্ধি-সকলকে পুনরায় উপলব্ধি করিতেছিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকলের সত্যতা এবং উহাদিগের চরম সীমা-

সম্বন্ধে ঠাকুর দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না। সেজন্যই পরবর্ত্তীকালে সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেজন্যই শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য কৃপায় কেবলমাত্র অন্তরের ব্যাকুলতা-সহায়ে যাহা তিনি দেখিয়া শুনিয়াছিলেন তাহাই আবার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন, নিজ গুরুর অনুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত সাধক আপন ধর্ম্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অনুভব সকল যতক্ষণ না মিলাইয়া সমসমান বলিয়া দেখিতে পায় ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, এবং গুরুর অনুভব, ঐ অনুভব-সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ আছে ও সাধক নিজে যাহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতেছে, এই তিনটি বিষয়কে মিলাইয়া সাধক যখনি এক বলিয়া দেখিতে পায় তখনি সে পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়।

পূর্ব্বোক্ত কথার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামীর জীবন-ঘটনা নির্দ্দেশ করিতে পারি। মায়ারহিত শুকের জন্মাবধি জীবনে নানাপ্রকার দিব্যদর্শন ও অনুভব উপস্থিত হইত। ঐ সকলের সত্যাসত্য ও চরম সীমা নির্দ্ধারণের জন্য তিনি নিজ পিতা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসের নিকট ষড়ঙ্গ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। স্বাধ্যায় সমাপ্ত হইলে তিনি পিতাকে বলিলেন, শাস্ত্রে যে সকল অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে তাহা ত আমি জন্মাবধিই অনুভব করিতেছি, কিন্তু ঐ সকল অবস্থা ও অনুভবই যে চরম সত্য তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিতেছি না, অতএব ঐ বিষয়ে আপনি যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই এখন আমাকে বলুন। মহাবুদ্ধি ব্যাস মনে মনে জল্পনা করিলেন, আমি যদি শুককে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্য সম্বন্ধে উপদেশ করি, তাহা হইলে তাহার মন হইতে সন্দেহ দূর হইবে না, সে ভাবিবে, সত্যলাভার্থী পুত্রের মানসিক ব্যাকুলতা প্রশমনের জন্য পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহাকে ঐরূপ বলিতেছি, সেজন্য অন্য কোন মনীষী ব্যক্তির নিকটেই তাহার ঐ বিষয় শ্রবণ করা ভাল। ঐ কথা ভাবিয়া ব্যাস বলিলেন, আমি তোমার ঐ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ, মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তির কথা তোমার অবিদিত নাই, তাঁহারই নিকটে গমন করিয়া তুমি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লও। মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, শুক পিতার ঐ কথা শুনিয়া অবিলম্বে মিথিলা গমন করিলেন এবং রাজর্ষি জনকের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেরূপ অনুভূতি উপস্থিত হয় শুনিয়া

এবং শাস্ত্রবাক্য ও নিজ জীবনানুভবের সহিত উহার একতা দেখিয়া শান্তিলাভ করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন, পরবর্ত্তী কালে ঠাকুরের সাধনার অন্য গভীর কারণ-সমূহও ছিল। ঐ সকলের উল্লেখমাত্রই আমরা এখানে করিতে পারিব। নিজ জীবনে শান্তিলাভই ঠাকুরের সাধনার উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীর-পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। সুতরাং যথার্থ আচার্য্যপদবী গ্রহণের জন্য তাঁহাকে সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সাধনা ও চরমোদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত করিয়া তুলিতেছিলেন। সেজন্যই ঠাকুরের স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের অদ্ভুত প্রয়াস। শুধু তাহাও নহে, নিরক্ষর পুরুষের জীবনে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থা-সকলের কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে স্বভাবতঃ উদয় করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরের শরীর-মনাবলম্বনে বেদ বাইবেল পুরাণ কোরাণাদি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যতাও বর্ত্তমান যুগে প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেজন্যও ঠাকুরের স্বয়ং শান্তিলাভ করিবার পরেও সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতসকলকে ঠাকুরের নিকট যথাকালে উপস্থিত করিয়া ও তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রসকল শ্রবণ করাইয়া, শ্রুতিধরত্বগুণসহায়ে ঐ সকল আয়ত্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা যে জগন্মাতা, ঠাকুরকে বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্যই প্রদান করিয়াছিলেন একথা আমরা এই অদ্ভুত জীবনালোচনায় যত অগ্রসর হইব ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

সে যাহা হউক, সাধনকালের প্রথম বিভাগের কথার আরও কয়েকটি ঘটনা আমরা এখনও পাঠককে বলি নাই। উহাই বলিতে এখন অগ্রসর হওয়া যাউক। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঠাকুরের ভিতর অদ্ভুত দৈববিকাশ দর্শনেই শ্রীযুত মথুরামোহনের ভক্তি তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উহার অল্পকাল পরে আর একটি ঘটনায় মথুরের ঐ ভক্তি আরও অচল অটল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ১২৬৬ সালের কোন সময়ে মথুরামোহনের দ্বিতীয় পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। রোগের ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈদ্য সকলে তাঁহার জীবন-রক্ষা সম্বন্ধে প্রথম সংশয়াপন্ন, পরে হতাশ হইলেন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি মথুর সুপুরুষ ছিলেন কিন্তু সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। রূপবান্ দেখিয়াই রাণী রাসমণি, তাঁহাকে জামাতারূপে গ্রহণ করিতে সম্মতা হন এবং প্রথমে নিজ

তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর সহিত এবং পরে, আন্দাজ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ঐ কন্যার মৃত্যু হইলে সম্ভবতঃ ১৮৩৪।৩৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সহিত মথুরের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন। অতএব জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়ায় মথুরামোহন এখন যে কেবল প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইতে বসিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধিসম্পন্না নিজ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সহিতও নিকট সম্বন্ধ হারাইয়া প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় দরিদ্রাবস্থায় পরিণত হইতেছিলেন। সুতরাং মথুরামোহনের এখনকার মনের অবস্থা সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রোগীর অবস্থা দেখিয়া যখন ডাক্তার বৈদ্যেরা একপ্রকার জবাব দিয়া গেল মথুর তখন এককালে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধানে পঞ্চবটীতলে আসিলেন। ঠাকুর তাঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তপ্রায় উদ্বিগ্নাবস্থা দেখিয়া সযত্নে পার্শ্বে বসাইলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করায় মথুরামোহন তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সজলনয়নে গদ্গদ বাক্যে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'আমার যাহা হইবার তাহা ত হইল, বাবা, তোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা ও আর করিতে পাইব না।'

ঠাকুর বলিতেন, মথুরের ঐরূপ দৈন্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি মথুরকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া ফেলিলেন, 'ভয় নাই, তোমার পত্নী আরোগ্য হইবে।' বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের অভয়বাক্যে প্রাণ পাইয়া সেদিন বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং জানবাজারে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন জগদম্বা দাসীর নাড়ি ফিরিয়াছে, সহসা তাঁহার সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন, "সেই দিন হইতে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল এবং তাহার ঐ রোগটার (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীরের উপর দিয়া ভোগ হইতে লাগিল, জগদম্বা দাসীকে ভাল করিয়া ছয় মাস কাল পেটের পীড়া ও অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল। মথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়াছিল তাহা কি অমনি করিয়াছিল?—মা তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত সব দেখাইয়াছিল, সেজন্যই ত সে অত সেবা করিত।"

রামায়ণ।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

[এই বক্তৃতাটী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত প্যাসিডোনা নামক স্থানে "সেক্সপিয়র সভায়" প্রদত্ত হয়। রামায়ণের আখ্যায়িকা যে আকারে দেশের ধর্ম্মজীবনে জড়িত হইয়া গিয়াছে, স্বামীজি তাহার প্রতিই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। দুই এক স্থান ব্যতীত বাল্মীকি-রচিত গাথা হইতেও তিনি অধিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন নাই। আখ্যায়িকার কোন কোন অংশে তিনি একটু বিশেষভাবে শ্রোতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অবশেষে ইহাও দ্রষ্টব্য যে স্বামীজি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত পোষাকে গল্পটীকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই। পাশ্চাত্যের দরবারে আমাদের পুরাণ ইতিহাসকে দাঁড় করাইতে গিয়া আমূল পোষাক বদলাইয়া দিতে হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। আমাদের জিনিষ, আমাদেরি ভাবে, সগৌরবে পাশ্চাত্যকে বুঝাইবার ও দান করিবার শক্তি স্বামীজির সকল বক্তৃতাতেই প্রকটিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্যের সভাস্থলে পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলির আলোচনায় স্বামীজির বিশেষত্ব উদ্বোধনের পাঠকবর্গ যেন অনুধাবন করেন, এই ক্ষুদ্র ভূমিকাদ্বারা ইহাই অনুরোধ করা হইল। ইতি- উঃ--সঃ]

সংস্কৃত ভাষায় শত শত মহাকাব্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে দুইখানি অতি প্রাচীন ও বিপুলকলেবর। যদিও প্রায় দুই সহস্র বর্ষের উপর হইল, সংস্কৃত আর কথোপকথনের ভাষা নাই, তথাপি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সেই প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে। আমি আপনাদের সমক্ষে সেই রামায়ণ ও মহাভারত নামক অতি প্রাচীন কাব্যদ্বয়ের বিষয় বলিতে যাইতেছি। ঐ গুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতবাসিগণের আচার ব্যবহার, সভ্যতা, তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। ঐ দুইটীর মধ্যে আবার রামায়ণ প্রাচীনতর—উহাকে রামের জীবনচরিত বলা যায়। রামায়ণের পূর্ব্বেও ভারতে পদ্যসাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল। হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের অধিকাংশ ভাগ একপ্রকার ছন্দে রচিত, কিন্তু এই রামায়ণ গ্রন্থখানিই ভারতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আদি কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

রামায়ণের কবির নাম মহর্ষি বাল্মীকি। পরবর্ত্তী কালে অপরের রচিত অনেক কাব্যাত্মক আখ্যায়িকা ঐ প্রাচীন কবি বাল্মীকির রচিত বলিয়া উহাদের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছিল। শেষে এমন দেখা যায়, যে অনেক শ্লোক বা কবিতা তাঁহার রচিত না হইলেও সেগুলি তাঁহারই রচিত

বলিয়া জ্ঞান করা—একটা প্রচলিত প্রথার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল প্রক্ষিপ্তাংশ থাকিলেও আমরা এখন উহা যে আকারে পাইতেছি, তাহাও অতি সুন্দর ভাবে গ্রথিত—জগতের সাহিত্যে উহার তুলনা নাই।

অতি প্রাচীনকালে এক স্থানে জনৈক যুবক বাস করিত—সে কোনরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিত না। তাহার শরীর অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল—আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া সে অবশেষে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেই সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত এবং ঐ দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধন দ্বারা পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রকন্যাদির ভরণপোষণ করিত। এইরূপে বহুদিন যায়, দৈবক্রমে একদিন দেবর্ষি নারদ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। দস্যু তাঁহাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিল। দেবর্ষি দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি কি জান না, দস্যুতা ও নরহত্যা মহাপাপ? তুমি কি জন্য আপনাকে এই পাপের ভাগী করিতেছ?" দস্যু উত্তরে বলিল, "আমি এই দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধন দ্বারা আমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকি।" দেবর্ষি বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যাহাদের জন্য এই ঘোর পাপাচরণ করিতেছ, তুমি কি মনে কর, তাহারা তোমার এই পাপের ভাগ লইবে?" দস্যু বলিল, "নিশ্চয়ই—তাহারা অবশ্যই আমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিবে।" তখন দেবর্ষি বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এক কায কর। তুমি আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও—তাহা হইলে আমি আর পলাইতে পারিব না। তার পর তুমি বাড়ী গিয়া পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস দেখি, তাহারা যেমন তোমার ধনের ভাগ গ্রহণ করে, তদ্রূপ তোমার পাপের ভাগ গ্রহণে প্রস্তুত কি না।" দস্যু দেবর্ষির বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সেই স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। গৃহে পঁহুছিয়াই প্রথমে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, আমি কিরূপে আপনাদের ভরণপোষণ করি, তাহা কি আপনি জানেন?" পিতা উত্তর দিল, "না, আমি জানি না।" তখন পুত্র বলিল, "আমি দস্যুবৃত্তি-দ্বারা আপনাদের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। আমি লোককে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করি।" পিতা এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া বলিয়া উঠিল—"কি? তুই এইরূপে ঘোরতর পাপাচরণে লিপ্ত থাকিয়াও আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিস—এখনই

আমার সম্মুখ হইতে দূর হ—তুই পতিত—তোকে আজ হইতে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম।" তখন দস্যু তাহার মাতার সমীপে গিয়া তাহাকেও পিতার ন্যায় প্রশ্ন করিল। সে কিরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করে, তৎসম্বন্ধে মাতাও পিতার ন্যায় নিজ অজ্ঞতা জানাইলে দস্যু তাহাকে নিজের দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। মাতা ঐ কথা শুনিবামাত্র ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল—"উঃ, কি ভয়ানক কথা।" দস্যু তখন কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "শোন মা—স্থির হও। ভয়ানকই হউক আর যাহাই হউক—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে—তুমি কি আমার পাপের ভাগ লইবে?" মাতা তখন যেন দশ হাত পিছাইয়া অম্লানবদনে বলিল, "কেন, আমি তোর পাপের ভাগ লইতে যাইব কেন? আমি ত কখন দস্যুবৃত্তি করি নাই।" তখন সে তাহার পত্নীর নিকট গমন করিয়া তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং একই রূপ উত্তর পাইল। তখন সে বলিল "শুন, প্রিয়ে, আমি একজন দস্যু, অনেক কাল ধরিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া লোকের অর্থাপহরণ করিতেছি, আর সেই দস্যুবৃত্তিলব্ধ অর্থদ্বারাই তোমাদের সকলের ভরণপোষণ করিতেছি—এখন আমার জিজ্ঞাস্য—তুমি কি আমার পাপের অংশ লইতে প্রস্তুত?" পত্নী মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই উত্তর দিল, "কখনই নহে। তুমি আমার ভর্ত্তা—তোমার কর্ত্তব্য আমার ভরণপোষণ করা। তুমি যেরূপেই আমার ভরণপোষণ কর না কেন, আমি তোমার পাপের ভাগ কেন লইব?"

দস্যুর তখন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। সে ভাবিল, "এই ত দেখিতেছি সংসারের নিয়ম। যাহারা আমার পরম আত্মীয়, যাহাদের জন্য আমি এই দস্যুবৃত্তি করিতেছি, তাহারা পর্য্যন্ত আমার পাপের ভাগী হইবে না।" এই ভাবিতে ভাবিতে সে দেবর্ষিকে যেখানে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে তাঁহার বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বাটীর কথা আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিল। পরে সে কাতরভাবে তাঁহার নিকট বলিল, "প্রভো, আমায় উদ্ধার করুন—আমি কি করিব বলিয়া দিন।" তখন দেবর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি এই দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ কর। তুমি ত দেখিলে, পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই তোমায় যথার্থ ভালবাসে না—অতএব ঐ সকল পরিবারবর্গের প্রতি আর মায়া কেন? যতদিন তোমার ঐশ্বর্য্য থাকিবে, ততদিন তাহারা তোমার অনুগত থাকিবে—আর যে দিন তুমি কপর্দ্দকহীন হইবে, সেই দিনই উহারা তোমায় পরিত্যাগ

করিবে। সংসারে কেহই কাহারও দুঃখ কষ্ট বা পাপের ভাগী হইতে চায় না, কিন্তু সকলেই সুখের বা পুণ্যের ভাগী হইতে চায়। অতএব তুমি তাঁহারই উপাসনা কর, একমাত্র যিনি সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, সকল অবস্থায়ই আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তিনি কখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, কারণ, যথার্থ ভালবাসার বিনিময় নাই, স্বার্থপরতা নাই, যথার্থ ভালবাসা অহেতুকী।”

এই সকল কথা বলিয়া দেবর্ষি তাহাকে সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিলেন। দস্যু তখন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক গভীর অরণ্যে গিয়া দিবারাত্র সাধন ভজন ও ধ্যানে নিযুক্ত হইল। ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে দস্যুর দেহজ্ঞান এতদূর লুপ্ত হইল যে, তাহার দেহে বল্মীকস্তূপ সংলগ্ন হইয়া গেলেও সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। অনেক বর্ষ এইরূপে অতিক্রান্ত হইলে দস্যু শুনিল, কে যেন গম্ভীরকণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, “মহর্ষে। উঠুন।” দস্যু চমকিত হইয়া বলিল, “মহর্ষি কে? আমি ত দস্যুমাত্র।” সেই বাণী আবার গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, “তুমি এখন আর দস্যু নহ। তোমার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে—তুমি এখন মহর্ষি। আজ হইতে তোমার পুরাতন নাম লুপ্ত হইল। এখন তুমি ‘বাল্মীকি’ (অর্থাৎ বল্মীকজাত) নামে প্রসিদ্ধ হইবে—যেহেতু তুমি ধ্যানে এত গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলে যে, তোমার দেহের চতুষ্পার্শ্বে যে বল্মীকস্তূপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা লক্ষ্যই কর নাই।” এইরূপে সেই দস্যু মহর্ষি বাল্মীকি হইল।

এই মহর্ষি বাল্মীকি কিরূপে কবি হইলেন, এক্ষণে সেই কথা বলিতেছি। একদিন মহর্ষি পবিত্র ভাগীরথীসলিলে অবগাহনার্থ যাইতেছেন, দেখিলেন, এক ক্রৌঞ্চমিথুন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মহর্ষি ক্রৌঞ্চমিথুনের দিকে একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের আনন্দ দেখিয়া তাঁহারও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই এই আনন্দদৃশ্য শোকদৃশ্যে পরিণত হইল—কোথা হইতে একটা তীর তাঁহার পার্শ্ব দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল—পুংক্রৌঞ্চটী সেই তীরবিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার দেহ ভূমিতে পতিত হইবামাত্র ক্রৌঞ্চবধূ পরম দুঃখিতান্তঃকরণে তদীয় পতির মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহর্ষির অন্তর এই শোকদৃশ্য দর্শনে পরম করুণার্দ্র হইল—তিনি এই নিষ্ঠুর কর্ম্মের কর্ত্তা কে, জানিবার জন্য ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্র এক ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন।

তখন তাঁহার মুখ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক নির্গত হইল :—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং ॥

তিনি বলিলেন, রে ব্যাধ! তুই কি পাষণ্ড! তোর একবিন্দুও দয়ামায়া নাই। ভালবাসার খাতিরেও তোর নিষ্ঠুর হস্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য হত্যাকার্য্যে বিরত নহে!

শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াই মহর্ষির মনে উদয় হইল, "এ কি? এ আমি কি বলিতেছি। আমি ত কখন এমন ভাবে কিছু বলি নাই।" তখন তিনি এক বাণী শুনিতে পাইলেন—"বৎস, ভীত হইও না—তোমার মুখ হইতে এই যাহা বাহির হইল, ইহার নাম কবিতা। তুমি জগতের হিতের জন্য কবিতায় রামের চরিত বর্ণন কর।" এইরূপে প্রথম কবিতার সৃষ্টি হইল। প্রথম কবি বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম কবিতার শ্লোক করুণাবশে স্বতঃ নির্গত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি পরমমনোহর কাব্য রামায়ণ অর্থাৎ রামচরিত্র রচনা করিলেন।

ভারতে অযোধ্যানাম্নী এক নগরী ছিল—উহা এখনও বর্ত্তমান। ভারতের যে প্রদেশে ঐ নগরীর এখনও স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকে আউধ বা অযোধ্যা প্রদেশ বলে এবং আপনারাও অনেকে ভারতের মানচিত্রে ঐ প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উহাই সেই প্রাচীন অযোধ্যা। অতি প্রাচীনকালে তথায় দশরথ নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার তিন রাণী ছিল—কিন্তু কোন রাণীর গর্ভেই রাজার কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই। তাই স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজা ও রাজ্ঞীগণ সন্তানকামনায় ব্রতোপবাস দেবারাধন প্রভৃতি নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহাদের চারিটী পুত্র জন্মিল—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম। ক্রমে এই রাজপুত্রগণ যথাবিধানে সর্ব্ব বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন।

জনক নামে আর একজন রাজা ছিলেন—তাঁহার সীতা নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। সীতাকে একটী শস্যক্ষেত্রের মধ্যে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল—অতএব সীতা পৃথিবীর কন্যা ছিলেন—তাঁহার অন্য জনকজননী ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কৃতে 'সীতা' শব্দের অর্থ হলকৃষ্ট ভূমিখণ্ড—তাঁহাকে ঐরূপ স্থানে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার তথাবিধ নামকরণ হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এইরূপ অলৌকিক জন্মের কথা অনেক পড়া যায়। কাহারও পিতা ছিলেন, মাতা ছিলেন না; কাহারও

মাতা ছিলেন, পিতা ছিলেন না; কাহারও বা পিতা মাতা কেহই ছিলেন না, কাহারও বা যজ্ঞকুণ্ড হইতে জন্ম, কাহারও আবার শস্যক্ষেত্রে জন্ম—ইত্যাদি ইত্যাদি—চলিত কথায় যেমন বলে—ভুঁইফোঁড়।

সীতা পৃথিবীর দুহিতা বলিয়া নিষ্কলঙ্কা ও পরম শুদ্ধস্বভাবা ছিলেন। রাজর্ষি জনকের দ্বারা তিনি প্রতিপালিতা হন। তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম হইলে রাজর্ষি তাঁহার জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভারতে প্রাচীনকালে "স্বয়ম্বর" নামক একপ্রকার বিবাহ-প্রথা ছিল—তাহাতে রাজকন্যাগণ স্ব স্ব পতি নির্ব্বাচন করিতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্নদেশীয় রাজপুত্রগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। সকলে সমবেত হইলে রাজকন্যা বহুমূল্য বসন-ভূষণবিভূষিতা হইয়া বরমাল্য হস্তে সেই রাজপুত্রগণের মধ্য দিয়া গমন করিতেন—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একজন নকিব যাইত—সে তাঁহার পাণিপীড়নপ্রার্থী প্রত্যেক রাজকুমারের গুণাগুণ বংশমর্য্যাদাদি কীর্ত্তন করিত। রাজকন্যা যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, তাঁহারই গলদেশে ঐ বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এই সকল স্বয়ম্বরস্থলে কখন কখন ভাবী বরের বিদ্যাবুদ্ধি বল পরীক্ষার্থ বিশেষ বিশেষ পণ নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

অনেক রাজপুত্র সীতার পাণিপীড়নে সমুৎসুক ছিলেন। হরধনুঃ নামক এক প্রকাণ্ড ধনুঃ যে ভগ্ন করিতে পারিবে, সীতা তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন, এ স্বয়ম্বরে ইহাই পণ ছিল। সকল রাজপুত্রই এই বীর্য্যপরিচায়ক কর্ম্মসম্পাদনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। অবশেষে রাম ঐ দৃঢ় ধনুঃ হস্তে লইয়া অবলীলাক্রমে উহা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। হরধনুভঙ্গ হইলে সীতা রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। মহামহোৎসবের সহিত রামসীতার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। রাম বধূকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন।

কোন রাজার অনেকগুলি পুত্র থাকিলে রাজার দেহান্তে যাহাতে সিংহাসন লইয়া রাজকুমারগণের মধ্যে বিরোধ না হয়, তদুদ্দেশে প্রাচীন ভারতে রাজার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। রামচন্দ্রের উদ্বাহক্রিয়া সমাপনান্তে রাজা দশরথ ভাবিলেন, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, রামও আমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি

অভিষেকের সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমগ্র অযোধ্যা এই অভিষেক সংবাদে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে প্রিয়তমা রাজমহিষী কৈকেয়ীর জনৈকা পরিচারিকা তদীয় স্বামিনীকে বহুকাল পূর্ব্বে রাজাকর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত দুইটী বরদানের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। এক সময়ে কৈকেয়ী রাজা দশরথের এতদূর সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কোন দুইটী বিষয় প্রার্থনা কর, যদি তাহা আমার সাধ্যাতীত না হয়, আমি তোমাকে তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিব।" কিন্তু কৈকেয়ী তখন রাজার নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি ঐ বরের কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ দুষ্টস্বভাবা দাসী তাঁহাকে এক্ষণে বুঝাইতে লাগিল, রাম সিংহাসনে বসিলে তাঁহার কি ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? বরং তাঁহার পুত্র রাজা হইলে তাঁহার সব সুখ। এইরূপে সে কৈকেয়ীর হিংসাবৃত্তি উত্তেজিত করিতে লাগিল। দাসীর পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণায় রাণীর হৃদয়ে প্রবল ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইল, তিনি অবশেষে ঈর্ষ্যাবশে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তখন সেই দুষ্টা, রাজার বরদানাঙ্গীকারের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল, "এই সেই অঙ্গীকৃত বর প্রার্থনার উপযুক্ত সময়। তুমি এক বরে তোমার পুত্রের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস প্রার্থনা কর।"

বৃদ্ধ রাজা রামচন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। এদিকে কৈকেয়ী যখন রাজার নিকট ঐ দুইটী কুৎসিৎ বর প্রার্থনা করিলেন, তখন রাজা বুঝিলেন, তিনি রাজা হইয়া কখন নিজ সত্যভঙ্গ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাম আসিয়া তাঁহাকে এই উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা করিলেন। রাম পিতৃসত্য রক্ষার জন্য স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্য-ত্যাগ করিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে রাম চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনগমন করিলেন—সঙ্গে প্রিয়তমা পত্নী সীতা ও প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ গেলেন—ইঁহারা কোন মতে রামের সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না।

আর্য্যগণ সে সময় ভারতের গভীর অরণ্যের অধিবাসিগণের সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তখন তাঁহারা বন্য জাতিগণকে "বানর" নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত "বানর" অর্থাৎ অসভ্য বন্যজাতিগণের মধ্যে যাহারা অতিশয় বলবান্ ও শক্তিশালী হইত, তাহারা আর্য্যগণ কর্ত্তৃক "রাক্ষস" নামে অভিহিত হইত।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণ দ্বারা অধ্যুষিত অরণ্যে গমন করিলেন। যখন সীতা রামের সহিত যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন রাম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি রাজকন্যা হইয়া কিরূপে এই সকল কষ্ট সহ্য করিবে—অরণ্যে কখন কি বিপদ্ উপস্থিত হইবে, কিছুই জানা নাই। তুমি কিরূপে তথায় আমার সঙ্গে যাইবে?" সীতা তাহাতে এই উত্তর দেন, "আর্য্যপুত্র যথায় যাইবেন, সীতাও তথায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। আপনি আমাকে 'রাজকন্যা' 'রাজবংশে জন্ম', এসব কথা কি বলিতেছেন। আমায় আপনাকে সঙ্গে লইতেই হইবে।" রামচন্দ্রকে অগত্যা সীতাকে সঙ্গে লইতে হইয়াছিল। আর রামগতপ্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও রামের মুহূর্ত্তমাত্র বিরহ সহ্য করিতে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং তিনিও কোনমতে রামের সঙ্গ ছাড়িলেন না। তাঁহারা অরণ্যমধ্যে গমন করিয়া প্রথমে চিত্রকূট পর্ব্বতে কিছুদিন বাস করিলেন, পরে গভীর হইতে গভীরতর অরণ্যে গমন করিয়া গোদাবরী তীরবর্ত্তী পরম রমণীয় পঞ্চবটী প্রদেশে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মৃগয়া ও ফলমূল আহরণ করিতেন—তাহাতেই তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। এইরূপে কিছুকাল বাস করিবার পর একদিন তথায় এক রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী। যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে সে রামের দর্শন পাইল এবং তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল। কিন্তু রাম মনুষ্যগণমধ্যে পরম শুদ্ধস্বভাব ছিলেন এবং তিনি বিবাহিত, সুতরাং রাক্ষসীর মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলেন না। রাক্ষসী প্রতিহিংসাপরবশা হইয়া তদীয় ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট গিয়া রামভার্য্যা পরমসুন্দরী সীতার বিষয় তাহাকে সমুদয় বিজ্ঞাপিত করিল।

মর্ত্ত্যগণের মধ্যে রাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীর্য্যবান ছিলেন। রাক্ষস, দৈত্য, দানব কাহারও এত শক্তি ছিল না যে, বাহুবলে রামকে পরাস্ত করিবে। সুতরাং সীতাহরণার্থ রাবণকে মায়া অবলম্বন করিতে হইল। সে অপর একটী রাক্ষসের সহায়তা গ্রহণ করিল—উক্ত রাক্ষস পরম মায়াবী ছিল। রাবণের অনুরোধে সে স্বর্ণ মৃগরূপ ধারণ করিয়া রামের কুটীরের নিকট মনোহর নৃত্য অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সীতা ঐ মায়ামৃগের রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য ঐ মৃগটীকে ধরিয়া আনিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিলেন। রাম লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষণা-

বেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া মৃগকে ধরিবার জন্য বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ তখন কুটীরের চতুর্দ্দিকে একটী মন্ত্রপূত গণ্ডী কাটিয়া সীতাকে বলিলেন, "দেবি, আমার বোধ হইতেছে—অদ্য আপনার কিছু অশুভ ঘটিতে পারে। অতএব আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি অদ্য কোনক্রমে এই মন্ত্রপূত গণ্ডীর বাহিরে যাইবেন না।" ইতিমধ্যে রাম সেই মায়ামৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন, সেই মৃগও তৎক্ষণাৎ তাহার স্বাভাবিক রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ঠিক সেই সময়ে কুটীরে এক গভীর আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল—যেন রাম চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,

"লক্ষ্মণ, ভাই, এস—আমায় রক্ষা কর।" সীতা শুনিয়া অমনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি অবিলম্বে বনমধ্যে গমন করিয়া আর্য্যপুত্রের সাহায্য কর।" লক্ষ্মণ বলিলেন—"এত রামচন্দ্রের স্বর নহে।" কিন্তু সীতার বারম্বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে রামের অন্বেষণে যাইতে হইল। লক্ষ্মণ যেমন বাহির হইয়া কিছু দূরে গিয়াছেন, অমনি রাক্ষসরাজ রাবণ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া কুটীরসম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। সীতা বলিলেন, "আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন—আমার স্বামী এখনই ফিরিবেন—তিনি আসিলেই আমি আপনাকে যথেষ্ট ভিক্ষা দিব।" সন্ন্যাসী বলিল, "শুভে, আমি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত—অতএব কুটীরে যাহা কিছু আছে, এখনই আমাকে তাহা প্রদান কর।" সীতা এই কথায় আশ্রমে যে কয়েকটী ফলমূল ছিল, তাহা আনিয়া গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই সন্ন্যাসীকে তাহা লইতে বলিলেন। কিন্তু কপট সন্ন্যাসী তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল—সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই, অতএব গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া তাহার নিকট আসিয়া অনায়াসে তিনি ভিক্ষা দিতে পারেন। সন্ন্যাসীর পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় সীতা যেমন গণ্ডীর বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই কপট সন্ন্যাসী নিজ রাক্ষসদেহ পরিগ্রহ করিয়া সীতাকে বাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক ধারণ করিল এবং নিজ মায়ারথ আহ্বান করিয়া তাহাতে রোরুদ্যমানা সীতাকে বলপূর্ব্বক বসাইয়া তাঁহাকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিল। আহা! সীতা তখন নিতান্ত নিঃসহায়া—এমন কেহ সেখানে ছিল না, যে আসিয়া তাঁহার সাহায্য করে। যাহা হউক, রাবণের রথে যাইতে যাইতে সীতা নিজ অঙ্গ হইতে কয়েকখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাবণ সীতাকে তাহার নিজ রাজ্য লঙ্কায় লইয়া গেল। সে সীতাকে তাহার মহিষী হইবার জন্য প্রস্তাব করিল এবং তাহার বাক্যে সম্মত করিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। কিন্তু সীতা সতীত্বধর্ম্মের সাকার বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। রাবণ সীতাকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে, যতদিন না তিনি তাহার পত্নী হইতে অঙ্গীকৃত হন, ততদিন তাঁহাকে দিবারাত্রি এক বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিলেন।

যখন রাম লক্ষ্মণ কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তথায় সীতা নাই, তখন তাঁহাদের শোকের আর সীমা রহিল না। সীতার কি দশা হইল, তাঁহারা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন দুই ভ্রাতায় মিলিয়া চারিদিকে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন উদ্দেশই পাইলেন না। অনেক দিন এইরূপ অনুসন্ধানের পর এক দল 'বানরের' সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল—তাহাদের মধ্যে দেবাংশসম্ভূত হনূমান্‌ও ছিলেন। আমরা পরে দেখিব, এই বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ রামের পরম বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া সীতা উদ্ধারে রামকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রামের প্রতি তাঁহার ভক্তি এত প্রবল ছিল যে, হিন্দুগণ এখনও তাঁহাকে প্রভুর আদর্শ সেবকরূপে পূজা করিয়া থাকেন। আপনারা দেখিতেছেন, 'বানর' ও 'রাক্ষস' শব্দে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন অধিবাসিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এইরূপে অবশেষে 'বানর'গণের সহিত রামের মিলন হইল। তাহারা তাঁহাকে বলিল যে, তাহারা আকাশ দিয়া একখানি রথ যাইতে দেখিয়াছিল, তাহাতে একজন 'রাক্ষস' বসিয়াছিল—সে এক রোরুদ্যমানা পরমা সুন্দরী রমণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, আর যখন রথখানি তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া যায়, তখন সেই রমণী তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজ গাত্র হইতে একখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তাহাদের নিকট ফেলিয়া দেন। এই বলিয়া তাহারা রামকে সেই অলঙ্কার প্রদর্শন করিল। লক্ষ্মণ প্রথমেই সেই অলঙ্কার লইয়া দেখিলেন, কিন্তু তিনি উহা চিনিতে পারিলেন না। তখন রাম তাঁহার হস্ত হইতে অলঙ্কারটী লইয়া তৎক্ষণাৎ উহা সীতার বলিয়া চিনিলেন। ভারতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে এতদূর ভক্তি করা হইত যে, লক্ষ্মণ সীতার বাহু বা গলদেশের দিকে কখন চাহিয়া দেখেন নাই। সুতরাং বানরগণ প্রদর্শিত অলঙ্কারটী সীতার কণ্ঠভূষণ ছিল বলিয়া উহা চিনিতে

পারেন নাই। এই আখ্যানটীতে ভারতের ঐ প্রাচীন প্রথার আভাস পাওয়া যায়।

সেই সময়ে বানররাজ বালীর সহিত তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের বিবাদ হইতেছিল। বালী সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। রাম সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালীর নিকট হইতে সুগ্রীবের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিলেন। সুগ্রীবও এই উপকারের প্রত্যুপকার-স্বরূপে রামের সাহায্যে সম্মত হইলেন। সীতার অন্বেষণার্থ সুগ্রীব সর্ব্বত্র বানর সৈন্ত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কোন সন্ধান করিতে পারিল না। অবশেষে হনুমান্ এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করিয়া ভারতের উপকূল হইতে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইলেন। কিন্তু তথায় সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও সীতার কোন সন্ধান পাইলেন না।

রাক্ষসরাজ রাবণ দেব মানব সকলকে, এমন কি, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল। সে জগতের সমুদয় সুন্দরী রমণীগণকে সংগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার উপপত্নী করিয়াছিল হনুমান্ ভাবিতে লাগিলেন, "সীতা, কখন তাহাদের সহিত রাজপ্রাসাদে থাকিতে পারেন না—ঐরূপ স্থানে বাসাপেক্ষা তিনি নিশ্চিত মৃত্যুকেও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিবেন।" এই ভাবিয়া হনুমান্ অন্যত্র সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সীতাকে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা দেখিতে পাইলেন—তাঁহার শরীর অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডু-বর্ণ—তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন প্রতিপদের শশিকলা আকাশে সবে উদয় হইতেছে। হনুমান্ তখন একটী ক্ষুদ্র কীটের রূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বৃক্ষের উপর উপবেশন করিলেন—তথা হইতে দেখিতে লাগিলেন, রাবণপ্রেরিতা রাক্ষসীগণ আসিয়া সীতাকে নানাপ্রকারে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সীতা রাবণের নামে পর্য্যন্ত কর্ণপাত করিলেন না।

চেড়ীগণ প্রস্থান করিলে হনুমান্ স্বস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেবি, রামচন্দ্র আপনার অন্বেষণার্থ আমায় প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি সীতার প্রত্যয় উৎপাদনার্থ চিহ্নস্বরূপ রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি সীতাকে আরও জানাইলেন যে, সীতা কোথায় আছেন জানিতে পারিলেই রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কায় আসিয়া রাক্ষসরাজকে জয় করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। এই সকল কথা সীতাকে নিবেদনান্তে হনুমান্

অবশেষে করযোড়ে বলিলেন, "দেবীর যদি ইচ্ছা হয় ত দাস আপনাকে স্কন্ধে লইয়া এক লম্ফে সাগর পার হইয়া রামচন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে পারে।" কিন্তু সীতা পাতিব্রত্যধর্ম্মের সাকার বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন, সুতরাং হনুমানের অভিপ্রায়মত কার্য্য করিতে গেলে, পতিব্যতীত পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ হইবে বলিয়া তিনি হনুমানের ওকথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি কেবল হনুমান্ যথার্থই সীতার উদ্দেশ পাইয়াছেন, রামচন্দ্রের এই বিশ্বাস উৎপাদনার্থ তাঁহাকে নিজ মস্তক হইতে চূড়ামণি প্রদান করিলেন। হনুমান্ ঐ চূড়ামণি লইয়া রামচন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন।

হনুমানের নিকট হইতে সীতার সমুদয় সংবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্র একদল বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের সর্ব্বশেষ প্রান্তে উপনীত হইলেন। তথায় রামের বানরগণ এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ করিল। উহার নাম সেতুবন্ধ—ঐ সেতু ভারতের সহিত লঙ্কার সংযোগ সাধন করিয়া দিয়াছে। খুব ভাঁটার সময় এখনও ভারত হইতে লঙ্কায় বালুকাস্তূপের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারা যায়।

অবশ্য রাম ঈশ্বরাবতার ছিলেন, নতুবা তিনি এ সকল দুষ্কর কর্ম্ম কিরূপে সম্পাদন করিবেন? হিন্দুদের মতে রামচন্দ্র ঈশ্বরাবতার ছিলেন। ভারতবাসিগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের সপ্তমাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।

বানরগণ সেতুবন্ধনের সময় এক একটা প্রকাণ্ড পাহাড় উৎপাটন করিয়া আনিয়া সমুদ্রে স্থাপন করিয়া তাহার উপর রাশীকৃত শিলাখণ্ড ও মহীরুহ সমূহ নিক্ষেপ করিয়া প্রকাণ্ড সেতু প্রস্তুত করিতেছিল। তাহারা দেখিল, একটা কাঠবিড়াল একবার বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতেছে, তারপর সেতুর উপর আসিয়া এদিক্ ওদিক্ করিতেছে ও নিজের গা ঝাড়া দিতেছে। এইরূপে সে নিজের সামর্থ্যানুসারে বালুকা প্রদান করিয়া রামচন্দ্রের সেতুনির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিতেছিল। বানরগণ তাহার এই কার্য্য দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল। তাহারা এক একজন এক একবারেই এক একটা পাহাড়, এক একটা জঙ্গল ও রাশীকৃত বালুকা লইয়া আসিতেছিল সুতরাং কাঠবিড়ালটীর ঐরূপ বালুকার উপর গড়াগড়ি ও গা ঝাড়া দেওয়া দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। রামচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিয়া বানরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কাঠবিড়ালটীর মঙ্গল হউক। সে তাহার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার কার্য্যটুকু করিতেছে, অতএব সে তোমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান

হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে।" এই বলিয়া তিনি আদর করিয়া কাঠ-বিড়ালটীর পৃষ্ঠে হাত চাপড়াইলেন। এখনও কাঠবিড়ালের পৃষ্ঠে যে লম্বালম্বি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে বলে, উহাই রামচন্দ্রের অঙ্গুলির দাগ।

সেতুনির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে সমুদয় বানরসৈন্য রাম ও তদীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল। তারপর কয়েক মাস ধরিয়া রামচন্দ্রের সহিত রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ হইল—অজস্র রক্তপাত হইতে লাগিল। অবশেষে রাক্ষসাধিপ রাবণ পরাজিত ও নিহিত হইল। তখন স্বর্ণময় প্রাসাদাদিবিভূষিত রাবণের রাজধানী রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। ভারতের সুদূর পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে, তথাকার লোকদিগকে আমি লঙ্কায় গিয়াছিলাম বলিলে তাহারা বলিত, "আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, তথাকার সমুদয় গৃহ স্বর্ণনির্ম্মিত।" যাহা হউক, লঙ্কার এই সমুদয় স্বর্ণময় নগরী রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ যুদ্ধকালে রামের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সাহায্যের প্রতিদান স্বরূপে রামচন্দ্র বিভীষণকে এই সমুদয় স্বর্ণময়ী নগরী প্রদান করিলেন এবং রাবণের স্থানে তাঁহাকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইলেন।

বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাম, সীতা ও অনুচর-বর্গের সহিত লঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন। রাম যখন অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন, তখন রামের কনিষ্ঠভ্রাতা কৈকেয়ীতনয় ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। সুতরাং তিনি রামের বনগমনের বিষয় কিছুই জানিতেন না। অযোধ্যায় আসিয়া যখন সমুদয় শুনিলেন, তখন তাঁহার আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, শোকের সীমা পরিসীমা রহিল না। বৃদ্ধ রাজা দশরথও এই সময়ে রামশোকে অধীর হইয়া দেহত্যাগ করেন। ভরত ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে অরণ্যে রামসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে পিতার স্বর্গগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন এবং রাজ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম তাহাতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস না করিলে, পিতৃসত্য কোনরূপে রক্ষিত হইবে না। চতুর্দ্দশবর্ষান্তে তিনি ফিরিয়া গিয়া রাজ্যগ্রহণ করিবেন। রামচন্দ্র তখন ভরতকে রাজ্যপালনের জন্য বারবার অনুরোধ করিতে থাকিলে অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রামাজ্ঞা পালন করিতে হইল। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি পরম অনুরাগ ও ভক্তিবশতঃ স্বয়ং সিংহাসনে বসিতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। সিংহাসনের উপর

রামচন্দ্রের কাষ্ঠপাদুকা স্থাপন করিয়া স্বয়ং রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

সীতা উদ্ধারের পরই রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের সময় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং ভরত তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি প্রজাবর্গের সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলের অনুরোধে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রাচীনকালে রাজাকে সিংহাসনে আরোহণের সময় প্রজাগণের কল্যাণার্থ যে সকল ব্রত গ্রহণ করিতে হইত, রাম যথাবিধানে তাহা গ্রহণ করিলেন। তখনকার রাজগণ প্রজাবর্গের সেবকস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রজাবর্গের মতামতের অধীন হইয়া চলিতে হইত। আমরা এখনই দেখিব, এই প্রজারঞ্জনের জন্য রামচন্দ্রকে নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয়তর বস্তুকে কেমন মমতা হারাইয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রাম অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল সীতার সহিত পরম সুখে যাপন করিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদিন রামচন্দ্র চরমুখে অবগত হইলেন যে, রাক্ষসাপহৃতা সমুদ্রপারনীতা সীতাকে তিনি গ্রহণ করাতে প্রজাবর্গ অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। রাবণবিজয়ের পরই রামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের সন্তোষবিধানার্থ তাঁহাকে স্বয়ং বিশুদ্ধস্বভাবা জানিয়াও সমবেত বানর ও রাক্ষসগণ সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন। যখন সীতা অগ্নিপ্রবেশ করিলেন, তখন রামচন্দ্র বুঝি সীতাকে হারাইলাম ভাবিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, অগ্নিদেব স্বয়ং সেই অগ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইতেছেন—তাঁহার মস্তকে এক হিরণ্ময় সিংহাসন —তদুপরি সীতাদেবী উপবিষ্টা। ইহা দেখিয়া রামচন্দ্রের এবং সমবেত সকলেরই আনন্দের আর সীমা রহিল না। রাম পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। অযোধ্যার প্রজাবর্গ এই অগ্নিপরীক্ষার বিষয় অবগত ছিল, কিন্তু তাহারা উহা স্বয়ং না দেখাতে তাহাদের মন সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা আপনাপনি বলাবলি করিত, সীতা রাবণগৃহে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, তিনি যে তথায় বাসকালে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধস্বভাবা ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি?

রাজা একরূপ অবস্থায় সীতাকে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতেছেন, হয় সর্ব্বসমক্ষে নিজ বিশুদ্ধ স্বভাবের পুনঃ পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য, নতুবা তাঁহাকে বিসর্জ্জন করাই রাজার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

প্রজাগণের সন্তোষবিধানার্থ সীতা অরণ্যে নির্ব্বাসিতা হইলেন। যথায় সীতা পরিত্যক্তা হইলেন, তাহার অতি নিকটেই আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। মহর্ষি তাঁহাকে একাকিনী রোরুদ্যমানা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন ও তাঁহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে নিজ আশ্রমে স্থানদান করিলেন। সীতা তখন আসন্নপ্রসবা ছিলেন—ঐ আশ্রমেই তিনি দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। উপযুক্ত বয়স হইলে মহর্ষি তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করাইয়া যথাবিধানে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি রামায়ণ নামক কাব্য রচনা করিয়া উহাতে সুরতাল সংযোজন করিলেন।

ভারতে নাটক ও সঙ্গীত অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে—উহাদিগকে লোকে ধর্ম্মসাধনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। লোকের ধারণা—প্রেমসঙ্গীতই হউক বা যাহাই হউক, সঙ্গীতমাত্রই, যদি কেহ ঐ গানে তন্ময় হইয়া যাইতে পারে, তবে তাহার অবশ্যই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস—ধ্যানের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সঙ্গীতেও তাহাই হইয়া থাকে।

যাহা হউক, বাল্মীকি রামায়ণে সুরতাল সংযোগ করিয়া রামের পুত্রদ্বয়কে উহা গাহিতে শিখাইলেন।

ভারতের প্রাচীন রাজগণ মধ্যে মধ্যে অশ্বমেধাদি বড় বড় যজ্ঞ করিতেন—রামচন্দ্রও তদনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তখন গৃহস্থ ব্যক্তির পত্নী ব্যতীত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার ছিল না—ধর্ম্মকার্য্যের সময় পত্নী অবশ্যই সঙ্গে থাকা চাই—সেই জন্যই পত্নীর অপর একটী নাম সহধর্ম্মিণী—যাঁহার সহিত একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান করিতে হয়। হিন্দু গৃহস্থকে শত শত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, কিন্তু পত্নী সঙ্গে থাকিয়া উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার কর্ত্তব্যটুকু অনুষ্ঠান না করিলে শাস্ত্রমতে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই বিধিমত অনুষ্ঠিত হইত না।

যাহা হউক, সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দেওয়াতে রাম কিরূপে বিধিপূর্ব্বক সস্ত্রীক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, এখন এই প্রশ্ন উঠিল। প্রজাগণ তাঁহাকে

পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু রামচন্দ্র জীবনে এই প্রথমবার প্রজাগণের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, "তাহা কখন হইতে পারে না। আমি সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় সীতার নিকট পড়িয়া আছে।" সুতরাং শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিবার জন্য সীতার প্রতিনিধিস্বরূপে তাঁহার এক সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। এই যজ্ঞমহোৎসবে সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মভাব ও আনন্দবর্দ্ধনের জন্য সঙ্গীতের আয়োজনও হইয়াছিল। কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি নিজ শিষ্যদ্বয় সঙ্গে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, উঁহারা রামের অজ্ঞাত পুত্র লব ও কুশ। সভাস্থলে একটী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল ও বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ গানের জন্য অন্যান্য সমুদয় আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সভাস্থলে রাম ও তদীয় অমাত্যবর্গ এবং অযোধ্যার সমুদয় প্রজা শ্রোতৃমণ্ডলীরূপে আসন গ্রহণ করিলেন। বিপুল জনতা হইল। বাল্মীকির শিক্ষামত লব কুশ রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন, তাহাদের মনোহর রূপলাবণ্য দর্শনে ও মধুর স্বর শ্রবণে সমগ্র সভ্যমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন। সীতার প্রসঙ্গ বার বার শ্রবণ করিয়া রাম উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, আর যখন সীতার বিসর্জ্জনপ্রসঙ্গ আসিল, তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। মহর্ষি রামকে বলিলেন, "আপনি শোকার্ত্ত হইবেন না—আমি সীতাকে আপনার সমক্ষে আনয়ন করিতেছি।" এই বলিয়া বাল্মীকি সভাস্থলে সীতাকে আনয়ন করিলেন। সীতার দর্শনে অতিশয় বিহ্বল হইলেও প্রজাবর্গের সন্তোষবিধানার্থ রামকে সভাসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধতার পুনঃ পরীক্ষাদানের প্রস্তাব করিতে হইল। দীনা সীতাদেবী বারম্বার তাঁহার বিশুদ্ধতার উপর এরূপ নিষ্ঠুরভাবে সন্দেহ প্রকাশ হওয়াতে এতদূর কাতর হইলেন যে, তিনি আর উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজ বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিবার জন্য দেবগণের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—তখন হঠাৎ পৃথিবী দ্বিধা হইল—সীতা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এই আমার পরীক্ষা।" এই বলিয়া তিনি পৃথিবীর বক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন। প্রজাবর্গ এই অদ্ভুত ও শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। রাম শোকে মুহ্যমান হইলেন।

সীতার অন্তর্দ্ধানের কিয়ৎকাল পরে দেবগণের নিকট হইতে জনৈক দূত আসিয়া রামকে বলিলেন, "পৃথিবীতে আপনার কার্য্য শেষ হইয়াছে—অতএব আপনি এক্ষণে স্বধাম বৈকুণ্ঠে চলুন।" এই বাক্যে রামের নিজস্বরূপস্মৃতি

জাগ্রত হইল। তিনি অযোধ্যার সমীপবর্ত্তিনী সরিদ্বরা সরযূর জলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া বৈকুণ্ঠে সীতার সহিত মিলিত হইলেন।

ভারতের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাব্য রামায়ণের আখ্যায়িকা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। রাম ও সীতা—ভারতবাসীর আদর্শ। ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকা মাত্রেই, সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় রমণীগণের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা—পরমবিশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্ব্বংসহা সীতার মত হওয়া। এই সমুদয় চরিত্র আলোচনা করিবার সময় আপনারা পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ কতদূর বিভিন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশ বলেন, "কর্ম্ম কর, কর্ম্ম করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।" ভারত বলেন, "দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।" মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, পাশ্চাত্যদেশ এই সমস্যা পূরণ করিয়াছেন, ভারত এদিকে মানুষ কত অল্প লইয়া থাকিতে পারে, এই সমস্যা পূরণ করিয়াছেন। এই দুইটী আদর্শই এক এক ভাবের চরম সীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপ, যেন মূর্ত্তিমতী ভারতমাতা। সীতা বাস্তবিক ছিলেন কি না, সীতার উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, এ বিষয় লইয়া আমরা বিচার করিতেছি না, কিন্তু আমরা জানি, সীতা চরিত্রে যে আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই আদর্শ ভারতে এখনও বর্ত্তমান। সীতাচরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির জীবনে, সমগ্রজাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন উহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য কোন পৌরাণিক উপাখ্যানই তদ্রূপ করে নাই। সীতা নামটী ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্য—তাহারই পরিচায়কস্বরূপ—নারীগণের মধ্যে আমরা যে ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, সীতা বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যখন স্ত্রীলোককে আশীর্ব্বাদ করেন, তিনি তাহাকে "সীতার মত হও" বলিয়া থাকেন, বালিকাকে আশীর্ব্বাদের সময়ও তাহাই বলা হয়। ভারতীয় রমণীগণ সকলেই আপনাদিগকে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, সর্ব্বংসহা, সদা পতিপরায়ণা, নিত্য বিশুদ্ধস্বভাবা রামভার্য্যা সীতার সন্তান জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি এত দুঃখ সহিয়াছেন, কিন্তু রামের উদ্দেশে

একটী কর্কশ বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া কখন নির্গত হয় নাই। এই সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করা তিনি নিজ কর্ত্তব্যরূপে মনে করিয়া লইয়াছেন, এবং স্থির শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। সীতার অরণ্যে নির্ব্বাসন ব্যাপার তাঁহার প্রতি কি ঘোর অবিচার ভাবিয়া দেখুন—কিন্তু তন্নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র বিরক্তিভাবের উদয় হয় নাই। এইরূপ তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব। ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, "আঘাতের পবিবর্ত্তে আঘাত করিলে সেই আঘাতের কোন প্রতীকার হইল না, উহাতে কেবল জগতে একটী পাপের বৃদ্ধিমাত্র হইবে" ভারতের এই বিশেষ ভাবটী সীতার প্রকৃতিগত ছিল—তিনি অত্যাচারের প্রতিশোধের চিন্তা পর্য্যন্ত কখন করেন নাই।

কে জানে, এই দুইটী আদর্শেব মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ?—পাশ্চাত্যমতানুযায়ী এই আপাতপ্রতীয়মান শক্তি ও তেজ, অথবা প্রাচ্যদেশীয় কষ্টসহিষ্ণুতা—তিতিক্ষা—ধৃতি?

পাশ্চাত্যদেশীয়গণ বলেন,—"আমরা দুঃখ কষ্টের প্রতীকার করিয়া, উহার নিবারণ করিয়া দুঃখ কমাইবার চেষ্টা করিতেছি।" ভারতবাসী বলেন,;"আমরা দুঃখ কষ্টকে সহিয়া সহিয়া উহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ সহ্য করিতে করিতে আমাদেব পক্ষে দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিবে না, উহাই আমাদেব পবম সুখ হইয়া দাঁড়াইবে।" যাহাই হউক, এই দুইটী আদর্শেব কোনটীই হেয় নহে। কে জানে, আখেবে কোন্ আদর্শের জয় হইবে? কে জানে, কোন ভাব অবলম্বনে মানবজাতিব যথার্থ কল্যাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে? কে জানে, কোন্ ভাবাবলম্বনে পশুভাবকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া দিয়া পরিণামে তাহার উপব আধিপত্য লাভ হইবে?—সহিষ্ণুতা বা ক্রিয়াশীলতা, অপ্রতীকার বা প্রতীকার।

পরিণামে যাহাই হউক, ইতিমধ্যে যেন আমরা পরস্পরের আদর্শ নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা না করি। আমরা উভয় জাতিই এক ব্রতে ব্রতী—সেই ব্রত—সম্পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তি। আপনারা আপনাদের ভাবে কার্য্য করিয়া যান, আমরা আমাদের পথে চলি। কোনও আদর্শকে, কোনও প্রণালীকে, কোনও পথকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমি পাশ্চাত্যগণকে একথা কখন বলি না, "আপনারা আমাদের প্রণালী অবলম্বন করুন।" কখনই নহে। লক্ষ্য একই, কিন্তু উপায় কখন একরূপ হইতে পারে না। অতএব ভারতের আদর্শ, ভারতের সাধনপ্রণালীর কথা শুনিয়া তখনই, আশা করি, আপনারা ভারতকে সম্বোধন

করিয়া বলিবেন—"আমরা জানি, আমাদের উভয় জাতির লক্ষ্য একই, এবং আমাদের উভয়ের ঐ লক্ষ্যে পঁহুছিবার যে দ্বিবিধ উপায়, তাহাও আমাদের পরস্পরের ঠিক উপযোগী। আপনারা আপনাদের আদর্শ, আপনাদের প্রণালী অনুসরণ করুন—ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হউক।" আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতিকে বলি—"বিভিন্ন আদর্শ লইয়া বিবাদ করিও না, যতই বিভিন্ন প্রতীয়মান হউক, তোমাদের উভয়ের লক্ষ্য একই।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনচেষ্টাই আমার জীবনব্রত। উপসংহারে তাই বলি, জীবনের কুটিল বর্ত্ম দিয়া অগ্রসর হইবার সময় আমরা যেন পরস্পর পরস্পরের লক্ষ্য-সিদ্ধির সাফল্যই কামনা করি।

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

(১৩)

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

যাহার দ্বারা দেখা যায় তাহার নাম দর্শন। দর্শনশাস্ত্রের "দর্শন" শব্দটীও এই অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের কার্য্য—কোন কিছু দেখাইয়া দেওয়া, বুঝাইয়া দেওয়া বা প্রমাণ করিয়া দেওয়া। তবে এই দেখান বুঝান বা প্রমাণ করিয়া দেওয়ার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা অন্য কোন কিছু দেখাইয়া বা বুঝাইয়া দেয় না পরন্তু ইহা, যাহা সত্য অথচ যাহা যাবৎ পদার্থের মূল তত্ত্ব তাহাই দেখাইয়া বুঝাইয়া বা প্রমাণ করিয়া দেয়। এখন দর্শনশাস্ত্রের কার্য্য এইরূপ হওয়ায়, ইহার আলোচ্য বিষয়টী প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, যথা—যে উপায়ে দেখা বা বুঝা যায় সেই উপায় বিষয়ক আলোচনা, এবং যাহা দেখা বা বুঝা হয় তদ্বিষয়ক আলোচনা। প্রথমটীর নাম, দার্শনিক ভাষায়, "প্রমাণ" এবং দ্বিতীয়টীর নাম প্রমেয়।

এখন দেখা যাউক দর্শনশাস্ত্রের এইরূপ দুইটী প্রধান বিভাগ কেন ঘটিল। ইহা বুঝিতে পারিলে এরূপ বিভাগের উপযোগিতা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা সকলেই বুঝি, যে আমরা চক্ষু দিয়া যাহা দেখি তাহা যেমন কতকটা চক্ষুর অবস্থার উপর নির্ভর করে তদ্রূপ কতকটা সেই দেখিবার জিনিষের স্বভা-

বের উপরও নির্ভর করে। যেমন চক্ষুতে যদি নেবা রোগ হয় তাহা হইলে দর্শনীয় বস্তুগুলি হল্‌দে দেখায়, চক্ষুতে যদি অন্য কোন রোগবিশেষ হয় তাহা হইলে তাহা ছোট বা বড় দেখায়—তদ্রূপ আবার দেখিবার জিনিষটী যদি চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ হয় তাহা হইলে তাহা চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণই দেখা যায়, ত্রিকোণ হইলে চতুষ্কোণ দেখা যায় না অথবা চতুষ্কোণ হইলেও ত্রিকোণ বলিয়া দেখা হয় না। সুতরাং বুঝা গেল দর্শনক্রিয়াজন্য যে জ্ঞান হয়, তাহা দেখিবার কারণ বা উপায় স্বরূপ চক্ষু এবং দর্শনীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

দর্শনক্রিয়াবিষয়ক এই যেমন দৃষ্টান্ত, দর্শনশাস্ত্রজন্যজ্ঞানেও সেই ব্যাপার ঘটে। এজন্য দর্শনশাস্ত্রে উপায় ও উপেয় ভেদে অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয় ভেদে তাহার আলোচ্য বিষয় যে দুইটী হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাস্তবিকই, যদি আমরা নানা দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে প্রমেয় সম্বন্ধে যেমন তাহাদেব মতভেদ তদ্রূপ প্রমাণ সম্বন্ধেও তাঁহাদের মতভেদ বর্ত্তমান। যেমন চার্ব্বাক্ দর্শনে দেখা যায় উঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী, বৌদ্ধ দর্শনে দেখা যায় তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী মাত্র প্রমাণবাদী, ন্যায় চারি প্রকাব প্রমাণবাদী, সাঙ্খ্য তিন প্রকাব এবং বেদান্ত কোন মতে তিন এবং কোন মতে ছয়টী পর্য্যন্ত প্রমাণ স্বীকার করেন। সুতরাং দর্শনশাস্ত্র মাত্রেই যে প্রমাণ ও প্রমেয় ভেদে দুইটী বিষয় আলোচ্য হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা এই "শ্রীরামানুজ দর্শন" প্রবন্ধে এ পর্য্যন্ত প্রমাণ বিষয়ই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আমরা উহার প্রমেয় তত্ত্বটী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এককথায় পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এস্থলে এই মাত্র বলা ভাল যে, আচার্য্য রামানুজ মতের বেদান্ত শাস্ত্র, সাঙ্খ্যশাস্ত্রস্বীকৃত প্রত্যক্ষ অনুমান ও শাব্দ—এই তিনটী মাত্র প্রমাণবাদী, "ন্যায়" দর্শনের স্বীকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শাব্দ—এই চারিটী প্রসিদ্ধ প্রমাণ বা শাঙ্কর বেদান্তমতানুযায়ী প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শাব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি প্রভৃতি ছয়টী প্রমাণ উহা স্বীকার করেন না।

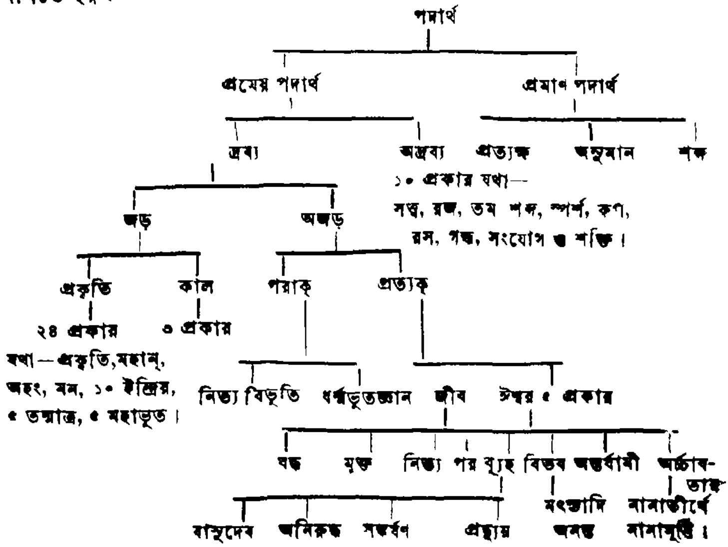
এইবার প্রকৃত বিষয় আরম্ভ করা যাউক। আচার্য্য রামানুজমতে এই প্রমেয় দ্বিবিধ যথা দ্রব্য ও অদ্রব্য। দ্রব্য আবার দ্বিবিধ যথা জড় ও অজড়। জড় আবার দুই প্রকার যথা প্রকৃতি ও কাল। প্রকৃতি ২৪ প্রকার যথা—১ প্রকৃতি স্বয়ংরূপ, ২ মহান, ৩ অহঙ্কার, ৪ মন, ৫ শ্রোত্র, ৬ ত্বক্, ৭ চক্ষু,

৮ জিহ্বা, ৯ ঘ্রাণ, ১০ বাক্, ১১ পাণি, ১২ পাদ, ১৩ পায়ু, ১৪ উপস্থ, ১৫ শব্দ-তন্মাত্র, ১৬ স্পর্শতন্মাত্র, ১৭ রূপতন্মাত্র, ১৮ রসতন্মাত্র, ১৯ গন্ধতন্মাত্র, ২০ আকাশ, ২১ বায়ু, ২২ তেজ, ২৩ অপ্, ২৪ পৃথ্বি। কাল তিন প্রকার যথা—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। অজড় দুই প্রকার যথা—প্রথম "পরাক্", দ্বিতীয় "প্রত্যক্"। "পরাক্" দুই প্রকার যথা—নিত্যবিভূতি ও ধর্ম্মভূতজ্ঞান। "প্রত্যক্" দুই প্রকার যথা—জীব ও ঈশ্বর। জীব তিন প্রকার যথা—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য।

ঈশ্বর পাঁচ প্রকার যথা—১ম পররূপ, ২য় ব্যূহ, ৩য় বিভব, ৪র্থ অন্তর্যামী, ৫ম অর্চ্চাবতার। পররূপ এক প্রকার। ব্যূহরূপ চারি প্রকার যথা—বাসু-দেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। অন্তর্যামী এক এবং অর্চ্চাবতার নানা যথা—শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গদেব, বেঙ্কটাচলে বেঙ্কটেশ ইত্যাদি।

অদ্রব্য দশ প্রকার যথা—১ম সত্ত্ব, ২য় রজঃ, ৩য় তমঃ, ৪র্থ শব্দ, ৫ম স্পর্শ, ৬ষ্ঠ রূপ, ৭ম রস, ৮ম গন্ধ, ৯ম সংযোগ, ১০ম শক্তি।

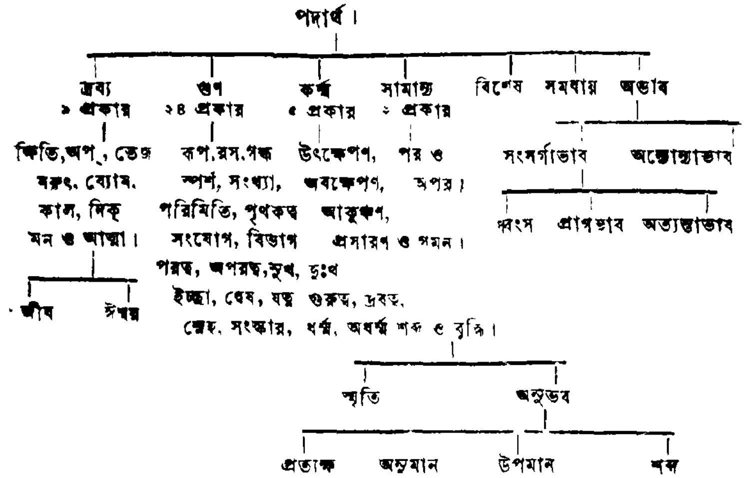
সহজে বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া নিম্নে ইহার একটী চিত্র অঙ্কন করা যাউক। রামানুজমতের এই পদার্থ বিভাগটী ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক, ইহা মনে থাকে না বলিয়া অনেক স্থলে আমাদিগকে অনেক ভুল করিয়া বসিতে হয়।



উপরে যাহা বলা হইল তাহা রামানুজদর্শনমতে পদার্থ বিভাগ মাত্র। ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ইহাদের লক্ষণ প্রভৃতি আলোচ্য। প্রমেয়ের প্রথম বিভাগ দ্রব্য এই :—দ্রব্য অর্থে রামানুজমতে উপাদান, যেমন ঘটের উপাদান মাটী, বস্ত্রের উপাদান সূত্র। এই উপাদান অর্থে এক কথায় অবস্থার আশ্রয়। যাহার অবস্থা আছে অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে অবস্থা শব্দটী প্রয়োগ করিতে পারা যায়, যেমন মাটীর কার্য্যাবস্থা ঘট, প্রাণীর বাল্য যৌবন প্রভৃতি, তাহাই উপাদান সুতরাং তাহাই দ্রব্য। সুতরাং দ্রব্য মানে উপাদান বা অবস্থার আশ্রয়।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, আমাদের এই প্রবন্ধগুলি একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। সেই গ্রন্থের নাম যতীন্দ্রমতদীপিকা এবং গ্রন্থকারের নাম শ্রীনিবাস দাস। গ্রন্থকার প্রমেয় পরিচ্ছেদের প্রথমেই একটী সংশয় উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিয়াছেন। সংশয়টী এই যে, নবন্যায়মতে যে প্রকারে পদার্থ বিভাগ করা হইয়াছে, উহা মহর্ষি গোতম ও মহর্ষি কণাদের যখন অভিমত, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া এপ্রকার বিভাগ অবলম্বনের প্রয়োজন কি? অবশ্য এ সংশয়টী এস্থলে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সাধারণের মনে যে উদয় হইবার মত সংশয়, তাহা বলা চলে না। ইহা ভারতীয় প্রাচীন রীতিতে শিক্ষিত ব্যক্তির মনে সহজে উদয় হইতে পারে, কিন্তু ইদানীন্তন শিক্ষিত ব্যক্তির মনে যে অবশ্যই উদয় হইবে তাহা বলা যায় না। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি একবার উক্ত মহর্ষিদ্বয়ের মত জানিতে পারিয়াছেন তাঁহার মনে এ সংশয় উদয় না হইয়া যাইতে পারে না। পদার্থ বিভাগ সম্বন্ধে নব্যন্যায়ানুযায়ী সিদ্ধান্তটী মনে হয় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

পরন্তু এই সংশয়টী বুঝিতে হইলে অগ্রে নব্যন্যায়মতে পদার্থ বিভাগটী জানা আবশ্যক। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে উহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করা গেল।



এই ন্যায়মতে পদার্থ সাত প্রকার যথা :—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। আমাদের যত রকমের জ্ঞান হয় বা হইতে পারে তাহা এই সাত রকমের কোন না কোন একটী বা ইহার কোন একটীর অন্তর্গত এবং যে কোন বিষয় আমাদের জ্ঞানগোচর হয় তাহার এই সাতটী পর্য্যন্ত দিকই থাকিতে পারে। এই সাত প্রকার পদার্থ এমন কৌশলক্রমে নির্ণীত হইয়াছে যে, ইহার দ্বারা জগতের তুচ্ছ তৃণটী হইতে সমগ্র জগৎ এবং তদতীত যদি কিছু থাকে ত সমুদায়েরই ব্যবহারোপযোগী যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, এবং অন্তিমে অক্ষয় অমৃত পর্য্যন্ত লাভ হয়। ইহা ব্যতীত মানুষ কিছু ভাবিতে বা বুঝিতেই পারে না। যে যাহা যে রকমেই জানুক ও বুঝুক মহর্ষি কণাদের পদার্থতত্ত্ব তাহার মূলে অবস্থিত থাকিবেই থাকিবে। এইবার আমরা এই কথাটী বুঝিবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি।

মনে করা হউক, একজন ব্যক্তি আমার সম্মুখে একটা কিছু আনিয়া ধরিল। ধরিবামাত্র আমার মনে কি হইল? আমি উহা দেখিলাম, দেখিবামাত্র আমি উহাকে অবশ্যই "একটা কিছু" বলিয়া বুঝি। তাহার পর "উহা কি" তাহা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই। "উহা কি" নির্ণয় করার অর্থ, "উহা কাহার মত" উহা কোন্ জাতীয় পদার্থ, ইহা অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিটী হইবামাত্র উহার এক রকম আকৃতি, বর্ণ, এবং উহা স্থির বা চঞ্চল প্রভৃতি, এককথায়—উহার গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি আমরা জানিয়া ফেলি। এই গুণ ক্রিয়া প্রভৃতি

নির্ণীত হইলে ইহা কাহার মত বা কোন্ জাতীয় পদার্থ তাহা স্থির করিয়া থাকি। তাহার পর এই গুণ ক্রিয়া প্রভৃতি বুঝিবার সময় ইহার সঙ্গে ইহার গুণ ও ক্রিয়ার যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহাও আমরা মনে মনে স্মরণ করি বা দেখিয়া লই। কারণ যে গুণ ও কর্ম্ম ইহার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে না থাকে, তাহাকে কখনই ইহার গুণ বা কর্ম্ম বলিতে আমরা সম্মত হইতে পারি না। এই কার্য্যটী আমরা সকলেই একপ্রকার অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাকি, ইহাকে আমরা কেহই লঙ্ঘন করিয়া যাই না। তাহার পর ইহা কাহার মত বা ইহার জাতিজ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটী নিজত্ব বা বিশেষত্ব আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। অবশ্য ইহাও যে সকল সময় আমাদের মনোমধ্যে স্পষ্টভাবে উদয় হয়, তাহা নহে, পরন্তু ইহা না হইলে কোনও কিছুরই নিজত্ব বলিয়া একটা বোধ জন্মে না। এজন্য স্পষ্ট ভাবেই হউক বা অস্পষ্ট ভাবেই হউক, সকল বিষয়েরই এদিকটা এই সময় উদয় হইয়া যায়। তাহার পর ইহা "এখানে ছিল না আসিল" এই বোধ এবং ইহার পর অপরের সঙ্গে ইহার যে ভেদ তাহাও আমরা জানিতে থাকি। এইরূপে উক্ত বস্তুটী সম্বন্ধে এতগুলি জিনিষ না বুঝিয়া আমরা ক্ষান্ত হই না। এখন যদি এই বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে দেখিব যে উক্ত বস্তুটীর সম্বন্ধে একটা পূর্ণজ্ঞান হইবার মধ্যে উহাকে সাত রকমেই আমরা জানিয়াছি। যথা :—ইহা যে একটা কিছু ইহাতে ইহার দ্রব্যত্ব অংশ বুঝিয়াছি। ইহার গুণ এই, (যথা, রূপ আকৃতি প্রভৃতি) ইহার কর্ম্ম এই বলায় ইহাতে ইহার গুণ ও কর্ম্ম এই দুইটী দিক দেখিয়াছি। ইহারই গুণ কর্ম্ম বলায় ইহার সহিত ইহার গুণ কর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধটীর প্রতি দৃষ্টি করিয়াছি, এই সম্বন্ধের নাম সমবায়। ইহার সহিত এতজ্জাতীয় অপরের যে আমূল পার্থক্য তাহা যখনই বুঝিয়াছি তখনই "বিশেষ" নামক পদার্থটী লইয়া আমরা তাহা বুঝিয়াছি। ইহা এই—ইহা এই নহে, ইহা এখন বর্ত্তমান, কোন সময়ে ইহা ছিল না বা থাকিবে না, এই গুলি যখন বুঝি তখনই আমরা অভাব পদার্থটী দ্বারাই তাহা বুঝি। সুতরাং একটী কোন কিছু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইতে গেলেই আমাদের এই সাতটী পদার্থ আবশ্যক হয়, ইহা ব্যতীত কাহারও কোনও কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ যদি কেহ আমার নিকট নীল এই গুণ বাচক শব্দটী উচ্চারণ করে তাহা হইলেও আমি ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্রব্য কর্ম্ম প্রভৃতি অপর ছয়টী পদার্থ দ্বারাই তাহার বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করি। কারণ নীল শব্দটী শুনিবামাত্র আমার মনে, ইহা

যে কাহারও আশ্রিত ধর্ম্ম তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। যাহার আশ্রিত তাহা আমার মনে দ্রব্য জ্ঞান উৎপাদন করিয়া দেয়। তৎপরে উহা নীল ইহা যখনই নির্ণয় হয় তখনই পূর্ব্বের দ্রব্যের ন্যায় সামান্য বিশেষ প্রভৃতি অপর পদার্থগুলিও আমাদের মনোমধ্যে উদয় হয়। এইরূপে কর্ম্মজ্ঞান হইবার সময়ও ঠিক ঐ ব্যাপার ঘটে। সামান্য বিশেষ প্রভৃতি অপর চারিটী পদার্থ সম্বন্ধে একটু অন্যথা ঘটে পরন্তু তাহা এস্থলে আর আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করি না, এ বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থখানি কোনও চিন্তাশীল অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক এই সাতটী পদার্থের যতটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতেই বুঝা যায় যে ইহা ব্যতীত কোনও কাজই চলে না। জগতে ব্যবহার করিতে হইলে, জগতে জীবিত থাকিতে হইলে, ইহা আমাদের একান্ত অবলম্বন হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ইহা জানে সেও যেমন ইহার ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি ইহার বিষয় অজ্ঞ সেও ইহার তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পদার্থ বিভাগ একটী যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক বিভাগ। এখন দেখা যাউক রামানুজমতে এমতের সহিত কেন অনৈক্য ঘটিল।

রামানুজ বলেন বৈশেষিকের পদার্থ বিভাগ যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে করুক, আমরা অন্য পথে যাইয়া জীবের পরম অভিষ্ট লাভের একটী সহজ উপায় আবিষ্কার করিতে পারি। (পূর্ব্বচিত্র দ্রষ্টব্য) দেখ বৈশেষিকমতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টী ও নব্যনৈয়ায়িকমতে অভাব সহিত সাতটী পদার্থ স্বীকার করা হয় কিন্তু দ্রব্য ও অদ্রব্য বলিলেই ত দ্রব্য ভিন্ন উক্ত গুণকর্ম্মগুলি ত অদ্রব্যের মধ্যে আপনাআপনি আসিয়া পড়ে, সুতরাং দ্রব্য ভিন্নকে অদ্রব্যের মধ্যে ফেলা যুক্তি সঙ্গত এবং প্রথমতঃ দ্রব্য ও অদ্রব্য এই দুইটী দ্বারা পদার্থ বিভক্ত হওয়া উচিত। তাহার পর বৈশেষিক মতে কর্ম্ম সামান্য, বিশেষ ও সমবায়কে এক একটী পদার্থ বলা হয়, ইহারই বা প্রয়োজন কি? কারণ বৈশেষিকের উৎক্ষেপন, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন রূপ পাঁচ প্রকার কর্ম্মই আমাদের এক সংযোগ পদার্থের দ্বারা সিদ্ধ হয়। যে হেতু উক্ত পাঁচ প্রকার কর্ম্মই একটীর সহিত সংযোগ ও অপরটীর সহিত বিয়োগ ভিন্ন আর কি? ঊর্দ্ধে ফেলার নাম উৎক্ষেপণ, দেখ যাহাকে ঊর্দ্ধে ফেলা হয় তাহা অধোদেশ হইতে বিযুক্ত ও ঊর্দ্ধদেশে সংযুক্ত হইতেছে কি না? এই রূপ অন্যত্র। সুতরাং সংযোগের দ্বারাই কর্ম্ম বুঝাইয়া যায়। তাহার পর

বৈশেষিকমতে একটী জাতি স্বীকার করা হয়, কিন্তু ইহা বস্তুতঃ কি ভাব দেখি? দ্রব্যের যে আকার বা সংস্থান তাহাই কি জাতি নহে? যদি সর্প দেখিবা মাত্র মনে মনে জগতের যত সর্পের একটা সাধারণ "রূপ" প্রত্যক্ষের পর সর্প জ্ঞান হয় বলিয়া ঐ সাধারণ জ্ঞানটাই জাতিবোধক হয় বল তাহা হইলে, বল দেখি, ঐ সাধারণ জ্ঞানটা কি সর্পের আকৃতির জ্ঞান নহে? উহা যদি সর্পের মত লম্বা না হইয়া চতুষ্কোণ পদার্থ হইত, তাহা হইলে কি উহার দ্বারা সর্পের জ্ঞান হইত? কখনই নহে, সুতরাং বলিতে হইবে সর্পজাতি সর্পের আকৃতি বা সংস্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সংস্থান দ্রব্যেরই ধর্ম্ম, ইহাকে দ্রব্য হইতে পৃথক বলিয়া স্বীকারের কোন প্রয়োজনই নাই। তাহার পর সমবায়কে বৈশেষিকমতে একটী পদার্থ বলা হয়, ইহার অর্থ দ্রব্যের সহিত কর্ম্ম বা গুণের নিত্যমিলিত সম্বন্ধ অথবা অংশের সহিত অংশীর নিত্যমিলিত সম্বন্ধ। এখন দেখ ইহাকে যদি পদার্থ বলা হয় তাহা হইলে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য এই যে এই সমবায়ের সহিত দ্রব্যের কি সম্বন্ধ? উত্তরে বলিতে হইবে যে ইহার সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ তাহাও সমবায় সম্বন্ধ, এই-রূপে সেই সমবায়ের সম্বন্ধও আবার জিজ্ঞাস্য হইবে, সুতরাং এপ্রশ্নের আর শেষ হইতে পারিতেছে না, অগত্যা ইহাকে দ্রব্যের স্বভাবের মধ্যে গণ্য করিয়া উক্ত অনবস্থা দোষের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই ভাল। আমরা ইহাকে এ জন্য সংযুক্ত বিশেষণ নাম দিয়া থাকি, ইহাকে আর পদার্থান্তর বলি না। এইরূপে বিশেষ পদার্থও জীব-ঈশ্বর প্রভৃতি দ্রব্যেরই স্বভাব বলা যাইতে পারে, কারণ ঈশ্বর ও জীবে বস্তুগত কোন ভেদই নাই, জীবগত অণুত্ব ও ঈশ্বরগত বিভুত্বই ইহাদের ভেদ, এবং ইহারা জীব ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে জীব ঈশ্বর ভাবই থাকিতে পারে না সুতরাং উক্ত বিশেষকে দ্রব্যের স্বভাব বলিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাহার পর অবশিষ্ট রহিল গুণপদার্থ ও অভাবপদার্থ। এই গুণ ও অভাব পদার্থদ্বয়ের মধ্যে গুণপদার্থটী আমাদের ও স্বীকার্য্য কিন্তু তাই বলিয়া আমরা উহাকে বৈশেষিকমতের ২৪টী বিভাগে বিভক্ত করি না। উহাকে আমরা প্রকৃতি দ্রব্যের সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ নামক তিন গুণে এবং পঞ্চ মহাভূতের শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ নামক পাঁচটী গুণ ও সংযোগ নামক এক গুণে বিভাগ করি। ইহার কারণ আমরা যাহারই যে কোন গুণ উপলব্ধি করি তাহা রূপ, রসাদি উক্ত ৯টী গুণ ভিন্ন কিছুই নহে। বৈশেষিকের সংখ্যা পরিমিত প্রভৃতি সব গুণগুলিই এই ৯টী গুণের রূপান্তর

মাত্র। সুতরাং বৈশেষিকের গুণ আমাদের অভিমত নহে। তাহার পর অভাব পদার্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমরা আমাদের অভিমত বলিয়াছি। উহা ভাবপদার্থেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। যেমন চারিপ্রকার অভাবের মধ্যে প্রাগভাব সম্বন্ধে যদি ভাবিয়া দেখা যায় তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যায় উহা কার্য্যপদার্থের পূর্ব্বাবস্থাপরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখ ঘট উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যে অভাব তাহাকেই যদি প্রাগভাব বলা হয় তাহা হইলে ঘটের কারণ মৃত্তিকাবস্তুর ঘটাকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে যে অবস্থাপরম্পরা তাহাই কি তাহা হইলে বৈশেষিকের প্রাগভাব হইল না? এইরূপ ধ্বংসও উক্তকালীন অবস্থাপরম্পরা কে বুঝায়। অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাবদ্বয়ও তদ্রূপ অন্য কোন ধর্ম্মি বস্তুর স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ অত্যন্তাভাবের লক্ষণ দ্বারা এই মাত্র বুঝায় যে, যদি কেহ বলে "এস্থলে ঘট নাই" তাহা হইলে আমাদের মনে যে অভাবের জ্ঞান হয় তাহাই অত্যন্তাভাব। এখন দেখ ইহাতে কি বুঝাইল? এখানে ঘট নাই বলায় কি এই বুঝায় না, যে, এস্থলে অন্য কিছু রহিয়াছে, অথবা ঘট যে স্থানটীতে থাকিতে পারিত সেই স্থানটী মাত্র রহিয়াছে? সুতরাং এই অত্যন্তাভাব বলিতে অন্য কোন বস্তুর স্বরূপই বুঝায়, অভাব নামক একটী "পৃথক্" পদার্থ বুঝায় না। অন্যোন্যাভাবও এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব বলিতে পারা যায় বৈশেষিকের পদার্থ বিভাগের ফল আমাদের পদার্থ বিভাগ মধ্যেও পাওয়া যায়, বরং তাহাতে শক্তি পদার্থ স্বীকার না করায় যে দোষ হয়, তাহা আমাদের মত হয় না।

শক্তি পদার্থ স্বীকার সম্বন্ধে নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক এবং বৈদান্তিকের মধ্যে তুমুল বিচার হইয়া গিয়াছে। ইহা যেমনই কৌতূহলপূর্ণ তেমনই প্রয়োজনীয়, দুঃখের বিষয় বঙ্গভাষায় এসব কথা এতই অল্প আলোচিত হয় যে, প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলিবার চেষ্টা করা বৃথা পরিশ্রম মাত্র বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ শক্তি পদার্থ স্বীকারে রামানুজ বা বৈদান্তিক মতের সূক্ষ্ম দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কৌতূহলী পাঠক এ সম্বন্ধে যদি জানিতে চাহেন তাহা হইলে বেদান্ত গ্রন্থের মধ্যে চিৎসুখী নামক গ্রন্থ এবং ন্যায় মতের গ্রন্থের মধ্যে চিন্তামণি গ্রন্থের টীকা গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে পারেন।

যাহা হউক উপরিউক্ত বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদের গ্রন্থকার শ্রীনিবাস দাস রামানুজমতের পদার্থ বিভাগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া ক্রমে উহার লক্ষণ প্রভৃতি নানা দার্শনিক কথার অবতারণা করিয়াছেন। আমরা

আগামী বারে উহা আলোচনা করিব। এক্ষণে যাহা অবলম্বন করিয়া এত কথা লিখিত হইল তাহার অনুবাদ এই,—

"প্রমাণ নিরূপণ করিয়া প্রমেয় নিরূপণ করা যাইতেছে।—যাহা প্রকৃষ্টরূপে 'মেয়' তাহাই প্রমেয়। তাহা আবার দ্বিবিধ যথা দ্রব্য ও অদ্রব্য। দ্রব্য অর্থ উপাদান, আর অবস্থার যাহা আশ্রয় তাহাই উপাদান।"

"আচ্ছা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই সাতটী পদার্থ মতান্তরে যখন পরিগণিত হইয়া থাকে তখন দ্রব্য অদ্রব্য ভেদে পদার্থকে দুইপ্রকার কি করিয়া বলা যাইতে পারে? বলিতেছি—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ভেদে কর্ম্ম পাঁচ প্রকার বলিলে গৌরব দোষ হয়, এজন্য চলনাত্মকই কর্ম্ম বলিলে এগুলি সবই বুঝাইয়া যায়। পরন্তু তাহাও আবার সংযোগ পদার্থ স্বীকারে উৎপন্ন হয়। ঐরূপ সংস্থানই জাতি, এজন্য সংস্থান অতিরিক্ত 'সামান্য' পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। সমবায়েরও সমবায় স্বীকার করিতে হয় বলিয়া অনবস্থা দোষ ঘটে, এবং তাহাও সংযুক্ত বিশেষণ দ্বারা উপপন্ন হয়। জীব ও ঈশ্বরের অণুত্ব ও বিভুত্বাদি রূপ বিভাজক ধর্ম্ম স্বীকার করিলেই যখন 'বিশেষ' পদার্থের কার্য্য সিদ্ধ হয় তখন 'বিশেষ' নামক কিঞ্চিৎ পদার্থ অঙ্গীকারেরই বা প্রয়োজন কি? এজন্য, 'কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়কে' দ্রব্য হইতে পৃথক বলিয়া অঙ্গীকার না করিয়া 'পদার্থ'কে দ্রব্য ও অদ্রব্য এই দুই বিভাগে বিভক্ত করাই ভাল"।

"আর ইহার দ্বারাই অভাবের সপ্তম পদার্থত্বও নিরস্ত করা হইল। কারণ অভাব বলিলেই ভাবান্তরের রূপ বুঝায়। প্রাগভাব বলিতে পূর্ব্বাবস্থার পরম্পরা, প্রধ্বংসাভাব বলিতে উত্তরাবস্থাপরম্পরা বুঝায়। অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাবও অন্য ধর্ম্মী বস্তুরই স্বরূপ। ইহা প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। উপাদানই দ্রব্য ইহা বলা হইয়াছে, এজন্য গুণাশ্রয়ই দ্রব্য এই সামান্য লক্ষণও সম্ভব হয়।'

জৈনধর্ম্মের কিঞ্চিৎ পরিচয়।

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।] [শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৩)

উপদেশক্রম।

সম্যক্‌দর্শন, সম্যক্‌জ্ঞান এবং সম্যক্‌চারিত্র, এই তিনের একতাই মোক্ষ-মার্গ। সমস্ত উপদেশক জৈনগ্রন্থে এইরূপ বলিয়াছে। এই তিনগুণকে রত্ন-ত্রয়ও বলা হয়। সম্যক্‌দর্শনের লক্ষণ—"তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্দর্শনম্।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জীব অজীব প্রভৃতি সপ্ততত্ত্বকে যথার্থ শ্রদ্ধান করাকে সম্যগ্দর্শন বলে। সত্যার্থ (যথার্থ) দেব, শাস্ত্র এবং গুরুকে শ্রদ্ধা করাকেও সম্যগ্দর্শন বলে। বীতরাগ, সর্ব্বজ্ঞ, আগমের কর্ত্তা, সকলের হিতোপদেশক সেই পরমেশ্বরই সত্যার্থ দেব, শাস্ত্র,—সেই দেবকথিত পূর্ব্বাপর-বিরোধ-রহিত, কুমার্গখণ্ডন-কারক, তত্ত্বোপদেশ-সমষ্টি; বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া, নিরারম্ভ এবং পরিগ্রহরহিত হইয়া যিনি জ্ঞান, ধ্যান এবং তপশ্চরণে মগ্ন থাকেন, তিনিই সদ্‌গুরু।

এইপ্রকার সম্যগ্দর্শনপূর্ব্বক, সংশয়বিপর্য্যয়রহিত যথার্থ জ্ঞানকেই সম্যক্ জ্ঞান বলে। সম্যগ্দর্শন পূর্ব্বক ও সম্যক্ জ্ঞান পূর্ব্বক রাগদ্বেষপ্রভৃতি-রহিত পবিত্রাচরণকে সম্যক্ চারিত্র বলে।

সম্যক্ চারিত্র দুই প্রকার—সকল চারিত্র এবং বিকল চারিত্র। সকল চারিত্র সাধুদের জন্য, বিকল চারিত্র গৃহীদের জন্য। বিকল চারিত্রের বিশেষ বর্ণনা করা যাইতেছে।

উপযুক্ত সম্যগ্দর্শন এবং সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, যে গৃহী সম্যক্ চারিত্র পালন না করে, তাহাকে অব্রতসম্যক্‌দৃষ্টি বলা হয়। গৃহী যখন চারিত্র পালন করিবেন, তখন তাহাকে শ্রাবক বা দেশব্রতী বলা হইবে। দেশব্রতী বলার উদ্দেশ্য, সে পূর্ণরূপে ব্রত পালন করিতে পারেনা, আংশিক পালন করে। দেশ-ব্রতী শ্রাবকের একাদশ শ্রেণী। গৃহী স্বকীয় চারিত্রের উৎকর্ষের দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে থাকে। জৈনগ্রন্থে শ্রেণীকে প্রতিমাও বলে।

প্রতিমা—(১) দর্শন প্রতিমা, (২) ব্রত প্রতিমা (৩) সামায়িক প্রতিমা (৪) প্রোষধ প্রতিমা (৫) সচিত্ত-ত্যাগ প্রতিমা (৬) দিন-মৈথুন-ত্যাগ ও রাত্রি-ভুক্তি-ত্যাগ প্রতিমা (৭) ব্রহ্মচর্য্য প্রতিমা (৮) আরম্ভ-ত্যাগ প্রতিমা (৯) পরিগ্রহ-ত্যাগ প্রতিমা (১০) অনুমতি-ত্যাগ প্রতিমা (১১) উদ্দিষ্ট-ত্যাগ প্রতিমা।

১। দর্শন প্রতিমা—সম্যক্ দর্শনকে পঞ্চবিংশতি দোষ রহিত করা এবং দ্যূত ক্রীড়া, মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান, বেশ্যারমণ, শিকার, চৌর্য্য, পরস্ত্রীসেবন এই সপ্তব্যসন পরিত্যাগ করা—এই প্রথম শ্রেণী।

২। ব্রত প্রতিমা—এই শ্রেণীতে পাঁচ অনুব্রত, তিন গুণব্রত, চারি শিক্ষাব্রত, মোট বার ব্রত নিরতিচার (নির্দ্দোষ ভাবে) পালন করিতে হয়।

পাঁচ অনুব্রত।

(১) অহিংসাণুব্রত।—সংকল্পিত হিংসার ত্যাগ, অর্থাৎ জানিয়া বুঝিয়া ত্রস জীবকে (জঙ্গম জীবকে)* হিংসা (বধ) স্বয়ং না করা এবং অন্য দ্বারা না করান—ইহার নাম অহিংসাণুব্রত। এই অহিংসাণুব্রতের পঞ্চ অতীচারও (সামান্য ত্রুটি) ত্যাগ করিতে হয়, পঞ্চ অতীচার—(ক) কোন জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভঙ্গ করা, (খ) রশি দ্বারা বন্ধন করা, (গ) যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা প্রহার ও তাড়না করা, (ঘ) কোন জীবকে শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করান (ঙ) এবং উহার পানভোজনের কাল উল্লঙ্ঘন করা এবং একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া।

(২) অসত্য ত্যাগ অর্থাৎ সত্যাণুব্রত, ইহারও পঞ্চ অতীচার আছে। পঞ্চ অতীচার—(ক) পরের দোষ বলা (খ) পরের গুপ্ত কথা প্রকাশ করা (গ) পরের পৈশুন্য ও নিন্দা করা (ঘ) মিথ্যা খতপত্র লিখন (ঙ) ন্যাস (গচ্ছিত ধন) অপহরণ।

(৩) অচৌর্য্যাণুব্রত—অন্যের রক্ষিত, পতিত, বিস্মৃত, দ্রব্য অপহরণ না করা। পঞ্চ অতীচার—(ক) চুরির উপায় প্রকাশ করা (খ) চুরির পদার্থ গ্রহণ (গ) রাজাজ্ঞার উল্লঙ্ঘন (ঘ) ক্রয় বিক্রয় করিবার তারাজু, বাটখারা, গজ প্রভৃতি ন্যূন কিংবা অধিক রাখা (ঙ) বেশী দামের জিনিষ অল্প মূল্যের জিনিষ মিশাইয়া বেশী দামের জিনিষ বলিয়া বিক্রী করা।

---

* জীব দুই প্রকার—ত্রস এবং স্থাবর। এক ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবকে স্থাবর বলে। একাধিক-ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবকে ত্রস বলে।

(৪) পরস্ত্রীসেবন-ত্যাগানুব্রত—ইহার অপর নাম স্বদারসন্তোষ। পঞ্চ অতীচার—(ক) পরকে বিবাহিত করান (খ) অনঙ্গ ক্রীড়া (গ) অশ্লীল বচনোচ্চারণ (ঘ) কাম সেবনে অতিশয়ানুরাগ (ঙ) ব্যভিচারিণী এবং কুটনীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা।

(৫) পরিগ্রহ পরিমাণ—যে যে পদার্থ স্বকীয় ভোগোপভোগে আইসে, সে সকল পদার্থের পরিমাণ করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী রাখিয়া তাহা হইতে অতিরিক্ত পদার্থের ত্যাগ করা এবং আয় অপেক্ষা ব্যয় না করা, ইহাকে পরিগ্রহ পরিমাণানুব্রত বলে। ইহার পঞ্চ অতীচার—(ক) অনাবশ্যক অতিবাহন (ঘোড়া, পাল্কী ইত্যাদি) রাখা (খ) অনাবশ্যক পদার্থের অধিক সংগ্রহ করা (গ) অন্যের বৈভব দেখিয়া হিংসা করা (ঘ) অধিক লোভ রাখা (ঙ) পশু প্রভৃতির উপর অধিক ভার চাপান।

এই প্রকার মদ্য, মাংস এবং মধু এই তিন পদার্থ ত্যাগ করিলে শ্রাবকের অষ্ট মূল গুণ হয়।

পঞ্চানুব্রতের অতীচার ত্যাগ না করিতে পারিলেও ব্রত ভঙ্গ হয় না, ধৌত বস্ত্রে কালো দাগের ন্যায় চারিত্র সমল হয়, যদি কোনো দোষ না থাকে তবেই নির্মল। পঞ্চাণুব্রতের পর তিনগুণ ব্রত পালন করিতে হয়।

তিনগুণ ব্রত।

তিনগুণ ব্রত—দিগ্‌ব্রত, অনর্থদণ্ড ব্রত এবং ভোগোপভোগ-পরিমাণ ব্রত।

(১) দিগ্‌ব্রত—পূর্ব্ব-পশ্চিমাদি দশদিকে জীবনে যত দূর পর্য্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন হইতে পারে, সেই পরিমাপে গণ্ডী কাটিয়া গণ্ডীর বাহিরে না যাওয়া ও যাবজ্জীবনের জন্য এরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা। ইহার পঞ্চ অতীচার—বিস্মরণ হইয়া গণ্ডীর বাহিরে, অর্থাৎ উর্দ্ধ (ক) অধ (খ) তির্য্যক্ (গ) গমন করা। ক্ষেত্র-মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা (ঘ) এবং ক্ষেত্র-মর্য্যাদা ভুলিয়া যাওয়া (ঙ)।

(২) নিজের কোন উপকারাপকার না হইলেই, অন্যকে পাপের উপদেশ দেওয়া, হিংসাকারক শস্ত্রাদি উপকরণের দান করা, কুবিষয়ের চিন্তা করা, কু-কথা কুবার্ত্তা প্রভৃতির পঠন শ্রবণ, এবং প্রমাদরূপ প্রবৃত্তি (বিনা প্রয়োজনে কাজ)—এই পঞ্চপ্রকার অনর্থদণ্ড হইতে বিরত হওয়াকে অনর্থ-দণ্ড-বিরতি ব্রত বলে। পাঁচ অতীচার—(ক) অশ্লীল বচন ব্যবহার করা, (খ) অশ্লীল চিত্রাঙ্কণ এবং শরীর সম্বন্ধে অশ্লীল হইতে চেষ্টা করা (নগ্ন হওয়া ইত্যাদি)

(গ) ব্যর্থ প্রলাপ করা, (ঘ) অনাবশ্যক ভোগ-সামগ্রীর সংগ্রহ করা, (ঙ) কার্য্যের আন্দাজ না করিয়া কার্য্য সম্পাদন করা।

(৩) ভোগোপভোগ-পরিমাণ ব্রত। অন্ন জল, গন্ধ, পুষ্প প্রভৃতি ভোগ্য (যাহা একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়) পদার্থের এবং বস্ত্রাভূষণ, গৃহ, তোষক, বাহন প্রভৃতি উপভোগ্য (যাহা বহুবার ব্যবহৃত হয়) পদার্থসমূহের পরিমাণ করা এবং অনুপভোগ্য ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ পদার্থসমূহ ত্যাগ করাকে ভোগোপ-ভোগপরিমাণগুণ ব্রত বলে। বিষয়ভোগের বাসনাকে আদর করা, পূর্ব্ব-কালের ভুক্ত বিষয়ের স্মৃতি, বিষয়ভোগে অতিশয় অনুরক্তি, ভাবী বিষয় সেবন করিবার অতিশয় তৃষ্ণা রাখা, এবং কার্য্যতঃ বিষয় ভোগ না করিয়াও বিষয় ভোগ করিতেছি এরূপ অনুভব করা—এই পাঁচ অতীচার ত্যাগ করিলে নির্দ্দোষ ভোগোপভোগ পরিমাণ ব্রত পালন করা যাইতে পারে।

চারি শিক্ষাব্রত।

দেশাবকাশিক, সাময়িক, প্রোষধোপবাস এবং বৈয়াবৃত্য (দান) এই চারি ব্রতের নাম শিক্ষাব্রত।

(১) দেশাবকাশিক শিক্ষাব্রত—দিগ্‌ব্রতে যে যে মর্য্যাদার কথা বলা হইয়াছে, সেই যাবজ্জীবন মর্য্যাদার ভিতরে আবার কোন নদী, দেশ, পর্ব্বত, বাজার, হাট, গলী প্রভৃতির নির্দ্দেশে সঙ্কুচিত মর্য্যাদা করিয়া, অর্থাৎ আর একটি ছোট গণ্ডী কাটিয়া, বর্ষ, ঋতু, অয়ন, মাস, চতুর্ম্মাস, পক্ষ, দিন প্রভৃতি পরিমিত অল্প কালের জন্য সেই গণ্ডীর মর্য্যাদা রক্ষা করাকে দেশাবকাশিকব্রত বলে। ইহার পঞ্চ অতীচার—(ক) মর্য্যাদার বাহিরে কাহাকেও পাঠান, (খ) বাহির হইতে কোন পদার্থ আনয়ন করা, (ঘ) মর্য্যাদার বহিঃস্থিত ব্যক্তিকে দৈহিক ইঙ্গিতে কোন-কিছুর সূচনা করা (ঙ) মর্য্যাদার বাহিরে পাথর, ঢেলা নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কেত করা।

(২) সামযিক শিক্ষাব্রত—প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সন্ধ্যাকাল এই তিন সময়ে এক মুহূর্ত্ত, দুই মুহূর্ত্ত, কিংবা তিন মুহূর্ত্তকাল * উপবিষ্ট হইয়া কিংবা দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে, রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর গুণ স্মরণ করা, ধর্ম্মপুস্তকের স্বাধ্যায় করা এবং ধ্যান করাকে সামযিক শিক্ষাব্রত বলে। সামযিক উপবিষ্ট হইয়া ছয় কর্ম্ম করা যায়—(ক) আপন হাতে যে কিছু

* ৪৮ মিনিটে এক মুহূর্ত্ত হয়।

দুষ্কৃত্য হইয়া থাকে, কাহাকেও যদি কটুবাক্য বলা হইয়া থাকে, মনে মনে যদি কাহারো অশুভ চিন্তা করা হইয়া থাকে—সেই সকল স্মরণ করিয়া মুখে উচ্চারণ করিয়া পশ্চাত্তাপ করাকে প্রতিক্রমণ কর্ম্ম বলে। (খ) পুনর্ব্বার এ সকল পাপ আর করিব না, এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করাকে প্রত্যাখ্যান কর্ম্ম বলে, (গ) সামযিকব্রত দ্বারা অন্তর শুদ্ধ হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা একটী মহৎ প্রায়শ্চিত্ত। (ঘ) জিনেন্দ্র ভগবানের গুণস্তব করা (ঙ) চারিদিককে তিন তিন বার নমস্কার করা (চ) শরীরের প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়া কার্য্যে উৎসর্গ করা। এই সাময়িক ছয়ক্রিয়াকে ষড়াবশ্যক ক্রিয়াও বলে সাময়িক ব্রতের পাঁচ অতীচার আছে। মন, বচন কায়ের একাগ্রতা না রাখা, সাময়িক উৎসাহপূর্ব্বক না করিয়া অনাদরপূর্ব্বক করা, সাময়িক কর্ম্মের আবশ্যক ক্রিয়া এবং পাঠ বিস্মৃত হইয়া যাওয়া। এই অতীচার রহিত করিতে পারিলে সাময়িক শিক্ষাব্রত নির্দ্দোষ হইয়া থাকে।

(৩) তৃতীয় শিক্ষাব্রত—প্রোষধোপবাস। প্রত্যেক অষ্টমী চতুর্দ্দশী, এই পর্ব্বতিথির দিবসে উপবাস অথবা একাশন (প্রোষধ) করিয়া অহোরাত্র এক জায়গায় বসিয়া ধর্ম্মপুস্তকের বচন শ্রবণ এবং বৈরাগ্য চিন্তা করিতে করিতে তিথি যাপন করাকে প্রোষধোপবাস বলে, ইহার পঞ্চ অতীচার:—(ক) না দেখিয়া না ঝাড়িয়া চাটাই কুশাসন কি সতরঞ্চী বিছান (খ) ভাল করিয়া না দেখিয়া সে স্থানে মলমূত্র ক্ষেপন করা, (গ) ভাল করিয়া না দেখিয়া কোন স্থান হইতে উপকরণাদি গ্রহণ করা (ঘ) আবশ্যক ক্রিয়াতে অনাদর করা, (ঙ) শাস্ত্র পঠন শ্রবণাদি আবশ্যক ক্রিয়ার বিস্মৃতি।

(৪) চতুর্থ শিক্ষাব্রত—দান (বৈয়াব্রত) ইহাকে অতিসংবিভাগও বলে। যোগ্য পাত্রকে আহার দান, ঔষধ দান, অভয়দান এবং জ্ঞান দান করা অর্থাৎ যাহার যে বস্তু দরকার তাহাকে সেই বস্তু দান করিয়া সুখী করাকে দান বলে। যদি ইহা দ্বারা পাত্রের শরীরে আলস্য, প্রমাদ, উন্মত্ততা, রোগ, পাতক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে দান দান নামে অভিহিত হইবে না। এই জন্য দাতাকে বহু বিচার করিয়া দান করিতে হয়। ইহার পাঁচ অতীচার আছে, (ক) সচিত্ত (জীব সহিত) পাত্রে ভোজন সামগ্রী রাখিয়া দান করা, (খ) সচিত্ত পাত্রদ্বারা ঢাকিয়া দান করা (গ) স্বয়ং দান না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে আজ্ঞা দিয়া দান করান (ঘ) মৎসরবুদ্ধিপূর্ব্বক (দেখা দেখি প্রতিযোগিতাপূর্ব্বক) দানকরা। (ঙ) দানের উপযুক্ত সময় অতিক্রম করিয়া দান

করা। উক্ত দ্বাদশ প্রকার ব্রত তিন-শল্য-রহিত হইয়া ধারণ করাকে শ্রাবকের দ্বিতীয় প্রতীমা (শ্রেণী) বলা হয়, অর্থাৎ এই শ্রেণীর গৃহস্থকে শ্রাবক বা ব্রতী গৃহস্থ বলে।

তিনশল্য—মায়াশল্য, মিথ্যাত্বশল্য এবং নিদানশল্য। হৃদয়ে কপটতা প্রথিত রাখাকে মায়াশল্য বলে। মনে অযথার্থ শ্রদ্ধা পুঁতিয়া রাখাকে মিথ্যাত্বশল্য বলে।—এই ব্রতদ্বারা আমার অমুক ফল হউক, এইপ্রকার আশা মনে মনে অঙ্কিত করিয়া রাখাকে নিদানশল্য বলে।

ব্রতীশ্রাবকের মরণ সময়ে সল্লেখনা* করিতে হয়। সল্লেখনার বিধি—এখন আমি বাচিব না, আমার মৃত্যু অতি নিকটে, এইরূপ নিশ্চিত হইলে, ইষ্ট, মিত্র, স্ত্রী-পুত্রাদির উপর মমতা ছাড়িয়া দিবে এবং যে শত্রু ছিল তাহার উপর দ্বেষভাব মুছিয়া ফেলিয়া, তাহাকে ডাকাইয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং নিজেও তাহার সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া দিবে। তার পর ঘর, দ্বার, বস্ত্র, গহনা প্রভৃতির মমতা ত্যাগ করিয়া কাহারও নিকট ঋণী থাকিলে, ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে। এই রূপ পরিশোধ করিয়া যদি কিছু থাকে তাহা পুত্র, স্ত্রী, সেবকদাসদাসী প্রভৃতিকে এবং ধর্ম্ম-কার্য্যের জন্য দিবে। তারপর নিজ জীবনে যে সকল কাজ করা হইয়াছে সমস্ত স্মরণ করিয়া মনে মনে বিচার করিবে এবং অনুচিত কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিবে। তারপর মৃত্যুর জন্য শোক, ভয়, হায়, তোবা প্রভৃতি বিলাপসূচক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শান্তচিত্ত হইয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবে। ক্রমশঃ আহার কমাইয়া, তৎপরিবর্ত্তে দুগ্ধ, তক্র পান করিবে, এবং পরে তক্রাদি ছাড়িয়া শুধু গরম জল পান করিবে, তারপর যখন মৃত্যুকে অতিশয় নিকটে, একবারে হাতের কাছে, বিবেচনা করে, তখন জলপানও ত্যাগ করিয়া উপবাসপূর্ব্বক পঞ্চ নমস্কার মন্ত্র† মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে শান্তপরিণামপূর্ব্বক (শুদ্ধচিত্ত হইয়া) প্রাণ ত্যাগ করিবে। ইহাকেই সল্লেখনা ব্রত এবং সন্ন্যাসমরণ বলে। ইহারও পাঁচ

---

* মরণ সময়ে শুদ্ধচিত্ত হওয়া।

† নমস্কার মন্ত্র—নমো অরহংতাণং। নমো সিদ্ধাণং। নমো আইরিয়াণং। নমো উবজ্‌ঝায়াণং। নমোলোএ সব্বসাহূণং।

ইহার ফল—এসো পংচ নমোক্কারো সব্বপাবপ্পণাসণং।

মংগলাণংচ সব্বেসিং পঢমং হোই মংগলং ॥ ১ ॥

অতীচার আছে—(ক) অধিক দিবস জীবিত থাকিবার বাঞ্ছা রাখা, (খ) শীঘ্র মরণের বাঞ্ছা করা, (গ) সুকৃত পুণ্যকার্য্যের পরিবর্ত্তে কোন প্রকার ফল প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখা (ঘ) দুঃখ এবং মৃত্যুকে ভয় করা (ঙ) মরিবার সময় প্রিয়পরিজনের স্মরণ করা। সল্লেখনা-পূর্ব্বক যাহার মৃত্যু হয় তাহার স্বর্গ কিম্বা মোক্ষেরও প্রাপ্তি হইতে পারে।

৩। সাময়িক প্রতিমা—শিক্ষাব্রতে যে সাময়িক ব্রতের উল্লেখ হইয়াছে তাহা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা এবং মধ্যরাত্রি এই চারি সময়ে প্রত্যেকবারে নির্দ্দোষ (নিরতীচার) ভাবে পালন করার নামই সাময়িক প্রতিমা।

৪। প্রোষধ প্রতিমা—শিক্ষাব্রতে যে প্রোষধোপবাসব্রতের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা নিরতীচার ধারণ করার নামই প্রোষধ প্রতিমা।

৫। সচিত্তত্যাগ প্রতিমা—এই শ্রেণীতে ফল, মূল, কন্দ, শাখা, বীজ, পুষ্প, প্রভৃতি সচিত্ত (জীব সহিত) পদার্থ অপক্ক ভক্ষণের ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ ঐ সকল পদার্থ গাছে পাকাইয়া অথবা অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া অচিত্ত করিয়া খাইতে হয়।

৬। দিনমৈথুনত্যাগ এবং রাত্রিভুক্তিত্যাগ প্রতিমা—এই শ্রেণীতে দিবসে মৈথুনত্যাগ এবং রাত্রিতে (সূর্য্যাস্তের পর) অন্ন, খাদ্য, লেহ্য, পেয় এই চারিপ্রকারের আহারের ত্যাগ করিতে হয়।

৭। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিমা—এই শ্রেণীতে স্বস্ত্রী-সেবনেরও ত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার কামচেষ্টার ত্যাগ করিতে হয়।

৮। আরম্ভ-ত্যাগ প্রতিমা—এই শ্রেণীতে ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, চাকরী প্রভৃতি সমস্ত আরম্ভের (যাহাতে জীবহিংসা হয়) ত্যাগ করিতে হয়।

৯। পরিগ্রহত্যাগ প্রতিমা—এই শ্রেণীতে ধনধান্যাদি বাহ্য পরিগ্রহের উপর মমতা ত্যাগ করিয়া সন্তোষবৃত্তি ধারণ করিতে হয়।

১০। অনুমতিত্যাগ প্রতিমা—এই শ্রেণীতে আরম্ভ, পরিগ্রহ, বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যে সম্মতিপ্রদানেরও ত্যাগ করিতে হয়।

১১। উদ্দিষ্টত্যাগ প্রতিমা—এই শ্রেণীতে গৃহ ত্যাগ করিয়া মুনির নিকট দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক এক কৌপিন, এক খণ্ড বস্ত্র, পিচ্ছিকা, কমণ্ডলু মাত্র ধারণ করিয়া মুনিবৎ তপশ্চরণাদি সমস্ত ক্রিয়া করিতে হয়।

এই প্রকার শ্রাবকের একাদশ শ্রেণী বা প্রতিমার বর্ণনা করা গেল। যে ব্যক্তি উচ্চ শ্রেণীর কোন ব্রত ধারণ করিবে, তাহাকে নিম্ন শ্রেণীর

ব্রতগুলিও পালন করিতে হইবে। এইরূপ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে হয়।

গৃহস্থের জন্য দৈনন্দিন ছয়টি অনুষ্ঠান আছে—ইজ্যা, বার্ত্তা, দত্তি, স্বাধ্যায় সংযম এবং তপ (১) প্রতিদিন দেব শাস্ত্র গুরুর পূজা করাকে ইজ্যা কর্ম্ম বলে। (২) অসি, মসি, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প এবং পশুপালন এই ছয়প্রকার জীবিকার মধ্যে কোন প্রকার জীবিকা অবলম্বন করাকে বার্ত্তা কর্ম্ম বলে, (ক) অসি—তলোয়ার বন্দুক প্রভৃতি শস্ত্রধারণ পূর্ব্বক রাজ্য ব্যবস্থা করা। (খ) লিখন পাঠনাদি কার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করাকে মসি বলে। (গ) কৃষি—ক্ষেত্র চাষ করিয়া ধান্যাদি উৎপন্ন করা (ঘ) বাণিজ্য—ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা (ঙ) শিল্প—কুম্ভকারের কাজ, কর্ম্মকারের কাজ, স্বর্ণকারের কাজ, বস্ত্রকারের কাজ, তন্তুবায়ের কাজ প্রভৃতি কাজের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা, (চ) পশুপালন—গো, মহিষ প্রভৃতি পশু পালন করিয়া জীবিকার্জ্জন করা। গৃহীকে এই প্রকারে ন্যায়পূর্ব্বক জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, অন্য কাহারো গলগ্রহ হইতে নাই। অসি-কার্য্যকর্ত্তা রাজন্যবর্গকে আত্মপালন (স্বকীয় দেশ রক্ষা) মতিপালন (বুদ্ধি নির্ম্মল রাখা) কুলপালন (রাজকুলের রক্ষা) প্রজাপালন অর্থাৎ পুত্রবৎ স্বকীয় প্রজার পালন করিতে হয়। (৩) চারিপ্রকারের দান করাকে দত্তি কর্ম্ম বলে। চারি প্রকারের দান—অভয় দান, আহার দান, বিদ্যাদান, এবং ঔষধ দান *। (৪) জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা অথবা উপদেশ দান করাকে স্বাধ্যায় কর্ম্ম বলে। (৫) পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনকে সংযম করাকে সংযম কর্ম্ম বলে। (৬) অনশনাদি দ্বাদশ কর্ম্ম করাকে তপঃ কর্ম্ম বলে।

এই সকল ব্যতীত গর্ভাধানাদি ত্রিপঞ্চাশৎ ক্রিয়াও গৃহস্থের জন্য "আদি পুরাণে" কথিত হইয়াছে। ইহাদের ভিতর কতিপয়ের বর্ণনা করা যাইতেছে—

১। গর্ভাধান ক্রিয়া—স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হইলে ষষ্ঠ দিবসে তাহাকে স্নানাদি করাইতে হয়, পরে পতির সঙ্গে দেব পূজা করিয়া রাত্রে সন্তানপ্রাপ্তির জন্য সহবাস করিতে হয়। ইহাকে গর্ভাধানক্রিয়া বলে। ঋতুকাল ব্যতীত অন্যকালে সহবাস করা অবিধেয়।

---

* কোন কোন আচার্য্য ঔষধদানকে অভয়দানের মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বসতিকাদান (ধর্ম্মশালা ইত্যাদি) বলিয়াছেন।

২। প্রীতিক্রিয়া গর্ভাধানের পর গর্ভিণীর চিত্ত প্রসন্ন করিবার জন্য দেব পূজাদি উৎসব করা।

৩। সুপ্রীতিক্রিয়া—গর্ভের পঞ্চম মাসে দেবপূজাদি উৎসব করা।

৪। ধৃতিক্রিয়া—সপ্তম মাসে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধিকামনায় দেবপূজাদি-উৎসব করা।

৫। মোদক্রিয়া—নবম মাসে গর্ভপুষ্টির জন্য গর্ভিণীর শরীরে মন্ত্রপূর্ব্বক বীজাক্ষরলিখন এবং রক্ষাবন্ধন করাকে মোদক্রিয়া বলে।

৬। প্রিয়োদ্ভবক্রিয়া—প্রসব হইলে পূজনাদি উৎসব করাকে প্রিয়োদ্ভব-ক্রিয়া বলে।

৭। নামকরণক্রিয়া—দ্বাদশ দিবসে গুরু এবং গৃহস্থাচার্য্যের পূজনপূর্ব্বক বালকের নামকরণ করা।

৮। বহির্যানক্রিয়া—দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থমাসে বালককে প্রসূতি-গৃহ হইতে বাহির করা।

৯। অন্নপ্রাশন—সপ্তম অথবা অষ্টম মাসে বালকের অন্নপ্রাশন করাইতে হয়।

১০। ব্যুষ্টিক্রিয়া—বালক এক বর্ষের হইলে তাহার বার্ষিক উৎসবে (বর্ষ গাঁঠ) ইষ্ট, মিত্র, বন্ধু প্রভৃতিকে ভোজন করাইতে হয়।

১১। কেশবায়—কেশমুণ্ডনপূর্ব্বক শিখাধারণ করা। ইহাকে চূড়া কর্ম্মও বলে।

১২। লিপিসংখ্যানসংগ্রহ—পঞ্চম বর্ষে উপাধ্যায়ের নিকট ওম্‌কার লিখন করাইতে হয়, অর্থাৎ বিদ্যারম্ভ করাইতে হয়।

১৩। উপনীত—অষ্টম বর্ষে তাহাকে গুরুর নিকট পঞ্চানুব্রত, যজ্ঞোপবীত কটি সূত্র, শিখাবন্ধন প্রভৃতি ক্রিয়া ধারণ করিতে হয়।

এই প্রকার ব্রতচর্য্যা, ব্রতাবতরণ, বিবাহসংস্কার, বর্ণলাভ, কুলচর্য্যা, গৃহ-শিক্ষা প্রশান্তি প্রভৃতি ৫৩ ক্রিয়া আছে। এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ জিন-সেনাচার্য্য কৃত "আদি পুরাণে" * প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রাবকের (গৃহস্থের) ধর্ম্মের বর্ণনা এ পর্য্যন্ত করা গেল, এখন যতিধর্ম্মের বর্ণনা করা যাইতেছে।

* এই আদিপুরাণ মূল সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষানুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ২০৲ টাকা।

যতি শব্দে সাধু এবং মুনি বুঝিতে হইবে। শ্রাবক একাদশ প্রতিমা ধারণ করিবার পর, গুরুর নিকট মুনিদীক্ষা গ্রহণ করে। মুনিকে অষ্টাবিংশতি মূলগুণ ধারণ করিতে হয়, অষ্টাবিংশতি মূলগুণ——অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহত্ব (পঞ্চ মহাব্রত); ঈর্য্যা, ভাষা, এষণা, আদাননিক্ষেপন, উৎসর্গ (পাঁচ সমিতি) সাময়িক, প্রতিক্রমণ, প্রত্যাখ্যান, বন্দনা, স্তুতি, কায়োৎসর্গ (ছয় আবশ্যক ক্রিয়া), পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চবিষয়ের ত্যাগ, নগ্নতা, কেশলুঞ্চন*, দিবসে একবার ভোজন করা, খাড়া হইয়া ভোজন পান করা, পাণিপাত্রে ভোজন করা, স্নান ত্যাগ, দন্তধাবন ত্যাগ। ইহা বাদেও চৌরাশি লক্ষ উত্তর গুণ আছে। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ "মূলাচার" প্রভৃতি যত্যাচার গ্রন্থে লিখিত আছে।

উত্তর গুণের মধ্যে, সবগুণ না থাকিলেও সাধুর সাধুত্ব নষ্ট হয় না, কিন্তু মূলগুণের কোনো একটী গুণ না থাকিলে, সাধু বলা যাইতে পারে না।

সাধুকে ভোজনার্থ গৃহস্থের বাড়ী যাইতে হয়। গৃহস্থ প্রত্যহ ভোজনের সময় বাড়ীর দ্বারে বসিয়া দ্বারপেক্ষণ (সাধুদিগের অভ্যর্থনার জন্য দ্বারে বসা) করিয়া থাকে। সাধুকে দ্বারের নিকটস্থ হইতে দেখিলেই হর্ষপ্রফুল্ল নয়নে তাঁহাকে "তিষ্ঠত" "তিষ্ঠত" "আমার শুদ্ধ শ্রাবককুল" "শুদ্ধ আহার গ্রহণ করুন" ইত্যাদি নবধাভক্তিদ্বারা আহ্বান করিয়া গৃহী যাহা কিছু শুদ্ধ ভোজনসামগ্রী প্রদান করে, তাহা সাধু গ্রহণ করেন। যদি গৃহস্থ নবধাভক্তি পূর্ব্বক আহ্বান না করে, তাহা হইলে তাহার গৃহে প্রবেশ করিবেন না, অপর গৃহে চলিয়া যাইবেন। এই প্রকার পাঁচ গৃহস্থের দ্বারে যাইবেন। যদি পাঁচ গৃহস্থের মধ্যে কোন গৃহস্থ নবধাভক্তিপূর্ব্বক অভ্যর্থনা না করে, তাহা হইলে "অদ্য আমার উপবাস" এরূপ বুঝিয়া বনে চলিয়া আসিবেন এবং ধ্যানস্বাধ্যায়াদিতে মগ্ন হইবেন। সাধু কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবেন না। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতশিখরে এবং শীতকালে নদীতীরে খোলামাঠে (চারডায়), বর্ষাকালে গাছের তলে বসিয়া তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। ইহাই মুনিধর্ম্ম।†

* জৈন সাধুরা চতুর্মাসের পর হস্ত দ্বারাই কেশোৎপাটন করিয়া থাকেন।

† "সূখৈঁ সরোবর জল ভরে, সূখৈঁ তরপানি-তোয়।
বাটৈঁ বাটোহী না চলৈঁ, জই ঘাম গরমী হোয়॥
তিহকাল মুনিবর তপ তপৈঁ, গিরিশিখর ঠাড়ে ধীর।
তে সাধু মেরে মন বসো, মেরী হরো পাতকপীর॥ ১॥

(৪)

পুণ্য এবং পাপের স্বরূপ।

জৈনমতে দয়া, পরোপকার, সৌজন্য, দান, স্বার্থত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, গুণপ্রীতি, বাৎসল্য, দেবপূজা, গুরুভক্তি, শাস্ত্রাভ্যাস, বিনয়, দরিদ্রকে সাহায্য করা, ছয় প্রকার জীবিকার মধ্যে কোন একটিকে ন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করা, নির্ব্বাণভূমির জন্য যাত্রা করা প্রভৃতি কার্য্যকে পুণ্য কর্ম্ম বলা হয় এবং মিথ্যাশ্রদ্ধা, হিংসা, অসত্যভাষণ, চৌর্য্য, ব্যভিচার (কুশীল সেবন), অতিপরিগ্রহ, মোহ, ক্রোধ, গর্ব্ব, কাপট্য, লোভ, নিন্দা, আলস্য, প্রমাদ, অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যকে পাপকর্ম্ম বলা হয়। স্নান করিলে পুণ্য হয় না, গৃহস্থকে শারীরিক স্নিগ্ধতা স্বচ্ছতার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই স্নান করিতে হয়। গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী বিশেষে অথবা সমুদ্রে স্নান করিলে পুণ্য হয়, একথা জৈনমতে স্বীকার করেন না। গ্রহণ, সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বের কোন মাহাত্ম্য আছে এবং ঐ সময়ে বিশেষ ক্রিয়া করা বিধেয়, একথার কোন উল্লেখ জৈন শাস্ত্রে নাই। শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান, গোপূজা, তুলসীপূজা, বট পাকর (অশ্বত্থ) পূজাদি জৈনমতে পুণ্য কাজের তালিকার মধ্যে পড়ে নাই।

(৫)

কর্ম্মবন্ধন।

"জৈনধর্ম্মের মুখ্যতত্ত্ব' নামক দ্বিতীয় প্রকরণে 'বন্ধতত্ত্বে'র বর্ণনার সময় ইহারও (কর্ম্মবন্ধন বর্ণনা করা হইয়াছে। চেতনের অর্থাৎ জীবের (আত্মার) অনাদিকাল হইতে কর্ম্মবন্ধন হওয়াতে এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে। যখন কর্ম্মবন্ধন সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সে মুক্ত হইবে। আত্মার

ঘন ঘোর গরজৈঁ ঘন ঘটা, জল পরৈ পাবসকাল।
চহুঁ ওর চমকৈ বীজুরী, অতি চলৈ শীতল ব্যাল।
তরু হেট তিষ্ঠৈঁ তব জতী, একান্ত অচল শরীর।
তে সাধু মেরে ... ॥ ২ ॥
জব শীতমাস তুষারসোঁ, দাহৈ সকল বনরায়।
জব জমৈ পানী পোখরাঁ, থরহরৈ সবকী কায়॥
তব নগন নিবসৈঁ চৌহটে, অথবা নদীকে তীর।
তে সাধু .... ॥"

—জৈন কবি ভূধর দাস।

দর্শন (সামান্য জ্ঞান) জ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) এই দুইটী স্বগুণ। এই দুই গুণ দ্বারা অর্থাৎ দর্শন এবং জ্ঞান দ্বারা আত্মা যে যে পদার্থ দেখে বা জানে সেই সেই পদার্থে আত্মার রাগ দ্বেষ হইয়া থাকে। এই রাগদ্বেষরূপ "পরিনমণ" (প্রবৃত্তি) হওয়াই কর্ম্মবন্ধনের মূলকারণ। এ কারণেরই উপচারকে (ব্যবহারতঃ করা) কর্ম্মবন্ধ বলা যাইতে পারে।

(৬)

মোক্ষের স্বরূপ এবং তাহার প্রাপ্তির উপায়।

সমস্ত কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া, পৃথক্ হওয়াকে, মোক্ষ বলা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মা যে যে কর্ম্মবন্ধনস্থিতিতে ধরা পড়িয়াছে, সেই সেই কর্ম্ম-বন্ধনের যতই নাশ হইতে থাকে, তৎসঙ্গেসঙ্গে উহার অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনকে জৈনমতে গুণস্থান বলা হইয়াছে। গুণস্থান চতুর্দ্দশ প্রকার, প্রথম মিথ্যাত্বনামক গুণস্থান। এই গুণস্থানস্থিত জীব সমস্ত কর্ম্মদ্বারা চেষ্টিত থাকে। তখন সে স্বকীয় হিতাহিত জানিতে পারে না। কোন কারণে যখন তাহার হিতাহিত বুঝিবার জ্ঞান হয়, তখন তাহার জ্ঞানের অনুযায়ী তৎপরিমাণ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। এই শ্রদ্ধাকে তৃতীয় এবং চতুর্থ গুণস্থান বলা যায়। চতুর্থগুণস্থানে সে শ্রদ্ধা নির্ম্মল হয়, তখন তাহাকে সম্যক্ গুণস্থান বলা হয়। তৃতীয় গুণস্থানে শ্রদ্ধা নির্ম্মল হয় না, মিথ্যাত্ব দ্বারা মিশ্রিত থাকে, এইজন্য তৃতীয় গুণস্থানের নাম মিশ্রগুণস্থান।

কখনো কখনো এই জীব তৃতীয় এবং চতুর্থ গুণস্থান হইতে চ্যুত হইয়া প্রথম গুণস্থানে আসিয়া দাঁড়ায়। চ্যুত হইবার পশ্চাৎ যাবৎ সে প্রথম গুণ-স্থান প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থিতি করে তাবৎ সেই স্থিতিকে দ্বিতীয় সাসাদন নামক গুণস্থান বলা হয়

চতুর্থ গুণস্থানে কেবল জীবের হিতাহিতের শ্রদ্ধামাত্র হইয়া থাকে, ব্রতাচরণ প্রভৃতি কিছুই হয় না।

পঞ্চম গুণস্থানে শ্রাবকের অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য প্রভৃতি পঞ্চ অনুব্রত, তিনগুণব্রত, চারিশিক্ষা ব্রতধারণ প্রভৃতি একাদশ প্রতিমা পর্য্যন্ত আচরণে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, যদি কেবল অহিংসা নামক অনুব্রতে শ্রদ্ধা হয় তাহা হইলেও সে পঞ্চম গুণস্থানবর্ত্তী হইবে, সমস্ত একাদশ প্রতিমা পর্য্যন্ত ব্রতধারণেও সেই একই কথা। পঞ্চম গুণস্থানের নাম সংযতাসংযতগুণস্থান।

তারপর মুনির অহিংসাদি মহাব্রত ধারণকে ষষ্ঠ প্রমত্তসংযত-নামক গুণস্থান বলে। এই গুণস্থানে প্রমাদের দোষ ঘটিয়া থাকে এইজন্য ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

সপ্তম গুণস্থানে প্রমাদ দোষ নষ্ট হইয়া যায়, এইজন্য ইহাকে অপ্রমত্তগুণস্থান বলা হইয়াছে।

তারপর যোগসাধন (মন বচন কায়) দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং কর্ম্মবন্ধনের নাশও ধারাপ্রবাহরূপে অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে। এই গুণস্থানে চিত্তের যে বৃত্তি হয় তাহা পূর্ব্বে কখনো হয় নাই বলিয়া ইহার নাম অপূর্ব্বকরণ গুণস্থান।

নবম অনিবৃত্তিকরণ গুণস্থান। এই গুণস্থানে পরিণামে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

দশম গুণস্থান সূক্ষ্মসাম্পরায়। এই গুণস্থানে সমস্ত কষায় সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

একাদশ গুণস্থানের নাম উপশান্তমোহ। এই গুণস্থানে সমস্ত কষায়ের উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু এই গুণস্থান হইতেও জীব চ্যুত হইয়া সপ্তম, ষষ্ঠ এবং চতুর্থ গুণস্থান পর্য্যন্তও নামিয়া আসিতে পারে।

দ্বাদশ গুণস্থানে মোহনীয়, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয় এবং অন্তরায় এই চারি ঘাতিয়া * কর্ম্মের সম্পূর্ণ নাশ হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম ক্ষীণমোহ গুণস্থান। এই গুণস্থানে চারি প্রকার শুক্লধ্যানের † মধ্যে প্রথম পৃথক্‌বিতর্ক বিচার এবং দ্বিতীয় একত্ব্‌বিতর্ক বিচার এই দুই ধ্যান হইয়া থাকে। প্রথম ধ্যানে মন বচন কায় তিনের যোগই থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে তিনযোগের মধ্যে কোন একটি থাকে।

এই একাগ্রধ্যানের প্রভাবে অন্তর্ম্মুহূর্ত্তের মধ্যেই (৪৮ মিনিটে এক মুহূর্ত্ত। এই ৪৮ মিনিটের মধ্য মধ্য কাল) সযোগকেবলী-নামক ত্রয়োদশ গুণস্থানের আবির্ভাব হয়। এই গুণস্থানে আত্মার অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান (কেবল জ্ঞান) অনন্তসুখ, অনন্তবীর্য্য এই চারি স্বাভাবিক গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেবল

---

* আত্মার জ্ঞানাদি গুণকে যে ঘাত করে তাহাকে ঘাতিয়া কর্ম্ম বলে, যাহা না করে তাহাকে অঘাতিয়া কর্ম্ম বলে। অঘাতিয়া কর্ম্ম চারিটি —বেদনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র।

† ধ্যান চারি প্রকার—আর্ত্তধ্যান, রৌদ্রধ্যান, ধর্ম্মধ্যান এবং শুক্লধ্যান। ইহাদের প্রত্যেকের আবার চারি চারি ভাগ আছে।

জ্ঞান প্রকটিত হওয়া মাত্রই স্বর্গ হইতে ইন্দ্রকুবেরাদি দেবগণ আসিয়া সমবশরণ-নামক সভার রচনা করেন। এই সভার মধ্যে দেব, মানুষ, পশুদিগের দ্বাদশ প্রকারের সমাজ একত্রিত হয়। কেবলী ভগবান্ এই সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। আত্মার এই অবস্থায় অরহন্ত, পরমেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, ভগবান্, প্রভু, প্রভৃতি নামোচ্চারণ করিয়া ইন্দ্র, ধরণীন্দ্র, চক্রবর্ত্ত্যাদি রাজেন্দ্রগণ এবং সর্ব্বলোক তাঁহার স্তুতি এবং পূজা করে। তারপর এই কেবলী ভগবান্ সর্ব্বদেশে বিহার (পর্যটন) করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে থাকেন। যখন আয়ুর কিছু শেষ থাকিতে শুক্লধ্যানের তৃতীয় ভেদ, সূক্ষ্মক্রিয়া প্রতিপাত নামক ধ্যান হইয়া থাকে তখন এই ধ্যানের প্রভাবে আত্মার প্রদেশ সমস্ত ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া পুনঃ সঙ্কুচিত হইয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসে। এখানে কেবল কায় (শরীর) যোগই থাকে। তারপর ব্যুপরতিক্রিয়ানিবৃত্তিনামক চতুর্থধ্যান দ্বারা চতুর্দ্দশ গুণস্থানের আবির্ভাব হয়।

এই গুণস্থানে শরীরও নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য ইহাকে অযোগকেবলী গুণস্থান বলে। এই অবস্থায় শরীর কর্পূরবৎ যত্রতত্র গলিয়া উড়িয়া যায়। এই অবস্থাকেই নির্ব্বাণ অথবা মোক্ষ বলে। এই গুণস্থানে আত্মা অ, ই, উ, ঋ, ৯ এই পঞ্চবর্ণ উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে ততক্ষণ থাকে।

আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া তিন লোকের অগ্রভাগে সিদ্ধশিলা-নামক স্থানে যাইয়া স্থিতি করে। সেখান হইতে আর কোন কালেও প্রত্যাগমন করেনা। মুক্ত জীবকে সিদ্ধভগবান্ বলা হয়। সেই সিদ্ধশিলায় অনন্ত অনন্ত জীব অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত এই প্রকারই থাকিবে। সিদ্ধ ভগবানের মুখ্যতঃ অষ্টগুণ—১) সম্যক্ত্ব (২) অনন্ত জ্ঞান (৩) অনন্তদর্শন (৪) অনন্তবীর্য্য (৫) সূক্ষ্মত্ব (৬) অবগাহনত্ব (৭) অগুরুলঘুত্ব এবং (৮) অব্যাবাধত্ব। এই প্রকার মোক্ষের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল।

মোক্ষসাধনের উপায় সম্যক্‌দর্শন, সম্যক্‌জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র এই রত্নত্রয়। এই রত্নত্রয়ের স্বরূপ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। যে চতুর্দশ গুণস্থানের কথা এতক্ষণ বলা হইয়াছে তাহাতে ক্রমশঃ আরোহণ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল গুণস্থানই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়, কেননা এদের ভিতর দিয়াই রত্নত্রয়ের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, এবং চতুর্দ্দশগুণস্থানে পূর্ণতা লাভ করে। রত্নত্রয়ের পূর্ণতা না হইলে মোক্ষ হয় না।

(৭)

মূর্ত্তি-পূজা।

যে সকল মহাত্মা সংসার হইতে (গৃহস্থাবস্থা হইতে) পৃথক্ হইয়া পরম বৈরাগ্যপদ ধারণ পূর্ব্বক একাগ্রধ্যানপ্রভাবে গুণস্থানে আরোহণ করিয়া ঘাতিয়া কর্ম্মবন্ধনকে নষ্ট করিয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব ও পরমেশ্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ধ্যানমুদ্রা (ধ্যানাবস্থা) এবং গুণরাজি সাধারণকে স্মরণ করাইয়া সেই পথের জন্য ব্যাকুলিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং চিত্রাঙ্কণ করা হয়। যে উদ্দেশ্যে মহাত্মা পুরুষদের পাষাণমূর্ত্তি স্থাপিত হয় এবং আলেখ্য (ফোটো ইত্যাদি) গৃহে, বিদ্যামন্দির প্রভৃতি স্থানে রাখা হয় জৈনগণও সেই উদ্দেশ্যে মূর্ত্তিপূজা করিয়া থাকেন। মূর্ত্তি পূজা করিবার সময় পাথর কিংবা সাধু মহাত্মাদের আকৃতির স্তুতি করা হয় না, কিন্তু যাঁহাদিগের সেই মূর্ত্তি আছে, তাঁহাদিগের গুণরাজিরই স্তুতি এবং পূজা করা হয়। নিজ নিজ জীবনে যাহাতে ঐরূপ হইতে পারে মূর্ত্তির ধ্যান তাহারই স্মরণকারক।

মূর্ত্তি খড়্গাসন এবং পদ্মাসন এই দুই প্রকারের। উভয়ই ধ্যানাবস্থার। খড়্গাসন মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। পদদ্বয় বেশ সোজা, পরস্পর প্রায় সংলগ্ন, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত। নেত্রের দৃষ্টি অর্দ্ধ-উন্মীলিত, নাসাগ্রে স্থাপিত। উভয় প্রকারের মূর্ত্তিই বস্ত্রালঙ্কাররহিত। মূর্ত্তির নিকট কোন স্ত্রী বা কোন প্রকার শস্ত্রাদির মূর্ত্তি থাকে না।

যোগাভ্যাসের যে সব উৎকৃষ্ট মুদ্রা শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় কথিত হইয়াছে * জৈন মূর্ত্তিতে ঠিক সেই সব প্রদর্শিত।

---

* "সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫
৬ষ্ঠ অঃ।

দেহের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাদেশকে (অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্যন্ত) সরল ও নিশ্চল ভাবে ধারণ করিয়া, স্থির হইয়া, স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে

ভগবদ্গীতায় যে প্রকার ধ্যানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, জৈনধর্ম্ম-গ্রন্থও সেই প্রকার ধ্যানের মহত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুক্লধ্যান ছাড়া কেবল জ্ঞান এবং মুক্তি কদাপি হইতে পারে না—এটী জৈনধর্ম্মের মুখ্য সিদ্ধান্ত। সেই শুক্লধ্যান কি প্রকারে করা যায়, এবং কোন কোন মহাত্মাগণ কোন কোন প্রকার করিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইবার জন্যই মূর্ত্তির স্থাপনা এবং পূজা করা হয়।

জৈনগণ মূর্ত্তি পূজা অষ্টবিধ জিনিষে করিয়া থাকেন। অষ্টবিধ জিনিষ—(১) মূর্ত্তিকে জলদ্বারা অভিষেক করান (২) মূর্ত্তির সম্মুখে চন্দন এবং কেশর (জাফ্‌রাণ) অর্পণ করা (৩) মূর্ত্তির সম্মুখে অক্ষতের (তণ্ডুলের) পুঞ্জ করা (৪) পুষ্প (৫) নৈবেদ্য রাখা (৬) প্রদীপ জ্বালা (৭) ধূপ পোড়ান (৮ ফল রাখা। এই অষ্ট দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সমর্পণ করিতে হয়, এবং সমস্ত মিশ্রিত করিয়া অর্ঘ্য দিতে হয়। পূজার স্থানে আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি এই তিন প্রকারের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া হোম করিবারও বিধি আছে। অরহন্ত (অর্হৎ) পূজা, সিদ্ধপূজা, গুরুপূজা, সরস্বতী পূজা, (শাস্ত্র পূজা) প্রত্যেক তীর্থঙ্করের পূজা, নির্ব্বাণ ভূমির পূজা, দশলক্ষণ ধর্ম্মের পূজা, রত্নত্রয় পূজা, এবং ষোড়শকারণ পূজা প্রভৃতি অনেক প্রকারের পূজা আছে। প্রত্যেক পূজাতেই সদ্‌গুণের বর্ণনা এবং স্তুতি করা হইয়া থাকে। পূজায় যে সব জিনিষ অর্পণ করা হয় তাকে নির্ম্মাল্য বলে। নির্ম্মাল্য কোন জৈন লোক কোন প্রকার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করে না। এরূপ নিষেধ আজ্ঞা আছে। নির্ম্মাল্য ভক্ষণে বড় পাপ, উক্ত হইয়াছে।——এই প্রকারে মূর্ত্তি পূজার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল।

অবলোকন করিয়া এবং অন্যদিক অবলোকন না করিয়া প্রশান্তচিত্ত, নির্ভীক ও ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া মন সংযত করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ ও যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন॥ ১৩।১৪॥

উক্তরূপে সদা মনকে সমাহিতকারী সংযতচিত্ত যোগী নির্ব্বাণপরমা মৎসংস্থা শান্তি প্রাপ্ত হন॥ ১৫॥

"কামক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যত চেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

৺দীনদয়াল নাগ।

(শ্রীপার্ব্বতী চরণ মিত্র)

উদ্বোধনের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় নাগ মহাশয়কে জানেন, কারণ অনেকেই সম্ভবতঃ অল্পদিন হইল প্রকাশিত নাগ মহাশয়ের অপূর্ব্ব জীবনী* পাঠ করিয়াছেন। পুস্তকে উল্লিখিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের পিতার নামই দীনদয়াল নাগ। তাঁহার বিস্তৃত জীবন আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, সুধু যে কয়েকটী ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিম্বা নাগ মহাশয় ও অন্যান্য বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য। নাগ মহাশয়ের কথা লোকে সম্প্রতি জানিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, এ সময়ে তাঁহার পিতার সম্বন্ধে ঘটনাগুলির আলোচনা বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

দীন দয়াল ১০০ এক শত বর্ষ জীবিত ছিলেন। তাঁহার মহাপ্রস্থানের চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হই। তদ্দেশবাসী হইলেও আমি ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখি নাই, কিম্বা তাঁহার পূত চরিত্রের বিষয় জানিতাম না। অতএব ঐ চারি বৎসরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার কিয়দংশই এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল, একথা বলা বাহুল্য।

ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে বানপ্রস্থাশ্রমের ও তদাবলম্বী তাপসদিগের আচরণের কথা জানা যায়। তাঁহাদের দিবারাত্রব্যাপী তপস্যা, আত্মসংযম ও অবিচলিত আত্মনিষ্ঠা সকলকেই তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। বর্ত্তমান কালে দুইটী আশ্রমই ভারতে পরিলক্ষিত হয়,—সংসার ও সন্ন্যাস। শাস্ত্রানুযায়ী ঠিক ঠিক সংসার ও সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী লোকের সংখ্যা অধুনা বিরল হইলেও এই দুইটী আশ্রম অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে—ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থরূপ অন্য আশ্রম দুইটী উহাদেরই অঙ্গীভূত হইয়া এক প্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু দীনদয়ালকে যাঁহারা জীবিত দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেন যে, তিনি যেন বানপ্রস্থাবলম্বী ঋষিসদৃশ জীবন যাপন করিতেছেন। আমি যখনই দেওভোগ গিয়াছি, তখনই তাঁহাকে তপঃধ্যাননিরত দেখিয়াছি। সংসারের কোন কাজে ব্যাপৃত হইতে দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার পুত্র শ্রীদুর্গাচরণ তাঁহাকে সংসারের বিষয়ে সামান্য আলোচনা করিতেও অবসর দিতেন

* শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "সাধু নাগমহাশয়"। প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

না, সন্ধ্যাপূজা, জপতপে নিরত থাকিয়া পিতাকে ঈশ্বরচিন্তাতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতে উৎসাহিত করিতেন, অথবা একচিত্তে ঈশ্বরগুণানুবাদ শ্রবণ করিতে বলিতেন। দীনদয়াল অতি প্রত্যুষে নিদ্রাত্যাগ করিতেন ও শয্যায় বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় মন্ত্রাদি পাঠ করিতেন। শ্রীযুত দুর্গা-চরণও চিরকাল অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিতেন, রাত্রি ৩।৪ টার সময় শুইতে গেলেও তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পর তিনি তামাক খাইতে থাকিতেন ও পিতা দীনদয়াল শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবামাত্র তাঁহাকে তামাকু সাজিয়া দিতেন। দীনদয়াল ছোট একটী থেলো হুকোয় উহা সেবন করিয়া হাত মুখ প্রক্ষালন করিতে যাইতেন এবং ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তামাকু খাইতেন, পুত্র দুর্গাচরণই তাঁহার জন্য তামাক প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, কিম্বা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। সাধু দুর্গাচরণ যখন বাড়ীতে থাকিতেন, তখন সেখানে প্রায়ই সারাদিনই পাঠ, কীর্ত্তন ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা হইত। বৃদ্ধ দীনদয়াল তামাকু টানিতে টানিতে তাহা শ্রবণ করিতেন। এইরূপে ৯৷৷০ টা বাজিলে তিনি তৈল মাখিয়া স্নান করিতে যাইতেন। স্নানান্তে সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্তোত্র পাঠ করিতেন। পূজা ও স্তোত্র পাঠ করিতে তাঁহার প্রায় ৩।৪টা বাজিয়া যাইত। ঐকালে বিবিধ দেবদেবীর স্তোত্র সকল তাঁহার হৃদয়কন্দর হইতে অনর্গল বহির্গত হইতে থাকিত। তৎপরে তিনি আহার করিতে বসিতেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগতের কোন কালেই অভাব ছিল না। দুর্গাচরণ স্বয়ং সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিলেও, দেহপাত করিয়া, অতিশয় আদরের সহিত অতিথি-সেবা করিতেন এবং অতিথিগণকে চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয় আহার করাইয়া তৃপ্ত হইতেন। বেলা অধিক হইলে অতিথিগণের কষ্ট হইবে বলিয়া দুর্গাচরণ বাজার হইতে দ্রব্যসম্ভারের মোট স্বয়ং মাথায় করিয়া যত শীঘ্র পারেন বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিত্য প্রাণান্তক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অমৃতোপম নানা ব্যঞ্জন ও ভাত যত শীঘ্র পারেন রাঁধিয়া দিতেন। তদুপরি সুমিষ্ট দুগ্ধও অতিথিগণের নিত্য প্রীতিসাধন করিত। অতিথিদিগের জন্য পূর্ব্বাহ্নেই রান্না হইত, সুতরাং বৃদ্ধ দীনদয়ালের অদৃষ্টে ঠাণ্ডা ভাত ও ঠাণ্ডা ব্যঞ্জনই প্রায় নিত্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যও ঐ ভাত ব্যঞ্জন খাইয়া বিরক্ত হইতেন না। একদিনও কাহাকেও তদ্বিষয়ে কিছু বলেন

নাই, বলিবার প্রয়োজনও বোধ করিতেন না। আহারান্তে তিনি সামান্য বিশ্রাম করিতেন ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে উঠিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া কোন কোন দিন অন্যান্য লোকের সহিত বসিয়া কীর্ত্তন বা গ্রন্থপাঠ শুনিতেন, নতুবা স্বীয় নির্দ্দিষ্ট শয্যোপরি উপবেশন করিয়া জপ করিতে থাকিতেন। জপ করিতে করিতে রাত্রি ১১০টা বাজিয়া যাইত, বৃদ্ধের ভ্রূক্ষেপই হইত না। এদিকে সংকীর্ত্তনাদি শেষ হইলে অতিথিগণ আহার করিতেন, ও নিজ নিজ বিছানায় নিদ্রাদেবীর কোমল কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, বৃদ্ধ দীনদয়াল কিন্তু নিজ অভিষ্ট জপেই মগ্ন থাকিতেন। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধজগৎ সুষুপ্তির গাঢ় আলিঙ্গনে নিবদ্ধ হইলেও জপনিরত বৃদ্ধ জাগিয়া থাকিয়া, জপ ও ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। পরে তাঁহার চিরসহচর ঠাণ্ডা ভাত ও ঠাণ্ডা ব্যঞ্জন পুনরায় উদরস্থ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতেন। প্রত্যুষে উঠিয়া তাপস দীনদয়াল আবার তাঁহার দৈনন্দিন তপস্যায় মন দিতেন। এই ভাবে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত এবং তিনি সংসারের সুখ দুঃখ হাসি কান্না হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। ইহার ভিতরেও একটু সামান্য অবসর ছিল, যাহা দীনদয়াল ইচ্ছামত ব্যয় করিতেন। দুর্গাচরণ ইচ্ছা করিতেন না পিতা সে সামান্য সময়টুকুও ভগবৎচিন্তা হইতে বিরত থাকেন, এবং ঐ সময়ে সংসারের প্রসঙ্গ তুলিলে পিতার উপর বিরক্তও হইতেন, কিন্তু বিষয় বাসনা মানবহৃদয়ে এতই প্রবল যে, দীনদয়াল অনেক সময়ে ঐ কালে ঐ প্রলোভনের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। স্নান করিবার পূর্ব্বে তাঁহার তৈল মাখিবার সময়ে পুত্র প্রায়ই বাজারে যাইতেন, সুযোগ বুঝিয়া ঐ সময়েই দীনদয়াল সমাগত আত্মীয়স্বজনের সহিত সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিতেন। আবার ঐরূপ আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে সশঙ্কচিত্তে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিতেন পাছে পুত্র আসিয়া তাঁহাকে ঐভাবে নিযুক্ত দেখিতে পায়। দুর্গাচরণ কোন কোন দিন বাজার হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে তদ্রূপে নিযুক্ত দেখিতেও পাইতেন এবং দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেন। সময়ে সময়ে পিতাকে তজ্জন্য গঞ্জনাও সহ্য করিতে হইয়াছিল।

এক সময়ে এক রমণী শ্রীযুত দুর্গাচরণের গুণগ্রামে মুগ্ধা হইয়া পড়েন। দুর্গাচরণ রমণী মাত্রকেই জগদম্বার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া জানিতেন ও 'সচ্চিদানন্দময়ী মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঐ রমণী বোধ হয় তাহা জানিতেন না, অথবা

জানিলেও দুর্গাচরণের প্রণয়ে এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আপনাকে সংযত রাখিতে পারিতেন না। রমণী মধ্যে মধ্যে আসিয়া দীনদয়ালের কাছে বসিতেন ও দুর্গাচরণের প্রসঙ্গ তুলিয়া নানারূপে তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন। শুনা যায় একদিন তিনি এতদূর উন্মত্তা হইয়াছিলেন যে বৃদ্ধকে বলিয়াই ফেলেন—"আপনার পুত্রকে আমি কতরূপেই যে দেখি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। কখন শ্রীকৃষ্ণের মত, কখন গৌরাঙ্গের মত, কখন বা স্বীয় স্বামীর মত দেখিয়া থাকি।" বৃদ্ধ দীনদয়ালের রমণীর অভিপ্রায় বুঝিতে বিলম্ব হইল না, তত্রাচ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "দেখ, দুর্গা আমার (দীনদয়াল নাগমহাশয়কে দুর্গা বলিয়া ডাকিতেন) স্ত্রীলোক মাত্রকেই মাতৃজ্ঞান করে। তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান, কিন্তু স্ত্রীর সহিতও দৈহিক সম্বন্ধ রাখে না। এমতাবস্থায় তোমার ঐরূপ উন্মত্তের বচন প্রয়োগ উচিত নহে; উহাতে তোমারই অনিষ্ট হইবে।" রমণী তথাপি নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আসিতে নিরস্ত হইলেন না।

দুর্গাচরণের নিয়ম ছিল অতিথি অভ্যাগতদিগের সেবা সাঙ্গ না হইলে কখনও জলগ্রহণ করিতেন না, সুতরাং উক্ত রমণী বাটীতে আসিলে তাঁহাকে অপর সকলের ন্যায় অগ্রে ভোজন না করাইয়া নিজে জলস্পর্শ করিতে পারিতেন না। রমণীও কোনও কোন দিন কি জানি কি ভাবিয়া শত অনুনয় বিনয়েও খাইতে বসিতেন না। অতএব সেদিন দুর্গাচরণ ও তৎপত্নীরও খাওয়া হইত না। রাঁধা ভাত ব্যঞ্জন অমনি পড়িয়া থাকিত। বৃদ্ধ দীনদয়ালের হৃদয়ে ঐ দিনে বড়ই আঘাত লাগিত, ভাবিতেন, ঐ দুর্ব্বৃত্তার জ্বালায় আমার দুর্গার খাওয়া পর্য্যন্ত হইল না। কিন্তু উক্ত রমণীর মনোগত অভিপ্রায় নিজে বুঝিলেও পুত্রকে তৎসম্বন্ধে সহসা কিছু বলিতে পারিতেন না, অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে, সকল অত্যাচার সহ্য করিতেন ও ভাবিতেন রমণী নিশ্চিতই পাগলিনী হইয়াছে।

বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই এক অভিনব দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, সমস্ত দেশটী যেন অসীম জলরাশির উপর ভাসিতে থাকে। ঐ কালে একদিন রাত্রে অতিশয় বৃষ্টি হইতে লাগিল। অবিশ্রান্ত মুষলধারায় বারিপাত হইলে অন্ধকার রজনী যে কি ঘোর আকার ধারণ করে, তাহা সকলেই জানেন। ঐ মহা দুর্য্যোগের রাত্রিতে দুর্গাচরণ তাঁহার কুটীরে শয়ন করিবার কিছুক্ষণ পরেই দেখেন উক্ত পাগলিনী একেবারে তাঁহার শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যতা হইয়াছে! তাহার আর্দ্র বস্ত্র দেখিয়া দুর্গাচরণ বুঝিলেন পাগলিনী

নিশ্চিত সন্তরণ করিয়া নিজবাটী হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধু দুর্গাচরণ নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং বারম্বার তাহাকে মাতৃসম্বোধন ও প্রণাম করিয়া সযত্নে পুনরায় বাটী পাঠাইয়া দিলেন। ঐ দিন হইতে কিন্তু পাগলিনীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। তাহার ইতিপূর্ব্বের উগ্রভাব দূর হইয়া সে অনেকটা শান্ত হইল এবং মধ্যে মধ্যে স্বগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণকে দেখিতে আসিলেও দূর হইতে যোড়করে তাহাকে বারম্বার প্রণাম মাত্র করিয়াই চলিয়া যাইত। শুনিয়াছি, অল্পদিন হইল রমণীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে এবং সে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি দীনদয়াল বড়ই নিষ্ঠাবান ছিলেন। দুর্গাচরণ কিন্তু নিষ্ঠার অতীত ভূমিতে পৌছাইয়া সর্ব্বদা নির্ব্বিকার থাকিতেন। পিতা সে জন্য অনেক সময় তাঁহাকে বুঝিতে পারিতেন না, তিনি ইচ্ছা করিতেন, তাঁহার পুত্র তাঁহারই মত শৌচাচারসম্পন্ন গৃহী হউন। পিতা পুত্রে সেজন্য সময়ে সময়ে বাদানুবাদও হইত। আমরা শুনিয়াছি একদিন ঐ প্রসঙ্গে দুর্গাচরণ তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "বলুন দেখি, কোনটী শুচি, ও কোনটী অশুচি, আপনি যে স্থানকে অশুচি মনে করেন, মনে ভক্তি থাকিলে সেখানে বসিয়াও সমস্ত দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। আপনার ঐরূপ ভ্রমাত্মক বুদ্ধি ত্যাগ করা উচিত।"

দীনদয়ালের স্নান আহ্নিক করিতে অনেক সময় লাগিত, সুতরাং পুকুরে নামিবার স্থানটি বাঁশ বাঁখারির সাহায্যে ভাল করিয়া না বাঁধা থাকিলে তাঁহার কষ্ট হইত। সেজন্য ভগ্ন হইলে সময়ে সময়ে তিনি নিজেই ঘাটটি ঠিক করিয়া বাঁধিয়া লইতেন। এদিকে পিতা ঐবিষয়ে ঐরূপে কষ্ট স্বীকার করেন দুর্গাচরণের তাহা ভাল লাগিত না। সেজন্য অনেক সময়ে পিতার জন্য নিজেই ঘাট সমান করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া আসিতেন। একদিন দুর্গাচরণ ঐরূপে ঘাট ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিলেও দীনদয়ালের তাহা মনোমত না হওয়ায় তিনি তাহা আবার ঠিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে দুর্গাচরণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতাকে ঐরূপে অযথা কষ্ট করিতে দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, বাহিরের তুচ্ছ বিষয় লইয়া কাল কাটাইবার অভ্যাস তাঁহার কিছুতেই গেল না। দীনদয়ালের তাহাতে অতিশয় ক্রোধ হইল, ও পুত্রকে বলিলেন, "তুমি ত বেশ পুত্র হইয়াছ। আমার বাড়ীতে থাকিয়া আমাকেই অন্যায় কথা বলিতেছ। আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, আমি আর তোমার মুখ দেখিতে চাহি না।" দুর্গাচরণ তাহাতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ বাড়ীতে আমুন, আমি

চলিয়া যাইব।” দীনদয়াল কোনরূপে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া বাড়ীতে আসিয়া দুর্গাচরণকে দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন। ক্রোধরহিত দুর্গাচরণ তাহাতেও হাসিতে লাগিলেন এবং পিতার ভোজন শেষ হইলে, তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন। অভিমানী দীনদয়াল উহাতে মর্ম্মাহত হইলেও মুখে কিছু বলিলেন না। প্রতিবেশীরা ঐকথা জানিতে পারিয়া দুর্গাচরণকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন। দুর্গাচরণ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবা মাত্র বৃদ্ধ দীনদয়াল আর না থাকিতে পারিয়া কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “দুর্গা এসেছিস্।” তাঁহার স্বর শুনিয়া মনে হইল তিনি যেন মৃত দেহে প্রাণ পাইলেন। অতঃপর তিনি দুর্গাকে আর কখন কিছু বলিতেন না। সর্ব্ব বিষয়ে দুর্গা যেমন বলিতেন প্রসন্নচিত্তে সেইরূপই করিতেন।

বৃদ্ধ দীনদয়ালের মহাপ্রস্থানের কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীযুত দুর্গাচরণ একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “বাপ মহাশয় (দুর্গাচরণ পিতাকে ‘বাপ মহাশয়’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন) বলেন, পূজাকালে মা যেন এখন হাত পাতিয়া তাঁহার প্রদত্ত অঞ্জলি গ্রহণ করেন!” পিতার ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার সে দিন কতই আহ্লাদ। এত দিনে পিতার যথার্থ ভক্তিলাভ হইয়াছে, একথা ভাবিয়াই তিনি যে আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গের কিছু দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে দীনদয়াল শয্যা ত্যাগ করিয়া পুত্রপ্রদত্ত তামাকু সেবনান্তে বাহিরে যাইতে যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গেলেন। দুর্গাচরণ তখন বাজারে গিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জের সীমান্তে অবস্থিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরের নিকট যাইতে যাইতে পিতার তদবস্থার সংবাদ পাইলেন এবং সসব্যস্তে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলেন পিতার মুখ হইতে কফ নির্গত হইতেছে, অজ্ঞানাবস্থায় মাটীতে পড়িয়া আছেন। তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া দুর্গাচরণ বুঝিতে পারিলেন অন্তরে তাঁহার অতিশয় যাতনা হইতেছে। অধীর হইয়া দুর্গাচরণ পিতার চারি পাশে ঘুরিতে ঘুরিতে বলিতে লাগিলেন, “কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যদি কিছু পুণ্য সঞ্চয় আমি করিয়া থাকি তবে তাহার ফলে পিতা আমার মুক্তিলাভ করুন ও পিতার অশুভ কর্ম্মের সমস্ত ফল আমি তাঁহার হইয়া ভোগ করি!” কয়েকবার ঐরূপ বলিবার পরেই দীনদয়ালের মুখে শান্তির ভাব পরিলক্ষিত হইল এবং উহার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিয়া গেল!

পিতার মহাপ্রস্থানের পর নাগমহাশয় কখন কখন তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া মুক্তচিত্তে বলিতেন, "তাঁহার আর জন্ম হইবে না, তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে; আমি না বুঝিয়া তাঁহাকে কত সময়ে কত কথাই বলিয়াছি। তিনি শিবস্বরূপ ছিলেন!"

একদিন কথায় কথায় নাগমহাশয় আমাদিগকে তাঁহার পিতার আত্মসংযমের বিষয় বলিতে লাগিলেন। বলিলেন—এক সময়ে দীনদয়াল কলিকাতা হইতে অন্যত্র নৌকাযোগে রওনা হইয়া পথিমধ্যে কোন স্থানে নৌকা বাঁধাইয়া শৌচে গমন করেন ও ঐ স্থানে হঠাৎ এক ঘড়া প্রোথিত মোহরের সন্ধান পান। কিন্তু পরের জিনিষ লইতে নাই বলিয়া ঠিক করিয়া তাহা অমনি মাটী চাপা দিয়া নৌকায় উঠিয়া সেই স্থান ত্যাগ করেন।

নাগমহাশয় আর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তিনি ৪০ বৎসর যাবৎ উর্দ্ধরেতা হইয়া যাপন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

স্বামিনং বিবেকানন্দং নত্বা বেদান্তভাস্করং
ব্রহ্মসূত্রং যথাদ্বৈতজ্ঞানদং ব্যপদিশ্যতে॥

(মদীয় আচার্য্যদেব স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে প্রায়ই বলিতেন, জনসাধারণের মধ্যে সহজ ভাষায় বেদান্ত শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম প্রকাশকল্পে ব্যাস্‌প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের একখানা ভাষ্য লিখিতে চেষ্টা করিবে। গুরুদেবের সেই আদেশ স্মরণ করিয়া, নিজেকে একান্ত অনধিকারী জানিয়াও আমি ব্রহ্মসূত্রের একখানি সরল ভাষ্য প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। এই ভাষ্যে সূত্রগুলির মূল সংস্কৃত-ব্যাখ্যা ও অদ্বৈতমত প্রতিপাদক শাঙ্করমতের অনুসরণ করিব।)

বেদান্তশাস্ত্র যে বঙ্গদেশে তেমন প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভোগবহুল বঙ্গদেশে ন্যায় ও তন্ত্র শাস্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বেদান্ত,—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসি-

দিগের শাস্ত্র। বঙ্গদেশে কৌলসন্ন্যাস ভিন্ন অন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম কদাপি সমর্থিত হয় নাই। বেদ বেদান্ত সমর্থিত—যথার্থ সন্ন্যাসধর্ম্ম ভোগপ্রধান বঙ্গভূমে সমাদৃত হয় নাই।

ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে নিখিলধর্ম্মমতের সমন্বয় হইয়াছে। বঙ্গদেশে বৈদিক সন্ন্যাসিগণের অভ্যুদয় হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে, বিবেক, বৈরাগ্য ও ত্যাগের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহগণ বেদান্ত ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে জেয়জগতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই শুভমুহূর্ত্তে ভোগপ্রধান বঙ্গদেশ যদি বেদান্তধর্ম্ম বুঝিতে না চাহেন ত বঙ্গবাসী দয়ার পাত্র। এই বঙ্গভূমি পবিত্র করিতে—ভোগের পরাকাষ্ঠায় উপস্থাপিত বঙ্গবাসীর মোহনিদ্রার অবসান করিতে—ভগবান্ শঙ্কর—বেদান্তের মহিমা প্রচার করিতে আবার নর শরীরে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা এই শুভ সময়ে—বেদান্তের মর্ম্ম পরিগ্রহণে যত্নপর হইব—তবেই আমাদের মঙ্গল—দেশের মঙ্গল—জগতের কল্যাণ সংসাধিত হইবে। এই ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই আমি বেদান্তের একখানি সরল ভাষ্য বঙ্গভাষায় প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছি। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিবার পূর্ব্বে বেদান্ত সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন। নতুবা সূত্রার্থ বা তাহার ভাষ্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে না। সেই জন্য বেদান্তশাস্ত্র সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে।

ঋগাদি ভেদে চতুর্দ্ধা সঙ্কলিত প্রত্যেক বেদই আবার তিন প্রস্থানে প্রবিভক্ত। সংহিতা ভাগে মন্ত্রস্তোত্রাদি, ব্রাহ্মণভাগে যাগ যজ্ঞাদি, এবং আরণ্যক বা উপনিষদ্ ভাগে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশাদি বর্ণিত আছে। প্রতি বেদের শেষ অধ্যায় বা অন্তভাগে ব্রহ্মজ্ঞানমূলক আরণ্যক শ্রুতি থাকায় ইহাদের নাম বেদান্ত বা উপনিষৎ। মোট ১০৮ খানি উপনিষদের নাম উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১২ খানি উপনিষদের প্রামাণ্য সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই ১২ খানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। প্রতি উপনিষদে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্রহ্মজ্ঞান-মূলক মন্ত্রগুলির অর্থ বুঝাইবার জন্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস "বেদান্ত-দর্শন" বা "ব্রহ্মসূত্র" রচনা করেন। ইহা যেন উপনিষৎ-উপবনের সংগৃহীত—ফুটন্ত কুসুম মালিকা—মহর্ষি ব্যাস অতি সন্তর্পণে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষ্য, বৃত্তি, বার্ত্তিক টীকা টীপ্পনিতে এই "ব্রহ্মসূত্র মালা" আবৃত হইলেও ইহার রচনানৈপুণ্য ও সমাধানপারিপাট্য

অদ্যাপি অক্ষুন্ন রহিয়াছে। বৌধায়ন, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মাধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য, অবধূতাচার্য্য অধুনাতন বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত সকলেই স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায় অনুকূলে "ব্রহ্মসূত্রের" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এই সূত্রার্থ প্রকাশে শঙ্করের মতানুসরণ করিব—পরন্তু মদায় আচার্য্যদেব স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সূত্রার্থ বিবৃতি স্থানে স্থানে যেমন অবগত হওয়া গিয়াছে শাঙ্কর-মতের বিরোধী হইলেও তাহা প্রকাশ করিব। কিন্তু পাঠকগণকে মনে রাখিতে হইবে, পারিপার্শ্বিক মতের সামান্য বিরোধ থাকিলেও স্বামী বিবেকানন্দ শুদ্ধাদ্বৈত মতের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্যান্য ব্যাখ্যাতৃগণের ব্যাখ্যা হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইতেন। বেদান্ত শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। বাদশাস্ত্র ও বিষয় শাস্ত্র। বিষয়শাস্ত্র—কি না, শ্রুতি-মূলক মন্ত্রাদি দ্বারা বেদান্তকথিত "ব্রহ্ম"রূপ বিষয়ই যে একমাত্র জ্ঞাতব্য, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। বাদশাস্ত্র—কি না, শ্রুতিবিগর্হিত স্বাধীন যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া স্বাধীন যুক্তিপ্রাধান্য সাংখ্য ন্যায়াদি স্মৃতির যুক্তি খণ্ডনদ্বারা স্বীয় বাদের প্রতিষ্ঠা করা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরক ভাষ্যে বাদশাস্ত্র অপেক্ষা বিষয়শাস্ত্রের প্রতিই অধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু ক্ষুরধারবুদ্ধি শঙ্করের স্বাধীন যুক্তির নিকটেও সাংখ্যাদি স্মৃতি যে মুহুর্মুহুঃ খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে পাঠকগণ এই ভাষ্যে ক্রমশঃ তাহা দেখিতে পাইবেন।

ন্যায় ও সাংখ্য দর্শনের ন্যায় বেদান্ত শাস্ত্রেরও কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে, যাহার অর্থ না বুঝিলে শাস্ত্রে কিছুমাত্র প্রবেশাধিকার লাভ হইতে পারে না। তবে ভারতীয় অন্য পঞ্চদর্শনের ন্যায় বেদান্ত দর্শনে পারিভাষিক শব্দের তেমন ছড়াছড়িও নাই—শব্দ কৌটিল্যও নাই। আমরা সূত্রার্থ বিবৃতি কালে যথাস্থলে ঐ সকল পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা করিব। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে আমরা ভাষ্য প্রকাশে কোথাও "চুলচিরে" বিচারের অবতারণা করিব না—তাহাতে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। বিষয় শাস্ত্রে একবার প্রবেশাধিকার ঘটিলে বিচার প্রবৃত্তি আপনা আপনি জাগ্রত হইয়া উঠে। তখন ভ্রমটা "ভ্রমজ্ঞান" না "অজ্ঞান" আপনিই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এই সুখভাষ্য পাঠে কাহারও ভীত বা বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্যকার শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যের নাম "শারীরক ভাষ্য" রাখিয়াছেন।

সংস্কৃত শৃধাতু হইতে শরীর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শৃধাতুর অর্থ শীর্ণ হওয়া, যাহা দিনে দিনে শীর্ণ হইয়া অন্তে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় তাহার নাম শরীর। এই শরীর—যাহাতে জীব "আমি" "আমি" করিয়া অন্তে লয় হইয়া যাইতেছে সেই শরীরটা যে আমিত্বের আধার হইয়াও "আমি" নহে এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই ভাষ্যকারের প্রবৃত্তি। শরীর সম্বন্ধীয় ইহা শারীর, শরীর শব্দের উত্তর তুচ্ছার্থে "ক" প্রত্যয় করিয়া "শারীরক" শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ভাষ্যকার ইঙ্গিতে বলিতেছেন হে জীব! যে শরীর লইয়া তুমি অহোরাত্র কেবল "আমি" "আমি" করিয়া ভ্রমণ করিতেছ সেই শরীর তোমার নহে—এ শরীর অতি জঘন্য—তুচ্ছ পদার্থ। তোমার প্রকৃত—"আমিত্ব" কোথায় তাহা জানিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করতঃ নরজন্ম সফল করিয়া চলিয়া যাও। *ইহাই "শারীরক" শব্দের গূঢ় অভিপ্রায়।*

আমাদের এই ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা স্বামীজির নামানুসারে "বিবেক-ভাষ্য" বলিয়া কথিত হইবে। জীবের বিবেক বৈরাগ্য উৎপাদন দ্বারা আত্মারস্বরূপ যথার্থ অবগত হইতে যদি এই ভাষ্য কাহাকেও কিঞ্চিন্মাত্র পথ প্রদর্শন করে তবেই লেখক— আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে। এখানে প্রকাশ থাকে যে আমরা কথায় কথায় শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ করিব না। ভাষ্যার্থ "ভাষায়" বিবৃত করিব, এবং সর্ব্বত্রই স্বামী বিবেকানন্দের মত উদ্ধৃত করিয়া দুর্গম শঙ্কর ভাষ্যের কূটার্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু নির্ব্বিশেষাদ্বৈত মতই আমাদের গমনীয় পন্থা ইহা পাঠকগণকে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে।

ইদানীং আমরা ভাষ্যকারের "অধ্যাসবাদের" আলোচনা করিয়া ১ম সূত্রার্থের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইব। এই অধ্যাসভাষ্য বুঝিতে পারিলেই বেদান্ততত্ত্ব সমগ্র বুঝিতে পারা যায়। এমন চমৎকার ভাষ্য ভূমিকা জগতে কোন ভাষ্যকার এ পর্যন্ত লিখিতে পারেন নাই। এই অধ্যাসভাষ্য এইজন্য আমাদিগকে বিস্তৃত ভাবে বুঝিতে হইবে। নতুবা ব্রহ্মসূত্রে প্রবেশাধিকার লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই "অধ্যাসভাষ্য" বুঝিতে এইজন্য আমাদিগকে স্থির সমনস্ক ও ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে। অধ্যাসভাষ্য ও প্রথম চারি সূত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিলে যেন সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের মর্ম্মার্থ ভেদ হইয়া যাইবে। সেইজন্য ভাষ্যকার তাঁহার সমগ্র প্রতিভা যেন এই অধ্যাসভাষ্যে ও প্রথম চারি সূত্রের ব্যাখ্যায় পর্য্যাপ্ত বিকীর্ণ করিয়াছেন। ক্রমেই আমরা তাহার আভাষ পাইব।

অধ্যাস-ভাষ্য।

ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর সূত্রব্যাখ্যা ভূমিকায় বলিতেছেন :—"আমি" আছি এ বিষয়ে কেহই সন্দেহ করে না। "আমি ভিন্ন" যাবতীয় পদার্থ—যাহা "তুমি" "ইহা" বা "এই" বলিবার যোগ্য তাহা যে "আমা" হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বা পৃথক্ সত্ত্বা, প্রাণিমাত্রেরই এই অসন্দিগ্ধ জ্ঞান আছে। সুতরাং সাধারণ জ্ঞানে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে "আমি" এবং "তদিতর পদার্থ" সম্পূর্ণ পৃথক্,—আলো ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাবাপন্ন। "আমি" জ্ঞানের আলম্বন বা বিষয় এক বই দুই হইতে পারে না, কিন্তু তদিতর পদার্থ বহুরূপে প্রতিভাত হইতেছে। "আমি" জ্ঞানের আলম্বন হইতেছে চেতন স্বভাব আত্মা, জড়জগৎ যাহা সেই আত্মা দ্বারা প্রকাশিত হইয়া, আত্মার ভোগ্যরূপে বর্ত্তমান্ রহিয়াছে, তাহা কখনো (অহংজ্ঞানের জ্ঞেয়) চিৎস্বভাব আত্মার ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতে পারে না, অথবা প্রকাশস্বভাব আত্মায় কোনক্রমেও ইদংপ্রত্যয় গম্য জড়ত্বাদিগুণের সংক্রমণ হইতে পারে না। সাধারণ জ্ঞানে ইহাই বোধগম্য হইয়া থাকে; এবং আরও এই বোধ হয় যে জাগতীক যাবতীয় ব্যবহার সত্যমূলক—বেদান্তশাস্ত্র সমর্থিত অধ্যাস বা ভ্রমমূলক নহে।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন আচ্ছা মানিলাম অহংজ্ঞানের জ্ঞেয় আত্মাতে, আত্ম প্রকাশ্য জড়জগতের অন্যোন্যাধ্যাস অসম্ভব। কিন্তু তোমার "আমি" জ্ঞানের আলম্বন বা বিষয়টী কি? তুমি জড় শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কখন বলিতেছ—আমি এই শরীর—জড়শরীরের ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া কখনো বলিতেছ—আমি বালক—যুবক—বৃদ্ধ—স্থূল—কৃশ—কাণ—কুব্জ—অন্ধ ইত্যাদি। মানসিক ধর্ম্ম অধ্যস্ত হইয়া কখনো বলিতেছ—আমি দুঃখী—সুখী—বদ্ধ—মুক্ত। এইরূপ অজ্ঞ অবস্থায় আমিত্বের আলম্বন বিভিন্নভাবে উদিত হইতেছে। সুতরাং কেবল অহংবৃত্তির প্রকাশ্য যে "আমি" তাহা "আমার" স্থির বা অব্যভিচরিত স্বরূপ হইতে পারে না। অর্থাৎ যে অহংবৃত্তি কখনো দেহ অবলম্বনে উঠিতেছে, কখনো ইন্দ্রিয়ের, কখনো বা মনের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উঠিতেছে তাহা "আমার" যথার্থ স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ব্যবহারকালে ইহা না বুঝিলেও একান্তমনে তাহা কখনো বুঝিতে পারা যায়। যে জ্ঞানের ব্যভিচার আছে, তাহা মিথ্যা বই সত্য হইতে পারে না। নানাভাব ধরিয়া নানাভাবে অহংজ্ঞানের উত্থান হয়, এইজন্য সংসার দশায় অহংজ্ঞান সন্দিগ্ধ-অপ্রমা ও মিথ্যা। সুতরাং তুমি যে

পূর্ব্বপক্ষস্থলে বলিয়াছিলে, অহংজ্ঞানগম্য চিদাত্মায় জড়দেহাদির প্রাতিভাসিক জ্ঞান হয় না, তাহা মিথ্যা হইয়াই দাঁড়াইতেছে। এইজন্যই সিদ্ধান্তপক্ষে বলিতেছি অনাদি অবিবেকবশতঃ অত্যন্ত বিবিক্ত চিদাত্মায় অনাত্মধর্ম্ম আরোপ করিয়া প্রাণীমাত্রই সংসার দশায় "আমি" "আমার" ইত্যাদি ব্যবহার করিতেছে। এই ব্যবহার জ্ঞান সত্য মিথ্যা উভয় মিলিত এবং আধ্যাসিক। ইহার উচ্ছেদেই জীবের মুক্তি লাভ হয়।

অধ্যাস কি? এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। এক বস্তুসত্ত্বাতে অন্য বস্তুসত্ত্বা আরোপ হইলে তাহাকে অধ্যাস বলা যায়। "রাম" আমার বন্ধু, তাহাকে অপরোক্ষ প্রত্যক্ষ করিয়া "রামে" যে "রামজ্ঞান" তাহা প্রমাজ্ঞান। অপরিচিত "শ্যাম" নামধারী ব্যক্তিবিশেষকে দূরে দর্শন করিয়া "শ্যাম"কে "রাম" বলিয়া নির্দ্ধারণ করা অধ্যাসের ফল। দড়াতে দড়া জ্ঞান যথার্থ বা প্রমাজ্ঞান। দড়াকে সর্প বোধ করা আধ্যাসিক জ্ঞানের পরিণতি। অতি বিবিক্ত চিদাত্মায় অভেদাত্মানুভূতি হচ্ছে অপরোক্ষ প্রমাজ্ঞান। শরীরে আত্মবোধ অধ্যাসমূলক। তুমি যখন শ্যামকে রাম বলিয়া দর্শন করিলে, ঝিনুককে রূপা বলিয়া অনুভব করিলে, দড়িকে সর্প বলিয়া বুদ্ধিস্থ করিলে, তখনো কিন্তু অধ্যস্ত পদার্থে স্বরূপ বস্তুর বা স্বরূপ বস্তুতে আরোপিত পদার্থের গুণধর্ম্মাদি কিছুমাত্র অনুপ্রবেশ করে নাই। অর্থাৎ দড়িটা সর্প হইয়া যায় নাই, মরুমরীচিকা জল হইয়া যায় নাই--প্রকৃত বিবিক্ত আত্মা দেহাদি হইয়া যায় নাই। সুতরাং অধ্যাস হইলেই যে জাড্য চেতনাদি ধর্ম্মের স্ব স্ব রূপের ব্যভিচার হইবে তাহা নহে। অধ্যাসবশতঃ বস্তুস্বরূপ অন্যোন্যাশ্রয়ী বলিয়া মনে হয় মাত্র; কিন্তু স্বরূপাদি যেমনি তেমনি থাকে। বিশেষভাবে এই কথা পরে বলা যাইতেছে।

এখন অধ্যাসের স্বরূপ কি তাহাই উক্ত হইতেছে। অধ্যাস একপ্রকার ভ্রান্তিজ্ঞান যাহা স্মৃতিজ্ঞানের ন্যায় উদিত হইয়া এক বস্তুকে অন্যের মত প্রদর্শন করে। সুতরাং বলিতে হইবে এক পদার্থে পদার্থান্তরের অনুভূতি পার্থক্যের অভাব বশতই উৎপন্ন হয়। রজ্জুতে ও সর্পে বস্তুগত্যা পার্থক্য থাকিলেও রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হওয়ার সময় উভয়ের বস্তুগত্যা বিভিন্নতা উপলব্ধি হয় না। কিন্তু রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া অবগত হওয়ার পরে উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য কেহ বলেন পৃথকত্বের অভাব হইতেই অধ্যাস উৎপন্ন হয়। অপরে বলেন যাহা যাহার ধর্ম্ম তাহাতে তাহার বিপরীত ধর্ম্ম কল্পনা করার নাম অধ্যাস। স্থানুতে মনুষ্য বুদ্ধি অথবা মরীচিতে জল ভ্রমস্থলে

বিপরীত ধর্ম্মের যে আরোপ হয় একথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। সুতরাং যে কোন কারণেই এই অধ্যাস উপস্থিত হউক না কেন বুঝিতে হইবে ভ্রমের আধার সত্য হইলেও প্রতীত বিষয় মিথ্যা বা ভ্রান্তির আস্পদ। এই অধ্যাস বা ভ্রান্তিজ্ঞান "আকাশ-কুসুমবৎ" একান্ত মিথ্যা হইতে পারে না, কারণ একান্ত মিথ্যা বিষয়ের কোনরূপ জ্ঞান হইতেই পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে আধ্যাসিক জ্ঞান সত্যও নহে একান্ত মিথ্যাও নহে, তবে সদসদাত্মক ও অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু এই আধ্যাসিক জ্ঞান যে প্রজ্ঞাবস্থায় নিঃশেষ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এস্থলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এই "অনির্ব্বচনীয়" খ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা তুলিয়া নিজের "সৎখ্যাতি"বাদের স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন। রামানুজ নিজ দর্শনে জীব, ব্রহ্ম ও জগতের নিত্যপ্রায়তা স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং এই নিত্যত্ব বজায় রাখিতে তিনি যে অনির্ব্বাচ্য অধ্যাসবাদের বাদী হইয়া দাঁড়াইবেন তাহাতে বিচিত্র কি? অধ্যাসবাদ প্রসঙ্গে শাঙ্কর মতে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপন্ন করিবার জন্য বাধ্য হইয়া এইস্থলে আমাদিগকে এইজন্য রামানুজ মতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইতেছে। পাঠকগণের বিবিদিষা ঔৎসুক্য নিরাকরণকল্পে সামান্যভাবে এই বিবাদের আলোচনা করিতেছি।

(ক্রমশঃ

৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

বিশ্বাসের তুঙ্গ গিরি—জ্ঞানে গুরু বৃহস্পতি—
পরা ভক্তি মূর্ত্তিমান্—নাট্যকার-মহারথি,
গুরুপদ ধ্যান বলে, গৃহে করি অবস্থান,
সন্ন্যাসীর উচ্চাদর্শ লভিলে পদ নির্ব্বাণ॥

সংসারীর কাছে তুমি—মহাবুদ্ধি মহাজন,
বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তব গ্যারিকের উচ্চাসন।
সাহিত্য-আকাশে তুমি প্রভাতী উজলতারা
লেখনীতরঙ্গভঙ্গে বঙ্গভূমি মাতোয়ারা॥

রামকৃষ্ণসঙ্ঘে তুমি গৃহীর আদর্শ স্থান
পূজনীয় দেবতার—গুরুকৃপা-মূর্ত্তিমান্।
রামকৃষ্ণপদে করি "তনমন" সমর্পণ
বকল্মার সাক্ষীরূপে কাটাইলে আজীবন।

বিপরীত দ্বন্দ্বভাব দেখাইতে একাধারে
এনেছিল রামকৃষ্ণ বুঝি তোমা সঙ্গে ক'রে
"ভৈরবের অবতার" ভয়শূন্য কর্ম্মবীর
শক্রমিত্র-উদাসীন তব কাছে নতশির।

বিধিনিষেধের ভাব ছিল তব ভয়ঙ্কর,
তাই বকল্মার ভার নিয়ে গুরু দিল বর—
"যাহা ইচ্ছে এ জীবনে, ক'রে নে নির্ভয় মনে
বিশ্বাসে হইবে পার—সাধন ভজন বিনে"
গুরুবাক্য সত্য করি দেখাইলে এ জীবনে।

ভগবান্ রামকৃষ্ণ-শ্রীপদে বিক্রীতশির
মহাশক্তিকৃপা লভি "অকৃপা" যাচিলে বীর।
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান গুণাতীত ভগবান্
রামকৃষ্ণরূপে এসে উদিত জগতী তলে—
চিনেছিলে দৃষ্টিমাত্র "পাঁচশিকে" বুদ্ধিবলে॥

সংসার তাপিত তব শুনিয়ে অভয় বাণী,
আশায় বাঁধিল বুক—পঙ্গু লঙ্ঘিল ধরণী
"রামকৃষ্ণ দয়াবান্ হবে নাকো সন্দিহান্"
বিশ্বাসপ্রবণ প্রাণে বলিয়াছ কতবার।
"জরা মৃত্যু মাঝে দয়াহস্ত প্রসারিত তাঁর।"

"অরূপ" "রূপের ঘর" হেরিয়াছ কতবার
উপলব্ধি কথা ছলে রামকৃষ্ণে নমস্কার—
করিতে দেখেছি কত, "সন্তান আমি নিন্দিত
ছিপ্ ভাঙ্গা ছেলে বলি করিয়াছ অভিমান।"
রামকৃষ্ণপদ তব চির অভিপ্সীত স্থান॥

দক্ষিণেশ্বর মন্দির—ভবতারিণীর স্থান
রামকৃষ্ণ অধিষ্ঠানে যথা ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্
লোকাচার্য্য নরেন্দ্রাদি বসে যথা নিরবধি
বলিয়াছ কতবার—এই মত স্বর্গ স্থান
তুলনায় ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবলোক—ছাড় জ্ঞান॥

অটল বিশ্বাস তব ছিল গুরু ভ্রাতৃগণে,
দোষগুণ বিচারের অবসর নাহি মনে।
"নিত্য-সিদ্ধ দেবগণ, নরদেহে আগমন
করিয়াছে"—বার বার বলিয়াছ দার্ঢ্য করি।
"রামকৃষ্ণ নামে মুক্ত কি সন্ন্যাসী কি সংসারী।"

অপার করুণা তব হেরিয়াছি দীনজনে,
একবার রামকৃষ্ণ নাম যে নিল বদনে
গৃহীর ভরসা স্থল প্রেম উৎস নিরমল
পথ দেখাইয়া দিলে কত ভ্রান্ত পান্থ জনে
ত্রিতাপ-হরণ শান্তি বারি দিলে দগ্ধপ্রাণে॥

"ধর্ম্মপথে কঠোরতা" "বড় বিঘ্ন অন্তরায়"
বলিতে শুনিনু মুখে—"সরলে অভীষ্ট পায়।"
আনন্দে যে ভজে ইষ্ট, তাহে ভগবান্ তুষ্ট
কঠোরীর কাছে তিনি বহুদূর—বহু বক্র
বিধি নিষেধের গণ্ডী ভেঙ্গে পায় মধুচক্র।

"কোন্ পথে পাব শান্তি"—জিজ্ঞাসিলে তব স্থান
বলিতে "বসিয়ে ভাই কর রামকৃষ্ণ নাম!
ইতে না পাইলে শান্তি জানি ধর্ম্ম কর্ম্ম ভ্রান্তি
রামকৃষ্ণ নামে যদি অভীষ্ট না পূর্ণ হয়
কোটি কল্প যেন মোর নিরয়ে বসতি রয়।"

বিশ্বাস বিস্ফার নেত্র—বদনে প্রশান্ত জ্যোতি
অযুত ভাবের উৎস—হৃদয়ে ইষ্ট বসতি,
স্থূলমূর্ত্তি দীপ্তিমান্ দয়া ধর্ম্ম দ্রবমান্
শতমুখে রামকৃষ্ণ মহাম্বোধি পানে ধায়
বঙ্গের গৌরব তুমি—কোটিপতি তব পায়॥

আগমনী।

১।

ভারতের সুপ্তপ্রাণ গৃহে গৃহে উঠিল জাগিয়া,
বোধনের বাজিছে বাজনা ;
দশদিক উজলি শরতে,
প্রেরণায় দিব্যরশ্মিপথে
নীরবে, অলক্ষ্যে, ওই এসেছে মা দশপ্রহরণা !
দৈন্য অবসাদ ভেদি' হৃদয়—সঞ্চারে
হের তাঁর স্পন্দিত করুণা।

২।

জাগ সুপ্ত, নিরানন্দ ! উঠ স্বার্থকুহকমগন !
আগমনী করহে ঘোষণা ;
মৃন্ময়ীর পূজা তুচ্ছ জ্ঞানে,
অথবা দরিদ্র ভাবি মনে,
আজো এ আনন্দহাটে কে সন্তান আসিতে চাহনা,
দূরে ফেল ও বিজ্ঞতা, দুখরোমন্থন,
মা'র ছেলে প্রৌঢ়ের অঙ্গনা ?

৩।

হের মন, দ্বিপঞ্চাশ-মহাপীঠে, আর ঘরে ঘরে
দেশজোড়া পূজার আঙিনা !
বর্ষে বর্ষে বহু যুগ ধরি,
সন্তানের চুম্বি শিরোপরি,
অমৃতত্ব-জয়টীকা ভালে দেন উমা ত্রিনয়না,
মরতে জিনিয়া মৃত্যু, জয়মন্ত্র সেই
বিশ্বজনে করিতে ঘোষণা।

৪।

বিজয়ার দান সেই ভুলোনা ভুলোনা হে মানব!
জন্মিয়াছ ভারতে যে জনা,
একবার তমো পরিহরি
জাগ অমৃতের অধিকারি!
দ্বারে মা মোক্ষদা যাচে ত্যাগের সে পূজা অতুলন,
একযাগে একযোগে উঠ উঠ বীর!
বিশ্বমুক্তি তোমার যাজনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ।

[স্বামী সারদানন্দ]

সাধনার প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বর দর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। তখনও এমন কোন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হন্ নাই যিনি তাঁহাকে সকল বিষয়ে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ পথে চালিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করিবেন। সুতরাং সকল ধর্ম্মের সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহরূপ সাধারণ বিধিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৺জগদম্বার দর্শন লাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হইল যে, বাহ্যিক কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে ঐ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কতদূর হওয়া আবশ্যক তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলেই সে কথা আমাদের স্পষ্ট প্রতীতি হয়। আমরা দেখিয়াছি, ঐ তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় তাঁহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাস সকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল, এবং শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, জীবন রক্ষার দিকেও কিছুমাত্র

লক্ষ্য ছিল না! ঠাকুর বলিতেন, "শরীর সংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলা মাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলেই মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে পক্ষিসকল জড়পদার্থ জ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশ মধ্যগত ধূলীরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত। আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত! ঐরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময়ে চলিয়া যাইত তাহার হুঁসই থাকিত না। পরে, সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত, দিবাশেষ হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না, আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা, এখনও দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ক্রন্দনে দিক্ পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতাম। লোকে বলিত, পেটে শূল ব্যথা ধরিয়াছে তাই অত কাঁদিতেছে।" ইহার বহুকাল পরে যখন আমরা ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি তখন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের জন্য প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে পূর্ব্বোক্ত কথা সকল শুনাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—"লোকে পত্নী পুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয় হারাইয়া ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ হইল না বলিয়া কে আর ঐরূপ করে বল? অথচ বলে, 'তাঁহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না।' ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন করুক্ দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন।" কথাগুলি আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিত, শুনিলেই বুঝা যাইত, তিনি নিজ পূর্ব্ব জীবনে ঐকথা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত নিঃসংশয়ে উহা এখন বলিতে পারিতেছেন।

আবার সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৺জগদম্বার দর্শন মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভাবমুখে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভের পর নিজ কুলদেবতা ৺রঘুবীরের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং মহাবীর হনুমানের ন্যায় দাস্য ভক্তির সহায়েই তাঁহার দর্শন লাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্য ভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ

করিয়া সাধনায় কিছু দিনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, এ সময়ে তিনি নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এতদূর তন্ময় হইয়া যান্ যে, আপনার পৃথক অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকালের জন্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন! তিনি বলিতেন, "এ সময়ে আহার বিহারাদি বাহ্যিক সকল কার্য্যই হনুমানের ন্যায় করিতে হইত!—ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনিই ঐরূপ হইয়া পড়িত। পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না—তাহাও আবার খোসা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরে উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম। এবং নিরন্তর মধ্যে মধ্যে 'রঘুবীর রঘুবীর' বলিয়া গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতাম! চক্ষুদ্বয় তখন ঐ জাতীয় পশুর ন্যায় সর্ব্বদা আরক্ত ও চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।" * শুনিয়া, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয়, আপনার শরীরের ঐ অংশ কি এখনও ঐরূপ আছে?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"না, মনের উপর হইতে ঐ ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবার পরে, কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছিল।"

মহাবীরের সাধনার সময়ে ঠাকুরের জীবনে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব দর্শন ও অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দর্শন ও অনুভব, তাঁহার ইতিপূর্ব্বের দর্শন প্রত্যক্ষাদি হইতে এতই নূতন ধরণের ছিল যে, উহা তাঁহার মনে গম্ভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া স্মৃতিতে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। তিনি বলিতেন, "এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসিয়া আছি—তখন ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে, অমনি বসিয়া ছিলাম—এমন সময়ে এক নিরুপমা জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া স্থানটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্ত্তিটিকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটীর গাছ পালা গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম মূর্ত্তিটি মানবীর, কারণ ত্রিনয়নাদি দেবীলক্ষণ তাহাতে নাই। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতাপূর্ণ মুখের সে অপূর্ব্ব গম্ভীরভাব ও শক্তি দেবীমূর্ত্তি সকলেও সচরাচর দেখা যায় না! দেখিলাম, প্রসন্ন-গম্ভীরদৃষ্টিতে আমার দিকে দেখিতে দেখিতে ঐ দেবী-মানবী ধীরপদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে, আমার

* Enlargement of the Coc-cyx.

দিকে অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 'কে ইনি?' এমন সময়ে একটা হনুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ করিয়া শব্দ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া উপবিষ্ট হইল এবং মনের ভিতরে কে বলিয়া উঠিল 'সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, 'রামময়জীবিতা সীতা! তখন 'মা', 'মা' বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি এমন সময়ে তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন!—আমিও আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যান চিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই, ইহাই ঐরূপ ভাবে প্রথম দর্শন। জনম-দুঃখিনী সীতাকে ঐরূপে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় আজন্ম এত দুঃখভোগ করিতেছি।"

তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ঠাকুর এই সময়েই হৃদয়ের নিকট একটি নূতন পঞ্চবটী স্থাপনের বাসনা প্রকাশন করেন। হৃদয় বলিত, "পঞ্চবটীর নিকটবর্ত্তী 'হাঁসপুকুর' খ্যাত ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটি তখন ঝালান হইয়াছে এবং পুরাতন অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষের নিকটস্থ নিম্ন জমীখণ্ড ঐ মাটিতে ভরাট করিয়া সমতল করা হওয়ায় ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে যে আমলকী বৃক্ষের নিম্নে ধ্যান করিতেন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।' তখন, এখন যেখানে সাধনকুটির আছে তাহারই পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিয়া হৃদয়কে দিয়া বট, নিম্ব, বেল ও আমলকী বৃক্ষের এক একটি চারা রোপণ করাইলেন এবং অনেকগুলি তুলসী ও অপরাজিতার চারা পুতিয়া সমগ্র স্থানটিকে বেষ্টন করাইয়া লইলেন। গোরু ছাগলের হস্ত হইতে ঐ সকল চারা গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে অদ্ভুত উপায়ে ঠাকুর 'ভর্ত্তাভারী' নামক ঠাকুরবাটীর উদ্যানের জনৈক মালীর সাহায্যে ঐ স্থানে বেড়া লাগাইয়াছিলেন তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।* ঠাকুরের যত্ন ও নিয়মিত জলসিঞ্চনে গাছগুলি অতি শীঘ্রই এত বড় ও নিবিড় হইয়া উঠে যে, উহার ভিতরে বসিয়া যখন তিনি ধ্যান করিতেন তখন ঐ স্থানের বাহিরের ব্যক্তিরা তাঁহাকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না।

রাণী রাসমণির কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পর হইতেই গঙ্গাসাগর ও ৺জগন্নাথ দর্শন প্রয়াসী পথিক সাধুকুল, ঐ তীর্থদ্বয়ে যাইবার ও সেখান হইতে আসিবার কালে, কয়েক দিনের জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্না রাণীর

* গুরুভাব। পূর্ব্বার্দ্ধ ৭৭পৃষ্ঠা।

আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটিতে বিশ্রাম করিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। * ঐরূপে ঐ কাল হইতে বিশিষ্ট সাধক ও কখন কখন সিদ্ধপুরুষেরাও এখানে পদার্পণ করিতেন। ইঁহাদিগের কাহারও নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে প্রাণায়ামাদি হট্‌যোগের ক্রিয়া সকলও অভ্যাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নিম্নলিখিত হলধারী-সম্পর্কীয় ঘটনাটি বলিতে বলিতে একদিন তিনি আমাদিগকে ঐ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ঐরূপে হট-যোগোক্ত ক্রিয়া সকল স্বয়ং অভ্যাস ও উহাদিগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি পরজীবনে আমাদিগকে ঐ সকল অভ্যাস করিতে নিষেধ করিতেন। আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কখন কখন ঐ বিষয়ের উপদেশ লাভের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তর পাইয়াছে—"ও সকল সাধন একালের পক্ষে নয়। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অন্নগত প্রাণ, এখন হটযোগ অভ্যাস করিয়া শরীর দৃঢ় করিয়া লইয়া রাজযোগ অভ্যাস করিবে, ঈশ্বরকে ডাকিবে তাহার সময় কোথায়? আবার হটযোগের ঐ সকল ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইলে ঐ বিষয়ে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকিয়া আহার বিহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত বিশেষ কঠোর নিয়মে চলিতে হয়, নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত হয় এবং অনেক সময়ে সাধকের মৃত্যুও হইয়া থাকে। সেজন্য ওসকল করিবার আবশ্যকতা নাই। আর এক কথা, মন নিরোধের জন্যই ত প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি করিয়া বায়ু নিরোধ করা? ঈশ্বরের ভক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই আপনা আপনি নিরুদ্ধ হইয়া আসিবে, দেখিতে পাইবে। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অল্পশক্তি বলিয়াই ভগবান কৃপা করিয়া তাহার জন্য ঈশ্বরলাভের পথ এত সুগম করিয়া দিয়াছেন যে, স্ত্রী পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আসে, ঈশ্বরের জন্য সেইরূপ ব্যাকুলতা চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র কাহার প্রাণে স্থায়ী হইলেই তিনি একালে তাহাকে দেখা দিবেনই দিবেন।"

লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র একস্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি যে, বর্ত্তমানকালে ভারতে স্মৃত্যনুসারী সাধক ভক্তেরা প্রায়ই অনুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ঐরূপ ব্যক্তিরা প্রায়ই পরকীয়া প্রেমসাধন-রূপ পথে ধাবিত হন।† হলধারী বৈষ্ণব সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাচারী ছিলেন একথা ইতিপূর্ব্বেই আমরা পাঠককে বলিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাগোবিন্দজীর

* গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ ৪৬ পৃষ্ঠা। † গুরুভাব। উত্তরার্দ্ধ ৩২ পৃষ্ঠা।

পূজায় কিছুকাল নিযুক্ত হইবার পরে তিনিও গোপনে পূর্ব্বোক্তরূপ সাধনপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রমে লোকে সে কথা জানিতে পারিয়া কাণাকাণি করিতে থাকে, কিন্তু হলধারী যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই হইবে, এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহার কোপে পড়িবার আশঙ্কায় কেহই ঐ কথা লইয়া তাঁহার সম্মুখে আলোচনা ও হাস্ত-পরিহাসাদি করিতে সাহসী হইত না। ক্রমে ঠাকুরও অগ্রজের ঐরূপ আচরণের কথা লোকমুখে জানিতে পারিলেন। স্পষ্টবক্তা নির্ভীক ঠাকুর তখন লোকে নিন্দাবাদ করিতেছে দেখিয়া হলধারীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। হলধারী তাহাতে সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন—"কনিষ্ঠ হইয়া তুই আমাকে এইরূপে অবজ্ঞা করিলি? তোর মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে।" ঠাকুর তখন তাঁহাকে ঐ বিষয় বলিবার কারণ বুঝাইয়া নানারূপে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি সে সময়ে কোন কথাই আর শ্রবণ করিলেন না।

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে এক দিন, রাত্রি ৮।৯টা আন্দাজ সময়ে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা সাতিশয় সড় সড় করিয়া মুখ দিয়া সত্য সত্যই রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—"সিম্ পাতার রসের মত তার মিস্ কালো রং,—এত গাঢ় যে কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতরেই জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাঁত হইতে বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না। দেখিয়া বড় ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। হলধারী তখন মন্দিরে সেবার কাজ সারিতেছিল, ঐ সংবাদে সেও ভয় পাইয়া সসব্যস্তে আসিয়া পড়িল। তাকে দেখিয়া সজলনয়নে বলিলাম, 'দাদা, শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবস্থা কর্‌লে দেখ দেখি?' আমার কাতরতা দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।

"ঠাকুরবাড়িতে সে দিন একজন ভাল সাধু আসিয়াছিলেন। গোলমাল শুনিয়া তিনি ঐ সময়ে আসিয়া পড়িলেন এবং রক্তের রং ও মুখের ভিতরে যে স্থানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, রক্ত বাহির হইয়া বড় ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা করিতে। ঐ সাধনা প্রভাবে তোমার সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা যে এইরূপে মুখের ভিতরে একটা নির্গত হইবার দ্বার আপনা আপনি

করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল ইহাতে বড়ই ভাল হইল। ঐ রক্ত মাথায় উঠিলে তোমার জড়সমাধি হইত এবং ঐ সমাধি আর কিছুতেই ভাঙ্গিত না। তোমার শরীরটার দ্বারা জগন্মাতার বিশেষ কোন কার্য্য আছে, তাই উহাকে এই রূপে রক্ষা করিলেন, বোধ হইতেছে।' সাধুর ঐ কথা শুনিয়া যেন প্রাণ পাইলাম।" কাকতালীয়ের ন্যায় হউক বা যেরূপেই হউক ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ ঐরূপে সফলতা দেখাইয়া পরিশেষে বরে পরিণত হইয়াছিল।

হলধারীর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধে বেশ একটা মধুর রহস্যের ভাব ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হলধারী ঠাকুরের খুল্লতাত-পুত্র ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আন্দাজ ১২০৬ সালে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তিনি ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজাকার্য্যে ব্রতী হন্ এবং আন্দাজ ১২৭৩ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। অতএব ঠাকুরের সাধনকালের দ্বিতীয় চারি বৎসর এবং তাহার পরেও প্রায় দুই বৎসর কাল তিনি দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া ঠাকুরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তত্রাচ তিনি ঐ কালের মধ্যে ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই! হলধারী নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং ঠাকুরের ভাবাবেশে পরিধানের কাপড, পৈতা প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়াটা তাঁহার ভাল লাগিত না, ভাবিতেন, কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারী অথবা পাগল হইয়াছে। হৃদয় বলিত—"তিনি কখন কখন আমাকে বলিয়াও ফেলিয়াছেন, 'হৃদু, উনি কাপড ফেলিয়া দেন, পৈতা ফেলিয়া দেন, এটা বড দোষের কথা, কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, উনি কি না সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিতে চান? এমন কি উচ্চাবস্থা হইয়াছে যাহাতে উনি ঐরূপ করিতে পারেন? হৃদু, উনি তোমারই কথা যা একটু শুনেন, তোমার উচিত যাহাতে উনি ঐরূপ না করিতে পারেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা, এমন কি বাঁধিয়া রাখিয়াও উঁহাকে যদি তুমি ঐরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পার, তাহাও করা উচিৎ।'"

আবার পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের নয়নে প্রেমধারা, ভগবদ্ গুণ শ্রবণে অদ্ভুত উল্লাস ও ভগবদ্দর্শন লাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের ঐসকল অবস্থা ঐশ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে, নতুবা মানুষের কখন তো ঐরূপ হইতে দেখা যায় না! দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া হলধারী কখন কখন আবার হৃদয়কে বলিতেন, 'হৃদয় তুমি

নিশ্চয় উঁহার ভিতর হইতে কোনরূপ আশ্চর্য্যদর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত করিয়া কখন সেবা করিতে না।'

ঐরূপে হলধারীর মন সর্ব্বদা সন্দেহে দোলায়মান থাকিয়া ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে পারিত না। ঠাকুর বলিতেন, "হলধারী মন্দিরে পূজাদি কালে তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া কতদিন বলিয়াছে, 'রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।' তাহাতে কখন কখন আমি রহস্য করিয়া বলিতাম, 'দেখো আবার যেন গোলমাল হয়ে যায় না।' সে বলিত, 'এবার আর তোর ফাঁকি দিবার জো নাই, তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে, এবার একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি।' শুনিয়া বলিতাম, 'আচ্ছা দেখা যাবে।' অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ করিয়া হলধারী এক-টিপ নস্য লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা বা অধ্যাত্ম রামায়ণাদিশাস্ত্রবিচার করিতে বসিয়াই অভিমানে একবারে অন্য এক লোক হইয়া যাইত। তখন আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পোড়েচো সে সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝতে পারি।' শুনিয়াই হলধারী বলিয়া উঠিত, 'হাঁ, তুই মূর্খ, তুই আবার এসব কথা বুঝ্‌বি।' আমি বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়া) সত্য বলছি, এর ভিতরে যে আছে সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বোল্‌লে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়।' হলধারী ঐকথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত—'যাঃ যাঃ মুখ্যু কোথাকার, কলিতে কল্কিছাড়া আবার ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে! তুই উন্মাদ হইয়াছিস তাই ঐরূপ ভাবিস।' হাসিয়া বলিতাম—'এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না,'—কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধদিন নয় অনেক দিন হইয়াছিল। পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, উলঙ্গ হইয়া পঞ্চবটীর বটবৃক্ষের ডালে বসিয়া মূত্র ত্যাগ করিতেছি—(বোধ হয় মহাবীরের উপাসনা কালেই ঐরূপ হইয়াছিল)—সেই দিন উহা দেখিয়া সে একেবারে পাকা করিল (স্থির নিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে!"

বৈষ্ণব হলধারীর শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐদিন হইতে তিনি ৺কালী মূর্ত্তিকে তমোগুণময়ী বা তামসী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুরকে ঐকথা বলিয়াও ফেলেন "তামসী

মূর্ত্তির উপাসনায় কখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি? তুমি কেন অত করিয়া ঐ দেবীর আরাধনা কর?' ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া তখনি তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ইষ্টনিন্দা শ্রবণে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইল। অনন্তর কালী মন্দিরে যাইয়া সজল নয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সে তোকে তমোগুণময়ী বলে, তুই কি সত্যই ঐরূপ?" অনন্তর ৺জগদম্বার মুখে ঐ বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—'তুই মাকে তামসী বলিস্? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী।' ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐরূপ কথায় ও স্পর্শে হলধরীর তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি তখন পূজার আসনেই বসিয়াছিলেন—ঠাকুরের ঐকথা অন্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মামা, এই তুমি বল, রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার তাঁহাকে ঐরূপে পূজা করিলে যে?' হলধারী বলিলেন "কি জানি হৃদু, কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে এক রকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রকাশ দেখিতে পাইলাম। কালীমন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই তখনই আমাকে ঐরূপ করিয়া দেয়। এ এক চমৎকার ব্যাপার—কিছু বুঝিতে পারি না।"

ঐরূপে হলধারী, ঠাকুরের ভিতর বারম্বার দৈবী প্রকাশ দেখিতে পাইলেও নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিলেই পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া 'পুনর্মূষিকত্ব' প্রাপ্ত হইতেন। কামকাঞ্চনে আসক্তি দূর না হইলে বাহ্যশৌচ আচার, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি যে বিশেষ কোন কাজে লাগে না এবং মানব সত্য তত্ত্বের ধারণাই করিতে পারে না হলধারীর পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়িতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙ্গালীদিগকে নারায়ণ জ্ঞানে ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের পাত্রাবশেষ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হলধারী উহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'তোর ছেলে মেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয় তাহা দেখিব!'

ঠাকুর বেদান্তজ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া ক্ষোভে ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তবে রে শালা তুই না বলিস, শাস্ত্রে জগৎ মিথ্যা ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে বলেছে? তুই বুঝি ভাবিস্ তোর মত জগৎ মিথ্যা বল্‌বো আবার ছেলে মেয়েও হবে। ধিক্ তোর শাস্ত্রজ্ঞানে।"

আবার বালকস্বভাব ঠাকুরও কখন কখন হলধারীর পাণ্ডিত্যে ভুলিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন। আমরা শুনিয়াছি, ভাবসহায়ে ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি হয় সে সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া শাস্ত্রসহায়ে নির্দ্দেশ করিয়া হলধারী ঠাকুরের মনে একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিলাম, তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়াছি কথা শুনিয়াছি সে সমস্তই ভুল, মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়াছে। মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম—মা নিরক্ষর মুখ্‌খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়—সে কান্নার তোড় (বেগ) আর তখন থামে না। কুঠির ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, সহসা মেজে হইতে কুয়াসার মত ধোঁয়া উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। তার পর দেখি তাহার ভিতরে আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ। ঐ মূর্ত্তি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক।'—তিনবার মাত্র ঐকথাগুলি বলিয়াই ঐমূর্ত্তি ধীরে ধীরে আবার ঐ কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং ঐ কুয়াসার মত ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঐরূপ দেখিয়া তবে সেবার শান্ত হইলাম।" ঘটনাটি ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে স্বমুখে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, হলধারীর কথায় ঐ সন্দেহ আর একবার মনে উঠিয়াছিল, "সেবার স্বয়ং মাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কাঁদিয়া ধরিয়াছিলাম, মা ঐ সময়ে 'রতির মা' নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের বেশে নিকটে আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই ভাবমুখেই থাক্।' আবার পরিব্রাজকাচার্য্য তোতাপুরী গোস্বামী বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাইবার পর ঠাকুর যখন ছয় মাস কাল ধরিয়া নিরন্তর নির্ব্বিকল্প ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তখনও ঐকালের অন্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন—'তুই ভাবমুখে থাক্।'

হলধারী, দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটিতে প্রায় আট বৎসর (সন ১২৬৬ সাল

হইতে ১২৭৩ সাল পর্য্যন্ত) বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং পিশাচবৎ আচারবান পূর্ণজ্ঞানী সাধু, ব্রাহ্মণী, জটাধারী নামক রামায়েৎ সাধু ও শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে পর পর আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনা গিয়াছে, তিনি শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত একত্রে বসিয়া কখন কখন অধ্যাত্ম রামায়ণাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। হলধারী সংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি তাঁহার দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে আটবৎসর থাকিবার কালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইয়াছিল। বলিবার সুবিধার জন্যই আমরা ঐসকল এখানে পাঠককে একত্রে বলিয়া লইলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—,

* * * আমি ক্রমাগত এক স্থান থেকে অপর স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি—সর্ব্বদা কায কচ্চি,—বক্তৃতা দিচ্চি, ক্লাস কচ্চি, এবং লোককে নানা রকমে বেদান্ত শিক্ষা দিচ্চি।

আমি যে বই লেখ্‌বার সংকল্প করেছিলুম, তার জন্যে এখনও এক পঙ্‌ক্তিও লিখ্‌তে পারি নি। সম্ভবতঃ পরে একায হাতে নিতে পার্‌ব। এখানে উদারমতাবলম্বীদের মধ্যে আমি কতকগুলি পরম বন্ধু পেয়েছি, গোঁড়াখ্রীষ্টানদের মধ্যেও কয়েকজনকে করিছি। আশা করি, শীঘ্রই ভারতে ফির্‌বো। এদেশ ত যথেষ্ট ঘাঁটা হোলো, বিশেষতঃ অতিরিক্ত কার্য্যের দরুণ আমাকে দুর্ব্বল করে ফেল্‌ছে। সাধারণের সমক্ষে বিস্তর বক্তৃতা করার দরুণ ও একস্থানে স্থির ভাবে না থেকে ক্রমাগত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সেখানে ঘোরার দরুণ এই দুর্ব্বলতা এসেছে। * * সুতরাং বুঝ্‌ছো, আমি শীঘ্রই ফির্‌ছি। কতকগুলি লোকের আমি খুব প্রিয় হয়ে উঠিছি আর তাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়্‌ছে; তারা অবশ্য চাইবে, আমি এখানে বরাবর থেকে যাই। কিন্তু আমার মনে হচ্চে—খবরের কাগজে নাম বেরুণো এবং সর্ব্বসাধারণের ভিতর কায করার দরুণ ভুয়ো লোকমান্য ত যথেষ্ট হলো—আর কেন? আমার ওসবের একদম ইচ্ছা নেই।

* * * কোন দেশের অধিকাংশ লোকই কখনও কেবল সহানুভূতির বশে লোকের উপকার করে না। খ্রীষ্টিয়ানদের দেশে কতকগুলি লোক যে সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করে, অনেক সময়ে তার ভিতর কোন মতলব থাকে, কিম্বা নরকের ভয়ে ঐরূপ করে থাকে। আমাদের বাঙ্গালাদেশে যেমন চলিত কথায় বলে, "গরু মেরে জুতো দান।" এখানে সেই রকম দানই বেশী। সব যায়গাযই তাই। আবার আমাদের জাতের তুলনায় পাশ্চাত্যদেশবাসীরা অধিক কৃপণ। আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, এসিয়াবাসীরা জগতের সকল জাতের চেয়ে বেশী দানশীল জাত, তবে তারা যে বড় গরীব।

কয়েক মাস আমি নিউইয়র্কে বাস করবার জন্য যাচ্ছি। ঐ সহরটী সমস্ত যুক্তরাজ্যের যেন মাথা, হাত ও ধনভাণ্ডার স্বরূপ। অবশ্য বোষ্টনকে 'ব্রাহ্মণের সহর' (বিদ্যাচর্চ্চাবহুল স্থান) বলে বটে। আমেরিকায় হাজার হাজার লোক রয়েছে, যারা আমার সহিত সহানুভূতি করে থাকে। * * * নিউইয়র্কের লোকগুলি খুব খোলা মন। সেখানে আমার কতকগুলি বিশিষ্ট গণ্যমান্য বন্ধু আছে—দেখি, সেখানে কি কত্তে পারা যায়। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি, এই বক্তৃতা ব্যবসায়ে আমি দিন দিন বিরক্ত হয়ে পড়্‌ছি। পাশ্চাত্য দেশের লোকের পক্ষে ধর্ম্মের উচ্চাদর্শ বুঝ্‌তে এখন বহু দিন লাগ্‌বে। তাদের টাকাই হল সর্ব্বস্ব। যদি কোন ধর্ম্মে টাকা হয়, রোগ সেরে যায়, রূপ হয়, দীর্ঘজীবন লাভের আশা হয়, তবেই সকলে সেই ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকবে, নতুবা নয়। * * *

বা—, জি, জি এবং আমাদের সকল বন্ধুবর্গকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে।

তোমার প্রতি চিরপ্রেমসম্পন্ন

বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—

* * * কল্‌কেতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে যে সব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিষ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। তাদের

মধ্যে কতকগুলি এরূপ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়্‌লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কচ্ছি। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমি একজন রাজনীতিজ্ঞ নই অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল ভিতরের আত্মতত্ত্বের দিকে—সেইটে যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সবই ঠিক হয়ে যাবে—এই আমার মত। * * * অতএব তুমি কল্‌কেতার লোকদের অবশ্য অবশ্য সাবধান করে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভিতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা করে আরোপিত করা না হয়। কি আহাম্মকি! * * শুন্‌লাম, রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুয্যে নাকি খ্রীষ্টিয় মিশনরিদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। যদি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে একথা বলা হ'য়ে থাকে, তবে আমার তরফ থেকে উক্ত বাবুকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি তাঁহার উক্ত কথাটা কল্‌কেতার যে কোন সংবাদপত্রে লিখে হয় প্রমাণ করুন, নতুবা তাঁহার ঐ বাজে আহাম্মকি কথাটার প্রত্যাহার করুন। এটা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে অপদস্থ কর্‌বার খ্রীষ্টান মিশনরিদের একটা কৌশলমাত্র। আমি সাধারণভাবে সমুদয় খ্রীষ্টিয়ান পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ্য করে সরলভাবে সমালোচনার ছলে কয়েকটা কড়া কথা বলেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা তথাবিধ চর্চ্চার দিকে কিছু ঝোঁক আছে অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সংস্রব আছে। যাঁরা ভাবেন, ঐ সব বক্তৃতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে ছাপানো একটা খুব জমকালো ব্যাপার, আর যাঁরা প্রমাণ কত্তে চান যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাঁদের আমি বলি, "হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।" * * *

* * * আমার বন্ধুগণকে বল্‌বে, যাঁরা আমার নিন্দাবাদ কচ্ছেন, তাঁদের কথার আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি তাদের ঢিলটী খেয়ে যদি তাদের পাটকেল মার্‌তে যাই, তবে ত আমি তাদের সঙ্গে এক দরের হয়ে পড়্‌লুম। তাদের বল্‌বে,—সত্য নিজেরি প্রতিষ্ঠা নিজেই কর্‌বে, আমার জন্য তাদের কারো সঙ্গে বিরোধ কর্ত্তে হবে না। তাদের (আমার বন্ধুদের) এখনও ঢের শিখ্‌তে হবে, তারা ত এখনও শিশুতুল্য। তারা বালক—তারা এখনও আহাম্মকের মত সোনার স্বপন দেখ্‌ছে!

* * * সাধারণের সাম্‌নে বেরোনোর দরুন এই ভূয়ো নাম যশ পেয়ে ও খবরের কাগজে নাম বেরিয়ে বেরিয়ে আমি একেবারে দিক্ হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের ভিতর আকাঙ্খা হচ্ছে—হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই,

তোমার প্রতি চিরস্নেহসম্পন্ন

বিবেকানন্দ।

সৌন্দর্য্য সুষমা

(গল্প)

কথায় বলে, 'চল্লেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চল্লেই হতবুদ্ধি।' দুর্দ্দিনের পীড়নে বুদ্ধিমান্ পীতাম্বর একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। হইবারই কথা। বহুদিন নয়, একমাস পূর্ব্বে যে অট্টালিকা জনপূর্ণ ছিল, স্থান কুলাইতনা, আজ সেখানে সকল ঘরে সন্ধ্যা পড়িতেছেনা। একমাস পূর্ব্বে যে স্থল হাস্যকোলাহলে পূর্ণ ছিল, আজ সেথায় কেবল সমীরণ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে, দেখিতে না পাইয়া, হতাশের নিশ্বাস ছাড়িয়া, আবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া কক্ষে কক্ষে বেড়াইতেছে। সেই অন্ধকারপুরে পীতাম্বর একা বসিয়া আছেন, গৃহের কোনে, মুমূর্ষুর জীবনালোকের ন্যায়, মিট্ মিট্ করিয়া একটি দিপ জ্বলিতেছে, আর তাঁহার পার্শ্বে একটি পঞ্চম বর্ষীয়া কুমারী অঘোরে ঘুমাইতেছে। পীতাম্বর ভাবিতেছেন, মাঝে মাঝে চক্ষু মুদ্রিতেছেন, নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, কখন অনিমেষ নেত্রে বালিকার মুখের পানে দেখিতেছেন। হায়, কাল সকালে এও যদি আর না উঠে! যেন ভোজ বাজি, এই ছিল এই নাই। দেবীস্বরূপিনী জননী ছিলেন, লক্ষ্মীস্বরূপিনী গৃহিণী, কুমারসদৃশ তিনটি পুত্র, আজ তাহারা কোথায়।

পঞ্চবিংশতি বর্ষে রিক্ত হস্তে পীতাম্বর সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তারপর পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছে। যত্ন, শ্রম, অধ্যবসায় বলে মানুষ যাহা কিছু করিতে পারে, সকলই হইয়াছিল। এই বিশাল অট্টালিকা— আজ যাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে—তাঁহারই নির্ম্মিত।

প্রভূত অর্থ—আজ যাহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন—তাঁহারই উপার্জ্জিত। ভোগ করিবে কে, এই কন্যা? ভরসা কি? এই ক্ষীণ জীবন দীপ কবে নিভিবে ঠিক কি? ভাবিতে ভাবিতে সহসা একটা ঝটকা আসিয়া ঘরের দীপ নিভাইয়া দিল; পীতাম্বর চমকিয়া উঠিলেন। বালিকা ডাকিল, "বাবা" পাছে আবার একটা ঝটকা আসিয়া এ ক্ষুদ্র দীপটিও নিভাইয়া দেয়, এই আশঙ্কায় পীতাম্বর কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, বুকের উপর আঁটিয়া ধরিলেন। বালিকা বলিল, "বাবা দাদারা কোথায় গেল" এ কথার উত্তর কি? কোথায় গেল, কোথায় গেল, পীতাম্বরের মন নিয়তই এই প্রশ্ন করিতেছে। কোথায় গেল, কোথায় গেল, গৃহের প্রতিকক্ষ তাঁহাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। বালিকা আবার বলিল—"বাবা মা কোথা?" কন্যাকে শান্ত করিবার জন্য পীতাম্বর বলিলেন "স্বর্গে" কিন্তু তাহার মন বলিতে লাগিল—কোথায় গেল, কোথায় গেল। আদর করিয়া পীতাম্বর কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন আদরিণী। আদরিণী আবার বলিল—"বাবা দাদারাও স্বর্গে?" পীতাম্বর বলিলেন, হ্যাঁ মা।

আদরিণী—ঠাকু'মা? পীতাম্বর বলিলেন, তিনিও স্বর্গে।

আদরিণী—বাবা, মা আমায় কেন নিয়ে গেল না, বাবা, আমিও স্বর্গে যাব।

পীতাম্বর—ছিঃ মা, তুমি কেন যাবে?

আদরিণী—তবে মা গেল কেন, ঠাকু'মা গেল কেন, দাদারা গেল কেন?

পীতাম্বর—তাদের অসুখ করেছিল, হাওয়া খেতে গেছে, তুই ঘুমো।

আদরিণী—"তবে তুমিও ঘুমোও।" পীতাম্বর কন্যাকে শূন্যবক্ষে চাপিয়া ধরিয়া শয়ন করিলেন, কন্যা ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু পীতাম্বরের নিদ্রা হইল না। মন কেবলই বলিতেছে, কোথায় গেল, কোথায় গেল।

পীতাম্বর সরকার কৌন্সুলী ডয়েন্ সাহেবের বাবু ছিলেন। ডয়েন্ তখনকার বড় ব্যারিষ্টার, একেবারে একচেটে পসার। লোকে বলিত তিনি অর্থ খুঁজিতেন না, কিন্তু অর্থ তাঁহাকে খুঁজিয়া তাঁহার কাছে আসিত। সাহেব বিবাহ করেন নাই, কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারি করিতেন, পসার প্রতিপত্তিও হইতেছিল, কিন্তু ভাগ্য মানুষকে সকল সুখে সুখী করে না। এক রমণীর প্রেমে বঞ্চিত হইয়া ডয়েন জন্মভূমি ত্যাগ করেন। সেও ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। কলিকাতায় আসিয়াই সাহেবের পসার হয় নাই। পাঁচবৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল, এইসময় তাঁহার পুরাতন

বাবুটি মরিয়া গেলে, পীতাম্বর তাঁহার কাছে নিযুক্ত হন। পীতাম্বরের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবেরও সুদিন আসিল। সাহেব বলিতেন 'পয়মন্ত' একটা কথা আছে, সেটা সত্য। পীতাম্বরের উপর সুনজর পড়িল, যাহাতে তাঁহার দুপয়সা উপার্জ্জন হয়, সাহেব তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। যে মোকদ্দমায় তাঁহার দশ মোহর ফিঃ, মক্কেলকে সেই মোকদ্দমায় পীতাম্বরকে এক মোহর দিতে হইত। না দিলে সাহেব সে মোকদ্দমায় বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন না। পীতাম্বরের বেশ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। দেশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। ক্রমে একটি, দুটী, তিনটি সন্তান হইল, তারপর আদরিণী। তখনকার রীতি ছিল, লোক উপার্জ্জন করিলে একা ভোগ করিত না। পীতাম্বরের গৃহে অর্থহীন আত্মীয়গণ একে একে আশ্রয় লইতে লাগিলেন। গৃহ ক্রমে জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। ২৫ বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর পীতাম্বরের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্ত গেল। প্রথম, তিন দিনের জ্বরে তাঁহার মাতা লোকান্তরিতা হইলেন, একটা ঘটার শ্রাদ্ধ হইবে তাহারই ফর্দ্দ হইতেছে, এমন সময় তাঁহার গৃহিণী সেই তিনদিনের জ্বরে শাশুড়ীর অনুগমন করিলেন। ক্রমে সংবাদ আসিতে লাগিল পল্লীতে হেথা সেথা দুই তিনদিনের জ্বরে দুই একটি করিয়া লোক মরিতেছে। পীতাম্বর ত্বরায় দেশত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু সময় যখন বিরূপ হয়, কে তাহার প্রতিরোধ করিবে? দেখিতে দেখিতে তিনটি পুত্র মারা গেল। গৃহে আত্মীয় স্বজন যাহারা ছিল, তাহারা কেহ মরিল, কেহ পলাইল। চক্ষের উপর বিশাল অট্টালিকা জনশূন্য হইয়া গেল। জননীর মৃত্যু হইতে একমাসমাত্র অতিবাহিত হইয়াছে, আজ কনিষ্ঠ পুত্রটিকে শ্মশানভূমে রাখিয়া পীতাম্বর গৃহে ফিরিয়াছেন। আদরিণীকে বুকে লইয়া শয়ন করিলেন কিন্তু নিদ্রা কিছুতেই তাঁহার নয়ন স্পর্শ করিলনা। অন্ধকারকক্ষে অন্ধকার হৃদয়ে কেবলই একটা অর্থশূন্য কথার উদয় হইতে লাগিল—কোথায় গেল কোথায় গেল।

পীতাম্বর পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়াছিলেন, ছুটির এখনও অনেক বাকী। কন্যা লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য সাহেব 'তার' করিয়াছেন। আদরিণীকে লইয়া পীতাম্বর পরদিনই যাত্রা করিলেন। ডয়েন্ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, দেখিলেন, একমাস পূর্ব্বে যে পীতাম্বরকে তিনি বিদায় দিয়াছিলেন, সে পীতাম্বর আর নাই। বাহিরে যেরূপ পরিবর্ত্তন, পীতাম্বরের মনেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পশ্চাতে নিষ্ফল জীবন, সম্মুখে আশাশূন্য ভবিষ্যৎ।

সাহেব আদরিণীকে কোলে লইলেন, পীতাম্বরকে আপনার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে বাসায় পহুঁছাইয়া দিয়া, বাটী গেলেন। কিন্তু অপরাহ্নে তাঁহার কাছে পত্র পৌছিল, পীতাম্বরের জ্বর হইয়াছে এবং তিনি সাহেবকে শীঘ্র দেখা করিতে লিখিয়াছেন। সাহেব আসিয়া দেখিলেন পীতাম্বরের জ্বর, তাহার বুক শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনের ভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন, "ভয় কি?" পীতাম্বর ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সাহেব ভরসা ভয় এসকল কথা আর কেন? আমার ডাক আসিয়াছে, সেইজন্যই আপনাকে ডাকিয়াছি।" ডয়েন্ চমৎকার বাঙ্গালা বলিতে পারিতেন, বাঙ্গালাতেই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সাহেব বলিলেন, "নিরাশ হইওনা। দেখ, তোমার জীবনে এই কন্যা উপলক্ষ্য রহিয়াছে, কিন্তু আমার কিছু নাই, তবু আমি জীবন ধারণ করিতেছি, উপার্জ্জন করিতেছি। তুমি হিন্দু, তোমাদেরই শাস্ত্রে বলে সংসার অনিত্য। জীবনের উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য পালন। সত্য, গুরু শোক পাইয়াছ, কিন্তু গুরুতর কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে। তোমার এই হতভাগিনী কন্যাটিকে মানুষ করিতে হইবে, তারপর ইহার বিবাহ দিয়া, তোমার ছুটি।"

পীতাম্বর বলিলেন—"সত্য, কিন্তু, সাহেব, বিধাতার বিধান সব সময় মানুষের ইচ্ছানুযায়ী হয় না।"

বালিকা একবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সাহেবের মুখপানে ও একবার পীতাম্বরের মুখপানে চাহিতেছিল, সহসা বলিয়া উঠিল, "বাবা তুমিও কি স্বর্গে যাবে?" পীতাম্বর, তাঁহার অভাবে, কন্যার মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন, হ্যাঁ মা, আমি তোমার মাকে, দাদাদের আন্তে যাব।"

ডয়েন্ বলিলেন—"কি বলিতেছ?"

পীতাম্বর—সাহেব, বালিকার যখন মন কেমন করে, আমায় জিজ্ঞাসা করে মা, দাদারা কোথায়? ইহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিয়াছি, অসুখ হয়েছিল, স্বর্গে হাওয়া খেতে গিয়েছে।

ডয়েন্—বাবু, ভরসা বাঁধ, আমি এখনি আমার ডাক্তার ডাকিয়া আনিতেছি।

সাহেব উঠিলেন। পীতাম্বর বলিলেন, "সাহেব, অনুগ্রহ করিয়া বসুন। আমার যে কটা কথা আছে বলি। হয়ত আর বলিবার সময় পাইবনা। এ জ্বর আমি চিনেছি। কিছু পরেই আমার চৈতন্য লোপ হইবে, কথাও ফুরাইবে। এ হতভাগিনীর কেহ রহিলনা। পিতা বলুন, মাতা বলুন, আপনিই এখন

ইহার সব। সাহেব, আমায় ভরসা দিন, মেয়েটিকে পায়ে রাখিবেন, আমি সুস্থ হই।

ডয়েন্—তোমার আশঙ্কা যদি সত্য হয়, তোমার কন্যাকে আমি আমার কন্যার মত পালন করিব। কিন্তু বৃথা ভয়, কেন তুমি কাতর হইতেছ? আমি এখনই ডাক্তার লইয়া আসিতেছি। এ তোমার হতাশে জ্বর, কোন চিন্তা নাই, আমি এখনই ডাক্তার আনিতেছি।

পীতাম্বর বলিলেন—"ভাল, তাহলেই ভাল। কিন্তু মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। ব্যাঙ্কে আমার একলক্ষটাকা জমা আছে, এই ব্যাঙ্কবই নিন্,. ইহাতেই আমি আপনাকে অছি নিযুক্ত করিয়া দুই লাইন লিখিয়া দিয়াছি।"

পীতাম্বর সাহেবের হাতে ব্যাঙ্কবই দিয়াই যেন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোর নিদ্রা তাঁহাকে অভিভূত করিল।

সাহেব বলিলেন—"আমি এখনই ফিরিতেছি, ভয় নাই।" কিন্তু তাঁহার মনে হইল, সে আশ্বাস বাক্য পীতাম্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল না। সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইলেন, গম্ভীর অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন—"বাবু! পীতাম্বর!" আদরিণী সাহেবের হাত ধরিয়া বলিল, "সাহেব, বাবাকে ঘুমুতে দিওনা। মা, দাদারা এমনি করে ঘুমুতে ঘুমুতে স্বর্গে গেছে।" বালিকা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, "বাবা, বাবা।" পীতাম্বর চক্ষু মেলিলেন না। নিশ্বাস ফেলিয়া ডয়েন্ বলিলেন, "ভয় কি, এস, আমরা ডাক্তার ডাকিয়া আনি।" আদরিণীর হাত ধরিয়া ডয়েন্ গাড়িতে উঠিলেন। পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা, সাহেবের সহিত তাহার এই নূতন পরিচয়, কিন্তু পরমাত্মীয় বোধে সে তাঁহার সঙ্গে চলিল। তাহার হৃদয়ে স্বয়ং বিধাতা সেই বোধের উদয় করিয়াছিলেন।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে, এই জন্য জীবিত বলিতে হয়, বল, কিন্তু মৃতের সহিত ইহার কোন প্রভেদ নাই। বাঁচিবার কোন আশাই নাই।" তথাপি দয়ার্দ্রহৃদয় ডয়েন, ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া পীতাম্বরের শুশ্রূষা করাইলেন, প্রাণপণে চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু সকলই নিষ্ফল, তৃতীয় দিবসে পীতাম্বরের মৃত্যু হইল।

আদরিণী সাহেবের বাটীতেই আছে। সাহেব সুদক্ষ ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। একঘর খেলনা কিনিয়া দিলেন, আর বলিলেন, "তোমার মাকে আনিবার জন্য বাবা স্বর্গে গিয়াছেন, তুমি কাঁদিও না।" ধাত্রীর যত্নে, ডয়েন্ সাহেবের কন্যানির্ব্বিশেষপালনে, বালিকা ক্রমে শান্ত হইতে লাগিল। সাহেব

বিলাতী পোষাক পরাইয়া, আদরিণীকে নিত্য সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমার কোন পরম আত্মীয়ের কন্যা, আমি ইহাকে পোষ্যস্বরূপ লইয়াছি।" বালিকার বর্ণে, পরিচ্ছদে, কেহ তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। তাহার সুন্দর মুখশ্রীতে বিধাতা কি একটি বিষাদ কাহিনী লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, যে দেখিত সেই আকর্ষিত হইত। নাম কি জিজ্ঞাসা করিলে ডয়েন্ বলিতেন, "আইরিন্"। আদরিণীকে এখন হইতে এই আইরীণ্ নামেই উল্লেখ করিব।

ধাত্রী আইরীণকে ইংরাজী শিখাইতে লাগিলেন। ডয়েন্ সাহেবের কন্যার যেরূপ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক, সাহেব প্রথম হইতেই তাহার ভিত্তি স্থাপন করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা শিক্ষাও অবহেলা করিলেন না। পীতাম্বরের দেশের বাটীতে যে সকল জিনিষ পত্র ছিল, সাহেব বিশ্বাসী লোক দ্বারা কলিকাতায় আনিলেন। অধিকাংশ দ্রব্যই বিক্রয় করা হইল। যখন মহামারী দূর হইল, সাহেব স্বয়ং পীতাম্বরের বাটীতে গিয়া তাহা পরিষ্কার করাইয়া, একটী তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিলেন, এবং ব্যাঙ্ক হইতে সমস্ত অর্থ তুলিয়া লইয়া, সাবধানে খাটাইয়া আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য, সাহেব নিজের এজেণ্টের হস্তে তাহা সমর্পন করিলেন। আইরীণের আর্থিক উন্নতি ও মানসিক উন্নতির যাহা কিছু প্রয়োজন, বিচক্ষণ ডয়েন্ তাহার কিছুরই ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। চিকিৎসকগণের উপদেশে তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইল। সাহেব আইরীণকে লইয়া ইংলণ্ড চলিয়া গেলেন। শূন্যহৃদয় উদ্দেশ্যবিহীন জীবন লইয়া ডয়েন্ যখন ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যান, সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা, আইরীণের হাত ধরিয়া সাগরের কূলে দাঁড়াইয়া,ডয়েন সেই কথা ভাবিতেছিলেন। ঐ নির্ম্মল নীল সাগরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ যেমন উঠিতেছে, পড়িতেছে, কূলে আঘাত করিতেছে, স্মৃতির পর স্মৃতির তরঙ্গ আসিয়া সাহেবের হৃদয়েও তেমনি আঘাত করিতে লাগিল। যে দিন জন্মভূমির নিকট সাহেব চির-বিদায় লইয়া যান, তাঁহার মনে হইয়াছিল, এই সফেন-তরঙ্গরাজির বিজয়-সঙ্গীত আর তাঁহার শ্রবণ স্পর্শ করিবেনা। বালুময় বেলাভূমে দাঁড়াইয়া অশান্ত বালকের ন্যায় ডয়েন্ রোদন করিয়াছিলেন। ঘটনা-তরঙ্গ আজ আবার তাঁহাকে স্বদেশকূলে আনিয়া নিক্ষেপ করিয়াছে। দূর প্রবাসে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত হইয়াছে, শূন্যহস্তে গিয়াছিলেন, স্বর্ণমুষ্টি লইয়া ফিরিয়াছেন। যে প্রণয়িনী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া তিনি আপনাকে

আপনি নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, সে আর ইহলোকে নাই। ডয়েন্ ভাবিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়ের ক্ষত চিরদিন রক্ত মোক্ষণ করিবে, কিন্তু আইরীণ তাহাতে সুধা প্রলেপ দিয়াছে। সাহেব সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে আকাশের দিকে চাহিলেন, তারপর আইরীণকে হৃদয়ে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।

ডয়েনের কর্ম্মাধ্যক্ষ পূর্ব্ব হইতেই একখানি সুন্দর উদ্যানবাটী ক্রয় করিয়াছিল, দাস দাসী, গাড়ি ঘোড়া সবই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সুরম্য-আবাসে ডয়েন্ আইরীণকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

স্নানের যেমন পরিমাণ নাই, ইচ্ছারও তেমনি অবধি নাই। ডয়েনের ইচ্ছা আইরীণ আর না বাড়ে, চিরদিন এমনি বালিকা থাকিয়া তাঁহার কোলে বসিয়া আবদার করে। কিন্তু সাহেবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইরীণ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বালিকাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য সাহেব শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। নৃত্যগীত শিখাইবার জন্য শিক্ষয়িত্রী রাখিলেন এবং সুদক্ষ ব্যক্তিদ্বারা অশ্ব-চালনা শিখাইতে লাগিলেন। পঞ্চদশ-বর্ষ বয়সে আইরীণ সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য নিপুণতার পরিচয় দিতে লাগিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালিকার সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া ডয়েন বলিতেন, "দৈবাং কোন্‌দিন দুইখানি পাখা বাহির করিয়া, আইরীণ পিতা মাতার উদ্দেশে স্বর্গদেশে উড়িয়া যাইবে।" দেখিতে দেখিতে আইরীণ পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিল।

ডয়েনের ভবনে আইরীণের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র কক্ষ ছিল, তাহার অনুমতি না লইয়া সাহেব স্বয়ংও কখন সে সকল কক্ষে প্রবেশ করিতেন না। তন্মধ্যে একটী কক্ষ আইরীণ দেবগৃহের ন্যায় অতি যত্নে রক্ষা করিত। আইরীনের পরিচারিকারও তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। ডয়েন্ পরিহাস করিয়া কক্ষের নাম দিয়াছিলেন, যাদুগৃহ। আইরীণ স্বহস্তে তাহা পরিষ্কার করিত, সাজাইয়া রাখিত। মান্দ্রাজে একপ্রকার ধূপ পাওয়া যায়, ডয়েন্ আইরীণের অনুরোধে তাহা আনাইয়া দিতেন। আইরীণ প্রতি সন্ধ্যায় যাদু-গৃহে সেই ধূপ জ্বালিত। এই নিভৃত কক্ষ আইরীণের জীবনস্বরূপ ছিল। প্রতিদিন সংসারের কাছে বিদায় লইয়া, দুই তিন ঘণ্টা সময় সে এই কক্ষে অতিবাহিত করিত। কোন পাদরীর সহিত ডয়েনের পরিচয় ছিল, তিনি একদিন ধূপগন্ধ পাইয়া, নাকে রুমাল দিয়া বলিলেন—"মিস্ ডয়েন, তোমার মন হইতে এখনও পৌত্তলিক ভাব দূর হয় নাই? তোমার এই ধূপের গন্ধের জন্য ঈশ্বর কি লুব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন?" আইরীণ মস্তক অবনত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

পাদরী—তবে দাও কেন ?

আইরীণ—আমি দিলে তিনি গ্রহণ করিবেন না কেন ?

পাদরী—কি অন্ধ বিশ্বাস। হেরিডিটী। জন্মজ সংস্কার দূর হয় না! তোমায় কে বলিয়াছে, ঈশ্বর আহার দিলে ভক্ষণ করেন, ফুল দিলে আহ্লাদিত হন, ধূপ দিলে আনন্দিত হন ?

আইরীণ—সাহেব, যদি তিনি আহার দিলে না লন, পূজা করিলে পূজা গ্রহণ না করেন, তবে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব তিনি প্রার্থনা করিলে শ্রবণ করেন, বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করেন? তাঁহার জয়গান করিলে উল্লাসিত হন? ঈশ্বরের শ্রবণ শক্তি আছে, কিন্তু আহার করিবার শক্তি নাই। জয়গান করিলে উল্লসিত হন, কিন্তু পূজা করিলে গ্রহণ করেন না। সাহেব, আমি শিশুকালে দেখিয়াছি, আমার পিতামহী প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পূজা করিতেন। আমার এক ভাইয়ের একবার সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, তাহার কল্যাণ কামনায় আমার মা, বুক চিরিয়া দেবতাকে শোণিত দান করিয়াছিলেন।

ক্রোধে পাদরী সাহেবের চক্ষু তখন রক্তবর্ণ হইয়াছে। অপ্রিয় আলোচনার নিবৃত্তি করিবার জন্য ডয়েন্ বলিলেন "আইরীণ, শিশুকালের কথা তোমার এত মনে আছে ?" আইরীণ বলিল—"মনে আছে কি, আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। আমি যখনই আমার বাল্যজীবন ধ্যান করি, সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।" ডয়েন হাসিয়া বলিলেন "তবে যাদুগৃহের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, ধ্যান-মন্দির রাখিব।" অন্যান্য যুবতীর ন্যায় আইরীণ হাসিত, খেলিত, আমোদ করিত, কিন্তু তাহাদের সহিত ইহার কি যে একটা অনির্দ্দেশ্য পার্থক্য ছিল, বৃদ্ধ ডয়েন্ এতদিনে তাহা বুঝিলেন। বুঝিলেন, আইরীণের অর্দ্ধমন এই বাস্তব সংসারে, অর্দ্ধমন ধ্যানসৃষ্ট অতীন্দ্রিয় লোকে বিচরণ করে। সাধারণ নরনারী সে লোকের কোন সমাচারই বিদিত নহে। পাদরী চলিয়া গেলে ডয়েন বলিলেন—"তোমার কেমন ধ্যান প্রত্যক্ষ, আমি তাহা পরীক্ষা করিব।" আইরীণ উত্তর দিল—"বাবা, আমার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে কিনা, তুমিই তাহার একমাত্র বিচারক। আমি আজই পরীক্ষা দিব, আমার যাদুগৃহে বা ধ্যানমন্দিরে চল। একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিয়া তোমায় লইয়া যাইতেছি।"

আইরীণ কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ডয়েনকে লইয়া নিভৃত কক্ষে

প্রবেশ করিল। রাত্রি তখন প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই বৃদ্ধ ডয়েন্ ভয়ে বিস্ময়ে চমকিত হইয়া বলিলেন—"পিতাম্বর! আইরীণ তোমার পিতা মৃত্যুভবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে! পিতাম্বর। পিতাম্বর ডয়েন পার্শ্বস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। আবার বলিতে লাগিলেন—"পিতাম্বর, তুমি আইরীণকে আমার নিকট হইতে লইতে আসিয়াছ। আমি দিব না, দিব না।" বৃদ্ধের পাণ্ডুমুখ ও উত্তেজিত ভাবদর্শনে আইরীণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বাবা, বাবা, কি বোলছ? ও ছবি, ছবি!" ডয়েন বলিলেন—"না, মা, ছবি নয়, এ জীবন্ত মূর্ত্তি! ছবির চক্ষু এমন সজীব হয়! পিতাম্বর, কথা কও, কথা কও।" আইরীণ বলিল—"বাবা, স্থির হও, আমার সঙ্গে এস।" বলিয়া বৃদ্ধের হস্ত ধরিয়া চিত্রের নিকট লইয়া গেল। সাহেব কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টে দেখিয়া বলিলেন, "কে এ চিত্র আঁকিয়াছে?," আইরীণ নতমস্তকে উত্তর দিল—"আমি।" বৃদ্ধ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তুমি? অসম্ভব। আমি আজও এমন চিত্রকর দেখি নাই যে এই জীবন্ত চক্ষু তুলিতে আঁকিতে পারে। তোমাকে ত ছবি লিখিতে কখন দেখি নাই।"

আইরীণ—"বাবা, আমি লুকাইয়া অভ্যাস করি। যখন আমার দশবৎসর বয়স, তখন হইতে লুকাইয়া ছবি আঁকিতাম, তোমায় বলি নাই। মনে করেছিলাম, দেখাবার যোগ্য ছবি আঁকিতে না পারিলে তোমায় বলিবনা। কিছু কাল আঁকিতে আঁকিতে হাত যখন বসিল, তখন মনে হইল, পিতার একখানি চিত্র আঁকিয়া তোমায় দেখাইব।

ডয়েন্—সেই জন্যই কি তুমি আমার নিকট হইতে তোমার পিতার ফটোগ্রাফ চাহিয়াছিলে?

আইরীণ—হাঁ। পিতার মূর্ত্তি আমার স্মরণে আসিত, কিন্তু ধোঁয়ার মত। সেই জন্য ফটোগ্রাফ চাহিয়াছিলাম।

ডয়েন্—আইরীণ, আমায় মার্জ্জনা কর। তোমার কাছে জীবনে এই একটী মাত্র মিথ্যা কথা বলিয়াছি। আমার কাছে পিতাম্বরের ফটোগ্রাফ ছিল, কিন্তু তোমায় দিই নাই কেন জান?

আইরীণ—বুঝিয়াছি। পাছে পিতার ফটোগ্রাফ দেখিলে তাঁহার প্রতি আমার স্নেহের উদয় হয়!

ডয়েন্—আইরীণ! পিতাম্বর যাহা স্বভাবতঃ পাইবার অধিকারী, আমাকে সে স্নেহ অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। পলে পলে, দিনে দিনে, আমি একনিষ্ঠ

হইয়া, ভগবচ্চরণভিখারী সাধকের ন্যায় তোমার স্নেহ অর্জ্জনে যত্ন করিয়াছি। কৃপণের ন্যায় যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, তোমার পিতাকেও তাহার অংশ দিতে আমার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হয়। আইরীণ, বৃদ্ধ হইয়াছি, জীবনে অন্য কোন আকিঞ্চন আমার নাই, তোমায় সুখী করিব এইমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তোমার স্নেহই আমার জীবন, অন্য কেহ তাহার অংশ চাহিলে, আমার মনে বিষ হয়।

প্রবীণা জননীর ন্যায় আইরীণ এই বৃদ্ধ-শিশুর মস্তক, করযুগলে ধারণ করিয়া সাদরে চুম্বন করিল।

ডয়েন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি ফটোগ্রাফ দিই নাই, তবে তুমি আদর্শ কোথায় পাইলে?

আইরীণ—আমি ব্যাকুল হইয়া অনুক্ষণ পিতার মূর্ত্তি চিন্তা করিতাম। সেই একাগ্র চিন্তা ক্রমে ধ্যানে পরিণত হয়। ঘোরতর ব্যাকুলতায় পিতাকে একরাত্রে স্বপ্নে দেখি, সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছি। ঠিক্ হইয়াছে কি?

ডয়েন্—কেবল ঠিক্ বলিলে, যথার্থ বলা হয় না। পীতাম্বর এই চিত্রে পুনর্জীবিত হইয়াছে, কেবল মুখে কথা নাই। আইরীণ, আর কি চিত্র করিয়াছ, আমায় কাল দেখাইও।

ডয়েনের মনে বর্ণিত রূপ বিস্ময় উৎপাদনের জন্য, আইরীণ পিতাম্বরের চিত্রের চারিদিকে নেতের আবরন দিয়াছিল। নিকটে দুইটী আলোক এরূপ ভাবে রাখিয়াছিল যে তাহাদের আভা কেবল চিত্রের উপরে পতিত হয়। চিত্র খানি ঢাকিয়া, আলোক স্থানান্তরিত করিয়া, সাহেবের সঙ্গে আইরীণ ভোজন গৃহে গমন করিল।

লণ্ডন চিত্রশালার অধ্যক্ষকে নিমন্ত্রণ করিয়া ডয়েন আইরীণের চিত্র সকল দেখাইলেন। সাহেব বলিলেন—"মিস ডয়েন, তোমার ঐ 'বাঙলার সান্ধ্য প্রকৃতি'র চিত্রখানি প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া দিও। মিষ্টার ডয়েন, অশিক্ষিত নৈপুণ্য যে এতদূর উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে, আপনার কন্যার নিকট আজ আমি তাহা শিখিলাম।"

প্রদর্শনীতে চিত্র পাঠাইতে ডয়েনের মনে প্রথমে দুর্দ্দমনীয় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এতদিন যে স্বর্গীয় কুসুম তাঁহার উদ্যান আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, যাহার অপার্থিব সৌরভ তিনি একা উপভোগ করিতেছেন, সহসা তাহা সাধারণের দৃষ্টিপথে পড়িলে, হয় তো কেহ তাঁহার হৃদয় হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইবে। স্নেহ এমনি স্বার্থপর। আবার এই স্নেহেরই

শিক্ষা আত্মবিসর্জ্জন। ডয়েন চিত্র পাঠাইয়া দিলেন। "বাঙলার সান্ধ্য-প্রকৃতি" প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিল।

রাজমুকুট অপেক্ষা যশোমুকুট অধিকতর গৌরবশালী। গুণবতী দুহিতার গৌরবে ডয়েন গর্ব্বিত হইলেন, কিন্তু আইরীণের নিরপেক্ষভাব দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "স্ত্রীচরিত্র কি দুর্ব্বোধ রহস্য। আইরীণের যতই প্রতিষ্ঠা বাড়িতেছে, ততই যেন বিমনা হইতেছে।" আইরীণের সে ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। লোকসঙ্গ ত্যাগ, অতি প্রিয় বন্ধুবান্ধব আসিয়াও সাক্ষাৎ পায় না, ফিরিয়া যায়। আইরীণের নিভৃত বাস ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল, যে আহারের সময় ব্যতীত সাহেবও আর তাহার সাক্ষাৎ পাইতেন না। ডয়েন চিন্তিত হইলেন। উন্মাদ বা অন্য কোন উৎকট মানসিক রোগের পূর্ব্বলক্ষণ ভাবিয়া, সাহেব সুদক্ষ চিকিৎসকগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলেরই এক যুক্তি, স্থান-পরিবর্ত্তন। কিন্তু আইরীণ সে কথায় কাণ দেয়না, বলিলে, বলে—"বৃথা ভয়, বৃথা ভয়, আমার স্বাস্থ্যের কোন বৈলক্ষণ্য নাই।" আইরীণ ক্রমে মাংসাহার পরিত্যাগ করিল। কক্ষ হইতে বিলাসের সাজ সজ্জা অন্তরিত করিয়া দিল। ডয়েন নীরবে মনঃক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত পাদ্‌রী বন্ধু আসিয়া একদিন সাহেবকে বলিলেন—"এই তো পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ। তোমার কন্যার সহিত সে দিন কথা কহিয়াই আমি বুঝিয়াছিলাম। হা হা হা, কি রহস্য। বলে, ঈশ্বর আহার করেন। একথা যে বিশ্বাস করে, সে পাগল নয় তো কি ?" ডয়েন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পাদ্‌রী সাহেবকে দ্বারদেশ দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু আইরীণের আচার ক্রমে কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল। ধরণীতে একখানি কম্বলমাত্র পাতিয়া শয়ন করে, আহার মাত্র একবার—তাহাও ফলমূল ও কিঞ্চিৎ দুগ্ধ। আইরীণের শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল, কিন্তু চক্ষে কি এক অপার্থিব, অলৌকিক জ্যোতির বিকাশ হইল আইরীণ প্রায় সমস্ত দিন নিভৃত কক্ষে বাস করিত। ব্যাকুল হইয়া ডয়েন কখন কখন নিঃশব্দে দ্বাররন্ধ্র দিয়া দেখিতেন, আইরীণ ধ্যান করিতেছে, একদিন শুনিলেন, অস্ফুট স্বরে রোদন করিয়া বলিতেছে—"কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, হৃদয়সর্ব্বস্ব আমার। দেখা দাও, আমার নয়ন, মন, প্রাণ সার্থক কর।" দীপ্ত বহ্নিশলাকার ন্যায়, আইরীণের কাতরোক্তি সাহেবের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল। বিদ্যুৎ যেমন তমসাচ্ছন্ন

দৃশ্যকে চকিতে উদ্ভাসিত করে, স্মৃতির আলোকে সহসা সাহেবের মানসপটে একটী অতীতচিত্র তেমনি ঝলকিয়া উঠিল। ডয়েন দেখিলেন, মৃত্যু শয্যায় শয়মান এক দিব্য পুরুষ, তাহার সমক্ষে তিনি এক অনাথা নিরাশ্রয়া বালিকার কর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এই অনাথাকে যদি তিনি হৃদয়ে স্থান না দিতেন, বক্ষের রক্তদিয়া পালন না করিতেন, আজ তাহার কি দুর্দ্দশা হইত! আজীবন-সঞ্চিত স্নেহ দিয়া, কন্যার অধিক যত্নে তিনি যদি না এই অকৃতজ্ঞ কুমারীকে লালন পালন করিতেন, আজ সে কোথায় থাকিত! অনুক্ষণ তিনি যাহার কল্যাণ কামনা করিতেছেন, সে কাহার জন্য অনাহারে শরীর পাত করিয়া রোদন করিতেছে। কিন্তু এই চিন্তার স্ফুরণ মাত্রেই, সদাশয় ডয়েন লজ্জিত হইলেন। গম্ভীর কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন—"আইরীন!"

আইরীণ সংযতা হইয়া কক্ষের বাহিরে আসিল, সাহেব হস্ত ধরিয়া তাহাকে নিজকক্ষে লইয়া গেলেন।

অতি যত্নে একখানি চেয়ারে বসাইয়া,নিকটে বসিয়া ডয়েন বলিলেন—"বৎসে! তুমি কি চাও, কার জন্য রোদন করিতেছিলে? আইরীণ, তুমি কি জান না, তোমার অঙ্গবিদ্ধ একটী কণ্টক তুলিবার জন্য আমি জীবন দিতে প্রস্তুত? তুমি আমার কাছে কেন আত্মগোপন কর? কা'কে তুমি ভালবাস? বল, যদি সে পথের ভিখারী হয়, আমি তাকে রাজসিংহাসনে বসা'ব। যে ভাগ্যবান্ তোমার স্নেহের অধিকারী, সে রাজাসন অপেক্ষা উচ্চস্থানে বসিবার যোগ্য।"

কথা শুনিয়া আইরীণ ডয়েনের মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দেখিয়া ডয়েন্ বুঝিলেন, আইরীণ যেন এখনও কি ভাবে ঘোরতররূপে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে! সাহেব স্নেহ গদ্‌গদ কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন—"আইরীণ, বল, তুমি কা'কে ভালবাস?" আইরীণ মন সংযত করিয়া বলিল—"ভালবাসি? তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে?

ডয়েন—"আইরীণ, শোন। আমার কাছে বৃথা আত্মগোপন করিও না। তোমায় সুখী করাই আমার একমাত্র সুখ। পিতাম্বরের মৃত্যুর দিন হইতে এই চতুর্দ্দশ বৎসর আমি অন্য চিন্তা করি নাই। কিসে তোমায় সুখী করিব, আমার জীবনের এই একধ্যান, একব্রত। আমার কাছে লুকাইও না। বল, কাহাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হও।

আইরীণ—বাবা, বিবাহের চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে স্থান পায় নাই।

ডয়েন—আইরীণ, তোমায় সরল সত্যবাদী বলিয়া আমার চিরদিন বিশ্বাস, হেলায় সে বিশ্বাস ভঙ্গ করিও না। বল, তুমি কার জন্য গোপনে রোদন কর?

আইরীণ—কারু জন্য নয়।

ডয়েন—তুমি অতি ছল। চিত্র করার কথা তুমি এমনি করে আমার কাছে গোপন করেছিলে। কেমন করে তোমায় বিশ্বাস করি? বুঝেছি, হতভাগিনী, তুমি যাকে হৃদয় সমর্পণ করেছ, সে মনুষ্য নামের কলঙ্ক, তাই তার নাম উচ্চারণ কর্‌তে তোমার জিহ্বা জড়িত হচ্চে। বোধ হয় তোমার সর্ব্বনাশ করে সে অন্তর্হিত হয়েছে। তাই তোমার এত ব্যাকুলতা। তুমি তার নাম বল। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে যদি সে লুক্কায়িত থাকে, আমি তা'কে ধরে এনে তোমার পদতলে সমর্পণ কোর্ব্বো।

আইরীণ—বাবা, কার নাম বল্‌তে বোলছ? আমি তোমার সঙ্গে কখন প্রতারণা করিনি, তোমার কাছে কখন মিথ্যা কথা বলিনি। বিবাহের কথা কি বোলছ? কার নাম কর্‌তে বোলছ?

ডয়েন—কার নাম কর্‌তে বলছি? যে তোমার হৃদয়সর্ব্বস্ব। "দেখা দাও, দেখা দাও" বলে, তুমি যার জন্য রোদন কর। যে হৃদয়-ভেদী রোদন শুন্‌লে পাষাণ বিগলিত হয়। যার জন্য আমি বৃদ্ধ, আমাকে ছলনা করছ। যার নাম, আমি তোমার পিতৃস্বরূপ, কর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা বিসর্জ্জন দিয়ে, আমার কাছে প্রকাশ কর্‌ছ না। যার জন্য তুমি এই মাত্র অশান্ত শিশুর ন্যায় ধরালুণ্ঠিত হয়ে অশ্রুবর্ষণ করছিলে, যে অশ্রুধারে এখনও তোমার নয়ন কপোলসিক্ত।

আইরীণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল—"বাবা, তুমি আত্ম-প্রতারিত হয়েছ। আমি কুমারী, চিরদিন কুমারীই থাকিব। তোমায় শপথ করে বল্‌ছি, কোন পুরুষের ছায়া এখনও আমার হৃদয় কলঙ্কিত করে নাই। আমায় বিশ্বাস কর। চিত্র করার কথা তোমায় বলিনি, আমি প্রথমে মনে করতুম ছেলেখেলা। লোকে আমার চিত্রের যে সুখ্যাতি করে, আমি যে তার যোগ্য, সে কথা এখনও মনে করিনি। যে কিছু চিত্র এঁকেছি, সকল গুলিই আমার ধ্যানের ছবি। ধ্যানে সত্য এঁকেছি কিনা, তাই পরীক্ষা করবার জন্য তোমাকে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ছবি দেখিয়েছিলুম। আমি মনে করেছিলুম, যদি সহসা সে চিত্র দেখে তোমার সত্য বলে ভ্রান্তি হয়, তাহলে বুঝ্‌বো, ঠিক্ এঁকেছি।

ডয়েন্—কিন্তু তুমি কার জন্য রোদন কর? আমায় বল। আমি তোমার রোদন আর সহ্য করতে পারব না।

আইরীণ—বাবা, আর তো উপায় নাই। আমি তাকে যত দিন না পাবো, ততদিন এ রোদন ফুরাবে না।

ডয়েন—তাকে! কাকে? বল, বল, কে সে? আমি সর্ব্বস্ব দিলেও কি তাকে পাওয়া যাবে না?

আইরীণ—বাবা, পৃথিবীতে এমন অর্থ নাই যা দিয়ে তাকে পাওয়া যায়। তাকে পাওয়া না পাওয়া, তার ইচ্ছা। বাবা, তুমি অনেক দিন আমাদের দেশে ছিলে, চাতক পাখীর কথা কখন শুনেছ কি? পৃথিবীতে কত নদ, নদী, হ্রদ সরোবর আছে, চাতক তার জল পান করে না। তৃষ্ণায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তবু সে পাথিব জল পান করে না। কেবল "ফটিক জল, ফটিক জল" বলে মেঘের পানে চেয়ে থাকে। যখন বড় প্রাণ কাঁদে, তখন সকরুণ স্বরে "ফটিক জল" বলে চীৎকার করে। বাবা, আমার এ ফটিক জলের তৃষ্ণা।

ডয়েন—তুমি কি সত্যই উন্মাদ হলে? তুমি কি চাও, কি পেলে সুখী হও? তুমি জানো, আমি ক্রোরপতি, আমিও কি তোমায় তা দিতে অক্ষম।

আইরীণ—বলেছি তো, আমি যা চাই তা অর্থে পাওয়া যায় না।

ডয়েন—কেন তুমি এমন সখ্ করলে? যা অর্থে পাওয়া যায় না, কেন তোমার এমন দ্রব্যে সখ্ হ'ল? কি সে দ্রব্য?

আইরীণ—বাবা, সখ—সখ্। সখ্ কি কেউ সাধ ক'রে করে? যার হয়—তার হয়।

ডয়েন—হায়, হায়, কেন তোমার এমন সখ্ হোলো? আইরীণ, আমি বৃদ্ধ, আমার একটী মিনতি রাখ, এমন সখ ত্যাগ কর। তোমার যেমন নিরুপম রূপ, তেমনি অনুপম গুণ, তার উপর তেমনি অতুল সম্পদ। সংসারে এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ বিরল, অতি বিরল। বিধাতার স্নেহের দান অবহেলা কোরো না। জীবন ভোগের জন্য, ভোগ কর। আমায় সুখী কর।

আইরীণ—বাবা, আমায় মার্জ্জনা কর। আমি স্বেচ্ছায় তোমার অবাধ্য হইনি। আমি আর আমার নই। রূপ, গুণ, জীবন, যৌবন, সম্পদ দিলে যদি আর একবার তার দেখা পাই, আমি এই দণ্ডে কৃতার্থ হয়ে সব দিতে প্রস্তুত।

ডয়েন—তুমি কি তাকে দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

আইরীণ—দেখেছি, স্বপ্নে।

ডয়েন—বাল্যকালের অনেক জিনিষ তোমার ধ্যানে উদয় হয়, বাল্যে কখন একে দেখেছ কি ?

আইরীণ—না।

ডয়েন—ওঃ, বুঝেছি। আহার, সহবাস, শিক্ষা, সমুদ্রের ব্যবধান, হিন্দুর শোণিতের সংস্কার দূর করতে অক্ষম। যে দেশে তোমার জন্ম, আমি দেখেছি সে দেশে দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য সর্ব্বাঙ্গে বাণ ফোঁড়ে। একটা কাল্পনিক স্বর্গের প্রত্যাশায় সতী মৃত পতির পার্শ্বে শুয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে পোড়ে। হিন্দুর কাছে সত্যের সংসার যেমন সত্য, কল্পনার রাজ্যও তেমনি সত্য। রক্তের সংস্কার দূর হ'বার নয়। সেই জন্যই মহানীতিজ্ঞ সুচতুর আখ্‌বর, হিন্দুর সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে, হিন্দুরক্ত কলুষিত করবার প্রয়াস করেছিলেন। হিন্দুর ঘরে তোমার জন্ম, বিচিত্র কি, অলীক স্বপ্নে প্রত্যয় স্থাপন ক'রে, সুখের জীবন জাহান্নমে দেবে। তোমার দেশে বড় বড় দার্শনিককে বল্‌তে শুনেছি—"একটা—চোখ বুজ্‌লে থাকে না, একটা—চোখ খুল্‌লে মিলিয়ে যায়, জাগ্রত সংসার ও স্বপ্নের সংসার, এ দুটোর কোন্‌টা সত্য কেমন করে বুঝ্‌বে।"

আইরীণ—বাবা, স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি আমি স্বপ্নে দেখে এঁকেছি, তুমি প্রত্যক্ষ দেখেছ, তবে কেমন করে বোলছ, স্বপ্ন অলীক। সে ছবি যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে যাকে স্বপ্নে দেখে আমি উন্মাদিনী হয়েছি, সে ছবি মিথ্যা হবে কেন? বাবা, তুমি তো জানো, শিল্পীমাত্রেই আদর্শ সৌন্দর্য্যের ধ্যান করে। কবি ভাষায়, চিত্রকর বর্ণে, ভাস্কর প্রস্তর গঠনে, সেই অব্যক্ত মানস প্রতিমা ব্যক্ত করবার প্রয়াস পান। এরই নাম সৃষ্টি। এই বিচিত্র বিশ্ব বিশ্ব-কবির মানস ছবি। আমিও সেই আদর্শ সুষমার ধ্যান করতুম্‌। বাবা, হিন্দুর ঘরে, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বলে জন্মেছিলুম, তাই সেই ধ্যানের প্রতিমা আমি স্বপ্নে দর্শন পেয়েছি।

ডয়েন—দর্শন পেয়ে থাকো, চিত্র কর, তাহলে তোমার তৃপ্তি হবে।

আইরীণ—বাবা, এমন চিত্রকর এখনও জন্মগ্রহণ করেনি, এমন তুলি এখনও সৃষ্টি হয় নি, এমন বর্ণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি, যে সে মাধুরি চিত্র করে। তার আভাস মাত্র দেবার জন্য আমি অনেক যত্ন করেছি। কিন্তু সে ছবি ধ্যানে উদয় হবামাত্রই আমি বিভোর হ'য়ে যাই, তুলি ধরবার আর সাধ বা শক্তি কিছুই থাকে না।

ডয়েন—তবে কি এমনি ক'রে বিফল জীবন অতিবাহিত কর্‌বে ?

আইরীণ—আমি তো বলেছি সে তার ইচ্ছা। আমি আর আমার নই, তার। সে যেমন ফেরায়, তেমনি ফিরি, যা করায়, তাই করি।

বলিতে বলিতে আইরীণের মুখ চোখ যেন মাদকের ঘোরে আচ্ছন্ন হইল। টলিতে টলিতে কক্ষ হইতে উঠিয়া গেল। ডয়েন বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই আইরীণ ডয়েনকে বলিল—"বাবা, আমায় বিদায় দাও, আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাবো।"

ডয়েন স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "সে কি আইরীণ ?"

আইরীণ। আমার প্রিয়তমের আদেশ। আমি গত রাত্রে আবার স্বপ্নে দেখেছি, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মঠ আছে, সেখানে আমার প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

ডয়েন মনে মনে চিন্তা করিলেন, স্থান পরিবর্ত্তনে হয় তো আইরীণের মনে বিকার আরোগ্য হইতে পারে। আর স্বপ্ন দৃষ্ট ঘটনা মিথ্যা প্রমাণ হইলে সকল বিষয়েই মঙ্গল হওয়া সম্ভব। ডয়েন সম্মত হইলেন ও সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া শীঘ্রই আইরীণকে লইয়া ভারত যাত্রা করিলেন। জাহাজ ভারত অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, আইরীণ ততই অধীর হইয়া উঠিল। ডয়েন শিশুর মত তাহাকে শান্ত করিতেন। কলিকাতায় পৌছিয়া ডয়েন একটী হোটেলে বাসা লইলেন। আইরীণ কোন কথাই শুনিলনা, সেই রাত্রেই পশ্চিম রওয়ানা হইল। ডয়েন সঙ্গে গেলেন।

রেলগাড়ী মথুরা ষ্টেসনে পৌছিলে, আইরীণ ডয়েনকে লইয়া অবতরণ করিল। একখানি গাড়িভাড়া করিয়া আইরীণ গাড়োয়ানকে একটী ঠিকানা বলিয়া দিল। বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, আইরীণের অনুমাত্রও ইতস্ততঃ ভাব নাই। কে যেন তাহাকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। গাড়ি একখানি কুটীরের সাম্নে উপস্থিত হইলে, আইরীণ গাড়ি হইতে ঝম্প দিয়া দ্রুতবেগে ছুটিল। কুটীরের দ্বার উন্মোচন করিয়া বলিল—"এই যে, এই যে আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব!" ডয়েন দেখিলেন—অপূর্ব্ব রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। নিকটে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপবিষ্ট এক।

আইরীণ মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছিল। ডয়েন ও সন্ন্যাসী যত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অতি কাতরকণ্ঠে ধীরে ধীরে আইরীণ সন্ন্যাসীকে বলিল—"বাবা, আমায় পদাশ্রয় দাও। যাতে আমার হৃদয়সর্ব্বস্বকে লাভ করতে পারি আমায় কৃপা কর।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"মা, তুমি অতুল সম্পদের অধীশ্বরী, সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করিলে, কেমন করে তোমার হৃদয়সর্ব্বস্বকে লাভ করবে?"

ডয়েন বলিলেন—"সন্ন্যাসী, অর্থে কি ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"সদুদ্দেশ্যে, সৎকার্য্যে নিয়োজিত হলে, অর্থে সংসারের অনেক উপকার হয়। কিন্তু ঈশ্বর লাভের পথে অর্থ কণ্টক স্বরূপ। জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বর লাভ। কালীঘাটে গিয়ে কালী দর্শন না করে কেবল দান করলে কি হবে? 'যো' 'সো' করে, ধাক্কা ধুক্কি খেয়ে আগে কালী দর্শন করে, তার পর দান ধ্যান যা কর।

আইরীণ ভক্তিভরে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, ঈশ্বর লাভের উপায় কি?"

সন্ন্যাসী—সহজ উপায় ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করা। দীন দরিদ্রের সেবা করা। দীন, দরিদ্র, আতুর জীবন্ত ঈশ্বর!

ডয়েন—সন্ন্যাসী, তাতে তো অর্থের প্রয়োজন?

সন্ন্যাসী—ভাল, তাই যদি মনে করে থাক, তোমার সব অর্থ দীন দরিদ্রকে দাও। সাহেব, তোমারই তো ধর্ম্মে আছে—ঈশ্বর তনয় যীশু বলেছেন, "তোমার যা কিছু আছে, দরিদ্রকে দান করে আমার অনুসরণ কর" কিন্তু অর্থ না হলেও পরের উপকার করা যায়। যে স্বার্থ ত্যাগ করে পরের কার্য্য করে, তার অর্থের অপেক্ষা করে না।

আইরীণ ডয়েনকে বলিল—"বাবা, পিতৃদত্ত যে কিছু অর্থের আমি অধিকারিণী হয়েছি, সে সমস্ত কোন সৎকার্য্যে নিয়োজিত কর। তোমার যে ঐশ্বর্য্য আছে, আমি আর তাহা গ্রহণ করিব না। বাবা, আমার স্বর্গীয় পিতা মাতার নামে আমাদের গ্রামে কোন সদনুষ্ঠান কর।

ডয়েন বলিলেন—"বৎসে, আমার সর্ব্বস্ব তুমি, তোমায় ছেড়ে অর্থ নিয়ে আমি কি কোর্‌বো? এই বিপুল অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করবার জন্য একজন কর্ম্মচারী তো আবশ্যক? আমি উদর পোষণের নিমিত্ত সামান্য কিছু বেতন নিয়ে তোমার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে কর্ম্মচারীরূপে অবস্থান কোরবো।

সন্ন্যাসীর সমক্ষে জানু পাতিয়া আইরীণ বলিল—"বাবা, আমাকে আমার হৃদয় সর্ব্বস্বের কার্য্যে নিযুক্ত কর।"

সন্ন্যাসী পরদিন আইরীণকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ডয়েন বলিলেন—"বৎসে, তুমি সুখী হয়েছ কি? কিন্তু সংসারে তোমার একটী কাজ অসম্পূর্ণ রহিল! তুমি আদর্শ সৌন্দর্য্যের চিত্র দেখালে না।" আইরীণ

বলিল—"বাবা, বলেছি তো সে সৌন্দর্য্য তুলিতে তুলিবার শক্তি কাহারও নাই। যদি এই মহাপুরুষ-দর্শনে তোমার চক্ষু উন্মিলিত হয়ে থাকে, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ও মুখভাব দেখ, আদর্শ সুষমার আভাস দেখতে পাবে।"

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ]

(২)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে শ্রীভাষ্য-অনুসারে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আচার্য্য রামানুজের প্রথম আপত্তিটী বিচার করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে, আচার্য্য রামানুজ অদ্বৈতবাদকে বেদ বিরুদ্ধ "মত" বলিয়াছেন কিন্তু অদ্বৈতবাদী তাহা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন। এক্ষণে উক্ত শ্রীভাষ্য অনুসারে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আচার্য্য রামানুজের দ্বিতীয় আপত্তিটী বিচার্য্য। এককথায় বলিতে গেলে এই আপত্তিটী অদ্বৈতবাদিস্বীকৃত জ্ঞান ও কর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব্ব মীমাংসা ও ব্রহ্মসূত্রের একগ্রন্থত্বপ্রতিপাদনে স্থাপিত। এক্ষণে দেখা যাউক এই জ্ঞানকর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদ জিনিষটা কি?

জ্ঞান ও কর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদ মানে—কেবল জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মসমূহ চিত্তশুদ্ধির কারণ, চিত্ত শুদ্ধ হইলে শ্রবণ মননাদির দ্বারা জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। যাহার চিত্ত জন্মাবধি শুদ্ধ, তাহার উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই,—কেবল গুরুমুখে বেদান্ত শ্রবণ এবং তৎপরে তাহার মনন ও নিদিধ্যাসন করিলেই মুক্তি ফল তাহার করায়ত্ত হয়। আর যাহার চিত্ত অশুদ্ধ তাহার উক্ত কর্ম্মের যথাবিধি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্তের মল অপগত হয়, তৎপরে গুরুমুখে বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎ শ্রবণ করিয়া যথারীতি তাহার মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে পূর্ব্ববৎ মোক্ষলাভ ঘটিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ব্যক্তি দুই প্রকার হইয়া থাকেন, কেহ বা জীবন্মুক্ত অবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠান বিবর্জ্জিত কেহ বা অভ্যাসবশে সে অবস্থাতেও নিষ্কামভাবে কর্ম্মনিরত। তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ এককালীন অনুষ্ঠানই মোক্ষ লাভের কারণ নহে, অথবা কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে এমন কোন পুণ্য প্রভৃতির "অপূর্ব্ব" জন্মে না যাহা জ্ঞানানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হইয়া মোক্ষ ফল প্রদান করে। জ্ঞানই মোক্ষ-

লাভের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, কর্ম্ম সেই জ্ঞানের পক্ষে কখন কখন সহকারী কারণ হইয়া থাকে, আবার কখন কখন তাহাও হয় না। এস্থলে এই কর্ম্ম শব্দে সাধারণ অর্থ অভিপ্রেত নহে, ইহার অর্থ স্বর্গাদিফলসাধক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম। আহারনিদ্রাদিরূপ জীবনধারণোপযোগী যাবৎ কর্ম্মই এই কর্ম্ম শব্দের অর্থ নহে। আর জ্ঞান শব্দে যে কেবল "জানা" বা "অবগত হওয়া" বুঝায় তাহা নহে, এই জ্ঞানও কর্ম্মশব্দের পূর্ব্বোক্ত সাধারণ অর্থ ধরিলে একপ্রকার কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্ম শব্দের পূর্ব্বোক্ত বিশেষ অর্থে কর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মশব্দে আজকাল সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহাতে এই "জ্ঞানকর্ম্মাসমুচ্চয়বাদে"র জ্ঞানও এক প্রকার কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু যে সময়ে, জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়াসমুচ্চয় লইয়া ভারতে বাদানুবাদ চলিতেছিল সে সময় উক্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম শব্দ দুইটীর অর্থ অন্যরূপ ছিল, এজন্য ইহাদের প্রকৃত অর্থের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হওয়া আবশ্যক। সংক্ষেপে এখানে কর্ম্ম শব্দের অর্থ—শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম; ইহা অনুষ্ঠান করিলে, পুণ্য প্রভৃতির ন্যায় "অপূর্ব্ব" উৎপন্ন হয় (এখানে অপূর্ব্ব শব্দটী একটী পারিভাষিক শব্দ) এবং সেই অপূর্ব্বের ফলে স্বর্গাদি অভীষ্ট ফল লাভ হয়। আর জ্ঞান শব্দে জানা বা অবগত হওয়া বুঝায়, এবং সেই অবগতিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিবার জন্য যে বিচার ও ধ্যান প্রভৃতি আবশ্যক তাহাও সুতরাং জ্ঞানশব্দবাচ্য। অধিক কি এই বিচার ও ধ্যানের জন্য জীবনধারণোপযোগী যে সকল অনুষ্ঠান তাহাও উক্ত শব্দের অর্থ। এক কথায় যে কর্ম্মের ফল জ্ঞান, সে কর্ম্মও জ্ঞান পদবাচ্য, এবং যে কর্ম্মের ফল জ্ঞান নহে, তাহাই কর্ম্মপদবাচ্য।

তাহার পর, এই জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়াসমুচ্চয়বাদের আর একটা দিক জানিবার আছে। ইহা মোক্ষাবস্থায় জীবব্রহ্মের সম্বন্ধসংক্রান্ত। অসমুচ্চয়বাদী বলেন—জ্ঞানই মোক্ষের অব্যবহিত নিয়ত কারণ বলিয়া জীব মুক্ত হইলে নিষ্ক্রিয় হয়। আর নিষ্ক্রিয় হইতে গেলে তাহাকে ব্রহ্ম সহ মিশিয়া যাইতে হয় বা সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন হইতে হয়। কারণ, দুইটী পদার্থ থাকিলে তাহারা কেহই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করিতে পারে না, যেহেতু এক অদ্বৈতপদার্থ ভিন্ন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাব অসম্ভব। (একথা আজকাল বিজ্ঞান শাস্ত্র বেশ ভাল করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছে, সুতরাং এস্থলে সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।) সুতরাং জ্ঞানকর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদীর মতে জীবব্রহ্মের ঐক্য বা

অভিন্ন ভাবই লক্ষ্য; অদ্বৈতবাদীএই উদ্দেশ্যেই জ্ঞানকর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদ স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী, তাঁহারা বলেন জ্ঞান ও কর্ম্ম একই কালে অনুষ্ঠান করিতে করিতে মুক্তি হয়, এবং মুক্ত হইয়াও ভগবৎ সেবন-অর্চ্চন রূপ কর্ম্ম করিতে জীব বাধ্য, সুতরাং জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ থাকিতে হয়, ব্রহ্মে মিশিয়া যাওয়া বা অভিন্ন হইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। কারণ কর্ম্ম থাকিতে গেলেই দুইটী বস্তুর প্রয়োজন, দুইটী বস্তু ভিন্ন কর্ম্ম অসম্ভব। এজন্য ইঁহারা দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কিম্বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। ফলতঃ দেখা যাইতেছে, জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়াসমুচ্চয়বাদ দুইটী দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে কত প্রয়োজনীয় জিনিষ।

আচার্য্য রামানুজ এই সমুচ্চয়বাদের পক্ষপাতী, এজন্য তিনি তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থের স্বরচিত শ্রীভাষ্য মধ্যে প্রথমেই নিজ ভাষ্যের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য-কথন-প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদকে মোটের উপর বেদবিরুদ্ধ মত বলিয়াই যে তিনি এই বিষয়টী বিচারের সুযোগ অন্বেষণ করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? পরন্তু ভাগ্যক্রমে অদ্বৈতবাদের প্রধান ও প্রাচীন প্রচারক আচার্য্য শঙ্করের কৃত শারীরকভাষ্য মধ্যে ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের প্রথম সূত্রের প্রথম শব্দটীর ব্যাখ্যাতেই তিনি এই প্রসঙ্গ পাইয়াছেন, সুতরাং এই সুযোগে তিনি অদ্বৈতবাদিগণ-স্বীকৃত জ্ঞানকর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইবেন ইহা খুব স্বাভাবিক। এক্ষণে দেখা যাউক আচার্য্য শঙ্কর কি ভাবে উক্ত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের প্রথম সূত্রের প্রথম শব্দটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আচার্য্য রামানুজই বা কি ভাবে তাহার খণ্ডন করিতেছেন।

ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের প্রথম সূত্রটী "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। ইহার পদচ্ছেদ করিলে "অথ" "অতঃ" "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই কয়টী পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্কর এই তিনটী শব্দের প্রথম "অথ" শব্দটীর অর্থ অবলম্বনে যে ভাবে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা অনুবাদ সহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

শাঙ্করভাষ্য। তত্র "অথ" শব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ, নাধিকারার্থঃ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ।

"ভাষ্যানুবাদ। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের প্রথম সূত্রের মধ্যে যে 'অথ' শব্দটী আছে, তাহার অর্থ হইতেছে আনন্তর্য্য। এই 'অথ' শব্দের অর্থ—'অধিকার' হইতে পারে না—কারণ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা অধিকার্য্য (অর্থাৎ অধিকারের বিষয়) নহে।

ভাষ্যের তাৎপর্য্য। 'অধিকার' শব্দের অর্থ—আরম্ভ। এক্ষণে দ্রষ্টব্য

এই যে—এই আরম্ভ বা অধিকার রূপ অর্থকেই 'অথ' শব্দ বোধ করাইয়া থাকে ইহা বলিলে ক্ষতি কি? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে—এই সূত্রে যে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' শব্দটী রহিয়াছে—তাহার সহিতই 'অথ' শব্দের অন্বয় করিতে হইবে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। 'অথ' শব্দের যদি 'আনন্তর্য্য'ই অর্থ হয়—তাহা হইলে 'অনন্তর' ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতেছে' এইরূপ অন্বয় করিতে হয়, এবং এরূপ অন্বয় করিলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু আনন্তর্য্য অর্থ না হইয়া যদি অধিকারই 'অথ' শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অধিকৃত অর্থাৎ আরব্ধ হইতেছে—এই প্রকার অন্বয় করিতে হয়। যদি বল ক্ষতি কি? এই প্রকার অন্বয়ই হউক না কেন? তাহার উত্তর এই যে, 'জিজ্ঞাসা' পদের অর্থ কি তাহা ঠিক্ করিয়া পরে উহা অধিকৃত হইতে পারে কিনা তাহার বিচার করা উচিৎ। 'জিজ্ঞাসা' পদের দুইটী অর্থ প্রসিদ্ধ আছে, প্রথম—জানিবার ইচ্ছা, দ্বিতীয়—জানিবার ইচ্ছা প্রযুক্ত উপনিষদের অর্থ কি তাহার বিচার। যদি প্রথম অর্থ অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছাই 'জিজ্ঞাসা' হয়, তাহা হইলে এইরূপ অন্বয় করিতে হয় যে, ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা অধিকৃত বা আরব্ধ হইতেছে। এই প্রকার অন্বয় নিতান্ত অসঙ্গত কারণ, আমরা বাহ্য কার্য্যেরই আরম্ভ করিয়া থাকি, ইচ্ছার আরম্ভ করিতেছি বা ইচ্ছা আরব্ধ হইতেছে, এই প্রকার বোধ সমীচীন হইতে পারে না—কারণ, ইচ্ছা হইলে আমরা কোন কার্য্যের আরম্ভ করি—ইচ্ছার আরম্ভ আমরা কেহই করি না, ইচ্ছা—আরম্ভের কারণ, উহা আরম্ভের বিষয় হইতে পারে না। 'জিজ্ঞাসা' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ—বিচার—অবশ্য অধিকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু এখানে উহা বলা যায় না—কারণ, 'কর্ত্তব্য' এই পদটীর যদি অধ্যাহার করা যায়—তাহা হইলে ঐ 'জিজ্ঞাসা' শব্দের "বিচার" এই অর্থ করিতে হয়, কারণ শবরভাষ্যকার—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রের এই আদিম সূত্র ব্যাখ্যা করিবার সময় 'কর্ত্তব্য' এই পদটীর অধ্যাহার করিয়াই 'জিজ্ঞাসা' শব্দটীর বিচাররূপ অর্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদনুসারে এই সূত্রেও 'কর্ত্তব্য' পদের যদি অধ্যাহার করিতে হয়, তাহা হইলে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য" এইরূপ অর্থ, অথশব্দব্যতিরিক্ত, সূত্রের অন্য দুইটী পদের দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহাই যদি হইল, তবে আবার 'অথ' শব্দের অধিকার রূপ অর্থ করিয়া লাভ কি? "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য" এই বলাতেই ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যে কৃতির বিষয় তাহা প্রতীত হইয়া যাইতেছে, সুতরাং কৃতির বিষয়রূপ অধিকৃত অর্থটীকে

বুঝাইবার জন্য, এই দ্বিতীয় পক্ষে 'অথ' শব্দের উপাদান ব্যর্থ হইয়া পড়ে—এই কারণেই বলিতে হইতেছে যে, 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য বা অধিকার নহে।

শাঙ্কর ভাষ্য। মঙ্গলস্য বাক্যার্থে সমন্বয়াভাবাৎ। অর্থান্তরপ্রযুক্ত এব হি অথ শব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গলপ্রয়োজনো ভবতি। পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্তর্য্যাব্যতিরেকাচ্চ।

ভাষ্যানুবাদ। (কেহ কেহ বলেন যে, 'অথ' শব্দের অর্থ মঙ্গল—তাঁহাদের মত নিরাকরণ করা যাইতেছে যে) 'অথ' শব্দের উচ্চারণ করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে—এই মাত্র, এখানে মঙ্গলরূপ অর্থ বাক্যার্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অন্য কোন অর্থ বোধ করাইবার জন্যও 'অথ' শব্দের প্রয়োগ করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে, সুতরাং এখানে 'অথ' শব্দের মঙ্গলরূপ অর্থ কল্পনা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। (যদি বল, এখানে 'অথ' শব্দের অর্থ পূর্ব্ব প্রকৃতাপেক্ষা অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা প্রকৃত অর্থাৎ প্রক্রান্ত ছিল, তাহারই অপেক্ষা—তাহাও ঠিক নহে কারণ) পূর্ব্ব প্রকৃতাপেক্ষারূপ অর্থ করিলে, ফলে পূর্ব্বোক্ত আনন্তর্য্যরূপ অর্থই আসিয়া পড়ে (তাহা হইলে আনন্তর্য্যরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইল—নূতন কোন অর্থ ত আর হইল না)।

শঙ্করভাষ্য। সতি চ আনন্তর্য্যার্থত্বে যথা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্ববৃত্তং বেদাধ্যয়নং নিয়মেনাপেক্ষতে, এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপি যৎপূর্ব্ববৃত্তং নিয়মেন অপেক্ষতে তদ্বক্তব্যম্। স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যং তু সমানম্। নম্বিহকর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ। ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ। আনন্তর্য্যই যদি 'অথ' শব্দের অর্থ হইল—তাহা হইলে যেমন ধর্ম্মজিজ্ঞাসা নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী বেদাধ্যয়নকেই অপেক্ষা করিয়া থাকে—সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কারণ, তাহাকে নিয়ত ভাবেই অপেক্ষা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই কারণ কি—তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। (যদি বল কর্ম্মমীমাংসাদর্শনের আদিভূত ধর্ম্মজিজ্ঞাসা যেরূপ বেদাধ্যয়নকে অপেক্ষা করে—ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও সেইরূপ বেদাধ্যয়নকে অপেক্ষা করিতেছে, তাহার উত্তর এই যে) বেদাধ্যয়নের আনন্তর্য্য যেমন ধর্ম্মজিজ্ঞাসাতে আছে—সেই ভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাতেও বেদাধ্যয়নের আনন্তর্য্য আছে (ইহা সকলেরই বিদিত আছে। কর্ম্মকাণ্ডও বেদ, উপনিষদও বেদ—বেদের অর্থ কি তাহা বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করিবার ইচ্ছা যে বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে হইতে পারে না—তাহা পূর্ব্বমীমাংসারূপ বিচারশাস্ত্রের আরম্ভকালে মীমাংসকগণ স্পষ্টতঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন, সুতরাং এখানে উপনিষদরূপ বেদের অর্থ কি—

তাহা বিচার করিয়া নির্ণয় করিবার ইচ্ছারূপ যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—তাহার পূর্ব্বে যে বেদের অধ্যয়ন অর্থাৎ অন্ততঃ উপনিষদ্রূপ বেদের অধ্যয়ন করিতেই হইবে—তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা না বলিলেও বুঝা যায়, তাহা বুঝাইবার জন্য সূত্রের মধ্যে অথ শব্দের উপাদান করা হইয়াছে ইহা বলা ঠিক নহে, সুতরাং বেদাধ্যয়ন ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়তকারণের আনন্তর্য্যই এখানে 'অথ' শব্দের অর্থ—ইহা স্বীকৃত হইবে, সেই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ কি—তাহা এখনও বলা হইল না।) যদি বল—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা কেবল বেদাধ্যয়ন রূপ নিয়ত কারণকে অপেক্ষা করে—কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাহা ছাড়া কর্ম্মকাণ্ডের বোধকেও নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়ত কারণরূপে অপেক্ষা করিয়া থাকে—ইহাই হইল ধর্ম্মজিজ্ঞাসা হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বৈলক্ষণ্য। (অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা পাঠ করিয়া বেদ বিহিত কর্ম্মসমূহের স্বরূপ জানিবার পর লোকের বেদান্ত শাস্ত্র প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের তত্ত্ব জানিবার জন্য ইচ্ছা হইয়া থাকে—ইহাই 'অথ' শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে) এই প্রকার মতও যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ, যে ব্যক্তি উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার পক্ষে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা না হইয়াও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। (সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডে প্রতিপাদ্য ধর্ম্মসমূহের তত্ত্ব জানার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে— ইহাই সূচিত করিবার জন্য এই সূত্রে অথ' শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে,—এইরূপ কথন কোন প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

শাঙ্কর-ভাষ্য। যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানাম্ আনন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, ন তথা ইহ ক্রমো বিবক্ষিতঃ। শেষশেষিত্বে অধিকৃতাধিকারে চ প্রমাণাভবাৎ।

ভাষ্যানুবাদ—বেদে এইরূপ বিধান আছে যে "হৃদয়স্য অগ্রে অবদ্যতি, অথ জিহ্বায়া, অথ বক্ষসঃ।" অর্থাৎ যজ্ঞে নিহত পশুর "হৃদয় প্রথমে খণ্ডিত করিবে, পরে জিহ্বা খণ্ডন করিবে, তাহার পর বক্ষঃস্থল খণ্ডন করিবে'। এইরূপ বেদবাক্যে হৃদয়াদির অবদান অর্থাৎ ছেদনরূপ ক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা ক্রম (অর্থাৎ অগ্রে এইটী করিয়া পশ্চাৎ এইটী করিবে) যেরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ বেদপ্রতিপাদ্য যাগ হোম প্রভৃতি কর্ম্মগুলির স্বরূপ অগ্রে জানিয়া, পরে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এইরূপ ক্রম কোন প্রকার বেদবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই। (অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান হইবার পরই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এপ্রকার কোনরূপ বেদবাক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ বেদবাক্য যদি থাকিত তাহা হইলে, সেই বেদবাক্যরূপ প্রমাণের অনুরোধেও না

হয় আমরা মানিয়া লইতে পারিতাম যে, ধর্ম্মজ্ঞান না হইলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইতে পারে না।) কর্ম্মজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার—শেষ-শেষিভাব অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাব বা গুণপ্রধানভাব আছে, কিম্বা ধর্ম্মজ্ঞানে যাহাব অধিকার জন্মিয়াছে তাহারাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবার অধিকাব আছে, অন্যের নাই, এরূপ কল্পনাও প্রমাণশূন্য। এই কাবণেও বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মজ্ঞানের পরই যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই।

শাঙ্করভাষ্য—ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ। অভ্যুদয়ফলং ধর্ম্মজ্ঞানং তচ্চ অনুষ্ঠানাপেক্ষং নিঃশ্রেয়সফলং তু ব্রহ্মজ্ঞানং নচ অনুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্। ভব্যশ্চ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্যো ন জ্ঞানকালে অস্তি, পুরুষব্যাপারতন্ত্রত্বাৎ। ইহ তু ভূতংব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যং নিত্যবৃত্তত্বাৎ ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্। চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ। যা হি চোদনা ধর্ম্মস্য লক্ষণং সা স্ববিষয়ে নিযুঞ্জানা এব পুরুষমববোধয়তি। ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষমববোধয়ত্যেব কেবলং, অববোধস্য চোদনাজন্যত্বাৎ ন পুরুষো হবোধে নিযুজ্যতে। যথা অক্ষসন্নিকর্ষেণ অর্থাববোধঃ তদ্বৎ। তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপদিশ্যতে ইতি।—

ভাষ্যানুবাদ—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফল ও জিজ্ঞাস্য বিষয় নিতান্ত বিলক্ষণ—এই কারণেও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—সমান হইতে পারে না (ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা যদি সর্ব্বপ্রকাবে একই রূপ হইত, তাহা হইলেও ধর্ম্মজিজ্ঞাসাব সহিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসাব শেষশেষিভাব সম্ভবপর হইত, অথবা ধর্ম্মজিজ্ঞাসাতে যাহাব অধিকার আছে—তাহারই ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে অধিকার আছে—এইপ্রকাব কল্পনা কবা যাইত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষেও তাহা সম্ভবপর নহে,) কাবণ ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ফল ও জিজ্ঞাস্যবিষয় হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফল ও জিজ্ঞাস্যবিষয় এত বিভিন্ন যে তাহাতে যে একই ব্যক্তি এক সময়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হইবে, তাহাও সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মজ্ঞানের ফল অভ্যুদয় (অর্থাৎ স্বর্গাদি) আর সেই অভ্যুদয় লাভ করিতে হইলে, কর্ম্মেব অনুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল কিন্তু মুক্তি। সেই মুক্তিলাভ করিতে হইলে, জ্ঞানব্যতিরিক্ত অন্য কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মকাণ্ড রূপ বেদভাগের প্রতিপাদ্য যে ধর্ম্ম—তাহা ভাবী (অর্থাৎ যখন বেদরূপ প্রমাণের সাহায্যে আমরা ধর্ম্মের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করি, তখনই যে আমরা ধর্ম্মলাভ কবি তাহা নহে; ধর্ম্মের তত্ত্ব কি তাহা বুঝিয়া, আমরা যদি ঐ ধর্ম্মলাভের উপায় স্বরূপ যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে—তাহাদের অনুষ্ঠান করি তাহা হইলে, সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠা-

নের পরে আমরা ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইয়া থাকি, কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিষয় যে ব্রহ্ম—তাহা নিত্য স্বতঃসিদ্ধ,—আমরা উপনিষদের সাহায্যে যখনই তাহাকে যথাযথ রূপে হৃদয়ঙ্গম করি, তখনই আমাদের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। মোক্ষ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। সেই মোক্ষ আমাদের স্বতঃসিদ্ধ হইলেও কেবল ভ্রান্তিবশতঃই আমরা আমাদিগকে বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি ও ফলে সংসারী হইয়া পড়ি। ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের সেই ভ্রান্তি বা অবিদ্যা দূর করিয়া দেয়, এইমাত্র, আর তখনই আমাদের মুক্তি হয় অর্থাৎ আমরা যে সর্ব্বদামুক্ত—তাহা বুঝিতে সমর্থ হই, সুতরাং মুক্তিরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফলকে লাভ করিবার জন্য, আমাদের কোন প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। ইহাই হইল—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পরস্পর ফলগত ও বিষয়গত বৈলক্ষণ্য।) ধর্ম্মরূপ জিজ্ঞাস্য বিষয় ভাবী, উহা জ্ঞানকালে থাকে না,) পরে অনুষ্ঠানের দ্বারা উহার উৎপত্তি হয়,) কারণ ধর্ম্ম পুরুষব্যাপারের ফল। এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য (অর্থাৎ জিজ্ঞাস্য যে) ব্রহ্ম—তাহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান—কারণ ব্রহ্ম নিত্যসিদ্ধ সুতরাং এই ব্রহ্ম কোন প্রকার পুরুষব্যাপারের অধীন বা ফল নহে। ধর্ম্মের প্রমাণ যে বেদভাগ তাহার প্রবৃত্তি হইতে—ব্রহ্মের প্রমাণ যে উপনিষদ্‌রূপ বেদভাগ তাহার প্রবৃত্তিও বিভিন্নস্বরূপ, (এই কারণেও ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারী ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারে না। (এক্ষণে সেই প্রবৃত্তিভেদ কিরূপ—তাহাই দেখান হইতেছে যে) যে বেদ ভাগ ধর্ম্মস্বরূপ বিষয়কে প্রতিপাদন করিয়া থাকে—তাহার স্বভাব এই যে, তাহা ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য—পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই ধর্ম্মস্বরূপটী তাহাকে বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু উপনিষদ্‌রূপ বেদভাগটী ইহার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের স্বরূপই পুরুষকে বুঝাইয়া দিয়া থাকে। (অর্থাৎ সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে লাভ করিবার জন্য পুরুষকে কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে না) এইপ্রকার ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান উপনিষদ্‌রূপ প্রমাণের ফল। যে উপনিষদ্ পাঠ করিবে তাহারই ঐ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হইবে—ইহাই বস্তুস্বভাব, কিন্তু, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কার্য্য কর—এইপ্রকার ভাবে কাহাকেও উপনিষদ্ জ্ঞানলাভার্থে প্রবর্ত্তিত করে না, যেমন আমার চক্ষুর সহিত যদি কোন ঘটপটাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইয়া পড়ে—তাহা হইলে, আমার ঐ ঘটপটাদি বিষয়ে জ্ঞান হইয়া থাকে—এইমাত্র, কিন্তু তাহা বলিয়া আমার চক্ষু আমাকে ঘটপটাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করে না,—প্রকৃতস্থলেও এইরূপই জানিতে হইবে। ইহাই যদি যুক্তিসঙ্গত

হইল, তাহা হইলে সিদ্ধ হইতেছে যে, এমন কোন বিষয় আছে যাহার পরই আমাদের নিয়মতঃ এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপদিষ্ট হইতেছে, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে—সে বিষয়টী কি ? তাহাই বলিতে হইবে।

শাঙ্কর-ভাষ্য—উচ্যতে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামূত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদি-সাধনসম্পৎ মুমুক্ষুত্বঞ্চ। তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধং চ—শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুঞ্চ। ন বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যং উপদিশ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ। (তাহাই) বলা হইতেছে,—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য তাহার জ্ঞান অথবা ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু ব্রহ্ম-অতিরিক্ত অন্য সকল বস্তুই অনিত্য এই প্রকার জ্ঞান,) এই জগৎ অর্থাৎ পৃথিবী এবং পরলোকে যত প্রকার ভোগ্যবস্তু আছে বা হইতে পারে, সেই সকল প্রকার ভোগ্যবস্তুর উপর বিরক্তি, শম ও দম প্রভৃতি সাধনের সম্পত্তি, (অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টীর সর্ব্বদা অনুষ্ঠান। এই ছয়টী সম্পদের লক্ষণও যথাক্রমে শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—লৌকিক ব্যাপার হইতে মনকে নিবৃত্ত করাই শম। ভোগ্যবিষয় সন্নিহিত হইলে তাহার ভোগের জন্য কোন প্রকার চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতির ব্যাপার হইতে না দেওয়া—দম। জ্ঞানলাভ করিবার যাহা প্রতিবন্ধক হইতে পারে এইরূপ কর্ম্মমাত্রকে পরিহার করাই উপরতি। শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব বস্তুর সহনই তিতিক্ষা। নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যেয়বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতাই সমাধান। গুরু ও বেদান্তবাক্য প্রভৃতিতে বিশ্বাস বা আস্তিকতাই শ্রদ্ধা,) এবং মোক্ষলাভের জন্য তীব্র অভিলাষ, এই কয়টী সাধন সম্পত্তি যদি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা হউক, বা না হউক, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে, এবং ব্রহ্মকে জানাও যাইতে পারে। কিন্তু এই কয়টী সাধনের সম্পত্তি (বা সকলগুলির এক সঙ্গে সমাধান) না হইলে, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না। এই কারণে পূর্ব্বে যাহার উল্লেখ করা হইল সেই সাধন চতুষ্টয়ের যে সম্পত্তি, তাহার আনন্তর্য্যই এই 'অথ' শব্দটীর দ্বারা উপদিষ্ট হইতেছে।

ভাষ্য। অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাদ্ বেদ এব অগ্নিহোত্রাদিনাং শ্রেয়ঃ সাধনানাং অনিত্য-ফলতাং দর্শয়তি, "তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতোলোক ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদি। তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি পরং পুরুষার্থং দর্শয়তি "ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরং ইত্যাদি। তস্মাৎ যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা।

ভাষ্যানুবাদ। "অতঃ" এই শব্দটীর অর্থ—হেতু। "এই সংসারে পরিশ্রমের দ্বারা অর্জ্জিত ভোগ্য বস্তু সমূহ যেমন (ভোগের দ্বারা) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরলোকেও পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গাদি ভোগসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়" এইরূপ শ্রুতি, যাগ প্রভৃতি সুখের সাধনবস্তুগুলির ফল যে অনিত্য তাহা প্রতিপাদন করিতেছে, এবং "যে ব্রহ্মবিৎ সে মোক্ষলাভ করে" এইরূপ শ্রুতিও প্রতিপাদন করিয়া দিতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারা যায়, এই হেতুই যথোক্ত প্রকার সাধন সম্পত্তির পরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য।

"অথ" এবং "অতঃ" শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা উপলক্ষে আচার্য্য শঙ্করের বক্তব্য কি তাহা দেখা গেল। এক্ষণে ইহার সংক্ষেপ(এই প্রসঙ্গে যতটুকু দরকার তাহ), এই,—

১। "অথ" শব্দের অর্থ অনন্তর।

২। কাহার অনন্তর? এতদুত্তরে বুঝিতে হইবে—বেদাধ্যয়ন এবং সাধনচতুষ্টয়ের অনন্তর। তন্মধ্যে বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাধারণ কারণ এবং সাধনচতুষ্টয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিশেষ বা অসাধারণ কারণ।

৩। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ধর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর, একথা বলাও ঠিক নহে কারণ মোটামুটি বেদাধ্যয়ন হইতেই জানা যায় যে, কর্ম্মের ফল অনিত্য এবং জ্ঞানের ফল নিত্য। ধর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর বলিলে ধর্ম্মজ্ঞানের জন্য পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং অংশতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানও করিতে হইবে বুঝায়। বেদ হইতেই যখন মোটের উপর কর্ম্মের নিন্দা অবগত হওয়া যায়, তখন সেই সব কর্ম্ম কি করিয়া করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় জানিবার ইচ্ছা আর নাও হইতে পারে, সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞানের পরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য, এমন অর্থ হইতে পারে না।

৪। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ফল উৎপাদ্য নহে, সুতরাং এজন্যও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে না। ব্রহ্মই নিত্য, ইহা ব্রহ্মসূত্রসাহায্যে বেদান্তে পড়িয়া ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফল সিদ্ধ হইল, পরন্তু ধর্ম্মজ্ঞান সেরূপ নহে।

৫। ধর্ম্মজ্ঞানের পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ইহা বৃত্তিকারের মত। ইহা ভাষ্যের উল্লেখ, টীকা প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়।

আচার্য্য রামানুজ এই বৃত্তিকারের মতাবলম্বী, এজন্য তিনি শাঙ্করভাষ্যের যে অংশে বৃত্তিকারের মত খণ্ডিত হইয়াছে, সেই অংশই প্রয়োগ স্থাপন করিয়া যেভাবে আচার্য্য শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন, আগামীবারে তাহা আমরা লিপিবদ্ধ করিব এবং অদ্বৈতবাদীর পক্ষ হইতে যাহা বক্তব্য তাহা বলিব।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিল্বমঙ্গল।

ওহে নাথ, আর কেন তোমার চাতুরী।
হৃদয়ে কে আলো করে, হৃদয় বিহারি ?
লোকে জানে অন্ধের জগত অন্ধকার,
অন্ধের নয়ন মণি, আলোক আমার।
তুমি জান, কত রবি
কত শশী, সোনাছবি
দিবানিশি খেলা করে চারিপাশে ঘিরি,
ওহে নাথ, আর কেন তোমার চাতুরী ?

লোকে জানে অন্ধের জগত অন্ধকার
তারা তো জানে না, আলো তুমি যে আমার।
তারা তো জানে না সেই দুটী আঁখি দিয়ে
কত কোটী আঁখি আমি লয়েছি কিনিয়ে,
আজি এ আঁধার ঘরে
যে মাণিক আলো করে,
বহে হেথা যে অকূল রূপপারাবার—
পিপাসিত কোটী আঁখি—
নিতি নব, যত দেখি,
দুটী আঁখি কোন খানে থাই পাবে তার ?
অন্ধের নয়নমণি, আলোক আমার।

আমার হৃদয়বনে তুমি বনমালী,
কত ভূষা করি তব, কত ফুল তুলি,
হেথা কত নদী বহে,
কত পাখী গান গাহে,
আমার নূতন বিশ্বে কতই মাধুরী,
সখা, ভাই, তুমি আমি কত খেলা করি।
একই গগণে শত চাঁদের উদয়,
চারিদিকে শুধু তুমি, শুধু তুমি-ময়!

লোকে হাসে কত ছলে,
পাগল ভিখারী বলে,
তারা তো জানেনা কেহ সম্পত্তি আমার,
ভিখারীর লুকানো যে রতনভাণ্ডার।

ওহে নাথ, আর কেন চাতুরী তোমার।
ফাঁকি দিয়ে কোথা তুমি পলাইবে আর।
এ নহে গৌরব, অন্ধে ভুলাইয়া ছলে
কেড়ে লয়ে হাত খানি পলাইয়া গেলে,
হৃদি হ'তে পলাইতে পার যদি আর,
বুঝি তবে সর্ব্বেশ্বর, চাতুরী তোমার।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা।

রামানুজ বলেন প্রমাজ্ঞানই হোক্ আর ভ্রান্তিজ্ঞানই হোক্ উভয়স্থলেই "বিষয়ের" বর্ত্তমানতা থাকা চাই। তাই তাঁহার মতে দড়িতে সাপ দেখা বা ঝিনুকে রূপা দেখা ব্যাপারে, সাপ ওরূপার বর্ত্তমানতা আছে, না থাকিলে সর্পজ্ঞান বা রৌপ্যজ্ঞান (তাহা ভ্রান্তি হয় হো'ক্) হইতেই পারে না। রামানুজের মতে এইজন্য কোন জ্ঞানের বিষয়ই অসত্য নহে। তাঁহার মতে ভ্রমজ্ঞানের অর্থ হচ্ছে "বিষয় ব্যবহারের বাধা" মাত্র। পঞ্চীকরণ প্রসঙ্গে ঝিনুকে রূপা থাকা দড়িতে সর্প থাকা প্রভৃতি যে সকল অসম্বদ্ধ প্রলাপাদির উক্তি আছে তাহার উল্লেখ করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার এ স্থল নহে। তবে অদ্বৈতবাদিগণ যে যুক্তি কৌশলে এই "সৎখ্যাতি" বাদ নিরাকরণ করিয়াছেন তাহা না বলিলে অধ্যাসবাদের ভিত্তি দৃঢ় হইবে না। এইজন্য "সৎখ্যাতিবাদের" খণ্ডন কথিত হইতেছে।

বেদান্তবাদী বলেন বেশ কথা তোমার ভ্রমের অর্থ "বিষয় ব্যবহারের বাধা" মানিয়া লইলাম। কিন্তু এই "ব্যবহার-বাধা" জ্ঞান তোমার কখন উৎপন্ন হয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। দড়িকে সর্প বলিয়া বোধ করিয়া তুমি যখন প্রাণভয়ে

পলাইয়াছিলে—ঝিনুককে রূপা বুঝিয়া যখন তুমি ধনলোভে অগ্রসর হইয়াছিলে —মরীচিকায় জল দেখিয়া যখন তুমি পিপাসা, দূরীকরণে ধাবমান্ হইয়াছিলে "ব্যবহার-বাধা" জ্ঞান তখন তোমার ছিল কি? না পরে দড়িকে দড়ি বুঝিয়া ঝিনুককে ঝিনুক বুঝিয়া মরীচিকাকে মরীচিকা বোধ করিয়া তোমার "ব্যবহার বাধা" জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে? যদি বল ভ্রমজ্ঞানান্তে দড়িকে দড়ি বুঝিতে পারিয়া "ব্যবহার-বাধা" জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি—তবে তোমার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র বিসম্বাদ নাই। আমরাও বলি দড়িতে যতক্ষণ সর্প বুদ্ধি ততক্ষণ তোমার জ্ঞান আধ্যাসিক জ্ঞান। যেই সর্পবুদ্ধি দূর হইয়া রজ্জুবুদ্ধি উৎপন্ন হইল তখনই তোমার আধ্যাসিক জ্ঞানের নিবৃত্তি—প্রমাজ্ঞানের অভ্যুদয় হইল। "ব্যবহার-বাধা" জ্ঞান বিবেক বলে উত্তরকালে উৎপন্ন বলিয়া তাহা অধ্যাসের বিরোধী হইল না। এইজন্য প্রলাপতুল্য তোমার "ব্যবহার-বাধা"—বাদ অধ্যাস বাদের প্রতিযোগী না হইয়া বরং তাহার পরিপোষক হইয়াই দাঁড়াইতেছে। কারণ অধ্যাস জ্ঞান সদসদাত্মক এবং অনির্ব্বচনীয়, প্রত্যভিজ্ঞা বা বিবেক বলে তাহার নিবৃত্তি হইলেই বস্তুগত্যা সত্ত্বা প্রকাশ পায়— তৎপরেই "ব্যবহার-বাধা" জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। আরও বলিতেছি, ঝিনুকে রজতজ্ঞান উপস্থিত হইলে তোমার ত "ব্যবহার-বাধা"ও উপস্থিত হইতে পারেনা। কেন পারেনা বলিতেছি—শ্রবণ কর। তুমি ঝিনুককে রূপা মনে করিয়া যখন রূপাসংগ্রহে অগ্রসর হইয়াছিলে তখন রূপাসংগ্রহব্যাগ্রতা-সমুৎসুক চিত্তে তদর্থে অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি ব্যবহারের ত বাধা উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আধ্যাসিক ভ্রম স্থলেও তোমার "ব্যবহারের" বাধা হইতেছে না। যদি বল আমি ঝিনুকে রূপা না পাইয়া রূপা ব্যবহার রূপ কর্ম্মে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছি। তা সত্য বটে, কিন্তু "রূপা ব্যবহার বাধা" জ্ঞান—তোমার কখন উৎপন্ন হইল? যখন তুমি বিবেক বলে বুঝিতে পারিলে ঝিনুক রূপা নহে তখন। ইহার পূর্ব্বে নহে। সুতরাং এই উপপত্তি হইতেছে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঝিনুকে রজতবুদ্ধি ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার কল্পিত "রূপা ব্যবহার কর্ম্মের বাধা" প্রাপ্তির কোন কারণই বর্ত্তমান্ ছিল না। ঝিনুককে ঝিনুক বলিয়া বুঝিতে পারিয়া উত্তর কালে "ব্যবহার-বাধা" উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং তুমি যে বলিয়াছিলে অধ্যাসেও বিষয়ের বর্ত্তমানতা আছে তাহা নহে। অদ্বৈতবাদী শঙ্করানভিপ্রেত "সৎখ্যাতিবাদ" এইরূপে নিরাকরণ করিয়া—প্রত্যগাত্মা যাহা স্বয়ং-জ্যোতি স্বপ্রকাশ ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়—তাহাতে দেশকালপরিচ্ছিন্ন অনাত্মা

বিষয়ের কিরূপ অন্যোন্যাধ্যাস হইতে পারে এক্ষণে তাহারি বিচার করা হইতেছে।

শ্রুতিমুখে অবগত হওয়া যায়, আত্মা নিত্য—নিরংশ নিরবয়ব—ভূমা—সর্ব্বগত—অপরাধীন প্রকাশদেশকালাদিদ্বারা অপরিছিন্ন, উৎপত্তিলয়াদি ধর্ম্ম-বর্জ্জিত, অহং প্রত্যয়েরও অতীত এবং মনোবুদ্ধিরও অতীত। এবং স্বরূপ অবিষয় আত্মাতে কিরূপেই বা দেশকালাবছিন্ন বিষয়ের ও বিষয়ধর্ম্মের অধ্যাস হইতে পারে? যে যাহা প্রত্যক্ষ করে নাই অন্যবস্তুতে তাহার অধ্যাস হইতেই পারেনা। যে সর্প দেখে নাই রজ্জুতে কখনো তাহার সর্প বুদ্ধির অধ্যাস হয় না। দৃষ্ট বস্তুতেই পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর অবভাস সংঘটিত হইয়া অধ্যাস উৎপাদন করে। এই নিয়মের যদি ব্যভিচার না থাকে তবে বলিতে হয় মনোবুদ্ধির অতীত আত্মায় অনাত্মভ্রম হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন—পরমার্থ পক্ষে আত্মা অবিষয় হইলেও ব্যবহার পক্ষে আত্মা আমাদের একান্ত অবিষয় নহে। কারণ—অনাদি অবিদ্যা-কল্পিত অহং বৃত্তি বা অহং উপাধি দ্বারা অবিষয় আত্মা যেন বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ অহং জ্ঞানের গোচরীভূত বিষয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। জীব যতকাল এই অবিদ্যাকল্পিত অহং বৃত্তির অধীন থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্তই নিরুপাধিক আত্মাও যেন অহং বৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছেদ্যের ন্যায় অহং বৃত্তিব বিষয়রূপে প্রতিভাত হইবেন। সুতরাং অহং বৃত্তির একান্ত উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মা—অহং বৃত্তির বিষয় রূপে অবস্থিত। অবিদ্যা-কল্পিত অহং উপাধির বিলোপ না হওয়া পর্য্যন্ত অবিষয় আত্মা এই জন্য বিষয়বৎ প্রতিভাত। অহং বৃত্তি পরিচ্ছিন্ন আত্মাকেও যে তুমি একেবারে অবিষয় বলিয়াছিলে—তাহা নহে। সুতরাং অহং রূপে জ্ঞেয় আত্মায় যে অনাত্ম পদার্থের অন্যোন্যাধ্যাস হইবে তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। আর অপ্রত্যক্ষ আকাশ পদার্থে অজ্ঞমানব যখন নীলাদি বর্ণের এবং গোলত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে তখন অপ্রত্যক্ষ আত্মায় যে অনাত্ম পদার্থ ও তদ্ধর্ম্মের অধ্যাস না হইতে পাবে এমন নহে। যে মিথ্যাজ্ঞানে আত্মার স্বরূপাবধারণে বাধা জন্মায় তাহা শাস্ত্রে অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিচারজনিত প্রজ্ঞা বা বিদ্যা দ্বারা সেই বহুলানর্থকারী অবিদ্যার উচ্ছেদ করিতে বেদান্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

জীবের কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব বোধ না থাকিলে জগতের ব্যবহার চলে না। আমি

অকর্ত্তা অভোক্তা এই জ্ঞানে চিরস্থিতি লাভ হইলে জীবের দ্বারা জাগতিক কোন ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যে দেহে অহং মমাদির অধ্যাস নাই সে নির্ব্যাপার থাকে—প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারেও তাহার প্রবৃত্তি থাকে না। অনাদি অবিদ্যা বশত আমি কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাকার অধ্যস্ত বুদ্ধি হইতেই জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার চলিতেছে। এই ব্যবহারিক জ্ঞানে মনুষ্য পশ্বাদির সহিত সমান। সুতরাং আমরা যাহাদিগকে জ্ঞানী পুরুষ বলিয়া থাকি তাহাদের ব্যবহারও অধ্যাস মূলক। তবে পশ্বাদির সহিত প্রভেদ এই যে উপদেশলভ্য বিবেকজ্ঞানে মানবের অবিদ্যা বিদূরিত হইতে পারে—পশ্বাদির সে সম্ভবনা নাই। ভাষ্যকার আবার অধ্যাস প্রসঙ্গে ইহাও বলিতেছেন যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই জীব শাস্ত্রীয় বা শাস্ত্রবিরোধী কর্ম্মে প্রবৃত্ত নিবৃত্ত হয়—কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্ম বেদাদি সমস্তই অবিদ্যা পরিকল্পিত—কারণ, আত্মায় অনাত্মবুদ্ধি, এবং অনাত্মায় আত্মবুদ্ধির আরোপ না করিলে কোনও শাস্ত্র বা শাস্ত্রীয় ব্যবহার চলিতে পারে না। সুতরাং এই অন্যোন্যাধ্যাস থেকেই শাস্ত্র অশাস্ত্র, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কাম অকাম প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, জীব যতকাল এই দ্বন্দ্বাধ্যাসের গণ্ডীতে অবস্থান করে ততকাল তাহার আত্ম-স্বরূপ লাভের সম্ভাবনা নাই। জীব যখন বিদ্যাবলে বুঝিতে পারে যে এই অবিদ্যাকল্পিত দেহ, বা অহংজ্ঞানের আধার মন (যাহা আত্মার প্রতিবিম্বন বশতঃ চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়) আত্মার স্বরূপ নহে—যখন বুঝিতে পারে আমার যথার্থ স্বরূপ এই সর্ব্বাবভাষক প্রত্যক্ষ আত্মা, যখন বুঝিতে পারে আমি অজর অমর নিত্য মুক্তস্বভাব চিদাত্মা—যখন বুঝিতে পারে আমি দেহ মন বুদ্ধি অহংকারাতীত চিন্ময় স্বভাব স্বয়ংজ্যোতি আত্মা—তখনি তাহার অনাদি অবিদ্যা (যাহা এতকাল অধ্যাস জ্ঞান উৎপন্ন করিতে ছিল) চির দিনের মত অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই অনাদিঅধ্যাসপ্রসূতি অবিদ্যার উচ্ছেদকল্পে বেদান্ত বিচারের প্রয়োজন। বেদান্ত বিচার ভিন্ন অন্য কোনরূপেই এই অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে না। ভাষ্যকার এইরূপ মত প্রকটন করিয়া সূত্রার্থ বিচারে অগ্রসর হইতেছেন।

ভাষ্যকারের অধ্যাসবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে অবিদ্যা বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা সূত্রার্থ ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইব। কারণ অবিদ্যার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে বেদান্তবেদ্য আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিব।

বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিজ্ঞা এই যে একমাত্র "ব্রহ্মই সত্যবস্তু, জগৎ মিথ্যা আর জীবই ব্রহ্ম।" ভাষ্যকার এই জন্য বলিয়াছেন :—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

যদি জীব ব্রহ্ম একই হয়, তবে সে অনুভূতি নাই কেন? জীব দ্বন্দ্বভাবে তরঙ্গিত হয় বলিয়া। এই দ্বন্দ্বভাব কোথা হইতে আসিল? অধ্যাস বশতঃ। অধ্যাসের কারণ কি? অনাদি অজ্ঞান—যাহাব ঐন্দ্রজালিক সম্মোহনে আপাতভিন্ন জীব-জগদাদির বিজৃম্ভণ দৃষ্ট হইতেছে। এই অনাদি অবিদ্যা কোথা থেকে এলো? উত্তরে বেদান্তবাদী বলেন "মৈবং বদ মূর্দ্ধাতে ব্যপতিষ্ঠতি" এ প্রশ্ন করিও না, তোমার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইবে। উত্তরটী বড়ই ভয়াবহ বোধ হইতেছে। কিন্তু হে জিজ্ঞাসু, তুমি ভীত হইও না; এই অবিদ্যাবিষয়ক প্রশ্নের প্রসঙ্গই যে "অপ্রাসঙ্গিক" তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। মনযোগী হইয়া শ্রবণ কর।

প্রথমত বেদান্তবাদী আমরা বলিতে চাই যে এই অবিদ্যা কোথা হইতে আসিল আমরা জানি না। তবে অবিদ্যাকে সৎ পদার্থ বলিতে পারি না, কেন না সৎপদার্থ এক বই দুই নাই, ইহাই বেদান্তের প্রতিজ্ঞা। ত্রিকাল সত্তাবৎ পদার্থই সৎ বলিয়া কথিত হয়। প্রনিধান কালে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম' "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি—মহাবাক্যের ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা যখন জীব ব্রহ্মাবস্থিত হইয়া বলেন—"ক্বগতং কেন বানীতং কুত্রলীন মিদং জগং" তখন অবিদ্যার সত্ত্বা আর কাথায় থাকিল? আনন্দঘন, প্রজ্ঞানঘন, সৎঘন আত্মার জীবাত্মাধ্যাসের যখন নিঃশেষ বিলয়প্রাপ্তি ঘটে তখন আর নানাত্ববিজৃম্ভণকরী অবিদ্যার অস্তিত্ব কোথায়? আত্মসংস্থ "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার দৃঢ় ধারণাশীল আত্মজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টিতে সেই জন্য অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই। সেইজন্য অবিদ্যাকে সৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। পক্ষান্তরে স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবিদ্যাকে একেবারে অসৎও বলা যায় না। কারণ এই অবিদ্যার বিজৃম্ভণেই ব্যবহার জ্ঞানে ভাসমান বিশ্বের প্রতীতি হইতেছে। রূপ রসাত্মক বহির্বিকাশমান জগৎ নানা জীবে নানা রূপে প্রতিভাত হোক্—তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু অবিদ্যাগ্রাহগ্রস্ত জীব বাহিরে যে কিছু অনুভব করিতেছে এ বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার অবসর নাই। সুতরাং

যে শক্তি বশে পরমার্থত অবাস্তব বিশ্বের বহির্বিকাশ তাহা যে একেবারে নাই এ কথাও সমর্থন করা যায় না। এইজন্য এই অবিদ্যাকে সদসদাত্মিকা অনির্ব্বচনীয়রূপা বলিয়া বেদান্তবাদিগণ সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন। আরও বলিতেছি; শ্রবণ কর, অবিদ্যা যদি সৎ বস্তুই হইত তাহা হইলে অবিষয় ব্রহ্ম অবিদ্যা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ ভৌমব্রহ্মে বিষয়ান্তরের অনুপ্রবেশ নাই, ইহা স্বসংবেদ্য সমাধি অবস্থায় অবগত হওয়া যায়। সুতরাং অবিদ্যা যে সদসদাত্মিকা ও অনির্ব্বচনীয়া তাহার এক প্রকার পর্য্যাপ্ত মীমাংসা হইল।

বেদান্তবাদিগণ অবিদ্যার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে না পারিলেও বুঝিবার সৌকার্য্যার্থে একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগতের বোধ্য বোধকতা জ্ঞান দেশ-কাল-নিমিত্ততা অবলম্বনে উদিত হয়। দেশ নাই, কাল নাই, কার্য্য কারণ বোধ নাই অথচ পদার্থ বোধ হইবে—একথা খপুষ্পবৎ অলীক। যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদাবস্থা সেই খানেই দেশকাল নিমিত্ততা তদুপাদান রূপে বিদ্যমান্ রহিয়াছে। বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে এই অবিদ্যা "নামরূপাত্মিকা"—যে নামরূপ লইয়া ব্যবহারিক জগতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। পরমার্থ পক্ষে অবিদ্যা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় দেশ, কাল, নিমিত্ততা বা নাম রূপ মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশ কাল নিমিত্ততা বা নামরূপ মিথ্যা কেন তাহা বলিতেছি। দেশ বলিতে আমরা কি বুঝি? দুই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থল। কিন্তু সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে গেলে সীমার চিহ্ন চাই। তাহা আবার কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর অপেক্ষা করে। সুতরাং যে নির্দ্দিষ্ট বস্তু তুমি দেশের সাহায্যে বুঝিবে তাহাই আবার "দেশ" বুঝিবার জন্য কারণ রূপে বিদ্যমান্ থাকা চাই। এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দুষ্ট বিচারে আমরা "দেশ" বুঝিতে অপারগ হইতেছি। কাল সম্বন্ধেও তাই। মনে করুন সূর্য্যের উদয়াস্ত ধরিয়া কালের অংশ দিন বলিয়া একটা ধারণা করিয়া লইলাম। যে দেশে সূর্য্য ছয় মাস কাল উদিত ও ছয়মাস কাল অস্তমিত থাকে তাহার দিন রূপ কালাংশের পরিমান আমার ধারণায় প্রায় দুইশত গুণ অধিক হইয়া দাঁড়াইতেছে। আবার কালাংশের মাপ ধরিয়া সূর্য্যের উদয়াস্ত নির্ণয় করিতেছি, সুতরাং যে কালের সাহায্যে বস্তু বোধ হইবে সেই কাল বুঝিতে অবান্তর বস্তুর প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে কার্য্যকারণপ্রবাহ জ্ঞানও (যাহা দেশ কালের উপর নির্ভর করে) আধ্যাসিক মিথ্যা বা

স্বস্বভাবদৃষ্ট অন্যোন্যাশ্রয়ী হইয়া পড়িতেছে। এই জন্য বেদান্তবাদিগণ বলেন দেশকালনিমিত্ততা-জ্ঞানও আধ্যাসিক—পারমার্থিক নহে। যাহা দেশকাল নিমিত্ততা সম্বন্ধে সত্য নামরূপে পরিণত জগৎ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। এই জন্যই বেদান্তমতে নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা। যে ব্রহ্মে এই নাম রূপাত্মক জগতের অলীক বিজৃম্ভণ সেই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। ব্যষ্টিপক্ষেও বলিতে হয় শরীর মন, ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিতে অধ্যস্ত অহংজ্ঞান মিথ্যা, যে প্রকাশস্বভাব আত্মার প্রাতিভাসিক সত্তায় জীব "আমি" "আমি" করে সেই আত্মাই সত্য; তাহাই জীবের যথার্থ স্বরূপ।

পূর্ব্বকথিত বিচারপ্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাইলাম বেদান্তবাদী অবিদ্যার যে লক্ষণা করিয়াছেন "সদসত্ত্বাভ্যাংনির্ব্বচনীয়রূপা" কোনরূপেই তাহার ব্যভিচার হইতেছে না। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি এই অবিদ্যার "কারণ" নির্ণয় হইতে পারে না—এ প্রশ্নই অপ্রশ্ন তাহা বুঝাইয়া বলিতেছি। আমাদের প্রশ্ন বা উত্তর দেশকালনিমিত্ততারূপ সীমা অবলম্বনে উদিত ও মীমাংসিত হইয়া থাকে। তুমি এমন প্রশ্নই করিতে পার না যাহা তোমার ভূয়োদর্শনের (যাহা দেশকাল নিমিত্ততায় আবদ্ধ) বাহিরে। সুতরাং আমার উত্তরও তদনুরূপ একদেশদর্শী অব্যাপক হইবে। যে অবিদ্যার কারণ নির্ণয়ে তুমি অগ্রসর সেই অবিদ্যার বিরাট বাগুরারূপ দেশকাল নিমিত্ততায় তোমার ভূয়োদর্শন জ্ঞান আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং অবিদ্যার কারণ বা উৎপত্তি তুমি কিরূপে নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে। ইহা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং ঐ বিষয়ে আর উৎসাহ না করিয়া এখন অবিদ্যাগ্রস্ত তোমার এমন চেষ্টা করা উচিত যাহাতে তুমি এই অবিদ্যার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পার। ইহাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অন্ধকারে সর্পাঘাত হইয়াছে। তুমি কি এখন প্রদীপ লইয়া "কি সাপ—কেন দংশন করিল" ইহাই বিচার করিবে—না রোঝা আনাইয়া বিষ মোক্ষণে যত্নপর হইবে? অবিদ্যাসর্পে তোমাকে দংশন করিয়াছে, "অবিদ্যা কেন এলো, কোথায় থাকে তাহার উৎপত্তি কোথায়" ইহাই বিচার করিবে না আত্মজ্ঞ পুরুষের আশ্রয় লইয়া স্বস্বরূপ লাভে যত্নপর হইবে? কোনটা বুদ্ধিমানের কার্য্য নিজেই বুঝিয়া লও। বেদান্তবাদিগণ এইজন্যই বলেন আত্মজ্ঞ পুরুষের আশ্রয়ে শ্রবণাদিসাধনাদ্বারা আত্মার স্বরূপ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া হে জীব! তুমি অবিদ্যাকে পরাজয় কর—দেখিতে পাইবে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অবিদ্যা বলিয়া কোন পদার্থ নাই।

অধ্যাস ভাষ্যের প্রসঙ্গ করিতে করিতে বেদান্তবেদ্য অনেক তত্ত্ব কথারই আংশিক অবতারণা করিয়াছি। আর একটী বিষয়ের আংশিক আলোচনা করিয়া "ভাষ্য" ভূমিকার উপসংহার করিতেছি।

অবিবেকীর মনে একটা সন্দেহ উঠিতে পারে যে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে এই নামরূপাত্মক অসদ্রূপী জগতের বিজৃম্ভণ কেমন করিয়া হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর ভাষ্যের যথাস্থানে সবিশেষ আলোচিত হইবে। কিন্তু এখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখা ভাল যে অব্যাকৃত ব্রহ্ম নামরূপে ব্যাপৃত জগতে পরিণত হন নাই। মিথ্যা বস্তু মিথ্যা বস্তু থেকেই উৎপন্ন হয়। জগৎ বলিয়া পরমার্থত কোন পদার্থই ত নাই। তবে নামরূপে বিজৃম্ভিত কিংভূত কিমাকার এই জগৎপদার্থভান পূর্ব্বকল্পের জগদ্ভান থেকেই আসিয়াছে। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পানুগত অসৎ জগদধ্যাস ব্রহ্মে পরিকল্পিত হইয়া আসিতেছে মাত্র। ইহাতে সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের কোনরূপ বিচার বা পরিনমন হয় নাই। এই জন্যই বেদান্ত সিদ্ধান্তিত উৎপত্তি এই যে নামরূপে ব্যাকৃত জগদ্জ্ঞান পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের জগদ্জ্ঞানের পুনরাবর্ত্তন বা বিজৃম্ভণ মাত্র। ব্রহ্মে এই জগদ্ভান রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায় আধ্যাসিক বা ব্যাবর্ত্তিত। সুতরাং এই বিচিত্রময়ী ব্যাকৃত সৃষ্টিলীলা ব্রহ্মে মরুমরীচিকার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম দেশকাল নিমিত্ততাকে অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব রূপে অবস্থান করিতেছেন। জীবমাত্রই সেই পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ। এই তত্ত্ব দৃঢ় করিবার জন্য ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র মুখে প্রথমেই বলিতেছেন :—

১ম অধ্যায়ঃ। ১মপাদঃ।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

সংস্কৃতার্থঃ—অথ (অনন্তরং) অতঃ (কারণাৎ) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (ব্রহ্মবিচার নীয়মিত্যর্থঃ)।

(ক্রমশঃ।)

জৈনধর্ম্মের কিঞ্চিৎ পরিচয়।*

(শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দত্ত)

স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ।

অনেকান্তবাদের অর্থ—একবস্তুতে অনেক ধর্ম্মের (attributes) অস্তিত্ব স্বীকার করা, যেমন একই ব্যক্তি কাহারও পিতা, কাহারও পিতৃব্য, কাহারও মাতুল, কাহারও শ্বশুর, জামাতা, কাহারও স্বামী, ইত্যাদি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধের স্থাপন ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষা লইয়া হইয়া থাকে। যেমন একই ব্যক্তি পুত্রাপেক্ষায় পিতা, জামাতাপেক্ষায় শ্বশুর, স্ত্রী অপেক্ষায় স্বামী ইত্যাদি। তেমনি একই ব্যক্তি চতুর এবং মূর্খ ইহাও বলা যাইতে পারে, যথা, সে চতুর যখন তাহাকে মূর্খাপেক্ষায় দেখা যায়, আর মূর্খ যখন অধিকতর চতুরব্যক্তির অপেক্ষায় দেখা যায়। এই প্রকার কোন বস্তু স্বচতুষ্টয়াপেক্ষায় কথঞ্চিৎ 'সৎ' ও পরচতুষ্টয়াপেক্ষায় কথঞ্চিৎ 'অসৎ'। যেমন সমুখস্থিত এই পুস্তকখানি এই দোয়াতটির অপেক্ষায় কথঞ্চিৎ 'অসৎ' অর্থাৎ দোয়াতের দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল এবং ভাব অপেক্ষায় পুস্তকখানি কথঞ্চিৎ 'অসৎ' কিন্তু স্বচতুষ্টয় অর্থাৎ স্বদ্রব্য, স্বক্ষেত্র, স্বকীয়কাল এবং স্বভাব অপেক্ষায় পুস্তকখানি কথঞ্চিৎ 'সৎ'। অতএব কোন বস্তু সর্ব্বথা 'সৎ'ও নয় এবং সর্ব্বথা 'অসৎ'ও নয়, এরূপ বলা যাইতে পারে। মহাত্মা শঙ্করও এই প্রকারে কোন পদার্থের দোষনিবারণ করিতে গিয়া 'ব্যবহারতঃ' এবং 'পরমার্থতঃ' অর্থাৎ ব্যবহার দৃষ্টিদ্বারা এবং পরমার্থ দৃষ্টিদ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ ভগবদ্গীতায় নিম্নোক্তস্থানে এইপ্রকারের বিরোধাত্মক দোষকে তিনি উক্ত উপায়ে নিবারণ করিয়াছেন।—

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতে প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবোঽস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

---

* জৈনধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবার সমাপ্ত হইল। এই পরিচয়লাভের পর ভারতীয় পরমার্থসাধনার ইতিহাসে ও বর্ত্তমানক্ষেত্রে জৈনমতের বিশেষত্ব আলোচনা করা ও স্থান নির্দ্দেশ করা আগামী পৌষ সংখ্যার জন্য স্থগিত রহিল। উঃ—সঃ।

†স্বচতুষ্টয়—স্বদ্রব্য, স্বক্ষেত্র, স্বকীয়কাল ও স্বভাব।

অন্যবস্তুর দ্রব্য কাল ক্ষেত্র এবং ভাবকে পরচতুষ্টয় বলে।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন কস্য সুকৃতং বিভুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫॥

গীতা ৫ম অধ্যায়।

ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্ম সকলও সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্মফলসংযোগও সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু জীবের স্বভাবই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥১৪॥

ঈশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না পুণ্যও গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে, এই জন্যই জন্তুগণ মোহিত (ভ্রমযুক্ত) হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া থাকে ॥১৫॥

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের বিরুদ্ধ শ্লোক—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥

গীতা ১৮শ অঃ।

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর মায়াদ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ়ভূত সকলকে (বাজিকরের ন্যায়) তত্তৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন ॥৬১।

এই শ্লোকের এবং উল্লিখিত গীতার শ্লোকদ্বয়ের অভিপ্রায় পরস্পর বিরোধী। অর্থাৎ এক শ্লোক বলিতেছে পরমেশ্বর কিছুই করেন না অপর বলিতেছে পরমেশ্বর সবই করেন। এই বিরুদ্ধবচনকে পরমার্থতঃ এবং ব্যবহারতঃ এই প্রকার ভিন্নদৃষ্টিতে বিচার করিয়া আচার্য্য শঙ্কর উক্ত দোষের নিবারণ করিয়াছেন।

কোন বস্তুর বিচার করিতে গেলে শুধু এক উপায়ে করিলে চলিবেনা, সব দিক দেখিয়া করিতে হয়। কেননা লোকেও নৈতিকদৃষ্টি, বৈদ্যশাস্ত্রদৃষ্টি, অর্থশাস্ত্রদৃষ্টি, ব্যবহারদৃষ্টি, পরমার্থদৃষ্টি, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষাদ্বারা বিচার করিয়া থাকে। যেমন—'রাত্রিভোজন বিধেয় নয়' আমি বলিলাম, অপর একজন বলিলেন কি দোষ? আমি বলিলাম "নৈতিক, ব্যবহারিক অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কোন দোষ নাই, আমি সেদিক দিয়া বলি নাই, আমি বলিতেছি বৈদ্যশাস্ত্রদৃষ্টিতে। রাত্রিভোজন অস্বাস্থ্যকর।"

ঠিক এই প্রকারে জৈনমতে ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষা লইয়াই স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ বলা হইয়াছে।

এই বিষয়ে ডাক্তার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এম, এ, বলিতেছেন—

"There are two ways of looking at things, one called দ্রব্যার্থিকনয় and the other পর্য্যায়ার্থিকনয় The production of a Jar is the production of something not previously existing, if we take the latter point of view, *i. e* as a Paryaya or modification, while it is not the production of something not previously existing, when we look at it from the former point of view, *i. e.* as different in each case This lead to the celsbrated Saptabhaṅginaya or the seven modes of assertion You can affirm existence of a thing from one point of view (Syadasti) deny if from another (Syannasti), and affirn both existence and non-exisience with reference to it at different times (Syad-asti-nasti). If you should think of affierming both existence and non-existence at the same time from the same point of view, you must say that thing cannot be so spoken of (Syad-avyaktovya) similarly under certain circumstances the affirmation of existence is not possible (Syad-asti-avaktavya) or of non-existence (Syan-nasti-avaktavya) and also of both (Syad-asti-nasti-avaktavya). All that is implied is that every assertion which is true is true only under certain conditions of space, time &c.

পদার্থ বিচার করিবার দুইটি মার্গ। এক দ্রব্যার্থিকনয়* ও অপর পর্য্যায়ার্থিকনয়।† যখন কোনও মূলপদার্থের যে বাহ্যরূপ পূর্ব্বে ছিলনা, এখন হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞান করি, তখন উহাকে আমরা পর্য্যায়ার্থিকনয় দ্বারা বিচার করি এবং তখন তাহাকে পর্য্যায় অথবা 'পল্টনা' (পরিবর্ত্তিতরূপ) বলা হয় এবং পূর্ব্বেও কখন উৎপন্ন হয় নাই এবং এখানে উৎপন্ন হয় নাই

* পদার্থের প্রকৃত বা সামান্য স্বরূপ যে বাক্য গ্রহণ করে (প্রকাশ করে) তাহাকে দ্রব্যার্থিক নয় বলা হয়।

† যে বাক্য পদার্থের বিশেষকে (গুণ অথবা পর্য্যায়কে) বিষয় করে (প্রকট করে) তাহাকে পর্য্যায়ার্থিক নয় বলা হয়।

এইরূপ জ্ঞান কোন পদার্থে প্রযুক্ত হইলে তাঁহাকে আমরা দ্রব্যার্থিকনয়দ্বারা বিচার করি এবং তখন তাহাকে দ্রব্য বলা হয়। যথা আত্মা যখন স্বকীয় পাপ-পুণ্যানুসারে দেব, মানব, পশু অথবা নরকবাসী হয়, তখন সেই আত্মাকে দেব বলা, মানব বলা, নরকবাসী পশু বলাকে পর্য্যায়ার্থিক নয়াপেক্ষ বলা হয়। কিম্বা তাহাকে আত্মা বলা, চৈতন্য বলা, জীব বলা দ্রব্যার্থিকনয়াপেক্ষা বলা হয়।

এই প্রকারে এক বস্তুকে এককালেই তুমি বলিতে পার, 'এই বস্তু এমন আছে, আমি বলিতে পারি সে বস্তু তাদৃশ নাই', এই প্রকার দ্রব্যার্থিক নয় এবং পর্য্যায়ার্থিক নয় দ্বারা একই পদার্থের বিচার করা যায়, আবার সপ্তভঙ্গীন্যায় দ্বারাও সাতপ্রকারে বিচার করা যায়।

এক অপেক্ষাদ্বারা তুমি 'একবস্তু আছে' (স্যাদস্তি) এই প্রকার বলিবে এবং অন্যাপেক্ষা দ্বারা 'সে নাই' (স্যান্নাস্তি) এইরূপ বলিবে এবং বিভিন্ন সময়ে 'সে বস্তু আছে' এবং সে বস্তু নাই (স্যাদস্তি নাস্তি) এরূপও বলিবে। যখন একই বস্তু একই সময়ে একই অপেক্ষা দ্বারা 'আছে' এবং 'নাই' বলা যাইতে পারে না তখন তাহাকে স্যাদ অবক্তব্যহ বলিতে হইবে। এইপ্রকারে এক অপেক্ষাদ্বারা যখন বস্তুর অস্তিত্ব বলা অসম্ভব তখন উহা স্যাদ্-অস্তি-অবক্তব্য এবং যখন বস্তুর নাস্তিত্ব বলা অসম্ভব হয়, তখন উহা স্যাদ-নাস্তি-অবক্তব্য। এবং যখন অস্তি নাস্তি উভয়ই বলা যায় না তখন উহা স্যাদ আস্তি-নাস্তি-অবক্তব্য। এই সপ্তপ্রকার নয়দ্বারা এই বুঝা যায় যে কোন বস্তু প্রত্যেক স্থানেই সর্ব্বকালেই প্রত্যেক পদ্ধতিতেই এবং প্রত্যেক বস্তুর আকারেই অবস্থিতি করে এরূপ বিবেচিত হইবে না, সে একস্থানে আছে, অন্যস্থানে নাই, এক সময়ে আছে, অন্য সময়ে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সপ্তনয় সম্বন্ধে অনেক বিদ্বজ্জনের এরূপ ধারণা যে উহাতে কোন নিশ্চয়তা নাই, অথবা আমরা কেবল উহার সম্ভাব্যতা নিয়া ব্যবহার করি কিন্তু এ ধারণা এ বিশ্বাস সপ্ত নয় করিতে বলে না। প্রত্যেক বস্তুই (বা সত্য) স্থান কাল পাত্র হিসাবে সত্য ইহাই এর মোটামুটী কথা। ইহাদ্বারা দ্রব্যসামান্য বা সধারণতঃ দ্রব্যের বিবেচনা হইয়া থাকে।*

* তাহাদের মর্ম্ম এই যে ব্যবহারকালে নিরপেক্ষ সত্য আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়না, সাপেক্ষ সত্যই বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় এবং একই পদার্থকে বুদ্ধি সপ্তভঙ্গীতে গ্রহণ করিতে পারে। বুদ্ধিপ্রয়োগের দ্বারা সত্য লভ্য নহে, সাধনাদ্বারাই লভ্য।

"জাতিভেদ।"*

(জনৈক সমালোচক।)

দশজনে মিলিয়া মিশিয়া খুব উৎসাহে ও উল্লাসে একটা কাজে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে, এ হেন সময় দেখা গেল যে ঘটনাচক্রে এমন একটা বিষম দোষ হইয়া পড়িয়াছে, যে কাজটী বুঝি একেবারেই নষ্ট হয়। এই অবস্থায় ঐ উদ্যোগীদের মধ্যে এমন কয়েকজন থাকিতে পারেন, যাঁহারা মাথা হারাইয়া পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার জন্য একটা তুমুল গণ্ডগোল উপস্থিত করেন। যে দোষ সকলের সমবেতচেষ্টায় হয়ত শোধরাইতে পারা যাইত, সেই দোষ এই গণ্ডগোলের ফলে সহজেই প্রতীকারের সম্ভাবনা অতিক্রম করে এবং কাজটী শেষে প্রকৃতই মাটি হয়।

আজ কাল সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে অনেকটা এই রকম 'কাজ-ভণ্ডুলের" পালা অভিনীত হইতেছে। সমাজ প্রাচীন কর্ম্মস্রোত হারাইয়া পাঁকে ভরিয়া উঠিতেছিল, এমন সময়, পাশ্চাত্য কর্ম্মাদর্শসংঘাতে যে উদ্দীপনা আসিয়াছে, তাহার প্রভাবে দেশে সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে। ভাল কথা, কিন্তু প্রাচীন জীবনখাতে কি উপায়ে সনাতন আদর্শ-শৃঙ্গ হইতে কর্ম্ম-গঙ্গা বহাইতে হইবে, সে চেষ্টায় সম্মিলিতভাবে উদ্যোগী না হইয়া, যদি আমরা পঙ্কিল সমাজের পঙ্ক লইয়া পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিতেই উদ্যোগী হই, তবে পাঁকে ডুবিয়া মরাই ভাগ্যে লেখা আছে বুঝিতে হইবে।

দুঃখের বিষয়, "জাতিভেদ" এই পঙ্কোৎক্ষেপণের সুরে বাঁধা, এবং অনুমান হইতেছে, গ্রন্থশেষে যে আরও আঠারখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, উহারাও সম্ভবতঃ এক একখানি পঙ্কোৎক্ষেপণী। এ অনুমান মিথ্যা হইলেই সুখের কথা।

প্রথম প্রশ্ন এই যে আমাদের দেশে সমাজসংস্কারকার্য্যে এমন উৎকট বিরোধের ধুয়া কেন উঠিল? "জাতিভেদ"-প্রণেতার মত সত্যানুরাগী, উদারহৃদয়, পরদুঃখকাতর, নিষ্কামকর্ম্মব্রতী, উদ্যমশীল ব্রাহ্মণসন্তান আধুনিক সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণবিরোধের গভীর উত্তেজনায় উত্তে-

* শ্রীযুত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত এবং পাংশা "আয়ুর্ব্বেদ শান্তিকুটীর" হইতে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য—১৲ টাকা।

জিত হইয়া উঠেন কেন? বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের মস্তক চূর্ণ করিবার প্রবৃত্তিটা সমাজসংস্কারের দলে ঢুকিলেই ভূতাবেশের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসে কেন?

এ প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য প্রথমতঃ "জাতিভেদে"র ২১১ পৃষ্ঠা খুলিতে বলি। গ্রন্থকার বুঝাইতেছেন যে একদিকে ব্রাহ্মণকৃত অত্যাচার ও অন্যদিকে বিধাতৃবিহিত প্রতীকার, এই উভয়বিধ ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া হিন্দুসমাজ বিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নহে, জগতে ইতিহাসের ধারাই ঐরূপ। একদিক থেকে অত্যাচার ও অপরদিক থেকে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই বিরোধলীলা সকল দেশের, সকল সমাজেরই ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে। এইরূপ ভূয়োদর্শনের ফলে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক স্থির করিয়া লইয়াছেন যে প্রথমতঃ স্বাভাবিক স্বার্থভাব, দ্বিতীয়তঃ তদুদ্ভূত বিরোধ, তৃতীয়তঃ সামঞ্জস্য, এই ত্রিকের পৌর্ব্বাপর্য্য ও পুনঃপুন অভিনয়ের দ্বারা ইতিহাসের ধারা নিরূপণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের এই দৃষ্টি পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে মানবপ্রকৃতির লীলা অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, আমরা যেন অজ্ঞাত সংস্কারের বশে ঐ দৃষ্টির প্রয়োগ করিয়া তৃপ্তি পাই। আর্য্য ও অনার্য্যের একটা সুদীর্ঘ সংগ্রাম কল্পনা না করিলে আমরা অতীতের ঘনতমসা ভেদ করিতেই পারি না। ঐরূপ একটা তুমুল বিরোধ না পাইলে, আমরা হিন্দু সমাজের উদ্ভব কোনমতেই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি না ('জাতিভেদ', ১৬ পৃঃ)। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ে একটা আবহমান কাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই, এতদিনে একটা "ইতিহাসের ধারা" পাওয়া গিয়াছে। ধন্য পাশ্চাত্যশিক্ষার জ্ঞানাঞ্জনশলাকা। ধন্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টি!

আধুনিক সমাজসংস্কারকের স্কন্ধে যে ভূতাবেশের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার জন্য দায়ী এই বিকৃত প্রত্নদৃষ্টি। যদি ঝগড়াই ইতিহাসের সারকথা হয়, তবে ঝগড়া করিয়াই উন্নতি করিতে হইবে, যেনাস্য পিতরো-যাতাঃ। সমাজসংস্কারকের ভগবান পর্য্যন্ত "অভ্যুত্থান কর, অভ্যুত্থান কর" বলিয়া ভারতের হীনজাতিদিগকে সংগ্রামে উত্তেজিত করিতেছেন ("জাতিভেদ" ২১২ পৃঃ)।।

এই যে দৃষ্টি আমাদের ইতিহাস গড়িয়া দিতেছে, সমাজসংস্কারকের ভগবান গড়িয়া দিতেছে, তুমুল আন্দোলনের পথনির্ণয় করিতেছে, কর্ম্মীর হৃদয়ে

প্রেরণার সঞ্চার করিতেছে, সমালোচকের অস্ত্র শানাইয়া দিতেছে,—এই দৃষ্টিই কি ভারতকে বুঝিবার, ভারতের সমাজকে বুঝিবার, ভারতের ভবিষ্যৎ বুঝিবার পক্ষে প্রকৃত দৃষ্টি? সংক্ষেপে উত্তর দিব।

পাশ্চাত্য ইতিহাসে দেখিতে পাই, মানুষ প্রবল স্বার্থসাধনের ভিতর দিয়াই নিস্বার্থতার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে এবং পরার্থের সহিত স্বার্থের যে অভিজ্ঞতালব্ধ সামঞ্জস্য, তাহারই উপর সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। ভগবান খ্রীষ্টের জীবনাদর্শ যথাসময়ে পাশ্চাত্যাকাশে সমুদিত হইয়া ঐ সামঞ্জস্যকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং উহার সুপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই যে পাশ্চাত্যে উদ্যমের মূলে বিরোধমূলক প্রেরণা জড়িত থাকে। স্বাধিকার বা রাইট্‌স্ বজায় রাখিবার জন্য বিরোধমূলক আন্দোলনকে জাগাইয়া রাখিতে হয়।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে উদ্যমকে প্রেরণার জন্য বিরোধভাবের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয় নাই। আদিযুগ হইতেই ঋষিরা মানুষের উদ্যমকে উচ্চাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন, কর্ম্মকে স্বার্থসাধনের দিক হইতে ফিরাইয়া ধর্ম্মের দিকে চালিত করিয়া দিয়াছেন, উদ্যমের মূলে স্বাধিকারভাবের পরিবর্ত্তে স্বধর্ম্মভাবকে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, বিরোধাত্মক আন্দোলনের ভিতর দিয়া হীনকে উচ্চাধিকারে উপনীত না করাইয়া, ধর্ম্মানুশীলনমূলক যোগ্যতাসম্পাদনের ভিতর দিয়া হীনকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন। ফলে আর্য্যসমাজের বিবর্ত্তনধারায় একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে, যথা:—একটা উচ্চভাব বিকশিত হইয়া প্রথমতঃ আত্মসংরক্ষণের জন্য সমাজে একটা উচ্চ স্তর গড়িয়া লয়, তারপর সেই স্তর হইতে সেই ভাব আপনাকে সমাজের সর্ব্বত্র সংক্রামিত করে, এবং শেষে নিম্ন স্তরগুলিতে সেই ভাব যথাসম্ভব আয়ত্ত হইলে, সমাজের একটা অখণ্ডতা ও সমষ্টি শক্তি প্রকাশ পায় এবং শিক্ষায়, প্রতিভায়, সামর্থ্যে ও গৌরবে, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আসল পরিচয়ে তখন আর শ্রেণীভেদ থাকে না। তার পর মনুষ্যত্বের আসল পরিচয়ে যখন শ্রেণীভেদ ঘুচিল, তখন আচারমূলক শ্রেণীভেদ সুস্থ সমাজে আপনা আপনি লোপ পাইয়া যায়।

বৈদিক ইতিহাসে সমাজের ঠিক এইরকম বিবর্ত্তন-ধারা দেখা যায়। মহত্তর আদর্শ আয়ত্ত করিয়া বৈশ্য বা শূদ্র ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে পরিণত হইতেছে, এরূপ সাক্ষ্য বৈদিক সাহিত্য বারম্বার দিতেছে। "জাতিভেদে" এরূপ অনেক

দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া নিম্নবর্ণের দাবীদাওয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় নাই, কিম্বা প্রথমেই আচারমূলক ভেদ রদ করিবার জন্য ঝগড়া করিতে হয় নাই। প্রথমে ভিতরের সাম্য, তার-পর বাহিরের সাম্য—ইহাই সমাজপরিণতির ভারতীয় রীতি। পাশ্চাত্য পারিপার্শ্বিক অথবা স্থূল সাম্যকে ভাবগত সাম্যের দ্বারস্বরূপ মনে করে, সেইজন্য প্রথম হইতেই স্থূল সাম্য বজায় রাখিতে পাশ্চাত্যে হীনবর্ণ উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করে। প্রাচীন আর্য্যগণ জানিতেন যে স্থূলে অসাম্য বা ভেদ থাকিবেই, তবে যাহাতে সমাজের মধ্যে একটা গতি থাকে, যাহাতে কলহের সৃষ্টি না হয়, সে জন্য সাম্যের অভিমুখে একটা অবিরাম উন্নয়ন বা উৎকর্ষের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হইবে, এই বন্দোবস্তের মূলসূত্র,—ভাবগত সাম্যকে স্থূল সাম্যের দ্বার বলিয়া মনে করা। অতএব পাশ্চাত্য সামাজিক সাম্যকে ভাবগত সাম্যের উপায়স্বরূপ ভাবিয়া উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে উচ্চনীচে বিরোধ বাধাইয়া দেয়, আর্য্যসমাজ সামাজিক সাম্যকে ভাবগত সাম্যের স্থূল বিকাশ বলিয়া জানে, সুতরাং সমাজের সর্ব্বাঙ্গে প্রবল ভাবশক্তির, অর্থাৎ-পরমার্থ-সাধনার, ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করে।

অতএব দেখা গেল যে পাশ্চাত্য বিরোধ-ভূত আমাদের সমাজসংস্কারকদের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছে। সেইজন্য ব্রাহ্মণকে গালি না দিলে, হিন্দুসমাজকে শ্লেষ না করিলে, আধুনিক সমাজসংস্কারের মুখে অন্ন উঠে না। ইহাদের আর সমস্ত ভাল,—হীনকে উন্নত করিবার ইচ্ছা, পরার্থপরতা, উদ্যম, উদ্দীপনা, স্বার্থ-ত্যাগৈষণা, এ সমস্তই ভারতের পক্ষে আবার বাঁচিয়া উঠিবার সম্বল, উন্নতি-পথের পাথেয়। কিন্তু বিরোধের আস্ফালন-আক্রোশে বৃথা শক্তিক্ষয় করি-বার শিক্ষা ইহারা কোথায় পাইলেন? দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, ইতি-হাসের প্রতি, এ বিরোধ-দৃষ্টি কে ফুটাইয়া দিল? আবার বলি, পাশ্চাত্যের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা।

কেহ হয়ত বলিবেন, যাহার ভাল করিতে হইবে, তাহাকে মাঝে মাঝে শাসাইতেও হয়। সুতরাং প্রাচীন সমাজের কল্যাণ করিবার ইচ্ছায় উহার উপর কষাঘাত করাটা কখনও কখনও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। আমরা বলি, বিরোধ-দৃষ্টির মত ইহাও একটা পাশ্চাত্য ভাব; এ ভাবের প্রধান উৎস বাইবেলের পৌরাণিক দৃষ্টান্ত। এ উভয় ভাবই আমাদের অনুকরণীয় নহে। বাইবেলের

প্রফেট্‌স্ বা ভবিষ্যৎবাদীদের মধ্যে সমাজকে শাসাইবার ভাব যেমন তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে, তেমন অন্য কোন সাহিত্যে দেখা যায় না। প্রাচীন য়ুদীয় সমাজকে ধমকাইয়া, শাসাইয়া, তাড়া দিয়া, খ্রীষ্টাবির্ভাবের উপযোগী করিয়া রাখিবার চেষ্টাই যেন প্রফেট্‌স্‌দের জীবনব্রত। এসম্বন্ধে অনেক প্রত্নতত্ত্বের থাক আছে, তাহা এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। কিন্তু সমাজকে শাসাইবার ভাবটী যে অনেকপরিমাণে বাইবেলেরই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজে আসন পাইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। আমাদের দেশের ভাব ঠিক ঐরূপ নহে। আমরা সমাজের ভাল করিবার অভিমানও রাখিনা, সমাজকে শাসাইবার স্পর্দ্ধাও রাখি না। আমাদের কাজ সমাজের সেবা করা; এ ক্ষেত্রে সেব্য কোনও সেবকের কণ্ঠলগ্ন হইয়া মুখ চাহিয়াও থাকেন নাই, যে দুটো কড়া কথা শুনাইয়া দিলে মানাইয়া যায়। এ সেবা আরাধ্য দেবতার সেবা, এ সেবার অধিকার রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যাদি লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া গিয়াছেন। বহু বহু যুগে বহু বহু মায়ারূপ ধরিয়া এই আরাধ্যদেবতা কত মহাপুরুষের সেবা পাইয়াছেন। এই মানবকুলের মোক্ষদায়িনী, সমাজরূপিনী আর্য্যজননীর সেবায় শাসাইবার প্রসঙ্গ অর্ব্বাচীনই উত্থাপিত করিতে পারেন, আর উত্থাপিত করিতে পারেন তিনি, যিনি পাশ্চাত্যের দেখাদেখি সামাজের ভাল করিবার অভিমানে স্ফীত হইয়াছেন।

আধুনিক সমাজসংস্কারের মধ্যে এই বিজাতীয়, অনিষ্টকর, বিরোধ-ভাব বা আক্রমণের ভাব আর একটী কারণে দেশের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ। পাশ্চাত্য রাইট্‌স্ বা স্বাধিকার রক্ষার ভাবটী পাশ্চাত্য শিক্ষাসূত্রে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ায়, আমরা সামাজিক ও গার্হস্থ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে একটা বিষম বিরোধদৃষ্টি প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত হইতেছি। "কি পাওয়ার দাবী আমার ছিল, অথচ বুঝি পাইলাম না"—এই আশঙ্কা আজকাল সকল ক্ষেত্রেই আমাদের হৃদয়কে সচকিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং স্বাধিকাররক্ষা অর্থাৎ স্বার্থানুসন্ধানের ফেরে পড়িয়া আমাদের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের অনেকাংশ ঝগড়া ও রেশারেশিতে ভাবিয়া যাইতেছে। কিন্তু শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাববিকার তত ভয়াবহ নহে, ইহার চেষ্টাসাধ্য প্রতীকার আছে, কারণ যে শিক্ষিত, সে ভাবপরতন্ত্র, ভাব বদলাইয়া দিতে পারিলেই, তাহার জীবন বদলাইয়া যায়। কিন্তু যারা অশিক্ষিত, তাহাদের কথা সেরূপ নহে; তাহারা বহুল পরিমাণে আবেগের বশ, সে আবেগের মোড় ফিরান বড় সহজ নহে। একবার ঐ অন্ধ-

প্রায় আবেগের যে দিকে গতি হয়, তাহার অন্যথা করা বহুযত্নসাধ্য ও দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় যদি নিজেদের পাশ্চাত্যশিক্ষাপুষ্ট বিকৃতদৃষ্টি এই অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দেয়, তবে যে অনিষ্ট সাধিত হইবে, তাহার প্রতীকার সুদুর্লভ। শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষাদীক্ষা, হাব-ভাব ত সহজেই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া যাইতেছে এবং বিবোধ-কলহ, স্বার্থান্ধতা, মামলা-মোকদ্দমা তাহাদের মধ্যেও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি দল বাঁধিয়া, বই লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে উচ্চশ্রেণীর প্রতি পূর্ব্বকথিত বিবোধ-দৃষ্টির বিষ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করেন, তবে পাশ্চাত্য হইতে নানা নূতন বিপদ আমাদের সমাজে ডাকিয়া আনা হইবে, সন্দেহ নাই।

হীনকে উন্নত করিবার মহাব্রতে আজ সমগ্র দেশ ব্রতী হউক—নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কিন্তু উন্নত করা কাহাকে বলে, তাহা কি সর্ব্বাগ্রে বুঝা দরকার নহে? যারা "মাস এড্‌কেশন" অর্থাৎ আপামর সাধারণে শিক্ষা প্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ করিতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহারা কি বলিতে পারেন কি শিক্ষা তাহারা প্রচার করিবেন? যে শিক্ষায় আপনারা প্রকৃত উন্নতিতে উন্নত না হইয়া, পাশ্চাত্য "চুনকাম"এরই ছড়াছড়ি করিলে,—যে শিক্ষায় নিজে উন্নত হইলে কি না বুক ঠুকিয়া বলিতে পার না, সেই শিক্ষায়ই পরকে উন্নত করিতে যাইতেছ নাকি? সাবধান, নিজের ভুল সহজে শোধ-রাইতে পার, শোধরাইবার পথও আছে, কিন্তু দেখিও দেশকে মজাইও না!

অতএব দেখা যাইতেছে যে আমাদের সমাজের সংস্কারে ব্রতী হইতে হইলে, উহার উদ্ভব, গতি ও স্থিতির প্রকৃতিবিচার করিয়া প্রথমেই সমাজের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সমাজজননীর চরণাশ্রিত প্রকৃত সেবকের ভাবে ভাবুক হইতে হইবে। আবার যে পরমার্থভাবকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজ বিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই পরমার্থভাবের আস্বাদ না পাইলে, সমাজকে প্রকৃতভাবে চিনিবার ও সেব্যরূপে গ্রহণ করিবার অধিকারী হওয়া যায় না। যে ভাবগ্রাহিতা থাকিলে ইতিহাসের মর্ম্ম গ্রহণ করিব ও অখণ্ড সমাজমূর্ত্তির নিকট সেবকের যথার্থ আত্মনিবেদন কার্য্যে প্রকাশ করিব, সে ভাবগ্রাহিতা, পরমার্থের আস্বাদ না পাইলে, হৃদয়ে জাগে না। অতএব পরমার্থের আস্বাদ, সমাজের প্রকৃত পরিচয় ও প্রকৃত সেবকের ভাব—এই তিন রকম শিক্ষা যাহার হয় নাই, কেবল প্রবল সহানুভূতিরূপ সম্বল লইয়াই অন্ধভাবে বা পাশ্চাত্যের

অনুকরণে তিনি যদি সমাজসংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করেন, তবে বিপর্য্যস্ত সমাজকে আরও বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলা হইবে—পূজামণ্ডপে মেছো হাট বসান হইবে।

"জাতিভেদের" গ্রন্থকার যে ভাবের ভাবুক হইয়া সমাজসংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা যে সমীচীন নহে তাহা আমরা দেখিয়াছি। শাস্ত্রচর্চ্চাদ্বারা সমাজের প্রকৃত পরিচয়ও যে তিনি লাভ করিয়াছেন, এমন মনে হয় না। সেরূপ পরিচয় লাভে তাহার পক্ষে যে প্রধান বিঘ্ন আছে, আমরা তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি, সে বিঘ্ন পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টি। আমাদের সমাজের উদ্ভব ও বিবর্ত্তনের মূলে যে একটা স্থায়ী, নিত্য প্রয়োজনের প্রেরণা কার্য্য করিয়াছে, তাহা গ্রন্থকার ঐ বিকৃত দৃষ্টির দোষে দেখিতে পান নাই। তিনি দেখিয়াছেন,—পূর্ব্বে আর্য্যগণ বহুবর্ষ ধরিয়া "প্রাতে আহারাদি করিয়া সমর ক্ষেত্রে রওনা হইতেন—দিবাবসানে সায়ংকালে ক্লান্তশ্রান্ত অবসন্ন দেহে যুদ্ধ সমাধা করনান্তর গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন," পরে তাৎকালীন অনুষ্ঠেয় নানা কার্য্যের সুবিধা ও সুশৃঙ্খলার জন্য "একদিন তাঁহারা সকলে একত্র সম্মিলিত হন, তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গুণ কর্ম্ম শক্তি অনুযায়ী তাঁহারা নিজেরাই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী মন্ত্রণাকুশল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অথচ শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বল ও যুদ্ধ কার্য্যে অপটু ছিলেন, তাঁহারা এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন, এই শ্রেণীর নাম হইল ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি ইত্যাদি॥ দেখিয়াছি, ঠিক এইরূপ আধুনিক বিকৃতদৃষ্টির প্রয়োগে কোনও ঐতিহাসিকপ্রবর বিচার করিয়াছেন যে রামচন্দ্রের বনাগমনের সঙ্গে সঙ্গে দশরথের যে মৃত্যু ঘটিল, তাহা শোকাবেগের পরিণাম নহে, ভরতপক্ষীয়দের ষড়যন্ত্রঘটিত একটা হত্যাকাণ্ড।

তারপর আর একটী কারণে গ্রন্থকার সমাজের প্রকৃত পরিচয় লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং তাঁহার বহুযত্নকৃত শাস্ত্রচর্চ্চা বিফল হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত কথা এই যে প্রত্যেক সমাজ একটা জীবনাদর্শকে আশ্রয় করিয়া বিবর্ত্তিত হয়—এক এক রকম মানুষ গড়াই এক একটা সমাজের ভিতরকার আসল লক্ষ্য। যিনি আর্য্যসমাজের উদ্ভব, স্থিতি ও গতি বুঝিতে চান, তাহাকে প্রথমেই বুঝিতে হইবে, জীবনাদর্শরূপ কোন ধ্রুবলক্ষ্য স্থির করিয়া আর্য্যসমাজ কালসাগরে তরী ভাসাইয়াছিল। সমাজলক্ষ্যটী অগ্রেই ভাল করিয়া না হৃদয়ঙ্গম করিলে, সমাজের গতি দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় বলিয়া প্রতিভাত হইবে, সমাজের প্রতি-

পদবিক্ষেপ নিরর্থক বোধ হইবে, এবং নানা বিসদৃশ অনুমানপরম্পরাকেই ইতিহাস নামে প্রচার করা হইবে। অতএব কোন লক্ষ্যে তরী ভাসান হইয়াছিল, তাহা প্রথমেই বুঝিতে হইবে। এ বিশ্বে লক্ষ্য স্থির না করিয়া কোন জনসমষ্টি বা সমাজই তরী ভাসায় নাই,—ভাসাইলে বেশী দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

তারপর, দ্বিতীয় কথা,—ঐ ধ্রুবলক্ষ্য যখন সমাজতরীর সম্মুখে উজ্জ্বল-ভাবে প্রকাশিত থাকে, যখন অব্যাহতদৃষ্টি ঐ লক্ষ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া সমাজ অনন্যভাবে দাঁড় টানিয়া যাইতে পারে, তখন সমাজের গতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই গতিশীল অবস্থার একটী চিত্র "জাতিভেদে" উদ্ধৃত, "গুণকর্ম্মগত জাতিভেদের" প্রতিপাদক, শাস্ত্রীয় বাক্য ও দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সমাজের সেই গতিশীল ও সুস্থ অবস্থায় আর্য্য অনার্য্যাকে ঘরে আনিতেছে, কত সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হইতেছে, অথচ উচ্চ বর্ণ স্বীয় উচ্চাদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিম্নবর্ণের সম্মুখে সেই উচ্চাদর্শের অনুশীলনের, ও ফলে বর্ণোন্নয়নের, পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছে। যে শরীরে প্রাণশক্তি স্বাভাবিক প্রবলবেগে সঞ্চালিত হইতেছে, সে শরীরে এমন কি অনেক উৎকট খাদ্যও হজম হইয়া যায় এবং সুপথ্যের কাজ করে। যখন সমাজতরী পূর্ণ লক্ষ্যবদ্ধদৃষ্টিতে, আপনার উপর আপনি পূর্ণ নিয়ন্তৃত্ব লাভ করিয়া, কালতরঙ্গে অগ্রসর হইতেছে, তখন নানা বিপরীত স্রোতভঙ্গে তাহার কি করিবে? সমাজের এই অবস্থার চিত্র যে সকল শাস্ত্রবচনে পাওয়া যায়, "জাতিভেদ"-গ্রন্থকার সেই সমস্ত বচনকে নজীররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

আবার এমন অবস্থাও আসে, যখন সমাজতরীর চতুর্দ্দিকে বিজাতীয় ভাবের স্রোত আসিয়া আঘাত করিতে থাকে, যখন বর্ণসঙ্করও সমাজের নিয়ন্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করিতে থাকে,—যখন নৌকা আপনাকে আপনি সামলাইতে পারে না—তখন সমাজদৃষ্টি অনেকাংশে ধ্রুব লক্ষ্য হইতেও অনিবার্য্যরূপে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, এবং আশঙ্কা ও সঙ্কোচের ভাব আসিয়া সমাজকে ক্রমশঃই গতিহীন করিয়া ফেলে। আর্য্যসমাজের ইতিহাসে এ অবস্থাও আসিয়াছিল। এই বিপন্ন অবস্থার মধ্যে আর্য্যসমাজ আত্মসংরক্ষণে ও সনাতন জীবনাদর্শরূপ লক্ষ্যের সংরক্ষণে কি ভাবে বহু বহু যুগ সংগ্রাম করিয়াছে, তাহা কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী ইতিহাসে নানা ঘটনাপরম্পরার আলোচনায় বুঝা যায়। এই আত্মরক্ষা ও আদর্শরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া

স্মার্ত্ত শাস্ত্রকার যে সকল কঠোর সামাজিক বিধান প্রচলিত করিয়াছিলেন, সেই গুলিই প্রধানতঃ জাতিভেদ-প্রণেতার তীব্র আক্রোশ ও ক্রোধের ভাগী হইয়াছে। এছাড়া এই প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পরবর্ত্তী অনেক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ ঐ সকল সাময়িক কঠোর বিধানের অনুকরণে হয়ত কালোপযোগী নব্য স্মৃতি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদেরও কেবলই দোষোদ্ঘাটন বা দোষকীর্ত্তন করিয়া কোন ফল নাই।

আসল কথা এই যে শাস্ত্রোক্ত সমাজবিধানের মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্য ও কালোপযোগিতা আছে। অতএব সমস্ত প্রাচীন বিধি ও দৃষ্টান্তগুলিকে এক পাত্রে ঢালিয়া, যুক্তির একটা খিচুড়ী প্রস্তুত করায় ব্যর্থ শ্রমের চূড়ান্ত হয়। এইরূপ করিবার ফলে, আধুনিক সংস্কারক একমুহূর্ত্তে হয়ত মনুকে গাল দিবেন ও পরমুহূর্ত্তে বাহবা দিবেন, এরকমও দেখা গিয়াছে; "জাতি-ভেদে"ও দৃষ্টান্ত খুঁজিলে পাওয়া যায়। অন্ততঃ সমাজবিবর্ত্তনের মূললক্ষ্যের অনুকূলে, প্রত্যেক বিধিনিষেধের পশ্চাতে কিরূপ কালোপযোগিতা বা কি সাময়িক প্রয়োজন ঘটিয়াছিল, তাহা বিচার করিয়া তবে তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করা "জাতিভেদের" লিপিকৌশলের অঙ্গীভূত নহে।

যাহা হউক, আমাদের প্রাচীন সমাজই এক সময় লেখক মহাশয়ের কাছে উপাদেয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, আর এক সময় হেয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। তিনি সমাজের সেই উপাদেয় রূপটী আবার দেখিতে চাহেন, সেই জন্য বর্ত্তমান হেয় রূপের বিরুদ্ধে তাঁহার সাবেগ অভিযোগ। বর্ত্তমান কালে চারিদিক হইতে যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা আসিয়া আমাদের গৃহদ্বারে আঘাত করিতেছে, তাহাতে সমাজ পূর্ব্বোক্ত উপাদেয় রূপটী ফিরিয়া না পাইলে সমস্যাগুলির হাত হইতে নিস্তার নাই। লেখকের এ সমস্ত কথা আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম, কিন্তু উপায় কি?

লেখক বলিবেন, উপায়—বাহিরের রীতিনীতিগুলি পরিবর্ত্তন করা, অর্থাৎ সভাসমিতিতে সঙ্কল্প করিয়া সমাজকে বাহির হইতে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া। আমরা বলিব লেখক মহাশয় রোগও ধরিতে পারেন নাই, রোগীর প্রকৃতিও বুঝেন নাই, রোগের প্রতীকারও বুঝেন নাই;—রোগীর প্রকৃতি বুঝেন নাই, কারণ ঝগড়া করিয়া, দলাদলি করিয়া, অগ্রেই স্থূল সাম্যপ্রতিষ্ঠা করা আমাদের সমাজসংস্কারের সনাতন নিয়ম নহে; আমরা ভাবগত সাম্যের ভিতর দিয়া স্থূল সাম্যে উপনীত হই, মনুষ্যত্বের আসল পরিচয়ে মানুষকে বড় করিয়া

তবে সমাজে বড় বলিয়া মানি। দ্বিতীয়তঃ লেখক মহাশয় রোগও ধরিতে পারেন নাই, কারণ আমাদের সমাজ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়াই এক দিকে এত সঙ্কোচ, এত আশঙ্কা, ও অন্য দিকে এত বুদ্ধির তরলতা, এত পাশ্চাত্যানুচিকীর্ষা, এত হটকারিতা। সনাতন জীবনাদর্শ প্রাণশক্তির মত সমাজের ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চালিত হইতেছে না, তাই সমাজের সর্ব্বাঙ্গে পঙ্গুতা এবং ভাববিকৃতির বিস্ফোটক। এই পঙ্গুতা, এই দূষিত শোণিতপ্রবাহ বিদ্যমান থাকিতে, সমাজসংস্কারের সমস্ত রিজলিউশন কেবলই নূতন নূতন বিস্ফোটক বা উপদ্রবে পরিণত হইবে এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সদিচ্ছাপ্রসূত উদ্যম বিবাদ ও হটকারিতায় পরিণত হইবে। যদি প্রকৃত সমাজসংস্কার চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে দেশের লোক একযোগে সমাজের সনাতন লক্ষ্যটী অধিকার করিবার জন্য উদ্যম প্রকাশ কর; যে যেখানে আছ,—সমাজের যে শ্রেণী বা যে স্তরেই অবস্থিত থাক, সেইখান থেকেই সেই সনাতন জীবনাদর্শের দিকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে, পরস্পরের সহায়তায়, সমাজের অখণ্ডতা ও সর্ব্ব-ধর্ম্মমতের সমন্বয় স্বীকার করিয়া, প্রবল উৎসাহে অগ্রসর হও। উত্তম সাধক অধম সাধকের হাত ধরিয়া লও, বিদ্বান মূর্খকে সঙ্গে করিয়া লও,—সমগ্র সমাজে উদ্যম ও সহানুভূতির তাড়িত-প্রবাহ ছুটিয়া যাক। সর্ব্বাগ্রে সমাজের সনাতন আদর্শকে এই ভাবে সমাজের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া দাও, দেখিবে সমাজে কর্ম্মস্রোতের মহাপ্লাবন আসে কি না, দেখিবে সেই স্রোতে সমস্ত পঙ্কিলতা, সমস্ত সংকীর্ণতা, সমস্ত দলাদলি, আপনা-আপনি ভাসিয়া যায় কি না, এবং যথার্থ কালোপযোগী সামাজিক বিধান ও ব্যবস্থার সহজ স্বাভাবিক প্রচলনের দ্বারা আবার অবাধগতিতে সমাজ লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিতে থাকে কি না।*

---

* উদ্বোধনে "ভারতের সাধনা"-নামক প্রবন্ধপর্য্যায়ে আষাঢ় ও ভাদ্রমাসে সমাজ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ দুইটী প্রকাশিত হইয়াছে, এই সমালোচনায় পাঠককে সে দুইটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি ; বুঝিবার সুবিধা হইবে, ইতি। শ্রীসমালোচক।

14 FEB 1913

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"



সূচী।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।

মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সডাক ২৲ দুই টাকা।

প্রতি সংখ্যা।৹ আনা।

১৩শ বর্ষ—১১শ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ১৩১৮।

The Sister Nivedita's New Book

"Civic and National Idea ls"

(AUTHORISED EDITION.)

This is the first of a series of volumes to be published to comprise all the writings of Sister Nivedita as yet unavailable in book form. The persent volume deals with the problem of Indian Nationalism, its basis and the resources to be developed. People interested in the Indian problem should eagerly welcome this publication from the Sister's pen. The book with a handsome get-up and a nice portrait of the Sister is to be had at the price of Re. 1 exclusive of postage of

The Udbodhan office.

SISTER NIVEDITA'S MASTERPIECE.

"The Master as I Saw Him"

The book can have no truer or better introduction to the public, than the following citations, one from Indian and the other from European appreciation :—

"How great Vivekananda was we can realise—as far as is now possible—in his very words as faithfully recorded by his desciple. Of his many words, his varied teachings and his yearnings and struggling, a full history is impossible. But in the volume before us, we can feel that he was a Master indeed, a living fountain of inspiration."

PROF. JADUNATH SARKAR.

"* * it (this book) may be placed among the choicest religious classic, below the various scriptures, on the same shelf with *the Confessions of St. Augustine* and Sabatier's *Life of St. Francis.*"

PROF. T. K. CHEYNE.
Of Oxford University.

Price—paper Bound Rs. 2-8. Postage extra.

To be had of the Udbodhan office.
12, 13, Gopal Chandra Neogi's lane
BAGBAZAR, CALCUTTA.

REG. 23 DEC 1912 ... BUILDINGS

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

[স্বামী সারদানন্দ।]

সাধনার প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা।

ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে নিঃসংশয় বুঝা যায়, তাঁহার উন্মত্তাবস্থাটা মস্তিষ্কের বিকার বা ব্যাধিজনিত সাধারণ উন্মাদাবস্থা নহে। ঈশ্বরদর্শনের জন্য তাঁহার অন্তরে সাতিশয় তীব্র ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল। ঐ ব্যাকুলতার প্রবল বেগেই তিনি ঐকালে আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না; এবং হৃদয়নিহিত ঐ অগ্নিশিখায় পুড়িতে পুড়িতে সাধারণের সহিত সাধারণ বিষয় লইয়া হাসিতে কাঁদিতে সক্ষম হইতেছিলেন না বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। কেই বা ঐরূপ করিতে পারে? হৃদয়ের যাতনা যখন কোন বিষয় লইয়া আমাদিগের স্বাভাবিক সহ্যগুণকে অতিক্রম করিয়া যায়, তখন কেহই আপনাকে সামলাইয়া মুখে একখানা ভিতরে একখানা রাখিয়া কামকাঞ্চনোন্মত্ত সংসারের সহিত একযোগে চলিতে পারে না। বলিতে পার, সহ্যগুণের সীমা কিন্তু সকলের পক্ষে এক নহে, কেহ অল্প সুখদুঃখেই বিচলিত হইয়া পড়ে, আবার কেহবা তদুভয়ের গভীর বেগ হৃদয়ে ধরিয়াও সমুদ্রবৎ অচল অটল থাকে; অতএব ঠাকুরের সহ্যগুণের সীমার পরিমাণটা বুঝিব কিরূপে? উত্তরে বলি, তাঁহার জীবনের অন্যান্যঘটনাবলীর অনুধাবন করিলেই উহা যে অসাধারণ ছিল একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল অর্দ্ধাশন, অনশন ও অনিদ্রায় থাকিয়াও যিনি স্থির থাকিতে পারেন, বারম্বার অতুল সম্পত্তি পদে আসিয়া পড়িলে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বলিয়া যিনি উহা ততোধিকবার প্রত্যাখান করিতে পারেন—ঐরূপ কত কথাই না বলিতে পারা যায়—তাঁহার শরীর ও মনের অসাধারণ ধৈর্য্যের কথা কি আবার বলিতে হইবে?

আবার, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের কথা অনুধাবন করিলে দেখা যায়, ঘোর বিষয়াবদ্ধ জীবের চক্ষেই তাঁহার ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুলতাটা ব্যাধিজনিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। দেখা যায়, মথুরানাথকে ছাড়িয়া দিলে, কল্পনাযুক্তিসহায়ে তাঁহার মানসিক অবস্থার বিষয় আংশিকভাবে নির্দ্ধারণ

করিতে পারে এমন লোকও কেহ ঐকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় নাই। শ্রীযুত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না, কারণ ঐ ঘটনার পরে তাঁহার কথা হৃদয় বা অন্য কাহারও মুখেই আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ঠাকুরের ঐ কালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে বিচার করিতে তখন যে কেবল মাত্র মূর্খ লুব্ধ কালীবাটীর কর্ম্মচারীরাই অবশিষ্ট ছিল একথা বুঝা যায়। তাহাদের কথা প্রমাণের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। অতএব কালীবাটীতে ঐ কালে সমাগত সাধু-সাধককুলের কথাই যে ঐ বিষয়ে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ একথা সুনিশ্চিত; এবং ঠাকুরের নিজের ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকটে ঐ বিষয়ে যাহা শুনা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় ঐ সকল সাধক ও সিদ্ধেরা তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করা দূরে থাকুক, অতি উচ্চাবস্থাসম্পন্ন সাধক বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন।

আবার এই কালের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিয়াছি, ঈশ্বর লাভের প্রবল ব্যাকুলতায় যতক্ষণ না তিনি এককালে দেহবোধরহিত হইয়া দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য ও নিজ জীবনে পর্য্যন্ত মমতাবিহীন হইয়া পড়িতেন, ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের জন্য তাঁহাকে যে যাহা করিতে বলিত তিনি তাহাই তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সম্বন্ধে নিজ জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য কখন সচেষ্ট হইতেন না। পাঁচজনে বলিল, তাঁহার চিকিৎসা করান হউক, তাহাতেই সম্মত হইলেন, কামারপুকুরে তাঁহার মাতার নিকট লইয়া যাওয়া হউক, তাহাতেই সম্মত হইলেন, বিবাহ দেওয়া হউক, তাহাতেও অমত করিলেন না।—এরূপাবস্থায় উন্মত্তের কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার আচরণাদির কেমন করিয়া তুলনা করা যাইতে পারে?

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, বিষয়ী লোক ও বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে সর্ব্বথা দূরে থাকিতে যত্নবান্ হইলেও, বহুলোক একত্রিত হইয়া যেখানে কোনভাবে ঈশ্বরের পূজাকীর্ত্তনাদি করিতেছে ঐ কাল হইতেই ঠাকুর সেখানে যাইতে ও যোগদান করিতে কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে বিশেষ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন। বরাহনগরের ৺দশমহাবিদ্যার স্থান দর্শন, কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কখন কখন দেখিতে গমন এবং এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটির মহোৎসবে তাঁহার যোগদান হইতে ঐ কথা বেশ বুঝা যায়। ঐ সকল স্থানেও শাস্ত্রজ্ঞ সাধক-

কুলের সহিত কখন কখন তাঁহার দর্শনসম্ভাষণাদি হইয়াছিল। তদ্বিষয়েও আমরা অল্প স্বল্প যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি ঐ সকল সাধকেরাও তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৬ সালে, ইংরাজী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে, পানিহাটি মহোৎসবদর্শনে গমন করিবার কথার উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীযুত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র বৈষ্ণবচরণকে তিনি ঐদিন ঐ স্থানেই প্রথম দেখেন। হৃদয়ের নিকটে এবং ঠাকুরের নিজমুখেও আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, ঠাকুর পানিহাটিতে গমন করিয়া ঐ দিন শ্রীযুত মনিমোহন সেনের ঠাকুরবাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে বৈষ্ণবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করেন। শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল উৎসব ক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গেই অতিবাহিত করেন এবং নিজ ব্যয়ে চিঁড়া, মুড়্কি, আঁব ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 'মালসা ভোগের' বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। আবার উৎসবান্তে কলিকাতা ফিরিবার সময় বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরের পুনরায় দর্শনলাভের জন্য রাসমণির কালীবাটীতে নামিয়া তাঁহার অনুসন্ধানও করিয়াছিলেন, এবং ঠাকুর তখনও উৎসবক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে বৈষ্ণবচরণ কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন সে সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি। *

এই চারিবৎসরের ভিতরেই আবার, ঠাকুর মন হইতে কাঞ্চনাসক্তি এককালে দূর করিবার জন্য কয়েক খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে হস্তে গ্রহণ করিয়া সদসদ্বিচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যবস্তু ঈশ্বরকে লাভ করা যে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে সে, ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে ঐ দুই পদার্থের নিকট হইতে বিশেষ কোন সহায়তাই লাভ করিতে পারে না, যুক্তিসহায়ে একথা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া মনে ঐ মীমাংসা ধারণার জন্য বারম্বার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে ঐ সকলকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তু ও ব্যক্তিই শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ ও অংশ, একথা ধারণার জন্য ঠাকুরবাটির কাঙ্গালীদের পাত্রাবশিষ্ট

* গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ ১ম অধ্যায়।

প্রসাদ গ্রহণ ও তাহাদের ভোজন-স্থান পরিষ্কার করা, মন হইতে অভিমান ও অহঙ্কার এককালে দূর করিবার এবং সকলের ঘৃণার পাত্র অপেক্ষাও তিনি কোন অংশে বড় নহেন একথা ধারণার জন্য মেথরের ন্যায় অশুচি স্থান স্বহস্তে ধৌত করা, ঘৃণা ত্যাগ করিবার এবং চন্দন ও বিষ্ঠা উভয় পদার্থই পঞ্চভূতের বিকার প্রসূত, অতএব স্বরূপতঃ সমতুল্য, একথা ধারণার জন্য নির্বিকার চিত্তে স্বীয় জিহ্বার দ্বারা অপরের বিষ্ঠা স্পর্শ করা প্রভৃতি যে সকল অশ্রুতপূর্ব্ব সাধন কথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায় তাহাও এই কালেই সাধিত হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রথম চারি বৎসরের ঐ সকল সাধন ও দিব্যদর্শনের বিবরণ অনুধাবন করিলে ঈশ্বর লাভের জন্য তাঁহার মনে ঐকালে কি অসাধারণ আকুলাগ্রহ যে আধিপত্য করিতেছিল এবং কি অলৌকিক বিশ্বাসের সহিত যে তিনি সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আবার স্বল্প চিন্তাসহায়ে সঙ্গে সঙ্গে একথাও নিশ্চয় ধারণা হইয়া পড়ে যে, অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা সহায়েই তিনি ঐ কালের ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। মনে হয়, সাধনার ফল ঐ কালের মধ্যে করগত করিয়া পরবর্ত্তী কালে তিনি উহা গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত মিলাইতেই অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ত্যাগ ও সংযমের অভ্যাস দ্বারা সাধক যখন নিজ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, ঠাকুর বলিতেন, নিজ মনই তখন তাঁহার নিকট গুরুস্থানীয় হইয়া দাঁড়ায়, তাহার শুদ্ধ মনে তখন যে সকল ভাব তরঙ্গ উঠিতে থাকে সে সকল, বিপথগামী করা দূরে থাকুক, পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে গন্তব্য লক্ষ্যেই আশু পৌঁছাইয়া দেয়। সাধনার প্রথম চারি বৎসরের ভিতরে ঠাকুরের শুদ্ধ পবিত্র মন, কেবল যে ঐরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে এবং কোন্‌টি হইতে বিরত থাকিতে হইবে একথা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক সময়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথক এক ব্যক্তির ন্যায় দেহমধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সাধন পথে উৎসাহিত করিত, ভয় প্রদর্শন করতঃ সাধনাবিশেষে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেষ কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিত এবং কখন কখন সাধনার ফলাফলও বিজ্ঞাত করাইয়া দিত। সেইজন্যই ঠাকুর ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিয়াছিলেন, শাণিতত্রিশূলধারী জনৈক সন্ন্যাসী, নিজ-

দেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া বলিতেছেন, 'অন্য সকল চিন্তা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টচিন্তা যদি না করিবি তো এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!' দেখিয়াছিলেন—ভোগবাসনাময় পাপপুরুষ নিজ শরীর মধ্য হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলে ঐ সন্ন্যাসী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ঐ পুরুষকে নিহত করিলেন।—দূরস্থ দেবদেবীর মূর্ত্তি বা কীর্ত্তনাদি দর্শনে অভিলাষী হইয়া, তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট ঐ সন্ন্যাসী যুবক জ্যোতির্ম্ময় শরীরে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় পথে ঐ সকল স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দর্শন ও ভজনানন্দ কিয়ৎকাল উপভোগ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া স্থূল শরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন।—ঐরূপ নানা দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের স্বমুখ হইতে সময়ে সময়ে শ্রবণ করিয়াছি।

সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই শরীর মধ্যগত ঐ যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন আরম্ভ হইয়াছিল এবং ক্রমে সকল কার্য্যের বিধি নিষেধ মীমাংসা স্থলেই ঠাকুর, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পরামর্শমত চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সাধকজীবনের ঐ সকল অপূর্ব্ব দর্শনাদির প্রসঙ্গ করিতে করিতে ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"ভিতর হইতে, দেখিতে আমারই অনুরূপ, এক যুবক সন্ন্যাসীমূর্ত্তি যখন তখন বাহির হইয়া আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ করিত, যখন সে বাহির হইত তখন স্থূল শরীরটা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিত এবং কেবল তাহারই চেষ্টা ও কথা দেখিতে শুনিতে পাইতাম, পরে এই স্থূল দেহটায় সে পুনরায় প্রবেশ করিলে আবার বাহ্যজ্ঞান হইত। তাহার মুখ হইতে যাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম তাহাই ব্রাহ্মণী, ন্যাংটা (শ্রীমৎ তোতাপুরী) প্রভৃতি আসিয়া পুনরায় উপদেশ করিয়াছিলেন। যাহা জানিতাম তাহাই আবার জানাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় বেদপ্রভৃতিশাস্ত্রগত বিধির মান্য রক্ষা করাইবার জন্যই তাঁহারা গুরুরূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা ন্যাংটা প্রভৃতিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

সাধনার এই কালের শেষভাগে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে গিয়াছিলেন তখন আর একটি অপূর্ব্ব দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। কামারপুকুর হইতে শিবিকারোহণে হৃদয়ের বাটী সিহড় গ্রামে যাইতে যাইতে তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। সুনীল অম্বরাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পুঞ্জীভূত হরিৎ শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে শীতলছায়াপ্রদ অশ্বত্থ

বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লমনে অগ্রসর হইবার কালে ঠাকুর দেখিলেন, সহসা তাঁহার দেহমধ্য হইতে দুইটি কিশোর বয়স্ক সুন্দর বালক-মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া কখন বীরপদে কখন ক্রীড়াচ্ছলে ছুটাছুটি করিয়া, বন্যপুষ্পাদির অন্বেষণে কখন প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন করিয়া আবার কখন বা শিবিকার সন্নিকটে থাকিয়া, বালসুলভ হাস্য, পরিহাস, কথোপকথন প্রভৃতি নানা চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপে আনন্দ করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। ঐ দর্শনের প্রায় দুই বৎসর পরে বিদূষী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে প্রথম আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঠাকুরের মুখে ঐ দর্শনের কথা শুনিয়া কিছুমাত্র চমৎকৃত না হইয়া বলেন— 'বাবা, তুমি ঠিকই দেখিয়াছ, এবার যে নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব - নিত্যানন্দ ও চৈতন্য যে একাধারে একসঙ্গে আসিয়াছেন এবং তোমার ভিতরে রহিয়াছেন।'—এই বলিয়াই ব্রাহ্মণী শ্রীচৈতন্যভাগবৎ হইতে আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

> অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার।
> পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
> কীর্ত্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥
> অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
> কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

আমরা যখন তাঁহার নিকট যাইতেছি তখন ঐ দর্শনের কথা উঠিলে ঠাকুর বলিতেন—"ঐরূপ দেখিয়াছিলাম সত্য। ব্রাহ্মণী তাহা শুনিয়া ঐরূপ বলিয়াছিল একথাও সত্য। তা কি জানি বাবু, ব্রাহ্মণীর কথা সত্য কি মিথ্যা।" ঐ সকল দর্শনের কথা শুনিয়া আমাদের মনে হয়, ঠাকুর এই সময়েই বিশেষ আভাস পাইয়াছিলেন যে, বহুপূর্ব্ব যুগ হইতে পৃথিবীতে পরিচিত কোন প্রাচীন আত্মাই তাঁহার শরীর মনে আমিত্বাভিমান লইয়া বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অবস্থান করিতেছেন।—মনে হয় ঐ সকল দর্শনাদি সহায়ে তিনি এখন নিজ ব্যক্তিত্বের যে অলৌকিক আভাস পাইতেছিলেন, তাহাই কালে সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—যিনিই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ৺অযোধ্যা ও শ্রীবৃন্দাবনে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রূপে উদিত হইয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্ম্মাদর্শদানের জন্য নব শরীর পরিগ্রহ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ

হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার নিকটে গমন করিয়া আমরা তাঁহাকে সুস্থ অসুস্থ সকল অবস্থাতেই একথা বারম্বার বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে রাম, যে কৃষ্ণ (হইয়াছিল) সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে—তবে এবার (তাঁহার) গুপ্তভাবে আসা।"

শেষোক্ত দর্শনটির সত্যতা অনুধাবন করিতে হইলে স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে অন্য সময়ে উচ্চারিত ঠাকুরের নিজ বাক্যে বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার এই কালের অপর দর্শন সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে আমরা অনেকটা নিশ্চিত ধারণা করিতে পারি। কারণ ঐরূপ দর্শনাদি আমাদের গমনাগমন কালের সময় নিত্যই ঠাকুরের জীবনে উপস্থিত হইত এবং তাঁহার ইংরাজীশিক্ষাসম্পন্ন সন্দেহশীল শিষ্যবর্গ অনেক সময় ঐ সকলের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া আপনারাই পরাজিত হইয়াছিল। লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র আমরা ঐ বিষয়ের কয়েকটি উদাহরণের* উল্লেখ করিলেও পাঠকের তৃপ্তির জন্য এখানে আর একটি ঐরূপ দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি—

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৺শারদীয়া পূজা মহোৎসবে কলিকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া থাকে সেইরূপ মাতিয়াছে। সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে বিশেষরূপে অনুভূত হইলেও উহার বাহিক প্রকাশের পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহাকে লইয়া তাহাদের আনন্দোল্লাস তাঁহার শরীরই বিশেষ অসুস্থ—ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীস্থ একটি দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়া প্রায় মাসাবধি হইল ভক্তেরা তাঁহাকে আনিয়া রাখিয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়া রোগারোগ্যের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। এপর্য্যন্ত কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যা ঐ বাটীতে আগমন করিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিতেছেন, এবং যুবক ছাত্র ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিতে যাওয়া ভিন্ন অপর সকল সময়ে এখানে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ আবার আবশ্যক বুঝিয়া তাহাও করিতে না যাইয়া চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে কাটাইতেছে।

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩৭—১৭৫।

অধিক কথা কহিলে, বারম্বার সমাধিস্থ হইলে, শরীরের রক্তপ্রবাহ ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হইয়া ক্ষত স্থানটিকে নিরন্তর আঘাত করিয়া রোগের উপশম হইতে দিবে না বলিয়া, চিকিৎসক, ঠাকুরকে ঐ সকল বিষয় হইতে সংযত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরও ঐ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বারম্বার ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য করিয়া বসিতেছেন। কারণ, 'হাড় মাসের খাঁচা' বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীরটা হইতে মন উঠাইয়া লইয়াছেন তাহাকে সাধারণ মানবের ন্যায় পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে ঠাকুর কিছুতেই সক্ষম হইতেছেন না এবং ভগবদ্‌প্রসঙ্গ উঠিলেই শরীর ও শরীর রক্ষার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া উহাতে প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই যোগদান করিয়া বারম্বার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন। নূতন নূতন ধর্ম্মপিপাসুর সমাগমও বহুল হইতেছে, তাহাদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়াও ঠাকুর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, মৃদুস্বরে তাহাদিগকে সাধনপথ সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিতে-ছেন। ঐরূপ কার্য্যে তাঁহার নিরন্তর উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া ভক্তদিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে সামান্য ও সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন, কেহ কেহ আবার নবাগত ঐ সকল ভক্তদিগকে কৃপা করিবার এবং বহুজন মধ্যে নিজ অদ্ভুত ধর্ম্মভাব প্রচারের জন্যই ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক ব্যাধিরূপ একটা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, অন্তরের এইরূপ ধারণা প্রকাশ করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ-পটুতার পরিচয় দিতেছে।

ডাক্তার কোন দিন সকালে এবং কোন দিন অপরাহ্নে প্রায়ই আসিতেছেন এবং রোগের হ্রাস বৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাদি করিবার পর ঠাকুরের মুখ হইতে ভগবদালাপ শুনিতে শুনিতে এতই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন যে তন্ময় হইয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল উহা শ্রবণ না করিয়া আর বিদায় গ্রহণ করিতে পারিতে-ছেন না। আবার, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ঐ সকলের অদ্ভুত সমাধান শ্রবণ করিতে করিতে বহুক্ষণ অতীত হইলে কখন কখন তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন, 'আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকাইয়াছি, অন্যায় হইয়াছে, তা হউক সমস্ত দিন আর কাহারও সহিত কোনও কথা কহিও না, তাহা হইলেই আর কোন অপকার হইবে না, তোমার কথায় এরূপ আকর্ষণ যে, এই দেখ না, তোমার কাছে আসিলেই সমস্ত কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া দুই তিন ঘণ্টা না বসিয়া আর উঠিতে পারি না, জানিতেই পারি না কোন দিক্ দিয়া সময় চলিয়া গেল। সে যাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরূপে এতক্ষণ ধরিয়া কথা

কহিও না; (কতক রহস্তে এবং কতক ভালবাসা ও আনন্দে) কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ হইবে না।' (ডাক্তারের ও সকল ভক্তদিগের হাস্য)।

ঠাকুরের পরম ভক্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—ঠাকুর যাঁহাকে কখন কখন 'সুরেশ মিত্র'ও বলিতেন—তাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্তু এক বৎসর বিশেষ বিঘ্ন বাধা হওয়ায় তদবধি পূজা বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এপর্য্যন্ত পূজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই, অথবা ইতিপূর্ব্বে কেহ আনিতে উদ্যোগী হইলেও অপর সকলে ধরিয়া পড়িয়া তাহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথ দৈববিঘ্নের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। সুতরাং বাটীর সকলে নানা ওজর করিয়াও তাঁহাকে এবৎসর পূজার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের অসুস্থতা বশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পূজা প্রারম্ভের অল্পদিন পূর্ব্বে বাটীতে কয়েক জন আত্মীয় কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ায় তিনি ঐ বিষয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বাটীর অপর সকলের মনোমালিন্যের হেতু হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া সুরেন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুভ্রাতাগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সপ্তমী পূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্টমী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইয়া ভগবদালাপ ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তার বাবু অপরাহ্নে ৪ ঘটিকার সময়ে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করিয়াছেন। সকলে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব্ব ভাবসংযুক্ত দিব্য স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ভাব সমাধি হইতেছে, আবার সমাধি ভঙ্গে সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারের সহিত মৃদুস্বরে কখন কখন দুই একটি ভগবদ্কথা কহিতেছেন ও সঙ্গীতের ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতেছেন। ভক্তগণের কেহ কেহও ভাবে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছেন,

একটা প্রবল আনন্দ প্রবাহে ঘর জম্ জম্ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি সস্নেহে স্বামীজিকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সহসা গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিল, 'এই সময় সন্ধিপূজা কিনা সেজন্যই ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন!—ঐ কথা না জানিয়াও সহসা সমাধিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা কি অল্প বিচিত্র!' প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল এবং ডাক্তারও বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে ঐ সমাধির বিষয় বলিতে লাগিলেন, "দেখিলাম এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ি পর্য্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, সুরেন্দ্রের ভক্তিতে প্রতিমাতে 'মার' আবেশ হইয়াছে। তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতির রশ্মি নির্গত হইতেছে। সম্মুখে দালানের ভিতর দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর মার সম্মুখে উঠানে বসিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া সুরেন্দ্র রোদন করিতেছে। তোমরা এখন সকলে মিলিয়া তার বাটীতে যাও। তোমাদের দেখিলেও তার প্রাণ অনেকটা শীতল হইবে।"

অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলে সুরেন্দ্র নাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং বাস্তবিকই ঠাকুরের যখন সমাধি হইয়াছিল তখন সুরেন্দ্র নাথ প্রাণের আবেগ আর ধারণ করিতে না পারিয়া প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া মা, মা, বলিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরূপে বাহ্যিক ঘটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ আনন্দে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।

সাধন কালের প্রথম চারি বৎসরের ভিতরেই আবার শ্রীমতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরনাথ কোন সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ধারণের ফলেই ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া ঐরূপ ব্যাকুলতা রূপে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলে পুনরায় শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা ভাবিয়া ঠাকুরের কল্যাণ কামনায় তাঁহারা লছমীবাই-প্রমুখাহাবভাবপূর্ণা সুন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে তাঁহাকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে

এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন ঐ সকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐকালে 'মা, মা' বলিতে বলিতে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় একবারে শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল! শুনিয়াছি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং ঠাকুরের বালকের ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধা হইয়া ঐ সকল নারীর হৃদয়ে ঐকালে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল! অনন্তর তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গে প্রলোভিত করিয়া তাহারাই অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজল নয়নে ঠাকুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, ও তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করিয়া তাহারা সশঙ্কচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল।

মহাভারত।*

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

গতকল্য আমি রামায়ণ মহাকাব্য সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু শুনাইয়াছি। অদ্যকার সান্ধ্য সভায় অপর মহাকাব্যখানির সম্বন্ধে কিছু বলিব—উহার নাম মহাভারত। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে রাজা ভরত জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ভরত হইতে যে বংশ প্রবর্ত্তিত হয়, মহাভারতে সেই বংশীয়

* ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত প্যাসিডোনার সেক্সপিয়ার ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প প্রাচীন হইয়াও চিরনবীন, যুগে যুগে কত কবি মহাজন, কত কথকঠাকুর ঐ গল্পের আবৃত্তি করিয়া বহু লোকের চিত্তহরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঐ কাহিনী সম্বন্ধে একথা বলাও ধৃষ্টতা যে রামায়ণ মহাভারতে যাহা জানিবার বা বুঝিবার, তাহা আমরা জানিয়া বুঝিয়া শেষ করিয়াছি। অতএব আশা করি, উদ্বোধনে রামায়ণ বা মহাভারত পড়িতে যাইয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। বিশেষতঃ খাস পাশ্চাত্যের একটী বিদ্বৎ-সভায় আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাবে ঐ ভারত-প্রচলিত আখ্যায়িকাগুলির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতেও অনুধাবন করিবার বিষয় যে যথেষ্ট আছে তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কি জানি, বর্ত্তমান সময়ে রুচিবৈচিত্র্যের ত অভাব নাই, সেই জন্য একটু ভূমিকা করিয়া রাখা ভাল।

রাজগণের উপাখ্যান আছে। উক্ত ভরত রাজা হইতেই ভারতবর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে এবং তাঁহার নাম হইতেই এই মহাকাব্যের নাম মহাভারত হইয়াছে। মহাভারত শব্দের অর্থ—মহান্ অর্থাৎ গৌরবসম্পন্ন, ভারত অর্থাৎ ভারতবর্ষ। অথবা মহান্ ভরতবংশীয়গণের উপাখ্যান। কুরুদিগের প্রাচীন রাজ্যই এই মহাকাব্যের রঙ্গক্ষেত্র আর এই উপাখ্যানের ভিত্তি—কুরুপাঞ্চাল মহাসংগ্রাম। অতএব এই বিবাদের সীমাক্ষেত্র খুব বিস্তৃত নহে। এই মহাকাব্য ভারতে সর্ব্বসাধারণের বড়ই আদরের সামগ্রী। হোমরের কাব্য গ্রীকদের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মহাভারতও ভারতবাসীর উপর তদনুরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যতই কাল যাইতে লাগিল ততই মূল মহাভারতের সহিত অনেক অবাস্তব বিষয় সংযোজিত হইতে লাগিল—শেষে উহা প্রায় লক্ষ শ্লোকাত্মক হইয়া দাড়াইল। কালে কালে মূল মহাভারতে নানাবিধ আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, পুরাণ, দার্শনিক নিবন্ধ, ইতিহাস, নানাবিধ বিচার প্রভৃতি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে—পরিশেষে উহা এক প্রকাণ্ডকলেবর গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় অবাস্তব প্রসঙ্গ থাকিলেও সমুদয় গ্রন্থের ভিতর মূল উপাখ্যানটী ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতের মূল উপাখ্যানটী এই :—ভারত সাম্রাজ্যের জন্য কৌরব ও পাণ্ডব নামক একবংশীয় জ্ঞাতিগণের মধ্যে যুদ্ধ।

আর্য্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভারতে প্রবেশ করেন। ক্রমে আর্য্যগণের এই সকল বিভিন্ন শাখা ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে আর্য্যগণই ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময়েই এক বংশের দুই বিভিন্ন শাখার ভিতর অন্যতরকে পরাভূত করিয়া একের স্বয়ং প্রভুত্বলাভ করিবার জন্য এই যুদ্ধের উৎপত্তি। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা গীতা পড়িয়াছেন, তাঁহাদেরই জানা আছে, উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভেই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বি সৈন্যাধিকৃত যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা। ইহাই এই মহাভারতের যুদ্ধ।

কুরুবংশীয় মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র ছিলেন—জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, কনিষ্ঠ পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানানুসারে অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, ক্ষয়রোগী বা অন্য কোন প্রকার স্থায়িব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি পৈতৃক ধনের অধিকারী হইতে পারে না, সে কেবল নিজ ভরণপোষণের ব্যয় মাত্র পাইতে

পারে। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারিলেন না, পাণ্ডুই রাজা হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের এক শত এবং পাণ্ডুর পাঁচটী মাত্র পুত্র ছিল। অল্প বয়সে পাণ্ডুর দেহত্যাগ হইলে ধৃতরাষ্ট্রের উপরই রাজ্যভার পড়িল। তিনি পাণ্ডব পুত্রগণকে নিজ পুত্রগণের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহাধনুর্দ্ধর বিপ্র দ্রোণাচার্য্যের উপর তাঁহাদের শিক্ষাভার সমর্পিত হইল—দ্রোণাচার্য্যের নিকট তাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন। রাজপুত্রগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপরায়ণতা ও বহুবিধ গুণগ্রাম এবং তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের শৌর্য্যবীর্য্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অপরিসীম ভক্তি দর্শনে অন্ধরাজের পুত্রগণের হৃদয়ে বিষম ঈর্ষার উদয় হইল এবং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধনের কৌশলে পঞ্চ পাণ্ডব এক ধর্ম্মমহোৎসব দর্শনচ্ছলে বারণাবত নগরে প্রেরিত হইলেন। তথায় দুর্য্যোধনের উপদেশানুসারে তাঁহাদের বাসার্থ, শন, সর্জ্জরস, জতু, লাক্ষা, ঘৃত, তৈল ও অন্যান্য আগ্নেয় দ্রব্য দ্বারা এক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল—সেই জতুগৃহে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল—তথায় কিয়দ্দিবস বাসের পরে দুর্য্যোধনানুচর কর্ত্তৃক এক রাত্রে গোপনে অগ্নি প্রদত্ত হইল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা বিদুর, দুর্য্যোধন ও তদীয় অনুচরবর্গের এই দুরভিসন্ধির বিষয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে এই চক্রান্তের বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—সুতরাং তাঁহারা সকলের অজ্ঞাতসারে দাহ্যমান জতুগৃহ হইতে পলায়নে কৃতকার্য্য হইলেন। কৌরবগণ যখন সংবাদ পাইলেন যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তখন তাঁহারা অন্তরে পরম প্রমুদিত হইলেন—ভাবিতে লাগিলেন, এতদিনে আমরা নিষ্কণ্টক হইলাম, আমাদের সকল বাধাবিঘ্ন এক্ষণে দূরীভূত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ রাজ্যভার গ্রহণ করিল। জতুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চপাণ্ডব জননী কুন্তীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। গভীর অরণ্যানী মধ্যে তাঁহাদিগকে অনেক দুঃখকষ্ট দৈবদুর্ব্বিপাক সহ্য করিতে হইল, কিন্তু তাঁহারা শৌর্য্যবীর্য্য ও ধৃতিবলে সর্ব্ববিধ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, নিকটবর্ত্তী পাঞ্চালদেশের রাজকন্যার শীঘ্র স্বয়ম্বর হইবে, এই সংবাদ তাঁহারা শুনিতে পাইলেন।

আমি বিগত রজনীতে এই স্বয়ম্বর প্রথার বিষয় একবার উল্লেখ করিয়াছি*। কোন রাজকন্যার স্বয়ম্বরের সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে বিভিন্নদেশীয় রাজপুত্রগণ স্বয়ম্বর সভায় আহূত হইতেন। এই সকল সমবেত রাজকুমারগণের মধ্য হইতে রাজকন্যাকে ইচ্ছামত বর মনোনীত করিতে হইত। নকীব রাজপরিচারকগণ রাজমাল্যহস্তা রাজকুমারীর অগ্রে অগ্রে যাইয়া প্রত্যেক রাজকুমারের সিংহাসনের নিকট গিয়া তাঁহার নামধাম বংশমর্য্যাদা শৌর্য্যবীর্য্যের বিষয় উল্লেখ করিত—রাজকন্যা সকলকে দেখিয়া যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, তাঁহার গলদেশে ঐ বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন—তাঁহার কন্যা দ্রৌপদীর রূপ ও গুণের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ছিল—সেই দ্রৌপদীই স্বয়ম্বরা হইবেন, পাণ্ডবেরা শুনিলেন।

স্বয়ম্বরে প্রায়ই কোন না কোন পণ থাকিত। রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থীকে সাধারণতঃ কোন প্রকার শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয়,অস্ত্রশিক্ষার কৌশলাদি দেখাইতে হইত। দ্রুপদরাজা স্বয়ম্বরসভায় নিম্নলিখিত প্রকারে তদীয় কন্যার পাণিপীড়নার্থীগণের বলপরীক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। খুব উর্দ্ধদেশে আকাশে একটী কৃত্রিম মৎস্য লক্ষ্যরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিম্নদেশে সতত ঘূর্ণ্যমান মধ্যছিদ্র একটী চক্র স্থাপিত ছিল, তাহার নিম্নে একটী জলপাত্র। জলপাত্রে মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চক্রচ্ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাণদ্বারা মৎস্যের চক্ষু যিনি বিঁধিতে পারিবেন, তিনিই রাজকুমারীকে লাভ করিবেন। এই স্বয়ম্বরসভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে রাজা ও রাজকুমারগণ সমবেত হইয়াছিলেন—সকলেই রাজকুমারীর পাণিপীড়নার্থ সমুৎসুক—সকলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

আপনারা সকলেই ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিষয় অবগত আছেন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ—পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পৌরহিত্য বা যাজনাদি তাঁহাদের কার্য্য, ব্রাহ্মণের নীচেই ক্ষত্রিয়—রাজগণ ও অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গ এই ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভুক্ত, তৃতীয়, বৈশ্য অর্থাৎ ব্যবসায়ী, চতুর্থ, শূদ্র বা সেবক। অবশ্য এই রাজকুমারী ক্ষত্রিয়বর্ণভুক্তা ছিলেন।

যখন রাজপুত্রগণ সকলেই লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন দ্রুপদরাজপুত্র সভামধ্যে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "ক্ষত্রিয়বর্ণ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে

* আশ্বিনের উদ্বোধনে রামায়ণবক্তৃতায়।

অকৃতকার্য্য হইয়াছেন—এক্ষণে অন্য ত্রিবর্ণের মধ্যে যে কেহ লক্ষ্যবিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, ব্রাহ্মণই হউন, বৈশ্যই হউন, এমন কি শূদ্রই হউন, যিনি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন।"

ব্রাহ্মণগণ মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব সমাসীন ছিলেন · তন্মধ্যে অর্জ্জুনই পরম ধনুর্দ্ধর। দ্রুপদপুত্রের পূর্ব্বোক্ত আহ্বান শ্রবণে তিনি উঠিয়া লক্ষ্য বিঁধিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণজাতি সাধারণতঃ অতি শান্ত প্রকৃতি ও কিঞ্চিৎ নম্রস্বভাব। শাস্ত্রবিধানানুসারে তাঁহাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র স্পর্শ করা বা সাহসের কর্ম্ম করা নিষিদ্ধ। ধ্যান ধারণা, স্বাধ্যায় ও আত্মসংযমে সদানির্ব্বদা নিযুক্ত থাকাই তাঁহাদের শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্ম। অতএব ইঁহারা কিরূপ শান্তপ্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয়, তাহা ভাবিয়া দেখুন। ব্রাহ্মণেরা যখন দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া লক্ষ্যবিদ্ধ কবিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহারা ভাবিলেন, এই ব্যক্তির আচরণে ক্ষত্রিয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সকলকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিবেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা ছদ্মবেশে অর্জ্জুনকে তদীয় অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবাব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়, তিনি তাঁহাদের কথায় নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অবলীলাক্রমে ধনুঃ তুলিয়া উহাতে জ্যাবোপণ করিলেন। পরে ধনুঃ আকর্ষণ করিয়া অনায়াসে চক্রচ্ছিদ্রেব মধ্য দিয়া বাণ-ক্ষেপণ করিয়া লক্ষ্যমৎস্যের চক্ষুঃ বিদ্ধ করিলেন।

তখন সভাস্থলে তুমুল আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। রাজকুমারী দ্রৌপদী অর্জ্জুনের নিকট অগ্রসর হইয়া তদীয় গলদেশে মনোহর বরমাল্য অর্পণ করিলেন। কিন্তু এদিকে রাজগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। এই মহতী সভায় সমবেত রাজা ও রাজকুমারগণকে অতিক্রম কবিয়া একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়জাতিসম্ভূতা পরমা সুন্দরী রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে, এ চিন্তাও তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে দ্রৌপদীকে কাড়িয়া লইবেন স্থির করিলেন। পাণ্ডগণের সহিত রাজগণের তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু পাণ্ডবেরা কোনমতে পরাভূত হইলেন না, অবশেষে জয়লাভ করিয়া দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া গেলেন।

পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাসস্থানে জননী কুন্তীসমীপে প্রত্যাগত হইলেন। ভিক্ষাই ব্রাহ্মণের উপজীবিকা—সুতরাং ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করাতে ইঁহাদিগকেও বাহিরে গিয়া খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত, ভিক্ষালব্ধ বস্তু গৃহে আসিলে কুন্তী উহা তাঁহা-

দিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। পঞ্চভ্রাতা যখন দ্রৌপদীকে লইয়া মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা কৌতুকবশে জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ মা, আজ কেমন মনোহর ভিক্ষা আনিয়াছি।" কুন্তী না দেখিয়াই বলিলেন, "যাহা আনিয়াছ, পাঁচজনে মিলিয়া ভোগ কর।" এই কথা বলিবার পর যখন রাজকুমারীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ কি! এ আমি কি কথা বলিলাম—এ যে এক কন্যা।" কিন্তু এখন আর কি হইবে? মাতৃবাক্যলঙ্ঘন ত আর হইতে পারে না—মাতৃআজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে। তাঁহাদের জননী জীবনে কখন মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না, ঐ বাক্য অবশ্য সত্য হওয়া চাই। এইরূপে দ্রৌপদী পঞ্চভ্রাতার সাধারণ সহধর্ম্মিণী হইলেন।

আপনারা জানেন, প্রত্যেক সমাজেই সামাজিক রীতিনীতির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন সোপান আছে। এই মহাকাব্যের ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু আশ্চর্য্য আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতপ্রণেতা পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া যে এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে কোনরূপ সামাজিক প্রথা বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া উহার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা পাইয়াছেন। মাতৃ আজ্ঞা—তাঁহাদের জননী এই অদ্ভুত পরিণয়ে সম্মতিদান করিয়াছেন, ইত্যাদি নানা যুক্তি বলিয়া মহাভারতকার এই ঘটনাটীর উপর টীকা করিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের জানা আছে, সকল জাতিতে, সকল সমাজে এমন এক অবস্থা ছিল, যে সময় বহুপতিত্ব সমাজের অনুমোদিত ছিল—এক পরিবারের সকল ভ্রাতায় মিলিয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করিত। ইহা সেই অতীত বহুপতিক যুগের একটা পরবর্ত্তী আভাস মাত্র।

যাহা হউক, এদিকে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিলে তাঁহার ভ্রাতার মনে নানাবিধ আন্দোলন হইতে লাগিল—তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "যে পঞ্চ ব্যক্তি আমার ভগিনীকে লইয়া গেল, ইহারা কে? আমার ভগিনী যাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন, যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে, সেই বা কে? ইহাদের ত অশ্ব, রথ বা অন্য কোন রূপ ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন দেখিতেছি না—ইহারা ত পদব্রজেই গেল দেখিলাম।" মনে মনে এই সকল বিতর্ক করিতে করিতে তিনি তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় জানিবার জন্য দূরে দূরে

তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন, অবশেষে গোপনে রাত্রে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া তাঁহারা যে যথার্থ ক্ষত্রিয়, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সংশয় রহিল না। তখন দ্রুপদরাজা তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

অনেকে প্রথমে এক স্ত্রীর এইরূপ বহুবিবাহে ঘোরতর আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু ব্যাসের উপদেশে সকলে বুঝিলেন যে, এক্ষেত্রে এইরূপ বিবাহ দোষাবহ হইতে পারে না। সুতরাং দ্রুপদরাজাকেও এই বিবাহে সম্মত হইতে হইল—রাজকুমারী পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলেন।

পরিণয়ের পর পাণ্ডবগণ পরমানন্দিতচিত্তে দ্রুপদগৃহে সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন, দিন দিন তাঁহাদের বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা জীবিত আছেন, দগ্ধ হন নাই, ক্রমে এ সংবাদ কৌরবগণের নিকট পঁহুছিল। দুর্য্যোধন ও তদীয় অনুচরবর্গ পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য নূতন নূতন ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদি বর্ষীয়ান্ মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের পরামর্শে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে লইয়া গেলেন—প্রজাবর্গ পাণ্ডবগণকে বহুদিনের পর দর্শন করিয়া পরমানন্দে মহোৎসব করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। তখন পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নামক মনোহর নগরী নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহারা আপনাদের রাজ্য ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন,—চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগকে আপনাদের করদ করিলেন। অতঃপর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আপনাকে ভারতের তদানীন্তন সমস্ত রাজগণের সম্রাটরূপে ঘোষণা করিবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সংকল্প করিলেন—এই যজ্ঞে পরাজিত রাজগণকে কর লইয়া আসিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় ও প্রত্যেককে যজ্ঞোৎসবের এক একটী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিজ হস্তে তাহা সম্পাদন করিয়া যজ্ঞকার্য্যের সাহায্য করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধুও ছিলেন। তিনিও পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়া রাজসূয়যজ্ঞ নির্ব্বাহবিষয়ে নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদনের একটী বিষম বিঘ্ন ছিল। জরাসন্ধ নামক জনৈক রাজা একশত রাজাকে বলি দিয়া নরমেধ যজ্ঞ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে বড়শীতি জন রাজাকে

কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শানুসারে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন জরাসন্ধের নিকট যাইয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। জরাসন্ধও যুদ্ধে সম্মত হইলেন। চতুর্দ্দশ দিবস ক্রমাগত দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর ভীম জরাসন্ধকে পরাভূত করিলেন। তখন বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার পর যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ চারি ভ্রাতা সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রত্যেকে এক এক দিকে দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত হইলেন ও সমস্ত রাজবর্গকে যুধিষ্ঠিরের বশে আনয়ন করিলেন। তাহারা রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জয়লব্ধ অগাধ ধন সম্পত্তি ঐ বিরাট্ যজ্ঞের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্পণ করিলেন।

এইরূপ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং জরাসন্ধের কারাগার হইতে মুক্ত রাজগণ রাজসূয় যজ্ঞে আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার এবং তাঁহার যথোচিত সম্মাননা করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্রগণও এই যজ্ঞে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞাবসানে যুধিষ্ঠির সম্রাটের মুকুটে ভূষিত ও রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এইখান হইতেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের ভাবী বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। পাণ্ডবগণের রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি দুর্য্যোধনের অসহ্য জ্ঞান হইল, সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রবল ঈর্ষ্যার ভাব লইয়া রাজসূয় যজ্ঞ হইতে ফিরিলেন। তিনি এইরূপে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া কিরূপে ছলে কৌশলে পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে নানাবিধ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, কারণ, তিনি জানিতেন, বলপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে পরাভূত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। রাজা যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি ছিল—অতি অশুভ ক্ষণে তিনি চতুর অক্ষবেদী ও দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণাদাতা শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে আহূত হইলেন। প্রাচীন ভারতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, ক্ষত্রিয়জাতীয় কোন ব্যক্তি যুদ্ধার্থ আহূত হইলে সর্ব্ববিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিজ মানরক্ষার্থ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে এইরূপ আবার দ্যূতক্রীড়ার্থ আহূত হইয়া ক্রীড়া করিলেই মান রক্ষা হইবে, আর ক্রীড়ায় অসম্মত হইলে তাহা অতি অযশস্কর বলিয়া পরিগণিত হইবে। মহাভারত বলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে সেই রাজর্ষিকেও দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হইতে হইয়াছিল। শকুনি ও তাহার অনুচরবর্গ কৃত্রিম অক্ষ প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাতেই যুধিষ্ঠির যতবার পণ রাখিতে লাগিলেন, ততবারই হারিতে

লাগিলেন—বার বার এইরূপ পরাজিত হওয়াতে তিনি অন্তরে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া জয়াশায় যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই একে একে তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সমুদয় পণ রাখিতে লাগিলেন এবং একে একে সমুদয়ই হারিলেন—তাঁহার সমুদয় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বস্বই তিনি এইরূপে হারিলেন। অবশেষে যখন তাঁহার সমুদয়-রাজ্য-ঐশ্বর্য্য কৌরবগণকর্ত্তৃক বিজিত হইল, অথচ তাঁহাকে আবার বার বার ক্রীড়ার্থ আহ্বান করা হইতে লাগিল, তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার নিজ ভ্রাতৃগণ, আপনি স্বয়ং এবং অনিন্দিত দ্রৌপদী ব্যতীত পণ রাখিবার তাঁহার আর কিছুই নাই। এইগুলির সমুদয়ই তিনি একে একে পণ রাখিলেন এবং একে একে সমুদয়ই হারিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ সম্পূর্ণরূপে কৌরবগণের বশীভূত হইলেন—তাহারা তাঁহাদিগকে কোনরূপে অবমাননা করিতে আর বাকি রাখিল না—বিশেষতঃ তাহারা দ্রৌপদীকে যেরূপ অবমাননা করিল, মানুষের প্রতি মানুষ কখন তদ্রূপ ব্যবহার করিতে পারে না। অবশেষে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কৃপায় তাঁহারা কৌরবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেন—রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্যশাসনে অনুমতি করিলেন। দুর্য্যোধন দেখিলেন, বড় বিপদ—তাহার কৌশল বুঝি সব ব্যর্থ হয় সুতরাং সে পিতাকে আর এক বার মাত্র ক্রীড়া করিতে অনুমতি দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন—অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হইলেন। এবার পণ রহিল, যে পক্ষ হারিবে, তাহাকে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু যদি এই অজ্ঞাতবাস মধ্যে জয়িপক্ষ তাহাদের বাসস্থানের সন্ধান পায়, তবে পুনর্ব্বার ঐরূপ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। কিন্তু যদি অজ্ঞাত বাসের সম্পূর্ণ কাল বিজিতপক্ষ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যাপন করিতে পারে, তবে আবার রাজ্য পাইবে।

এই শেষ খেলাতেও যুধিষ্ঠিরের হার হইল, তখন তিনি পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত নির্ব্বাসিত গৃহশূন্য ব্যক্তিগণের ন্যায় বনে গমন করিলেন। তাঁহারা অরণ্যে ও পর্ব্বতে কোনরূপে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা ধার্ম্মিক ও বীরপুরুষোচিত অনেক কঠিন কঠিন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন—মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকাল তীর্থভ্রমণ করিয়া বহু প্রাচীন ও পবিত্র স্মৃতি-উদ্দীপক স্থানসমূহ দর্শন করিতেন। মহাভারতের এই বনপর্ব্বটী বড়ই মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ—ইহা নানাবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকায় পূর্ণ। ইহাতে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও

দর্শনাত্মক অনেক মনোহর অপূর্ব্ব উপাখ্যান আছে। মহর্ষিগণ পাণ্ডব ভ্রাতৃগণকে এই নির্ব্বাসনের দিনে দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহারা যাহাতে নির্ব্বাসন দুঃখ অক্লেশে সহিতে পারেন, তদুদ্দেশে তাঁহাদিগকে প্রাচীন ভারতের অনেক অপূর্ব্ব মনোহর উপাখ্যান শুনাইতেন। আমি তন্মধ্যে একটী উপাখ্যান আপনাদিগকে বলিব।

অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার সাবিত্রী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী গুণবতী কন্যা ছিল। হিন্দুদের এক অতি পবিত্র স্তোত্রের নাম সাবিত্রী। উক্তকন্যার এত গুণ ও রূপ ছিল যে, তাঁহারও উক্ত সাবিত্রীনামকরণ হইয়াছিল। সাবিত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তদীয় পিতা তাঁহাকে নিজ স্বামী স্বয়ং মনোনীত করিতে বলিলেন। আপনারা দেখিতেছেন এই ভারতীয় প্রাচীন রাজকন্যাগণের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল—অনেক সময়েই তাঁহারা তাঁহাদের পাণিপীড়নার্থী রাজকুমারগণের মধ্য হইতে স্বয়ং পতিনির্ব্বাচন করিতেন।

সাবিত্রী পিতৃবাক্যে সম্মত হইয়া সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া নিজ পিতৃরাজ্য হইতে অতি দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদীয় পিতা কয়েকজন রক্ষী ও বৃদ্ধ সভাসদ্‌কে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সমভিব্যাহারে অনেক রাজসভায় যাইয়া অনেক রাজকুমারকে দেখিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোহরণে সমর্থ হইল না। অবশেষে তিনি অরণ্যমধ্যবর্ত্তী এক পবিত্র তপোবনে উপনীত হইলেন। প্রাচীনকালে এই সকল অরণ্যে পশুগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিত—তথায় কোন জীবকে হত্যা করিতে দেওয়া হইত না। এইরূপে তথায় পশুগণ আর মানুষকে ভয় করিত না—এমন কি, সরোবরস্থ মৎস্যকুল পর্য্যন্ত মানুষের হস্ত হইতে নির্ভয়ে খাদ্য লইয়া যাইত। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই সকল অরণ্যে কেহ কোন জীবহত্যা করে নাই। মুনিগণ ও বৃদ্ধগণ তথায় মৃগ ও বিহঙ্গমগণের মধ্যে আনন্দে বাস করিতেন। এমন কি, কোন গুরুতর অপরাধীও এই সকল স্থানে যাইলে তাহার উপর অত্যাচার করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। লোকে গার্হস্থ্য জীবনে যখন আর সুখ না পাইত, তখন এই সকল অরণ্যে গমন করিত—তথায় মুনিগণের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ও তত্ত্বচিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিত।

দ্যুমৎসেন নামক জনৈক রাজা পূর্ব্বোক্ত তপোবনে বাস করিতেন। তিনি জরাগ্রস্ত ও দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাভূত এবং তাঁহার রাজ্য অধিকার করিল। এই বৃদ্ধ অসহায় অন্ধ রাজা

তদীয় মহিষী ও তনয়ের সহিত এই তপোবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তথায় অতি কঠোর তপস্যাচরণ করিয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সত্যবান্।

সাবিত্রী অনেক রাজসভা দর্শন করিয়া অবশেষে এই পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন। প্রাচীনকালে এই তপোবনবাসী ঋষিতপস্বিগণের উপর সকলেই এত শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব পোষণ করিতেন যে, একজন সম্রাট্ও এই সমস্ত তপোবন বা আশ্রমসমূহের নিকট দিয়া যাইবার সময় এই সকল ঋষিমুনিগণকে পূজা করিবার জন্য আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এখনও ভারতে এই ঋষিমুনিগণের প্রতি লোকের এতদূর শ্রদ্ধার ভাব আছে যে, তথাকার একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটও অরণ্যবাসী,ফলমূলভোজী, চীরপরিধারী কোন ঋষির বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া বরং পরম গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিবেন। আমরা সকলেই ঋষির বংশধর। এইরূপেই ভারতে ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অতএব রাজগণ যে তপোবনের নিকট দিয়া যাইবার সময় উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই তপোবনবাসী ঋষিগণকে পূজা করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? যদি তাঁহারা অশ্বারোহণে আসিয়া থাকেন, তবে আশ্রমের বাহিরে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন। আর যদি তাঁহারা রথারোহণে আসিয়া থাকেন, তবে রথ ও বর্ম্মাদি সমুদয় বাহিরে রাখিয়া আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। বিনীত শমগুণসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় না যাইলে কোন যোদ্ধারই আশ্রমমধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল না।

সাবিত্রীও সুতরাং রাজকন্যা হইলেও এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় রাজতপস্বী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে দর্শন করিলেন। সত্যবান্‌কে দর্শন করিয়াই সাবিত্রী মনে মনে তাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ করিলেন। সাবিত্রী কত রাজপ্রাসাদে, কত রাজসভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন স্থানে কোন রাজকুমার তাঁহার চিত্ত অপহরণ করিতে পারে নাই—কিন্তু এখানে—এই রাজা দ্যুমৎসেনের অরণ্যবাসে—তদীয় পুত্র সত্যবান্ তাঁহার হৃদয় অপহরণ করিল।

সাবিত্রী পিতৃগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সাবিত্রি, বৎসে, তুমি ত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিলে—বল দেখি, তুমি

কোথাও এমন কাহাকেও দেখিলে কি, যাহার সহিত তুমি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, বল মা, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া হৃদয়ের কথা খুলিয়া বল।" তখন সাবিত্রী লজ্জানম্রবদনে মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ পিতঃ, দেখিয়াছি।" পিতা কহিলেন, "বৎসে, যে রাজকুমার তোমার চিত্ত অপহরণ করিয়াছে তাহার নাম কি?" তখন সাবিত্রী বলিলেন, "তাঁহাকে ঠিক রাজকুমার বলিতে পারা যায় না, কারণ, তাঁহার পিতা দ্যুমৎসেন রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে। অতএব তিনি রাজকুমার হইলেও রাজ্যের অধিকারী নহেন—তিনি তপস্বিভাবে জীবন যাপন করিতেছেন—বনজাত ফলমূল সংগ্রহ করিয়া কুটীরবাসী বৃদ্ধ জনকজননীর সেবানিরত রহিয়াছেন।"

তৎকালে দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা অশ্বপতি তাঁহাকে সাবিত্রীদ্বারা সত্যবান্‌কে পতিরূপে নির্ব্বাচন করার কথা বলিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, "এই নির্ব্বাচন বড়ই অশুভ হইয়াছে।" এই কথাগুলি শুনিয়া রাজা তাঁহাকে এইরূপ বলিবার কারণ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "অদ্য হইতে দ্বাদশমাসান্তে সত্যবান্ নিজ কর্ম্মানুসারে দেহত্যাগ করিবে।" রাজা নারদের এই কথা শুনিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে কন্যাকে বলিলেন "সাবিত্রী, শুনিলে ত, অদ্য হইতে দ্বাদশমাসান্তে সত্যবান্ দেহত্যাগ করিবে—অতএব তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে অল্প বয়সেই বিধবা হইবে—একবার এই কথা বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। অতএব বৎসে, তুমি সত্যবানের বিষয় আর হৃদয়ে স্থান দিও না—এরূপ অল্পায়ুঃ আসন্নমৃত্যু বরের সহিত তোমার কোন মতে বিবাহ হইতে পারে না।" সাবিত্রী কহিলেন, "পিতঃ, সত্যবান অল্পায়ুঃই হউক বা আসন্নমৃত্যুই হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমার হৃদয় সত্যবানের প্রতিই অনুরাগিণী, আমি মনে মনে সেই সাধুশীল বীর সত্যবান্‌কেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে বলিবেন না, তাহা হইলে আমি দ্বিচারিণী হইব। কুমারীর পতিনির্ব্বাচনে একবার মাত্র অধিকার আছে। একবার সে যাহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তদ্ব্যতীত আর কাহাকেও তাহার মনেও কখন স্থান দেওয়া উচিত নহে।" রাজা যখন দেখিলেন, সাবিত্রী সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয়া, তখন তিনি এই বিবাহ অনুমোদন করিলেন।

সাবিত্রী সত্যবানের সহিত যথাবিধানে বিবাহিতা হইয়া পিতার রাজপ্রাসাদ হইতে তদীয় মনোনীত পতির সহিত বাসার্থ ও শ্বশুরশ্বশ্রূর সেবার্থ তাঁহাদের অরণ্যমধ্যস্থ আশ্রমে গমন করিলেন।

নারদের মুখ হইতে শুনিয়া সাবিত্রী সত্যবানের ঠিক কোন্ দিন দেহত্যাগ হইবে তাহা অবগত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উহা সত্যবানের নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন। সত্যবান্ প্রতিদিন গভীর অরণ্যে গিয়া কাষ্ঠ এবং ফলফুল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কুটীরে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, সাবিত্রী রন্ধনাদি সমুদয় গৃহকার্য্য এবং বৃদ্ধ শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করিতেন। এইরূপে তাঁহাদের জীবন সুখে দুঃখে অতিবাহিত হইতে লাগিল—অবশেষে সত্যবানের দেহত্যাগের দিন অতি নিকটবর্ত্তী হইল। আর তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাবিত্রী এক কঠোর ব্রত গ্রহণ করিলেন—তিনি উপবাসপরায়ণা হইয়া ও রাত্রিজাগরণ করিয়া অনবরত দেবারাধনা করিতে লাগিলেন। এই তিন রাত্রি যে তিনি পতির আসন্ন মৃত্যু চিন্তা করিয়া কি গভীর দুঃখে কাটাইয়াছিলেন, অপরের অজ্ঞাতসারে কত অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন, দেবতার নিকট পতিদেবতার শুভাকামনায় কাতরভাবে কত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? অবশেষে সেই কাল দিবসের প্রভাত উপস্থিত হইল। সে দিন আর সাবিত্রীর পতিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতে সাহস হইল না। অতএব সত্যবানের অরণ্যে কাষ্ঠ ও ফলফুল সংগ্রহ করিতে যাইবার সময় তিনি সেদিন শ্বশুর ও শ্বশ্রূর নিকট হইতে পতির সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদের অনুমতি লাভ করিয়া তিনি সত্যবানের সঙ্গে অরণ্যে চলিলেন। হঠাৎ সত্যবান্ বিজড়িতস্বরে পত্নীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, সাবিত্রি, আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমার ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন বোধ হইতেছে, আমার সমগ্র দেহ যেন নিদ্রাভারাক্রান্ত হইতেছে—আমি কিছুকাল তোমার পার্শ্বে বিশ্রাম করিব।" সাবিত্রী ভয়-বিজড়িত ও কম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, "প্রভো, আপনি আমার অঙ্কদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করুন।" তখন সত্যবান্ নিজ উত্তপ্ত মস্তক সাবিত্রীর অঙ্কদেশে স্থাপন করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইল—তিনি দেহত্যাগ করিলেন। সাবিত্রী গলদশ্রুলোচনে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া সেই জনশূন্য অরণ্যে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যমদূতগণ সত্যবানের সূক্ষ্মদেহ গ্রহণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু যথায় সাবিত্রী পতির

মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্টা ছিলেন, তাহারা তাহার নিকটেই আসিতে পারিল না। তাহারা দেখিল, সাবিত্রীর চতুষ্পার্শ্বে—অগ্নির গণ্ডী রহিয়াছে—যমদূতগণের মধ্যে কেহই সে অগ্নির গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিল না। তাহারা সকলেই সাবিত্রীর নিকট হইতে পলাইয়া গিয়া যমরাজের নিকট উপস্থিত হইল এবং সত্যবানের আত্মাকে আনিতে না পারিবার কারণ সমুদয় নিবেদন করিল।

তখন মৃত্যুদেবতা, মৃত ব্যক্তিগণের বিচারক যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকের বিশ্বাস পৃথিবীতে প্রথম মানুষ যিনি মরেন, তিনিই মৃত্যুদেবতা অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তী মৃত ব্যক্তিগণের অধিপতি হইয়াছেন। কোন ব্যক্তি মরিবার পর, তাহাকে পুরস্কার দিতে হইবে অথবা সে শাস্তি পাইবে তিনিই তাহা বিচার করেন। সেই যমরাজ এক্ষণে স্বয়ং আসিলেন। অবশ্য যমরাজ যখন দেবতা, তখন সাবিত্রীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সেই অগ্নির গণ্ডীর ভিতর তাঁহার অনায়াসে গমনাগমনের অধিকার ছিল। তিনি সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মা, তুমি এই শবদেহ পরিত্যাগ কর। কারণ, জানিও, মর্ত্ত্য ব্যক্তিমাত্রকেই দেহত্যাগ করিতে হয়—ইহাই বিধির বিধান। মর্ত্ত্যগণের মধ্যে আমিই প্রথম মরিয়াছি—তার পর হইতে সকলকেই মরিতে হয়। মৃত্যুই মানবের নিয়তি।" যমরাজ এইকথা বলিলে সাবিত্রী সত্যবানের শবদেহ ত্যাগ করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেলেন, তখন যম সত্যবানের দেহ হইতে তাঁহার জীবাত্মাকে বাহির করিয়া লইলেন। যম এইরূপে সেই যুবকের জীবাত্মাকে লইয়া স্বীয় পুরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তিনি শুনিলেন, তাঁহার পশ্চাতে শুষ্ক পত্রের উপর কাহার পদশব্দ হইতেছে। শুনিয়া তিনি ফিরিয়া দেখেন—সাবিত্রী। তখন তিনি সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাবিত্রী, মা, বৃথা কেন আমায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ? সকল মর্ত্ত্যজনেরই অদৃষ্টে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।" সাবিত্রী বলিলেন, "পিতঃ, আমি আপনার অনুসরণ করিতেছি না। কিন্তু আপনি যেমন বলিলেন মর্ত্ত্যগণের পক্ষে মৃত্যুই বিধির বিধান, তদ্রূপ বিধির বিধানেই নারীও তাহার প্রিয় পতির অনুসরণ করিয়া থাকে—আর বিধির সনাতন বিধানেই পতিব্রতা ভার্য্যাকে কখন তাহার প্রিয় পতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না।" তখন যমরাজ বলিলেন, "বৎসে, তোমার ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি তোমার পতির পুনর্জ্জীবন ব্যতীত আমার নিকট হইতে

যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।" তখন সাবিত্রী বলিলেন, "হে প্রভো যমরাজ, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দিন যে, আমার শ্বশুর যেন পুনরায় তাঁহার চক্ষু লাভ করেন ও সুখী হইতে পারেন।" যম বলিলেন, "আমি ধর্ম্মজ্ঞ, অয়ি প্রিয় বৎসে, তোমার এই ধর্ম্মসঙ্গত বাসনা পূর্ণ হউক।" এই বলিয়া যমরাজ সত্যবানের জীবাত্মাকে লইয়া আবার নিজ গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে তিনি পূর্ব্ববৎ আবার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া আবাব সাবিত্রীকে দেখিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "বৎসে সাবিত্রি, তুমি এখনও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ?" সাবিত্রী উত্তর দিলেন, "হাঁ পিতঃ, আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি বটে। আমি যে না আসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, কে যেন আমায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি ফিরিবার জন্য বারবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার মনপ্রাণ যে আমার স্বামীর নিকট পড়িয়া আছে, সুতরাং যেখানে আমাব স্বামীকে লইয়া যাইতেছেন, তথায় আমার দেহও যাইতেছে। আমার আত্মাও পূর্ব্বেই গিয়াছে—কারণ, আমার আত্মা আমার স্বামীর আত্মাতেই অবস্থিত। সুতরাং আপনি যখন আত্মা-কেই লইয়া যাইতেছেন, তখন আমার দেহ যাইবেই। উহা না গিয়া কি করিয়া থাকিবে?" যম কহিলেন, "সাবিত্রি, আমি তোমার বাক্যশ্রবণে পরম প্রীত হইলাম—আমার নিকট হইতে তোমার স্বামীর জীবন ব্যতীত আর এক বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী কহিলেন, "দেব, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আমার শ্বশুর যেন তাঁহার নষ্ট রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া পান।" যম কহিলেন, "প্রিয় বৎসে, তোমায় এই বরও প্রদান করিলাম। কিন্তু এক্ষনে তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও কারণ, জীবিত মর্ত্ত্য কখন যমরাজের সহিত যাইতে পারে না।" এই বলিয়া যম আবার চলিতে লাগিলেন। যম যদিও বারম্বার সাবিত্রীকে ফিরিতে বলিলেন, কিন্তু সেই নম্রস্বভাবা, পতিপরায়ণা সাবিত্রী তথাপি তাঁহাব মৃত স্বামীর অনুসরন করিতে লাগিলেন। যম আবার ফিরিয়া সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "হে সাবিত্রি, হে মহানুভবে, তুমি এরূপ তীব্র শোকে বিহ্বলা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় স্বামীর অনুসরণ করিও না।" সাবিত্রী কহিলেন, "আমার মনের উপর আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, আপনি আমার প্রিয়তম স্বামীকে যথায় লইয়া যাইবেন, আমি তথাই তাহার অনুসরণ

করিব।" যম বলিলেন, "আচ্ছা সাবিত্রি, মনে কর তোমার স্বামী ইহলোকে অনেক পাপাচরণ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাকে নরকে যাইতে হইবে। তাহা হইলে কি সাবিত্রী তাহার প্রিয়তম পতির সহিত যাইতে প্রস্তুত ?" পতির প্রতি পরম অনুরাগিনী সাবিত্রী কহিলেন, "আমার পতি যেখানে যাইবেন, জীবনই হউক, মৃত্যুই হউক, স্বর্গই হউক, নরকই হউক, আমি পরমানন্দের সহিত তথায় যাইব।" যম কহিলেন, "বৎসে, তোমার বচনাবলী পরম মনোহর ও ধর্ম্মসঙ্গত, আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আরও একটী বর প্রার্থনা কর, কিন্তু জানিও, মৃত ব্যক্তি কখন আবার জীবিত হয় না।" সাবিত্রী কহিলেন, "যদি আমার প্রতি এতদূর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বরদান করুন, যেন আমার শ্বশুরের রাজবংশ লোপ না হয়, যেন সত্যবানের পুত্রগণ ঐ রাজ্য লাভ করে।" তখন যমরাজ ঈষদ্ধাস্যসহকারে বলিলেন, "বৎসে তোমার মনস্কামনা সফল হউক, এই তোমার পতির জীবাত্মাকে পরিত্যাগ করিলাম,—তোমার পতি আবার জীবিত হইবে। সত্যবানের ঔরসে তোমার অনেক পুত্র জন্মিবে, কালে তাহারা রাজপদ লাভ করিবে। এক্ষণে গৃহে ফিরিয়া যাও। প্রেম মৃত্যুকেও জয় করিল। পূর্ব্বে কোন রমণী পতিকে এরূপ ভাবে ভালবাসে নাই—আর আমি যে সাক্ষাৎ মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—অকপট, অব্যভিচারী প্রেমের শক্তির নিকট—সেই আমিও পরাজিত হইলাম।"

সাবিত্রীর উপাখ্যান সংক্ষেপে কথিত হইল। ভারতে প্রত্যেক বালিকাকে সাবিত্রীর ন্যায় সতী হইতে শিক্ষা দেওয়া থাকে, মৃত্যুও যাঁহার প্রেমের নিকট প্রভু হয় নাই, যিনি ঐকান্তিক প্রেমবলে এমন কি যমরাজের নিকট হইতেও নিজ স্বামীর আত্মাকে ফিরাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ওঙ্কারনাথে শঙ্কর।

দেখিতে দেখিতে ওঙ্কারনাথে শঙ্করের দ্বিতীয় বৎসরও অতীত হইল। যোগী শঙ্কর অনন্যমনে গুরূপদিষ্ট রাজযোগসাধনে নিরত। তিনি এখন ইহাতেই অপার আনন্দ লাভ করেন, একবার ধ্যানে বসিলেই সমাধিস্থ হইয়া যান এবং সমাধিতে বসিলে আর উঠিতে চাহেন না, আহারনিদ্রার আর প্রয়োজন হয় না, শরীর থাকিবে কি যাইবে সেদিকে দৃষ্টি নাই। গোবিন্দপাদের আদেশে শিষ্যগণ যখন তাঁহার সংজ্ঞাসম্পাদন করেন, তখনই তিনি সমাধি হইতে উত্থিত হয়েন নচেৎ তাঁহার সমাধি আর ভাঙ্গে না। সমাধিস্থ হইয়া থাকাই যেন তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আহা! তাহা না হইবেই বা কেন, যাহা লাভ করিবার জন্য কিশোর বয়সেই তিনি কতদূর হইতে কত কষ্ট করিয়া আসিয়া গোবিন্দপাদের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা পাইবেন বলিয়া আত্মীয় স্বজন এবং বৃদ্ধা জননীর স্নেহবন্ধন শিথিল করিয়াছেন, যাহার জন্য ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সেই অভীষ্ট তিনি আজ যাহার সাহায্যে পাইয়াছেন, তাহার প্রতি তিনি কি আর উপেক্ষা করিতে পারেন। এখন শঙ্কর আত্মতৃপ্ত, এখন শঙ্কর আত্মরতি। তাঁহার অবস্থা যেন সেই গীতোক্ত ভগবদ্‌বচনের দৃষ্টান্তস্থল, যথাঃ—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ গীতা ৩অঃ ১৭ শ্লোক।

অর্থাৎ যে মানব আত্মরতি, যে আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাহার কার্য্য আর কিছুই নাই।

গুরু গোবিন্দপাদ দেখিলেন যে তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে যে বীজ রোপণ করিয়াছেন তাহা এখন বিশাল অমৃতপাদপে পরিণত হইয়া ফলদানোন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু এ অমৃতপাদপের ফল যদি মানবকুল উপভোগ করিতে না পারিল, যদি ইহা দুর্গম ওঙ্কারনাথের গুহামধ্যে অবস্থিত থাকিয়া কালগর্ভে মিলাইয়া যাইল, তাহা হইলে আর হইল কি? গুরু গৌড়পাদ যে জন্য আমায় এতদিন দেহরক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন তাহা আর সফল হইল কই? গোবিন্দপাদ যদিও এই চিন্তায় আকুল তথাপি শঙ্করের এই অবস্থা দেখিয়া তিনি যারপরনাই সুখী, এমন কি মধ্যে মধ্যে তিনি অপর শিষ্যদিগকে বলিয়া ফেলিতেন

"দেখ আমি ধন্য, যেহেতু আমি শঙ্করের মত শিষ্য পাইয়াছি। যেজন্য আমার এত দিন দেহরক্ষা, তাহা এতদিনে সিদ্ধ হইল, এতদিনে সম্প্রদায়লব্ধ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রদানের উপযুক্ত পাত্র পাইলাম।"

ক্রমে বর্ষা শেষ হইল। এমন সময় ওঙ্কারনাথের প্রাকৃতিক শোভা বড় মনোরম। এক দিকে হরিদ্বর্ণ নব নব মুকুলে সজ্জিত পাদপকুল নিজ শোভা বিস্তার করিতেছে, অপর দিকে ওঙ্কারনাথকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিতা নর্ম্মদাদেবীর স্ফীতবক্ষে নাতিচঞ্চল প্রবাহ, ওঙ্কারনাথের চারিদিকে তুঙ্গ-গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে চন্দ্রসূর্য্যের সহিত বিচিত্রবর্ণ মেঘমালার ক্রীড়াকৌতুক, যেন ওঙ্কারনাথবাসীকে কৈলাসবাসের আনন্দ প্রদান করিতেছিল।

এই সময় একদিন প্রায় মধ্য রাত্রে গোবিন্দপাদ নিজ গুহার নিকটবর্ত্তী নর্ম্মদাতীরস্থ একটি বিশাল শিলার উপরে বসিয়া আছেন এবং যোগী শঙ্কর তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। এমন সময় গোবিন্দপাদ শঙ্করকে বলিতে লাগিলেন "বৎস। তুমি এতদিন এখানে সাধন করিলে এখন তুমি কিরূপ বুঝিতেছ, তোমার কিছু আর কি জিজ্ঞাসা করিবার বা জানিবার আছে?"

শঙ্কর গোবিন্দপাদের মুখে এভাবের কথা কখন শুনেন নাই। ইতিপূর্ব্বে গোবিন্দপাদ উপদেশ দিতেন এবং তিনি তদনুসারে সাধন করিতেন। অপ-রাপর কার্য্যের মধ্যে গুরুসেবাই তাঁহার মুখ্য কর্ত্তব্য ছিল। গুরুদেবের সহিত এভাবে কখন কথাবার্ত্তা হইত না, কারণ যোগিজনোচিত মিতভাষিতা উভয়কেই অধিকার করিয়া থাকিত।

এক্ষণে গোবিন্দপাদের প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্কর বুঝিলেন, তাঁহার গুরুদেব সম্ভবতঃ তাঁহাকে কিছু নূতন তত্ত্ব উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তিনি তখন একটু মৌন থাকিয়া কিছু পরে বলিলেন "ভগবন্। আপনার কৃপায় আমার জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই নাই, তবে যখন আপনি স্বয়ংই সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন তাহা আপনিই অবগত আছেন, দয়া করিয়া আপনিই বলুন এদাসকে আর কি করিতে হইবে? আমি আর আমার বিষয় কিছু ভাবিতে পারি না, আমার যাহা কিছু তাহা বহুদিনই আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছি, আপনি যে ভাবে পরিচালিত করিতেছেন সেই ভাবেই চলিতেছি।"

গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করের বিনয় এবং আত্মসমর্পণসূচক বাক্য শুনিয়া নিতান্তই প্রীত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন "দেখ বৎস। তুমি তোমার অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছ। তোমার আর

ভ্রান্তি বা বিপথগমন সম্ভাবনা নাই, তুমি এখন নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পার। কিন্তু তথাপি আমি তোমায় এইবার জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, এই জ্ঞানযোগ যোগীশ্বরেরও শিরোভূষণ, ইহাতে বিচারদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ঘটে। তুমি এখন রাজযোগের পদ্ধতি অনুসারে সমাধি দ্বারা যে ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া থাক, এই জ্ঞানযোগে বিচার দ্বারা তাহাই লাভ হয়। দেখ বৎস! ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইহাই একমাত্র পথ, সাধারণতঃ লোকের চিত্ত মলিন থাকে বলিয়া বিচার দ্বারা লোকের মনে ব্রহ্মজ্ঞান বদ্ধমূল হয় না। আর সেই জন্যই ব্যক্তি বিশেষে রাজযোগ, ব্যক্তিবিশেষে হটযোগ এবং কাহার বা উভয়ই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এগুলি সবই কৌশল। এই সকল কৌশলে চিত্তমল বিদূরিত হইলে বিচারজন্য ব্রহ্মজ্ঞান বিকশিত ও স্থির হয়। নচেৎ বেদান্ত বা গুরুমুখে ব্রহ্মকথা শ্রবণের পর বিচার সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভই স্বাভাবিক পথ। তুমি ত জান, লোকে যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, তাহা তাহারা স্বভাববশে বিচার দ্বারাই করিয়া থাকে। তৃণকণা হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যে কোনও বস্তুরই জ্ঞান আমরা লাভ করি তাহাতেই বিচার আছে। কোনও একটা কিছুকে "এটা এই" "এটা এই নহে" বলিয়া বুঝিতে গেলেই বিচার প্রয়োজন হয়, বিচারব্যতীত নির্ণয় হয় না, আর নির্ণয়ব্যতীত মনুষ্যত্ব সম্ভব নহে। এই জন্য জ্ঞানযোগই সকলের স্বাভাবিক পথ। ইহাতে সিদ্ধ হইলে যোগীগণ ব্যবহার ক্ষেত্রেও ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া অপরকেও সেই সুখে সুখী করিতে পারেন। ইহাতে সাধককে কেবল সমাধিতে থাকিতে হয় না। তুমি বৎস এইবার এইপথের পথিক হও এবং জগতের শোকতাপাতুর জনগণের দুঃখ দূর কর।"

গুরুদেবের কথা শুনিতে শুনিতে শঙ্করের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিতে লাগিল, প্রশান্ত মহাসাগর চন্দ্রকিরণে যেন ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি এখন শ্রবণোন্মুখ হইয়া গুরুদেবের মুখকমল প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্করকে শ্রবণোৎসুক দেখিয়া গোবিন্দপাদ বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত, তুমি প্রথমদিনেই যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছ এবং এত দিন যে ভাবে জীবন যাপন করিলে, তাহাতে তোমার জানিবার কিছুই অবশিষ্ট নাই তাহা আমি বুঝিয়াছি, কিন্তু দেখ বৎস, তথাপি গুরুমুখ হইতে বিদ্যালব্ধ না হইলে তাহা তাহার সম্পূর্ণ অভিলষিত ফল প্রদান করিতে পারে না; এজন্য বৎস এখন হইতে তুমি আমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের আকর প্রধান

কয়েক খানি বেদান্ত ও ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রখানি আলোচনা কর এবং জ্ঞানযোগ বা বিচারমার্গের মূলসূত্র কয়টী অবগত হও। দেখিবে ব্যাসদেবের অভিপ্রেত অদ্বৈতমতানুকূল ব্যাখ্যা কি এক অপূর্ব্ব জিনিষ এবং বিচারমার্গের মূলসূত্রানুসারে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে ব্রহ্মলাভের ইহা কি সুখপ্রদ সহজ পথ। এই মূলসূত্রের কথা আর তোমায় কি বলিব, তুমি সকলই বিদিত আছ, তথাপি বৎস তুমি বেদান্তসম্মত অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায়ের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবে, সত্য বুঝিবার যেমন চেষ্টা করিবে, অসত্য বা মিথ্যা বুঝিবারও তদ্রূপ চেষ্টা করিবে, যথার্থ জ্ঞানের স্বরূপনির্ণয়ে যেমন যত্নবান হইবে, ভ্রম জ্ঞানের স্বরূপনির্ণয়েও তদ্রূপ যত্নবান হইবে। অনেক বিচারপরায়ণ ব্যক্তি এই উভয় দিকে সমান দৃষ্টি রাখেন না এবং তাহার ফলে তাঁহাদের বিপথগমন ঘটে। তুমি বৎস এই উভয় দিকেই সমান দৃষ্টি রাখ,—বৎস বিচারমার্গের ইহাই মূলসূত্র। তোমার লক্ষ্য এদিকে পতিত হউক ইহাই আমার ইচ্ছা। এইরূপ বেদান্তের অদ্বৈতপর ব্যাখ্যার কথা কিছু বলি শুন। এই ব্যাখ্যা ব্রহ্মসূত্ররচয়িতা স্বয়ং ব্যাসদেব নিজপুত্র ও শিষ্য শুকদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং শুক হইতে শিষ্যপরম্পরায় আমি অবগত হইয়াছি। বৌদ্ধ প্রভৃতি বেদনিন্দুক দার্শনিকগণ ইহারই ছায়া অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মত প্রচার করিয়া আসিতেছেন, এজন্য বেদানুরাগী অনেকে এই মতকে তাহাদের মতেরই ছায়া ভাবিয়া ইহা বেদোক্ত মত কিনা তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া থাকেন। তুমি এই ব্যাখ্যা যথাযথ গ্রহণ করিয়া জগতে প্রচার করিও, দেখিবে অনেকে আদরে ইহাকে গ্রহণ করিবে।

দেখ বৎস! এমতটী সাধারণে সহজে বুঝিতে পারে না, এজন্য ইহা এত দিন আমাদিগের আচার্য্যগণ কেবল জিতেন্দ্রিয় বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর ইহা সে ভাবে আবদ্ধ রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে সাধারণ লোকেরও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, নির্ম্মল সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃত বেদান্তসম্মত অদ্বৈত-তত্ত্ব না জানিতে পারায় তাহারা অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা বেদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া, বুদ্ধদেবের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছে। বুদ্ধবাক্য তাহাদের নিকট বেদের আসন লাভ করিয়াছে, ইহা কিন্তু বুদ্ধদেবেরও অভিপ্রেত ছিল না, কারণ তাহা হইলে তিনিই তাঁহার নিজবাক্য

রক্ষার জন্য যত্নবান হইতেন। দেখ না কেন বুদ্ধবাক্য যথারীতি সংরক্ষিত না হওয়ায় আজ তাঁহার মতের কি ভীষণ পরিণাম। নাস্তিকতাও বীভৎস আকার যেন জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এজন্য বৎস তুমি আমার নিকট সেই অদ্বৈতবিদ্যা গ্রহণ করিয়া প্রচার কর, দেখিবে বৈদিক, অবৈদিক, জ্ঞানী, কর্ম্মী, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, সকল সম্প্রদায়েরই চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইবে।"

গোবিন্দপাদের কথা শুনিয়া শঙ্কর ভক্তি ও আনন্দে আপ্লুত হইলেন। তিনি তখন ধীরভাবে বিনয়নম্রবচনে গোবিন্দপাদকে বলিলেন, "ভগবন্ আপনার কৃপায় আমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই, তথাপি আপনার আদেশ আমার সর্ব্বথা শিরোধার্য্য। ভগবন্ আপনার দর্শনলাভের পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে আমার মনে এইরূপ বাসনার উদয় হইত, মনে হইত সেই সত্যের সত্য পরম সত্যকে জানিয়া জনসাধারণের গোচর করি, লোকে অনন্তভাবের আকর সেই ব্রহ্মবস্তুকে সংকীর্ণ ভাবে ভাবিয়া কেন প্রবঞ্চিত হয়। কিন্তু আপনার আশ্রয় পাইয়া তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আজ আপনি স্বয়ংই সেই আদেশ করিতেছেন, আপনার কৃপায় আমার অজ্ঞাবস্থার কোন বাসনাই অপূর্ণ রহিল না।"

শঙ্কর ও গোবিন্দপাদের এইরূপ কথোপকথনের পর শঙ্কর যথারীতি গোবিন্দপাদের নিকট বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত শিষ্য, সুতরাং অধ্যয়নও তদুপযুক্ত। গুরুশিষ্য উভয়েরই সমুদায় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ, গুরু গোবিন্দপাদ উপনিষদের আবৃত্তি করেন এবং শঙ্করকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে বলেন, অত্যদ্ভুত প্রতিভাশালী শঙ্কর স্থলবিশেষে এত রকমে উহার ব্যাখ্যা করেন যে গোবিন্দপাদ ইহাতে বড়ই আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি কখন কখন হাস্য করিতে করিতে বলিয়া উঠিতেন, বৎস। আমি তোমায় শিখাইব, না, তুমি আমায় শিখাইবে? পরন্তু শঙ্করের অপ্রতিভ ভাবই তাঁহার এ কথার উত্তর প্রদান করিত। গোবিন্দপাদ যে স্থলে দেখিতেন কিছু বলিবার আছে, সেই স্থলেই তিনি শঙ্করকে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাটী বলিয়া দিতেন। এইভাবে দিন নাই, রাত নাই, গুরুশিষ্যের অপূর্ব্ব আলাপ চলিতে লাগিল, কোথা দিয়া যেন এক বৎসর কাটিয়া গেল।

এইরূপে গোবিন্দপাদের ব্যাখ্যা যতই শঙ্কর অবগত হইলেন ততই তিনি দেখিতে লাগিলেন গুরু গোবিন্দপাদ, কি বেদান্ত, কি ব্রহ্মসূত্রে বহুস্থলেই

বৃত্তিকারের মত পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব পরম হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছেন। শঙ্কর গোবিন্দপাদের কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতে পারিলেন, দেখিলেন এক অদ্বৈতবাদ ব্যতীত যুক্তিসঙ্গত অথচ সকল অধিকারের অবিরোধী সার্ব্বভৌম মত জগতে সম্ভব নহে। যত দেবদেবী-উপাসক, যত সগুণ ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাবের উপাসক, সকলেই নিজ নিজ পথে থাকিয়া অদ্বৈত সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে স্বাভিলষিত ভোগ লাভ করিতে পারে এবং ভোগান্তে পরমনিঃশ্রেয়স লাভে সমর্থ হয়। অদ্বৈত-তত্ত্ব-স্বরূপের লাভ ব্যতিরেকে সকল লাভেই আপেক্ষিক সুখ বা আপেক্ষিক আনন্দ। যাহা সুখস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ তাহা এক অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই লাভ হইতে পারে না। রাজযোগাদি অভ্যাসে যাহা শঙ্কর সমাধিসাহায্যে অনুভব করিয়াছিলেন. আজ জ্ঞানযোগেও তাহা বিচারসাহায্যে অনুভব করিতে লাগিলেন। এখন তিনি জগৎপ্রপঞ্চ যাহা দেখেন তাহা আর জগৎ দেখেন না, তাহা এখন কেবল ব্রহ্মই দেখেন। পূর্ব্বে যেমন জগৎকে জগৎ বলিয়া বুঝিবার পর ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইত, এখন আর তাহা হয় না, এখন প্রথমে ব্রহ্মবোধ হয় পরে অবস্থানুসারে জগৎবোধ স্ফূর্ত্তি পায়। এ যেন আর একপথে আর এক রকমে সেই একই বস্তুর অনুভব। রাজযোগে তিনি 'সকলই ব্রহ্ম' এই উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু এই জ্ঞানযোগদ্বারা তিনি তাহার হেতুটী পর্য্যন্ত সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার হৃদয় হইতে সংশয়ের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইল। পূর্ব্বে যে শঙ্কর কথায় কথায় সমাধিস্থ হইবার চেষ্টা করিতেন, বহির্ম্মুখ বৃত্তি যাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না এখন তিনি সমাধিকে পর্য্যন্ত চিত্তবিকার ভাবেন, এখন যেন শঙ্কর একটী আনন্দঘনমূর্ত্তি, এখন তিনি :—

উদাসীনবদাসীনমসক্তং সর্ব্বকর্ম্মসু,

অর্থাৎ উদাসীনের ন্যায় সকল কর্ম্মেতেই অনাসক্ত। এখন তিনি :—

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্খতি।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুই তিনি দ্বেষ বা কামনা করেন না।

অথবা এখন শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্কর। এইরূপে বৎসরান্তে শঙ্করের প্রধান কয়েকখানি উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন শেষ হইল। গোবিন্দপাদের নিকট ব্যাসের অভিপ্রেত অদ্বৈততত্ত্ব শঙ্কর অবগত হইলেন।

গুরুগোবিন্দপাদ শঙ্করের অধ্যয়ন সমাপ্তি এবং এইরূপ ভাব দেখিয়া মনে

মনে বড়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। তিনি একাদিন কথায় কথায় বলিলেন, "বৎস শঙ্কর তোমার মুখে তোমার সিদ্ধান্ত আমার একবার শুনিতে ইচ্ছা হয়। তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছ, বল দেখি তুমি কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ?"

আচার্য্য শঙ্কর গুরুদেবের কথায় যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন। তৎপরে তিনি ক্ষণকাল গুরুদেবের মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া যেন সহসা একটু গম্ভীর হইলেন এবং ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন :—

ন ভূমির্ন তোয়ং ন তেজো ন বায়ু র্ন খং নেন্দ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ।
অনৈকান্তিকত্বাৎ সুষুপ্ত্যেকসিদ্ধ স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ১

"ভগবন! আমি ভূমি নহি, জল নহি, তেজ নহি, বায়ু নহি, আকাশ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, অথবা তাহাদের সমষ্টিও নহি। অনৈকান্তিকতাপ্রযুক্ত এক সুষুপ্তিদ্বারা সিদ্ধ সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিবস্বরূপই আমি। ১ (শিবস্বরূপ সদ্বস্তটী কখন স্বয়ং আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না, "ঘট আছে" "পট আছে" ইত্যাদি যাবৎ বস্তুর সঙ্গে উহার প্রতীতি হয়, এজন্য যদি মনে হয় উহা নিজে কোন বস্তু নহে, পরন্তু যাবৎ বস্তুরহ ধর্ম্মবিশেষ, অর্থাৎ একান্তন নহে), সেই জন্য বলা হইল—ইহা এক সুষুপ্তির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এ সময় কিছুই থাকে না কিন্তু কেবলই সদ্বস্তুই থাকে। এজন্য সদ্বস্তুই সমুদায়ের কারণ ও নিত্য।" *

ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মা ন মে ধারণাধ্যানযোগাদয়োঽপি।
অনাত্মাশ্রয়োঽহং মমাধ্যাসহানাৎ তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ২

আমার বর্ণ নাই, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই, আমার ধারণা ধ্যান বা যোগাদি কিছুই নাই, আমি অনাত্মার আশ্রয়, আমাতে অধ্যাস নষ্ট হইলে সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিববস্তুই থাকে, আর আমিই তাহা। ২ (এতদ্বারা বলা হইল যে মুক্তাবস্থাই আত্মার স্বাভাবিক, উপায়বিশেষদ্বারা সে অবস্থা সম্পাদ্য নহে, উহা জ্ঞান হইলেই প্রকাশ পায়।)

ন মাতা ন পিতা বা ন দেবা ন লোকা ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ব্রুবন্তি।
সুষুপ্তৌ নিরস্তাতি শূন্যাত্মকত্বাৎ তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৩

আমার পিতা নাই, মাতা নাই, আমার নিকট দেবতা নাই, লোকসমূহ নাই,

* শ্লোকগুলির বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সুবিধার জন্য সংগৃহীত হইল, সংস্কৃত নহে।

বেদচার বা তীর্থ কিছুই নহি। সুষুপ্তিতে অতিশূন্যাত্মক ভাব পর্য্যন্ত নিরস্ত হইয়া থাকে বলিয়া যে এক অবশিষ্ট কেবল শিবস্বরূপ পদার্থ থাকে তাহাই আমি। ৩ (এতদ্দারা মুক্তপুরুষ সুতরাং শঙ্কর নিজেও যে সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে অতীত এবং আত্মপদার্থ যে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষ তাহাই বলা হইল।)

ন সাঙ্খ্যং ন শৈবং ন তৎ পাঞ্চরাত্রং ন জৈনং ন মীমাংসকাদের্ম্মতং বা।
বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাৎ তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৪

সাংখ্য, শৈব, পাঞ্চরাত্র, জৈন এবং মীমাংসকাদি যাবং মতবাদীর কোন মতই আমার মত নহে, বিশেষ অনুভূতি দ্বারা আমি বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি হওয়ায় সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিববস্তুই আমি। ৪ (ইহাতে শঙ্করের আত্মসাক্ষাৎ করা হইয়াছিল বুঝা যায় এবং তজ্জন্য মুক্ত হইতে গেলে অপরোক্ষানুভূতি প্রয়োজন ইহাই বলা হইল।)

ন শুক্লং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পীতং ন পীনং ন কুব্জং ন হ্রস্বং ন দীর্ঘম্।
অরূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাৎ তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৫

আমি শুক্ল নহি, কৃষ্ণ নহি, রক্ত নহি, পীত নহি, পীন নহি, কুব্জ নহি, হ্রস্ব নহি, দীর্ঘ নহি; আমি অরূপ অথচ জ্যোতি পদার্থের ন্যায় বলিয়া সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিবস্বরূপ। ৫ (ইহাতে আত্মোপলব্ধিকালে যে সকল তত্ত্ব আত্মার ন্যায় প্রতিভাত হয় সেই সকলের সহিত আত্মভাবের বৈলক্ষণ্য জ্ঞাপন করা হইল।)

ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্নকো বা সুষুপ্তির্ন বিশ্বো ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকো বা।
অবিদ্যাত্মকত্বাত্ত্রয়াণাং তুরীয়স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৬

আমার যে অবস্থা তাহা জাগ্রত নহে, স্বপ্ন নহে, সুষুপ্তি নহে, সুতরাং আমি বিশ্ব, তৈজস বা প্রাজ্ঞ পদবাচ্য নহি। এই সকল অবিদ্যাত্মক বলিয়া ইহাদের অতীত যে তুরীয় ভাব সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিব বস্তু স্বরূপই আমি। ৬ (ইহাতে আত্মার কালাতীত স্বরূপ কথিত হইল। আর আচার্য্য যে মাণ্ডুক্যোপনিষদ অনুসারে সাধন করিয়াছিলেন তাহারও আভাস পাওয়া যায়।)

ন শাস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ॥
স্বরূপাববোধাদ্বিকল্পাসহিষ্ণুস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৭

আমার শাসন কর্ত্তা নাই, আমার নিকট শাস্ত্র নাই, শিষ্য ভাব নাই, শিক্ষা বলিয়াও কিছুই নাই, আমার নিকট তুমি আমি নাই, এই প্রপঞ্চও নাই, আমার স্বরূপের বোধ হওয়ায় আমি সকল প্রকার বিকল্প রহিত সেই এক অবশিষ্ট, কেবলই সার বস্তুই আমি। ৭ (এতদ্বারা মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণিত হইল।)

ন চোর্দ্ধং ন চাধো ন চান্তর্ন বাহ্যং ন মধ্যং নতির্য্যঙ্ ন পূর্ব্বাপরা দিক্।
বিয়দ্ব্যাপকত্বাদখণ্ডৈকরূপস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৮

আমার উর্দ্ধ নাই, অধোদেশ নাই, অন্তর নাই, বাহ্য নাই, মধ্য নাই, তির্য্যক্ ভাব নাই, পূর্ব্বাপর দিক্ নাই, আমি আপনাকেও ব্যাপিয়া রহিয়াছি ও অখণ্ড-রূপ সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিবস্বরূপ বস্তু। ৮ (ইহাতে আত্মা যে দেশের অতীত তাহাই বলা হইল।)

অপি ব্যাপকত্বাদ্ধিতত্বাৎ প্রয়োগাৎ স্বতঃ সিদ্ধভাবাদনন্যাশ্রয়ত্বাৎ
জগত্তুচ্ছমেতৎ সমস্তং তদন্যত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৯

আমি সকলের ব্যাপক বলিয়া, আমিই হিত বলিয়া, আমিই সকল প্রকার প্রয়োগের মূল বলিয়া, আমি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া, আমিই আমার আশ্রয় বলিয়া, তদ্ভিন্ন এই সমস্ত জগৎ আমার নিকট তুচ্ছ, আমি সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিব-স্বরূপ বস্তু। ৯ (ইহাতে জীবন্মুক্ত স্বরূপের কথা বলা হইল।)

ন চৈকং তদন্যদ্দ্বিতীয়ং কুতঃ স্যা ন্ন বা কেবলত্বং ন চাকেবলত্বম্।
ন শূন্যং ন চাশূন্যমদ্বৈতকত্বাৎ কথং সর্ব্ব বেদান্তসিদ্ধং ব্রবীমি॥ ১০

সেই বস্তু এক নহে, আর তাহা হইতে দ্বিতীয়ই বা থাকিবে কি করিয়া, তাহা কেবল নহে, তাহা অকেবলও নহে, তাহা শূন্য নহে, অশূন্যও নহে, উহা অদ্বৈত বলিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত যে কি তাহা আমি কি করিয়া বলিতে পারি। ১০ (এতদ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু কেবল উপলব্ধিরই জিনিষ, হইবারই জিনিষ, উহা বলিবার বুঝাইবার জিনিষ নহে, ইহাই বলা হইল। আর ইহা বলিতে বা বুঝাইতে হইলে এই প্রকারেই বলিতে বুঝাইতে হয়, ইহাও ইঙ্গিত করা হইল।)

শঙ্করমুখ হইতে এই কয়টী শ্লোক নির্গত হইবার পর গুরুশিষ্য উভয়েই নির্ব্বাক, উভয়েই নিশ্চল স্থির ভাব ধারণ করিলেন। ক্রমে উভয়ের হৃদয়ের অনাহত ধ্বনি পর্য্যন্ত থামিয়া গেল। তখন যেন প্রকৃতি দেবী পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইলেন, নর্ম্মদার কল্লোল নাই, নৈশ সমীরণের মধুর হিল্লোল নাই। জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা সকলই বিলীন হইল, অনুভব বোধস্বরূপে পরিণত হইল। সমীপস্থ শিষ্যগণও যেন সুষুপ্ত হইল। রাত্রি এই ভাবেই শেষ হইল।

প্রভাত হইল, প্রভাতী সমীরণ অরুণকিরণসহযোগে গুরুশিষ্যের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিতে আসিল, নর্ম্মদাদেবী উচ্চ কণ্ঠে বিহগ-কুলের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু

কাহারও সংজ্ঞা নাই, অবশেষে ওঙ্কারনাথের মঙ্গল আরতি, পূজারিবৃন্দের মধুর কণ্ঠে স্তবপাঠ এবং ঘণ্টাধ্বনি তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিল।

অনন্তর গুরু শিষ্য যথারীতি নিজ নিজ গুরুচরণে প্রণিপাত করিয়া নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

ইহার পর গোবিন্দপাদের নিকট শঙ্করের আর অধ্যয়ন হইত না। এখন মধ্যে মধ্যে কেবল শাস্ত্রালাপ মাত্র হইত। উভয়েই অধিকাংশ সময় সমাধিতে থাকিতেন, কখন বা শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন

বর্ষা অতীত হইয়াছে, এখন আর নিত্য বৃষ্টি নাই,—মধ্যে মধ্যে বারিপাত হয়। তথাপি সহসা একদিন নর্ম্মদা স্ফীত হইতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল হইতে নর্ম্মদার জলস্রোত অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ সময় গোবিন্দপাদ স্বীয় গুহামধ্যে সমাধিস্থ রহিয়াছেন। সন্ন্যাসীগণ জলের গতি দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে জলস্রোত গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

শঙ্কর এতক্ষণ গুরুদেবের গুহামধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। সহসা জলকল্লোল শুনিয়া গুহাদ্বারে আসিয়া দেখিলেন প্রবল বেগে নর্ম্মদার জল গুহামুখে প্রবেশ করিতেছে। ইহা দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল এই জলপ্রবাহ গোবিন্দপাদের গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার বিপদ ঘটিতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া তিনি তখন শীঘ্র একটী মৃণ্ময় কলস লইয়া গুহামুখে সংস্থাপিত করিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় নর্ম্মদার যত জল সেই কলস মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্ফীতকায়া নর্ম্মদা যেন ক্ষণমধ্যে পূর্ব্বরূপ ধারণ করিলেন।

সন্ন্যাসীগণ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। কিছুক্ষণ তাঁহারা যেন স্বীয় চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "একি! ইনি কি মানব না দেবতা?" কিন্তু একথার উত্তর কেহই দিল না, সকলেই নির্ব্বাক।

যথাসময়ে গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি ক্ষুদ্র গুহা হইতে বহির্গত হইলেন। গুহার বাহিরে আসিয়া বহির্গুহার সর্ব্বত্র জলচিহ্ন বিদ্যমান দেখিয়া একজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! গুহাভ্যন্তর জলসিক্ত দেখিতেছি কেন? নর্ম্মদায় কি জলপ্লাবন হইয়াছিল?"

যোগীবরের কথা শুনিয়া একজন সন্ন্যাসী শঙ্করের অলৌকিক কার্য্যের কথা বলিলেন। গোবিন্দপাদ তাহা শুনিয়া যেন একটু বিস্মিত হইয়াই

ঈষৎ হাস্য করিলেন। শঙ্কর তখন গুহামধ্যে ধ্যানস্থ ছিলেন, তিনি তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া বহির্দ্দেশে আসিয়া নর্ম্মদার শোভা দেখিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে নর্ম্মদাতীরে শিলাপরি আসিয়া উপবেশন করিলেন।

রাত্রি সমাগত হইল, শিষ্যগণ নিজ নিজ নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন এবং গোবিন্দপাদকে যথাবিধি প্রণাম পূর্ব্বক ওঙ্কারনাথদর্শনে প্রস্থান করিলেন। শঙ্কর নিজ কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিতে আসিলেন, এবং গুরুদেবকে একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

শঙ্করকে উপবিষ্ট দেখিয়া গোবিন্দপাদ সুযোগ বুঝিলেন, তিনি তখন শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, "বৎস শঙ্কর! তোমায় আমি আজ এক অপূর্ব্ব কথা বলি শুন।"

"আমার পরম-গুরু গৌড়পাদ মুনির নিকট আমি এক অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়াছিলাম, আজ আমি তোমার নিকট তাহাই প্রকাশ করিতেছি। তুমি তাহা শ্রবণ কর।"

"এক সময় দেবরাজের সভায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং তেত্রিশ কোটী দেবতা সমবেত হইয়া নানা বিষয় আলোচনা করিতে থাকেন। সেই সভায় ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব উপস্থিত ছিলেন, তিনি মহেশ্বরকে প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, 'দেবাদিদেব! জগতে ক্রমেই অধর্ম্ম স্রোত প্রবল হইতেছে। বৌদ্ধদিগের অত্যাচারে বেদ এবং ব্রাহ্মণ ক্রমে জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম আর রক্ষিত হয় না, অধর্ম্মই সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতেছে, ধার্ম্মিকের জীবনরক্ষা দুষ্কর হইয়াছে। অধিক কি বলিব, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সমস্তই অবগত আছেন। কিন্তু ইহার কি প্রতীকার করিবেন না? এইরূপে কি জগৎ ধ্বংসপথেই যাইবে। হে অনাথনাথ! কৃপা করিয়া বলুন, কতদিনে জগতের এ দুর্দ্দশা দূর হইবে?' ব্যাসের কথা শুনিয়া আশুতোষ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, 'বৎস ব্যাস! যিনি ক্ষুদ্র কুম্ভ মধ্যে নর্ম্মদার জলরাশি সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহা হইতেই বেদ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা পাইবে, জগতের অত্যাচার দূরীভূত হইবে।' ব্যাসদেব বলিলেন, 'ভগবন্ এ কার্য্য কে করিতে পারিবে? ইহা সামান্য মানবের কর্ম্ম নহে। তবে আপনিই ইহা করুন, নচেৎ মানবকুলের আর উপায় কি? কতবার জগতের হিতে আপনি ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন এবারও আপনিই কৃপা করুন।'

দেবাদিদেব ব্যাসের প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, বৎস তাহাই হইবে। তোমার চিন্তা নাই, আমি শীঘ্রই ইহার প্রতীকার করিব।'

"বৎস শঙ্কর তুমিই সেই শঙ্কব। যেহেতু তুমি নর্ম্মদা স্তম্ভন কবিয়াছ। মদীয় গুরু গৌড়পাদেব অভিপ্রায় অনুসাবে তোমাব জন্য আমি এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলাম, ব্যাসের বিদ্যা তোমায় অর্পণ করিয়াছি এবং তোমাতেই ঈশ্বরবিভূতি আবির্ভূত হইয়াছে।"

এই বলিয়া গোবিন্দপাদ শঙ্করেব মস্তকে হস্তস্থাপন কবিয়া কহিলেন, "বৎস আর তোমাব এখানে থাকিবাব প্রয়োজন নাই, এইবার তুমি জগতেব কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ কর। তুমি এক্ষণে বিশ্বনাথের প্রিয়তম বাবাণসী ক্ষেত্রে গমন কর, তোমাব যথাকর্ত্তব্য অতঃপর বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরই নির্দ্ধাবণ করিয়া দিবেন। আব বৎস আমারও কর্ত্তব্যের অবসান হইয়াছে জানিও। যাঁহার জন্য গুরুদেবেব আদেশে আজ সহস্র বৎসরাবধি সমাধিতে জীবনবক্ষা করিয়া আসিয়াছি আজ সেই শঙ্কবমূর্ত্তি শঙ্করকে দেখিয়া আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। তিনি শিষ্যরূপে আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কবিয়াছেন। এইবাব বৎস আমি স্বধামে গমন কবিব। তুমি প্রভাতেই বাবাণসী অভিমুখে যাত্রা কর।"

এই বলিয়া গোবিন্দপাদ শঙ্কবেব সঙ্গে গুহামধ্যে প্রবেশ কবিলেন। ইতিপূর্ব্বে অপব সন্ন্যাসীরাও ওঙ্কারনাথ দর্শন কবিয়া ফিবিয়া আসিয়াছেন। গোবিন্দপাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমাব কার্য্য শেষ হইয়াছে, আমি এক্ষণে পবম ধামে গমন করিতেছি, আজ হইতে তোমরা এই শঙ্করাবতাব শঙ্করকেই আশ্রয় কর। ইনিই তোমাদের অভীষ্ট প্রদান করিবেন।"

অনন্তর গোবিন্দপাদ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ সমাধি অবলম্বন করিলেন। শিষ্যগণ তখন পরস্পব পরস্পরেব মুখ প্রতি চাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাহারও মুখে কোনও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। আচার্য্য শঙ্করও মৌন ভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাত্রি এই ভাবেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল গোবিন্দ-পাদের দেহ নাই, ঘটাকাশ মহাকাশে মিলাইয়া গিয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর গুরুদেবের সন্ন্যাসীজনোচিত শ্রাদ্ধ তর্পনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সশিষ্যে বারাণসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

———

শ্রীমতী—

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি-খণ্ডন।

(৩)

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আচার্য্য রামানুজের দ্বিতীয় আপত্তি জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়-বাদ-সংক্রান্ত। এই আপত্তিটীকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের "অথ" শব্দের ব্যাখ্যাকালে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহার একটী প্রধান যুক্তি পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা নামক গ্রন্থদ্বয়কে একগ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করা। আমরা আচার্য্য শঙ্করের শারীরকভাষ্য অবলম্বনে পূর্ব্ব প্রবন্ধে এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়াছি, এক্ষণে আচার্য্য রামানুজের যাহা অভিমত তাহাই আলোচ্য।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি আচার্য্য রামানুজ বৃত্তিকারমতে ভগবান্ বোধায়ন, এবং অদ্বৈতসম্প্রদায় ও শবরস্বামী প্রমুখ পূর্ব্বমীমাংসকসম্প্রদায় মতে ইনি পাণিনী মুনির গুরু ভগবান্ উপবর্ষ। যাহা হউক এক্ষণে বৃত্তিকার বোধায়নের মতে আচার্য্য রামানুজের বক্তব্য কি দেখা যাউক।

শ্রীভাষ্য। অত্রাথ শব্দ আনন্তর্য্যে ভবতি, অতঃ-শব্দো বৃত্তস্য হেতুভাবে, অধীত-সাঙ্গসশিরস্ক-বেদস্য অধিগতাল্পাস্থিরফল-কেবল-কর্ম্মজ্ঞানতয়া সংজাত-মোক্ষাভিলাসস্য অনন্ত স্থিরফল-ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হি অনন্তরভাবিনী।

এই সূত্রে "অথ" শব্দের অর্থ—আনন্তর্য্য, এবং "অতঃ" শব্দের অর্থ—পূর্ব্বাবগত বিষয়ের হেতুত্ব। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মকাণ্ডে অবগত কর্ম্মফল অনিত্য, অস্থির ইত্যাদি জ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিতির হেতু। কারণ, যে ব্যক্তি বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ শাস্ত্র পাঠে অবগত হইয়াছে যে, কেবল জ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞানরহিত) কর্ম্মের ফল অল্প, অস্থির বা ধ্বংসশীল, পক্ষান্তরে ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল অনন্ত ও অক্ষয়, নিশ্চয়ই তাহার হৃদয়ে মোক্ষলাভের অভিলাষ উপস্থিত হয়, এবং তদনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবিনী।

শ্রীভাষ্য। মীমাংসা-পূর্ব্বভাগ-জ্ঞাতস্য কর্ম্মণোঽল্পাস্থিরফলত্বাদ্ উপরিতনভাগাবসেয়স্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য অনন্তাক্ষয়ফলত্বাচ্চ পূর্ব্ববৃত্তাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরং তত এব হেতোঃ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য-মিত্যুক্তং ভবতি। তথাহ বৃত্তিকারঃ—"বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম বিবিদিষা" ইতি। বক্ষ্যতি চ কর্ম্মব্রহ্মমীমাংসয়োরৈকশাস্ত্র্যং,—"সংহিতমেতৎ শারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শ-লক্ষণেনেতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ" ইতি। অতঃ প্রতিপিপাদয়িষিতার্থভেদেন ষট্‌কভেদবদধ্যায়-ভেদবচ্চ পূর্ব্বোত্তরমীমাংসয়োর্ভেদঃ।

অর্থাৎ মীমাংসার পূর্ব্বভাগে (অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসায়) কর্ম্মফলের অল্পত্ব

ও অনিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়, এবং উত্তরভাগে (এই ব্রহ্মমীমাংসার) ব্রহ্মজ্ঞান-ফলের অনন্তত্ব ও অক্ষয়ত্ব জানা যায়। এই জ্ঞানের ফলেই প্রাথমিক কর্ম্মতত্ত্বাবগতির পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। বৃত্তিকারও পূর্ব্বসম্পন্ন কর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হয়,' এই কথা বলিয়াছেন, এবং পরেও বলিবেন যে, এই শারীরক সূত্র (অর্থাৎ ব্রহ্মমীমাংসা) জৈমিনি কৃত কর্ম্মমীমাংসার সহিত সংহিত বা সম্মিলিত হইয়া 'ষোড়শাধ্যায় পূর্ণ।' অতএব উভয়ই (কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা) এক শাস্ত্র। যেরূপ, প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রভেদ অনুসারে ষট্‌ক ও অধ্যায়ের ভেদ হইয়া থাকে, এই পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার প্রভেদও সেইরূপ।

শ্রীভাষ্য—মীমাংসাশাস্ত্রং—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ইত্যারভ্য 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ইত্যন্তং সঙ্গতিবিশেষণবিশিষ্টক্রমম্। তথাহি প্রথমং তাবৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইত্যধ্যয়নেনৈব স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যবেদাখ্যাক্ষররাশেঃ গ্রহণং বিধীয়তে।

পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মীমাংসার শেষ সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত সূত্রসমষ্টি একই মীমাংসা শাস্ত্র, সঙ্গতি বা সম্বন্ধবিশেষ অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্যাদিরূপ বিশেষ ক্রমযুক্ত মাত্র। তাহা এইরূপ—প্রথমতঃ "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" অর্থাৎ "বেদ অধ্যয়ন করিবে" এই অধ্যয়ন বিধি দ্বারা 'স্বাধ্যায়' শব্দোক্ত অক্ষরসমূহাত্মক বেদের গ্রহণ বা অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে।

শ্রীভাষ্য। তচ্চাধ্যয়নং কিংরূপম্? কথং চ কর্ত্তব্যম্? ইত্যপেক্ষায়াম্ "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়েদিত্যনেন—

"শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি। যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্॥' মনু। ইত্যাদি ব্রত-নিয়ম-বিশেষোপদেশৈশ্চাপেক্ষিতানি বিধীয়ন্তে॥

সেই অধ্যয়ন কি? এবং কি প্রকারে কর্ত্তব্য এই আকাঙ্ক্ষায় "অষ্টবর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে এবং তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে।" 'ব্রাহ্মণ শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধি উপাকর্ম্ম করিয়া সার্দ্ধপঞ্চ মাস কাল স্থির চিত্তে (নিযুক্ত ভাবে) বেদ অধ্যয়ন করিবে' ইত্যাদিরূপে ব্রত ও নিয়ম বিশেষের উপদেশ দ্বারা বেদপাঠে অপেক্ষিত বিষয় সকল বিহিত হইয়াছে।

শ্রীভাষ্য—এবং সৎসন্তানপ্রসূতসদাচারনিষ্ঠাত্মগুণোপেত বেদবিদাচার্য্যোপনীতস্য ব্রতনিয়মবিশেষযুক্তস্য আচার্য্যোচ্চারণানূচ্চারণমক্ষররাশিগ্রহণফলমধ্যয়নম্ ইত্যবগম্যতে। অধ্যয়নং চ স্বাধ্যায়সংস্কারঃ, স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য "ইতি স্বাধ্যায়স্য কর্ম্মত্বাবগমাৎ। সংস্কারো হি নাম কার্য্যান্তরযোগ্যতাকরণম্। সংস্কার্য্যত্বং চ স্বাধ্যায়স্য যুক্তম্, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপপুরুষার্থ

চতুষ্টয়তৎসাধনাববোধিত্বাৎ, জপাদিনা স্বরূপেণাপি তৎসাধনত্বাচ্চ॥ এবমধ্যয়নবিধিস্ত্রিবৎ মিমমবদ্ অক্ষররাশিগ্রহণমাত্রেপর্য্যবস্যতি। অধ্যয়নগৃহীতস্য স্বাধ্যায়স্য স্বভাবত এব প্রয়োজনবদর্থাববোধিত্বদর্শনাৎ। গৃহীতাৎ স্বাধ্যায়াদেব সামান্যেন স্বপ্রয়োজনবদর্থান্ আপাততো দৃষ্ট্বা তৎস্বরূপ প্রকার-বিশেষ নির্ণয়ফল বেদবাক্য-বিচাররূপ-মীমাংসা-শ্রবণেঽধীতবেদঃ পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে।

তত্র কর্ম্মবিধিস্বরূপে নিরূপিতে কর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বং দৃষ্ট্বা অধ্যয়নগৃহীতস্বাধ্যায়ৈকদেশোপনিষদ্বাক্যেষু চামৃতত্বরূপানন্ত স্থির ফলাপাত-প্রতীতেস্তন্নির্ণয়ফল-বেদান্তবাক্য-বিচাররূপ-শারীরকমীমাংসায়ামধিকরোতি।

এই প্রকারে জানা যায় যে সদ্বংশসম্ভূত, সদাচারপূত (অক্রোধাদি) আত্মগুণ-সম্পন্ন বেদাজ্ঞ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপনীত এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকার) বিশেষ বিশেষ ব্রত ও নিয়মসম্পন্ন ব্রহ্মচারী), শিক্ষার উদ্দেশে আচার্য্যের উচ্চারণের অনন্তর যে অক্ষর সমূহের (অর্থাৎ শব্দের) উচ্চারণ করে, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন। 'বেদ অধ্যয়ন করিবে' এই বাক্যে জানা যায় যে, বেদই অধ্যয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্ম, সুতরাং অধ্যয়ন কার্য্যটীকে বেদের একপ্রকার 'সংস্কার' (বলিতে হয়)। সংস্কার অর্থ কার্য্যবিশেষে যোগ্যতা-সম্পাদন করা। যেহেতু, বেদ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ ও তদুপায় প্রতিপাদক, এবং জপাদি (অধ্যাপনাদি) দ্বারা নিজেও চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সাধক, অতএব, উহার 'সংস্কার্য্যত্ব' বা সংস্কার হওয়াই উচিত। উক্ত যুক্তি অনুসারে বেদাধ্যয়নের বিধিটীও মন্ত্রের ন্যায় কেবল অক্ষর সমূহ গ্রহণ করা অর্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে। কারণ, অধ্যয়ন-গৃহীত বেদেরই প্রয়োজনীয় অর্থ (অর্থাৎ যজ্ঞ ও উপাসনাদি) প্রকাশ করাই স্বভাব পরিদৃষ্ট হয়।

বেদবিৎ পুরুষ অধীত বেদ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ আপাততঃ (অর্থাৎ বিচার না করিয়া) অবগত হইয়া তৎসমুদয়ের স্বরূপ ও প্রকারগত বিশেষ বিশেষ ভাব সকল নির্দ্ধারণের উদ্দেশে বেদবাক্য বিচারাত্মক মীমাংসা-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে আপনা হইতেই প্রবৃত্ত হয়। সেই কর্ম্মমীমাংসায় কর্ম্মবিধি অবগত হইয়া (যখন) জানিতে পারে যে, কর্ম্মের ফল অল্প ও অনিত্য, (তখন) সে অধীত বেদৈকদেশ উপনিষদে, অনন্ত অক্ষয় মোক্ষ-ফলের কথা সাধারণ ভাবে জানা থাকায় তৎনির্ণায়ক বেদান্তবিচারাত্মক শারীরক-মীমাংসা শাস্ত্রে অধিকারী বা প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীভাষ্য। তথাচ বেদান্তবাক্যানি কেবল-কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্মজ্ঞানস্য চাক্ষয্যফলত্বং দর্শয়ন্তি। "তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"।

দেখ, বেদান্ত বাক্য সকলও জ্ঞানরহিত ও কর্ম্মফলের ক্ষয়িত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান-ফল মোক্ষের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে। যথা,—"ইহলোকে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত লোক অর্থাৎ শস্যাদি ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেইরূপ পরলোকেও পুণ্যকর্ম্মলব্ধ লোক যথা স্বর্গাদি, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি।

যাহা হউক এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে আচার্য্য রামানুজ নিজ মত বর্ণন করিয়াছেন মাত্র, অতঃপর তিনি আচার্য্য শঙ্করের মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এক্ষণে উপরে আচার্য্য রামানুজ যাহা বলিলেন তাহার সার, বর্ত্তমান বিচারপ্রসঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন তাহা এই,—

১। উপনয়নের পর বেদাধ্যয়নের অধিকারী ব্যক্তি গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করেন।

২। এই বেদ বলিতে বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ এবং বেদাঙ্গাদি বুঝিতে হইবে।

৩। এই অধ্যয়ন অবশ্য বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়ন নহে, তবে ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গজ্ঞান বশতঃ তাহায় একটা মোটামুটি অর্থাবগতি হইতে পারে। ইহা গুরুর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিলে সম্পন্ন হয়।

৪। উক্ত বেদ পড়িবার সময়।

(ক) নানা কর্ম্মের নানাবিধ ফল,

(খ) কর্ম্মের ফল অনিত্য, অস্থির,

(গ) এবং জ্ঞানের ফল অক্ষয়, অনন্ত,

ইত্যাদি বিষয় সমূহও মোটামুটি সুতরাং অবগত হওয়া যায়।

৫। গুরুর নিকট এই বেদাধ্যয়নকালে যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও বেদমধ্যে নানাভাবে উপদিষ্ট হওয়ায় তাহার মীমাংসার জন্য কর্ম্মমীমাংসা পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মে।

৬। কর্ম্মমীমাংসায় কর্ম্মবিধি অবগত হইয়া যখন জানিতে পারে যে, কর্ম্মের ফল অল্প ও অনিত্য তখন সে, অধীত বেদাংশস্বরূপ উপনিষদে অনন্ত ও অক্ষয় মোক্ষফলের কথা সাধারণ ভাবে জানা থাকায়, তন্নির্ণায়ক বেদান্ত বিচারাত্মক ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্রে অধিকারী বা প্রবৃত্ত হয়।

৭। এজন্য কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা একই শাস্ত্র এবং একই ব্যক্তি, কর্ম্ম করিতে করিতে উক্ত ব্রহ্মবিচার করিয়া থাকে। এই কর্ম্মযুক্ত

বিচারের ফলে যখন মুক্তি হয় তখনও জীবের কর্ম্মত্যাগের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

ইহাই আচার্য্য রামানুজের নিজমত বর্ণনের সার। ইহার পর তিনি পরমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। অদ্বৈতবাদী কিন্তু নিজমত খণ্ডনের কথা শুনিয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বে আচার্য্য রামানুজের নিজমত বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে যাহা বলেন তাহা আমরা এস্থলেই পাঠকবর্গের সমীপে নিবেদন করিয়া যাই, নচেৎ পরে এ কথার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিবে।

প্রথম—আচার্য্য রামানুজ বলেন "পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র, ইহারা উভয়ে মিলিয়া একখানি গ্রন্থ। কারণ, বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে "পূর্ব্বমীমাংসায় দ্বাদশ অধ্যায় ও উত্তরমীমাংসায় চারি অধ্যায় লইয়া ইহারা একশাস্ত্র।"

অদ্বৈতবাদী বলেন ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ, উভয়ই বেদেরই মীমাংসা। বেদ অপেক্ষায় ইহারা একশাস্ত্র—ইহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া যে পূর্ব্বমীমাংসা না পড়িলে উত্তরমীমাংসা পড়া চলিবে না, অথবা পূর্ব্বমীমাংসা পড়িলেই উত্তরমীমাংসা পড়িবার অধিকার জন্মে, তাহা আমরা স্বীকার করি না।

আর যদি বলা হয় বৃত্তিকার বলিয়াছেন "পূর্ব্বসম্পন্ন কর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হয়" সুতরাং কর্ম্মজ্ঞানসাধক পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু, অগত্যা ইহারা একগ্রন্থ, তাহা হইলে বলিব যে, "হেতু" বলিয়া উহারা একগ্রন্থ হইবেই তাহার প্রমাণ কি? আমরা বলি আচার্য্য এমন কোন নিয়ম দেখাইতে পারেন না। যদি বলা হয়, বৃত্তিকারের কথাই প্রমাণ, তাহা হইলে বলিব বৃত্তিকারের ঐ কথার আমরা অন্য প্রকার সঙ্গত অর্থ করিতে পারি। অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা হইতে কর্ম্মবিধি জানিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মবলে বৈরাগ্য উদয় হয়, তখন নিত্যফল-সাধক ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয়। এস্থলে দেখা যায় বৈরাগ্যই ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছার হেতু, কর্ম্মজ্ঞান হেতু নহে। আবার এমনও ব্যক্তি আছে, যে ব্যক্তি কর্ম্মবিধি জানিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, সেই কর্ম্ম-ফলকেও অনিত্য বুঝিয়া পুনরায় সেই অনিত্য ফলই আকাঙ্ক্ষা করে। সুতরাং কর্ম্মবিধির জ্ঞান হইতে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয়, ইহা সকল স্থলে অক্ষুণ্ণ থাকিল না। এজন্য বলিতে হয় বৃত্তিকারের ঐ উক্তিটী একটী সাধারণ উক্তি মাত্র। তাহার পর "পূর্ব্বসম্পন্ন কর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর" বলায় পূর্ব্ব-

মীমাংসা অধ্যয়নের অনন্তর একথাই বা কে বলিতে পারে? আমরা বলি উহা "পূর্ব্বসম্পন্ন কর্ম্মের অনিত্যতা জ্ঞানের অনন্তর" উহা পূর্ব্বসম্পন্ন কর্ম্মের বিধিজ্ঞানের অনন্তর নহে। আর তাহা হইলে এই অনিত্যতা জ্ঞান, উপনিষৎ পাঠে অথবা যে কোন বৈরাগ্যোৎপাদক ঘটনা বশতঃ জন্মিয়াছে, সেই উপনিষৎ পাঠ বা সেই ঘটনাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কারণ হইল। কর্ম্মবিধির জ্ঞানানন্তর অনুষ্ঠিত কর্ম্মফল ভোগ হয়, তৎপরে কর্ম্মের অনিত্যতা জ্ঞান হয়—আর সেই অনিত্যতা জ্ঞান হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়—ইহাই সাধারণতঃ দেখা যায়, বৃত্তিকার এই সাধারণ ভাবটীকে লক্ষ্য করিয়াই যে ঐ কথা বলেন নাই একথার প্রমাণ কি? আচার্য্য রামানুজ তাঁহার কথা দুই এক পংক্তির অধিক বলিতে পারিতেছেন না। আর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু বলিয়া যদি পূর্ব্বমীমাংসাকে উত্তরমীমাংসার সহিত একশাস্ত্র বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, যে "হেতু" নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী না হয়, তাহা ন্যায়শাস্ত্রানুসারে প্রকৃত হেতুপদবাচ্যই হইতে পারে না। সুতরাং বৃত্তিকারের একটী সাধারণ উক্তি লইয়া তাহার অপব্যবহার করা রামানুজাচার্য্যের উচিত নহে বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয় কথা। আচার্য্য রামানুজ বলেন পূর্ব্বমীমাংসা পড়িলে কর্ম্মফলের অনিত্যতা ও অস্থিরতা অবগত হওয়া যায়। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে বলেন কথাটা ঠিক নহে। কারণ, পূর্ব্বমীমাংসাতে কর্ম্মবিধি ও বেদপ্রমাণ্য এই দুইটী বিষয় জানা যায়। কর্ম্মের ফল নিত্য কি অনিত্য ইহা উহার প্রতিপাদ্য নহে। বর্ত্তমান কালে মীমাংসাগ্রন্থ যে সকল পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে শবরভাষ্য, কুমারিলের বার্ত্তিক এবং পার্থ সারথী মিশ্রের টীকাই প্রধান ও প্রামাণিক, কিন্তু ইহা পাঠে কেহই বুঝিতে পারেন না যে, পূর্ব্বমীমাংসাতে কর্ম্মের ফল অনিত্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সম্প্রতি শবরভাষ্যের উপর অদ্বিতীয় পণ্ডিত প্রভাকরেরও বৃহতী বার্ত্তিক পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাতেও যে একথা নাই তাহা একরকম জানা গিয়াছে।

যদি বলা হয়—কর্ম্মবিশেষের ফল স্বর্গ প্রভৃতি বর্ণিত হওয়ায় প্রকারান্তরে কর্ম্মফলের অনিত্যতাই কথিত হয়, তাহা হইলে বলিব, উহাতে অনিত্যজ্ঞাপনই তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না, বরং যে উপনিষদাদিতে স্বর্গাদির নিন্দা কথিত হইয়াছে, তাহাকেই কর্ম্মফলের অনিত্যতাজ্ঞাপক শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। আর সেই স্বর্গসাধক কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইলে নিয়ত অনন্ত স্বর্গলাভের পক্ষেও কোন বাধা ঘটিতে পারে না, সুতরাং কর্ম্মফলের অনিত্যতা জ্ঞাপনের

জন্য কর্ম্মবিশেষের ফল স্বর্গ বলিলেই যথেষ্ট হয় না, স্বর্গের নিন্দাসূচক বাক্য আবশ্যক, আর তাহা পূর্ব্ব মীমাংসায় নাই।

তাহার পর আর এক কথা। যদি ইতিহাস আলোচনা করা যায়, যদি বেদশক্র বৌদ্ধ ও জৈনগণের গ্রন্থ দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বমীমাংসার মতে কর্ম্মফল যে সর্ব্বথাই অনিত্য তাহা নহে, এমন কর্ম্মও আছে যাহাতে অক্ষয় অতুলনীয় স্বর্গ লাভ হয় ইত্যাদি। বাস্তবিক ঈশ্বরনাস্তিক জৈন বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে মীমাংসক শিরোমণি কুমারিল বিচারযুদ্ধে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এমন আর কেহ হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। এখন কর্ম্মফল অনিত্য, ইহা যদি তাঁহার অবলম্বিত গ্রন্থের মত হইত, তাহা হইলে তিনি, কর্ম্মের ফল—ক্ষয়শীল স্বর্গ—এই প্রকার কর্ম্মবাদ প্রচার করিয়া বিচারপটু, সংযতেন্দ্রিয়, সূক্ষ্মদার্শনিক এবং বৈরাগ্যবান উক্ত বেদশক্রগণকে কি স্বমতে আনয়ন করিতে পারিতেন? যদি কেহ আমাদের এই অনুমানটীকে ভুল বলিয়া সন্দেহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জৈনপণ্ডিত অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দ প্রভৃতির গ্রন্থ দেখিতে অনুরোধ করি। তাহার পর আরও দেখা যায়, আচার্য্য শঙ্করের গ্রন্থ মধ্যে এবং বেদাচার্য্য ভাস্করের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য মধ্যে নিত্যকর্ম্মফলবাদী এক সম্প্রদায় পূর্ব্বকালে খুব প্রবল ছিলেন। আচ্ছা যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে তাহারা আমাদের ছয়খানি দর্শনের মধ্যে কোন্ দর্শনের সেবা করিতেন সম্ভব? উত্তরে, কর্ম্মমীমাংসাই যে তাঁহাদের উপজীব্য তাহা আর বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আচার্য্য শঙ্করের সহিত মহাকর্ম্মী মণ্ডনমিশ্রের যে বিচার হয়, তাহাতেও মণ্ডন, কর্ম্মফলের নিত্যত্বের পক্ষপাতী ছিলেন দেখা যায়। অতএব আচার্য্য রামানুজের পূর্ব্বের আচার্য্যগণ পূর্ব্বমীমাংসাকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, মীমাংসক শিরোমণিগণ মীমাংসাকে যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের কথা লইলে দেখা যায় যে, মীমাংসা পড়িলে বরং কর্ম্মের ফল একরকম নিত্য—ইহাই প্রমাণ হয়। আচার্য্য রামানুজ, মীমাংসা পড়িয়া কি করিয়া কর্ম্মফলের অনিত্যত্ব বুঝিতে চাহেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

তৃতীয় কথা।—আচার্য্য রামানুজ বলেন "কর্ম্মমীমাংসায় কর্ম্মবিধি অবগত হইয়া যখন জানিতে পারা যায়—যে কর্ম্মের ফল অল্প ও অনিত্য তখন সে, অধীত বেদৈকদেশ—উপনিষদে অনন্ত ও অক্ষয় মোক্ষফলের কথা সাধারণ ভাবে জানা থাকায়, তন্নির্ণায়ক বেদান্ত বিচারাত্মক শারীরকমীমাংসা শাস্ত্রে অধিকারী বা প্রবৃত্ত হয়।"

অদ্বৈতবাদী বলেন—কথাটা বড়ই বিচিত্র। কারণ, কর্ম্মবিধি জানিতে প্রবৃত্ত হইলে কি কর্ম্মের অনিত্যতা জ্ঞান হওয়া উচিত, অথবা বিধিরই জ্ঞান হওয়া উচিত? যাহা জানিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাই জানা হয়, ইহাই ত জগতের নিয়ম, সুতরাং এ কথার মর্ম্ম বড়ই রহস্যময়।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করি আচ্ছা পূর্ব্বমীমাংসা পড়িয়া কর্ম্মবিধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের পূর্ব্বে লোকে ত বেদ পড়িবে? আচ্ছা, তখন সেই বেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ ইহাও পড়িবে। আর তাহাতে "এই কর্ম্ম কর" ইত্যাকার বিধি যেমন অবগত হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে "কর্ম্মফল ক্ষয়শীল" "জ্ঞানের ফল নিত্য" ইহাও ত সে জানিবে। এখন এক ব্যক্তি কর্ম্মফলের অনিত্যতা বোধক উপদেশটী কি সে নিজ মনের মধ্যে চাপা দিয়া রাখিয়া, কোন্ কর্ম্মের কোন্ বিধি, ইহাই বিচার করিতে বসিবে? আর এই বিচারকার্য্য শেষ হইলে তবে সে কর্ম্মের অনিত্যতা বোধক বেদবাক্যের কথা স্মরণ করিয়া ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্ত হইবে? কথাটা কি কিছু অস্বাভাবিক হইল না?

যদি বলা হয়, অষ্টম বৎসরের বালক বেদবিধি অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াই যখন বেদাধ্যয়ন করে, এবং যখন বেদাধ্যয়নকালেও তাহাকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তখন সে ব্যক্তি বেদের কর্ম্ম করিবার উপদেশ শুনিবামাত্র উক্ত কর্ম্মের মীমাংসা পড়িতে প্রবৃত্ত হইবে, ইহাই ত স্বাভাবিক?

তাহা হইলে বলিব ঐ বালক বেদ পড়িবার অগ্রে, যে গুরুর কথা শুনিয়া উপনীত হইল সেই গুরুর নিকটই কি সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারে না? আর গুরু যখন তাহাকে এক পথে পরিচালিত করিতেছেন তখন কি সে বেদের দোহাই দিয়া গুরুকে তাঁহার আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারে? কখনই নহে। ফলতঃ ইহাই সম্ভব যে, সে ব্যক্তি ঐ বয়সেই তাহার প্রকৃতি অনুসারে যদি কর্ম্মের ফলে আসক্ত হয়, তাহার যদি ভোগবাসনা থাকে, তাহা হইলে সে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসার জন্য কর্ম্মমীমাংসা পড়িবে, আর যদি তাহার প্রকৃতি চিন্তাশীল ও বৈরাগ্যপ্রবণ হয়, তাহা হইলে গুরুপ্রদর্শিত পথে কর্ম্ম করিতে করিতে ব্রহ্মবিচারের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে সে কর্ম্মমীমাংসা না পড়িয়াও, কর্ম্মবিধি বিচার না করিয়াও, ব্রহ্মসূত্র পড়িতে থাকিবে। বালকের বেদাধ্যয়নের প্রবৃত্তি পিতামাতা ও গুরুর আদেশ হইতে হয় এবং কর্ম্ম করিবার বা ব্রহ্মবিচার করিবার প্রবৃত্তি তাহার শ্রেয় লাভের ইচ্ছা বশতঃ হয়। সুতরাং যাহার নিঃশ্রেয়স লাভের প্রবৃত্তি প্রবল হয়

সে কখনই কর্ম্মজনিত নশ্বর সুখ লাভের উপায়জ্ঞানের জন্য অভিলাষী হইতে পারে না। বালকের প্রবৃত্তি দেখিয়া গুরুই বালককে এভাবে পরিচালিত করিতে পারেন।

শেষকথা—বেদান্ত বা উপনিষৎ মধ্যেই যখন কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মের নানাবিধ ফল, ও জ্ঞানের প্রশংসা আছে, তখন তাহার ব্রহ্ম বা কর্ম্মমীমাংসায় পড়িবার প্রবৃত্তির বীজ উক্ত বেদান্ত মধ্যেই রহিয়াছে বলিতে হইবে। কর্ম্মমীমাংসার মধ্যে ব্রহ্মমীমাংসা পড়িবার ইচ্ছার বীজ থাকা কখনই সম্ভব নহে।

যাহা হউক আমরা এক্ষণে আচার্য্য রামানুজের শ্রীভাষ্যের অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের কথা কিছু আলোচনা করিব, কারণ, তিনি উক্ত ভাষ্যটী বুঝাইবার জন্য উহার টীকা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে কয়েকটী এমন কথা আছে, যাহা আমরা এখনও আলোচনা করি নাই।

আচার্য্য রামানুজ, বৃত্তিকারের মত অনুসরণ করিয়া বলেন "এই শারীরকসূত্র, জৈমিনিকৃত কর্ম্মমীমাংসার সহিত সংহিত বা সম্মিলিত হইয়া ষোড়শ অধ্যায়ে পূর্ণ, এজন্য যেরূপ প্রতিপাদ্যবিষয়ের ভেদ অনুসারে ষট্‌ক ও অধ্যায়ের ভেদ হইয়া থাকে এই পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার ভেদও সেইরূপ যথা :—

"শারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেন ইতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ।" অতঃ প্রতিপিপাদয়িষিতার্থভেদেন ষট্‌কভেদবচ্চ পূর্ব্বোত্তর মীমাংসয়োর্ভেদঃ।

এই কথাটীকে বুঝাইবার জন্য অনুবাদক ও সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই :—

"সাধারণতঃ বেদের দুইটী ভাগ, পূর্ব্বভাগ—কর্ম্মকাণ্ড, উত্তরভাগ—জ্ঞানকাণ্ড। তন্মধ্যে, জৈমিনি মুনি, পূর্ব্বভাগ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত পূর্ব্বমীমাংসা, আর মহর্ষি বেদব্যাস, উপনিষৎ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। উভয় মীমাংসা যখন একই বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশক, তখন বুঝিতে হইবে, বৈদিক মীমাংসাশাস্ত্র ফলতঃ এক, পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা তাহারই দুইটী ভাগ বা অংশমাত্র—পৃথক শাস্ত্র নহে। জৈমিনিকৃত মীমাংসাটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ভেদে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, আর বেদব্যাসকৃত মীমাংসাও চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং মিলিতভাবে মীমাংসাশাস্ত্র ষোড়শ

অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই হেতুই বৃত্তিগ্রন্থে "ষোড়শলক্ষণেন" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসায় প্রকৃতি বিচারপূর্ণ ছয় অধ্যায় লইয়া প্রথম "ষট্‌ক" ও বিকৃতি বিচারপূর্ণ শেষ ছয় অধ্যায় লইয়া দ্বিতীয় "ষট্‌ক" বিরচিত হইয়াছে। উত্তরমীমাংসায় ওরূপ ষট্‌ক ভেদ নাই, কেবল অধ্যায় ভেদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিসমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ পরিহার, তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধন নিরূপণ, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফল নিরূপণ, এইরূপে চারিটী অধ্যায় বিভক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, উত্তরমীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মবিচারও স্থান পাইয়াছে। এই কারণেও মনে হয় যে, উভয় মীমাংসাই একশাস্ত্র, কেবল কর্ম্ম ও ব্রহ্ম, এই বিষয়ভেদে দুইটী পৃথক নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।"

ইহা হইতে দেখা যায়—পূর্ব্বমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায়ে যেরূপ দুইটী ষট্‌কভেদ আছে উত্তরমীমাংসায় তাহা নাই। তন্মধ্যে প্রকৃতি বিচারপূর্ণ ছয় অধ্যায় লইয়া প্রথম ষট্‌ক ও বিকৃতি বিচারপূর্ণ শেষ ছয় অধ্যায় লইয়া দ্বিতীয় ষট্‌ক বিরচিত হইয়াছে।

এক্ষণে এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী কি বলিতে পারেন দেখা যাউক। তাঁহারা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবেন—একগ্রন্থে এরূপ অধ্যায়গত অনৈক্য হয় কেন? গ্রন্থকার যে স্থলে সমস্ত বিষয়টী ভাবিয়া গ্রন্থ লেখেন, সে স্থলে এরূপ বৈসাদৃশ্য সম্ভব নহে। যদি বলা হয়, ইহাদের গ্রন্থকারও একজন নহেন, কাজেই ওরূপ হইয়াছে, তাহা হইলে বলিব, এক বেদের উপর যখন গুরু শিষ্য দুইজনে একখানি গ্রন্থ ভাগাভাগি করিয়া লিখিতেছেন, তখন তাঁহারা নিশ্চয় দুইজনে পরামর্শ করিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। জৈমিনি ও ব্যাস উভয়ে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ ইহা সকলেই অবগত আছেন। অবশ্য এমন গ্রন্থ অনেক আছে, যাহাতে "পরিশিষ্ট" প্রভৃতি অধ্যায়, গ্রন্থ-শোভা বর্দ্ধিত করে, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গ্রন্থকার তাহা'র গ্রন্থের বিষয়টী পূর্ব্বে ভাবিয়া স্থির করিয়া লিখেন নাই, পরন্তু লিখিতে লিখিতে তাঁহাদের মতের বা মতলবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তজ্জন্য ওরূপ হইয়াছে। যদি ব্যাস জৈমিনিকে এই জাতীয় গ্রন্থকার বলিতে কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি ইঁহাদিগকে যে কিছু নিম্নতর শ্রেণীর গ্রন্থকার করিয়া ফেলিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার পর আর এক কথা, যদি ব্যাসসূত্র গ্রন্থখানি জৈমিনির গ্রন্থের পরিশিষ্ট গ্রন্থ হইত তাহা হইলে জৈমিনিসূত্রের প্রথম সূত্রটী "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"

হওয়ায় ব্যাসসূত্রের প্রথম সূত্রটী "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" না হইয়া "অথাতো পরিশিষ্ট ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ হওয়াই সঙ্গত হইত। অথবা কর্ম্মমীমাংসাব পরবর্ত্তী অধ্যায়ারম্ভে যে ভাবে সূত্র আরম্ভ হইয়াছে, সেই ভাবেই আরম্ভ হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই। সুতরাং এজন্যও উহারা একগ্রন্থ হইতে পারে না।

তাহার পর, পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন যে, "পূর্ব্বমীমাংসার ১২শ অধ্যায়েব প্রথম ষট্‌কে কর্ম্মের প্রকৃতি বিচার এবং দ্বিতীয় ষট্‌কে উহার বিকৃতি বিচার আর উত্তরমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিসমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাস্ত্রান্তরেব সহিত অবিরোধ প্রদর্শন, তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফল নিরূপণ বর্ণিত আছে। অধিকন্তু উত্তরমীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মবিচারও স্থান পাইয়াছে। এই কারণে মনে হয় যে উভয় মীমাংসাই একশাস্ত্র, কেবল কর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই বিষয়ভেদে দুইটী পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।" ইহা হইতে *দেখা যাইবে, পূর্ব্বমীমাংসার সর্ব্বত্র কর্ম্মমীমাংসা বর্ণিত হইল*, এবং উত্তরমীমাংসায় ব্রহ্মমীমাংসা বর্ণিত হইলেও ইহার তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধনরূপ কর্ম্ম এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার ফল বর্ণিত হইয়াছে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, যদি আচার্য্য রামানুজ মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে মিলিয়া মোক্ষ প্রদান করে স্থির হইল, তাহা হইলে ষোড়শ অধ্যায়ে পূর্ণ এক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে কর্ম্মের কথা লিখিয়া, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মের কথা লিখিত হইল, আবার পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে কিরূপে সেই কর্ম্মের কথা আসিল? এক্ষেত্রে কর্ম্মের কথা শেষ করিয়া জ্ঞানের কথা বলাই ত যুক্তিসঙ্গত। যদি বলা হয় ব্রহ্মজ্ঞান সাধন কর্ম্ম ও স্বর্গাদি ফল সাধক কর্ম্ম বিভিন্ন, তাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কর্ম্ম ব্রহ্মমীমাংসায় এবং স্বর্গাদি সাধন কর্ম্ম পূর্ব্বমীমাংসায় আছে, তাহা হইলে বলিব, "নিত্য" কর্ম্ম যদি মোক্ষ সাধক হয়, তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মমীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়া কেন আবার কর্ম্মমীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে পুনরায় বিচারিত হইল? ইহা ত একস্থানে বর্ণিত হইলেই ভাল হইত। তাহার পর, কর্ম্মের প্রকৃতি বিকৃতি বিচার দ্বারা ছয়টী করিয়া অধ্যায় দ্বারা যদি কর্ম্মমীমাংসা দুইভাগে বিভক্ত হইল তাহা হইলে ব্রহ্মবিচারটীও কেন ছয় অধ্যায়ে শেষ হইয়া একটী ষট্‌কের আকার ধারণ করিল না, অথবা উহা একটী মাত্র অধ্যায়েই সম্পূর্ণ হইল না। উহা চারি অধ্যায়ে কি জন্য সমাপ্ত হইল? কেবল কি তাহাই, ইহারও মধ্যে প্রথম দুই অধ্যায়ে ব্রহ্মবিচার হইয়া

শেষ দুই অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী কর্ম্মের কথা অবতারিত হইল। ইহা কখনই একখানি গ্রন্থের সাজান বলিয়া বোধ হয় না। বলা হইয়াছে, ব্রহ্মমীমাংসাতে শেষ দুই অধ্যায়ে কর্ম্মের কথা থাকায় উহা কর্ম্মমীমাংসার সহিত মিশিয়া একগ্রন্থ ইহাই প্রতিপন্ন করে। আমরা বলি এই কারণেই উহারা একগ্রন্থ নহে ইহাই প্রতিপন্ন করে। দুই গ্রন্থেই কর্ম্মের কথা থাকাই ইহাদের পৃথক গ্রন্থের বোধক। যদি ব্রহ্মমীমাংসায় কোন কর্ম্মের কথা না থাকিত, পরন্তু কেবল ব্রহ্মের কথাই থাকিত, তাহা হইলেও একদিন আচার্য্য রামানুজের এ অনুমান সম্ভবপর হইত, কিন্তু ব্রহ্মমীমাংসায় কর্ম্মের কথাও থাকায়, তাহা হইতে পারিল না।

বস্তুতঃ ব্রহ্মমীমাংসায় কর্ম্মের কথা প্রবেশ করায় ব্রহ্মমীমাংসায় ব্রহ্মবিষয়কত্ব অক্ষুন্ন থাকে না, আর এইজন্য যাঁহারা কর্ম্মমীমাংসাসম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহারা ব্রহ্মমীমাংসাকেও কর্ম্মমীমাংসার অঙ্গ বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মমীমাংসার ব্রহ্মবিষয়কত্ব স্বীকারই করেন না। একথা ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ সূত্রটী পড়িলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় এবং ইতিহাসও ইহার আভাস দিয়া থাকে।

তাহার পর, পণ্ডিত মহাশয় এই দুই গ্রন্থের একত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভাষ্যতাৎপর্য্য অবলম্বনে যথাক্রমে পাঁচটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। যথা :—

(ক) "উভয় মীমাংসারই অবলম্বন এক বেদ, বেদের মধ্যে প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড, পরে জ্ঞানকাণ্ড সন্নিবিষ্ট আছে। তদনুসারে বেদার্থ প্রকাশক মীমাংসাশাস্ত্রেও পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম ব্যবস্থিত হইয়াছে।

(খ) সাধারণতঃ প্রথমেই লোকের ধর্ম্মে ও ধর্ম্মসাধন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, পরে মোক্ষ ও তদুপায় বিষয়ে চেষ্টা জন্মে। তদনুসারে ধর্ম্মজিজ্ঞাসাত্মক কর্ম্মমীমাংসা প্রথম ও মুক্তিসাধন ব্রহ্মমীমাংসা তাহার দ্বিতীয় অংশ হইতেছে।

(গ) উপনিষদের মধ্যেও অনেক স্থলে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গাঙ্গীভাবে সমুল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে সকল কর্ম্মের কিছুমাত্র বিবরণ বা কর্ত্তব্য প্রণালী উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতেও মনে হয় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রথমেই কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিয়া যজ্ঞাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে, শেষে উপনিষদুক্ত যজ্ঞাদির তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। এই কারণেই উপনিষদে আর যজ্ঞাদির বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। ইহাদ্বারাও কর্ম্মমীমাংসার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব ও উপনিষদ ব্রহ্মমীমাংসার পরবর্ত্তিত্ব সমর্থন করা যাইতে পারে।

(ঘ) জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব নিহিত আছে,—নিষ্কামভাবে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞানোদয় হয়, সুতরাং জ্ঞান কার্য্য বা উৎপাদ্য এবং কর্ম্ম তাহার কারণ বা উৎপাদক। অতএব, কর্ম্ম প্রতিপাদক কর্ম্মমীমাংসা পূর্ব্ববর্ত্তী ও জ্ঞানপ্রতিপাদক ব্রহ্মমীমাংসা যে, পরবর্ত্তী, একথা বলা যাইতে পারে।

(ঙ) দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মমীমাংসায় যে সকল ন্যায় বা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রহ্মমীমাংসায় সে সমুদায়ের বিশেষভাবে অপেক্ষা রহিয়াছে। ব্রহ্মমীমাংসা বুঝিতে হইলে কর্ম্মমীমাংসা প্রদর্শিত সেই সকল ন্যায় বা যুক্তি জানা নিতান্ত আবশ্যক, অতএব কর্ম্মমীমাংসার পরে যে, ব্রহ্মমীমাংসা বিরচিত ও পঠনীয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

উক্ত প্রকার কারণ কলাপে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পরম্পরাপেক্ষিত একই মীমাংসা শাস্ত্র কেবল পৌর্ব্বাপর্য্যাদি ক্রমানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 'পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা' নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।"

এখন দেখা যাউক ইহাদের উত্তর কি হইতে পারে? প্রথম "বেদের মধ্যে প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড পরে জ্ঞানকাণ্ড থাকায় উহার মীমাংসাও তদ্রূপ হইবে"—একথার উত্তর এই যে, এই ভাবে এই অর্থে যদি ইহারা একশাস্ত্র হয়, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সকলকেই কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিতে হইবে, তৎপরে তাহার ব্রহ্মবিচারে অধিকার হইবে, নচেৎ নহে, ইহার কোনও নিয়ম থাকিতে পারে না। যদি বলা হয় একশাস্ত্র বলিয়া সকলকেই ইহা'র সমগ্র পড়িতে হইবে। তাহা হইলে বলিব, বেদের মধ্যে যত কর্ম্ম আছে, তাহা যেমন সকলের আজীবনের প্রয়োজন হওয়া সম্ভব নহে, তদ্রূপ বেদের সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞানও সকলের প্রয়োজন হইতে পারে না। আর কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বেদে এই দুইটী বিভাগ থাকায় যে, উহা একই ব্যক্তি একই কালে অনুষ্ঠান করিবে, ইহার অনুকূলে কোনও অবিসম্বাদিত সাক্ষাৎ বেদবাক্যও নাই। আচার্য্য শঙ্কর ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ এতন্নিমিত্ত যে শ্রুতি প্রদর্শন করেন তাহা এতদর্থে স্পষ্ট শ্রুতির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। তাঁহার উদ্ধৃত ঐ শ্রুতি এই;—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশোকেন" ইতি। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২।) অর্থাৎ সেই এই আত্মাকে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান তপস্যা ও অনাশোকের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করেন। টীকাকার

এস্থলে 'যজ্ঞেন দানেন' ইত্যাদি পদের অর্থে যজ্ঞের সহিত দানের সহিত এইরূপ অর্থ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহার দ্বারা কি এমন কথা কিছু বলা হইল যে, যজ্ঞদানাদিরূপ কর্ম্ম সহকারে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইবে নচেৎ নহে? উহাদের সহিত ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করেন এইমাত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা ব্যতীত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয় না, একথা কি বলা হইয়াছে? এস্থলে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সাধারণ ব্রাহ্মণের প্রকৃতির পরিচয়, বিহিত নহে, অথবা সকলের অনিবার্য্য প্রকৃতির পরিচয়ও নহে। অধিকন্তু যে স্থলে এই শ্রুতিটী আছে, যদি তাহার প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে বেশ বুঝা যায় যে এ শ্রুতির লক্ষ্য জ্ঞানকর্ম্মের এককালীন অনুষ্ঠানই নহে—পরন্তু ইহার লক্ষ্য সেই ব্রহ্মবস্তুর বর্ণন মাত্র। সুতরাং জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ পক্ষে ইহা প্রকৃতই অস্পষ্ট শ্রুতি, এতদ্দ্বারা আচার্য্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আরও দেখা যায়, যদি মীমাংসাদ্বয় একই গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বভাগ অগ্রে পাঠ্য, শেষ-ভাগ পশ্চাৎ পাঠ্য, ইহার জন্য গ্রন্থমধ্যে কি আবার উল্লেখের প্রয়োজন হয়? কিন্তু "অথ" শব্দের অর্থ মধ্যে এই কথাটী আছে, ইহা আচার্য্য রামানুজেরই মত তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

আর যদি বলা হয়, ব্রহ্মবিচার করিতে গেলে যে সকল আশ্রমবিহিত কর্ম্ম ব্যতীত জীবনধারণ সম্ভব নহে, (সুতরাং ব্রহ্মবিচারও সম্ভব নহে) সে সকলের মীমাংসার জন্য বা নিশ্চয় জ্ঞানের জন্য কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন আবশ্যক। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞানই ব্রহ্মবিচারের পূর্ব্বে উপার্জ্জনীয়, তাহা হইলে বলিব, আচ্ছা আমরা আশ্রমবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের জন্য কর্ম্মকাণ্ডের কিয়দংশ মাত্র না হয় পড়িলাম, সমগ্র গ্রন্থ পড়িবার আবশ্যকতা কি? অথবা বলিব, উহা আমরা আমাদের গুরুগণের নিকট হইতেই বিদিত হইয়া কার্য্য সমাধা করিব, বিচারপূর্ণ পূর্ব্বমীমাংসা সমুদায় গ্রন্থ কেন পড়িতে যাইব? কাহারো যদি পৌরোহিত্য করিবার ইচ্ছা থাকে তিনি সমুদয় গ্রন্থ পড়ুন, তিনি যাবৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান রহস্য বিদিত হউন, আমাদের আপত্তি নাই। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ প্রয়োজন, আমরা উহার আবশ্যকতা বুঝি না। আমরা উপনয়নের সময় যেমন কর্ম্মমীমাংসা না পড়িয়া গুরুর মুখের কথায় কর্ম্মবিধি অবগত হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সময়ও করিব। তাহার পর, আর এককথা, ব্রহ্মবিচার জন্য জীবন ধারণ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য

এমন উপনিষদ বা বেদান্ত গ্রন্থই আছে, যদ্দ্বারা আশ্রমবিহিত কর্ম্মের জ্ঞান হয়, কর্ম্মমীমাংসা পড়িবার আবশ্যক হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদিগকে একশাস্ত্র বলিয়া কর্ম্মমীমাংসার জ্ঞান উত্তরমীমাংসা জ্ঞানের উপকরণ একথা অস্বীকার্য্য। আবার বলি, আচার্য্য রামানুজের কথাই যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে একই গ্রন্থের শেষ ভাগ পড়িতে গেলে পূর্ব্ব ভাগ পড়িতে হয়, একথা বলিবার জন্য গ্রন্থকারকে আর কিছু বলিতে হয় না। এইবার পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর দেওয়া যাউক:—তাঁহার কথা এই যে, "সাধারণতঃ প্রথমেই লোকের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসাধন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় পরে মোক্ষ ও তদুপায় বিষয়ে চেষ্টা জন্মে, তদনুসারে ধর্ম্মজিজ্ঞাসাত্মক কর্ম্ম-মীমাংসা প্রথম, ও মুক্তিসাধন ব্রহ্মমীমাংসায় তাহার দ্বিতীয় অংশ।

উত্তর। একথা তাঁহারই কথামত 'সাধারণতঃ' সত্য, আর তজ্জন্য সর্ব্বত্র সত্য নহে। এজন্য বলি, যাহা সর্ব্বত্র সত্য, তাহাই বলুন, তাহাই আমরা শুনিতে রাজি আছি। যাহা সর্ব্বত্র সত্য নহে, আমরা তাহা আর শুনিতে চাহি না। বালক বালিকাদিগের সাধারণতঃ প্রথমে খেলিবার প্রবৃত্তি হয়, পশ্চাৎ লেখাপড়ায় প্রবৃত্তি হয়, এজন্য তাহাদের খেলা শিক্ষাদিবার গ্রন্থ ও বিদ্যাভ্যাসের গ্রন্থ কি এক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়? একটার পর সাধারণতঃ আর একটা হইলে যে, তাহারা উভয়ে সমশ্রেণী একটার নিয়ত অংশ হইতে বাধ্য, একথা ভাবপ্রবণ ভাবুকের মুখের শোভাসম্বর্দ্ধন করুক, আমাদের তজ্জন্য চিন্তা নাই।

তৃতীয় যুক্তি—উপনিষদে অনেক স্থলে যজ্ঞাদিসাহায্যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা ছান্দোগ্যে উদ্গীথের কথা, কিন্তু সে স্থলে সে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালী বর্ণিত হয় নাই, অতএব এই প্রণালীজ্ঞানের জন্য কর্ম্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী আর তজ্জন্য পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা একগ্রন্থ।

উত্তর—কথাটী তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল, কারণ যাহাকে ব্রহ্ম বিচারের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হইবে, তাহা এমন কিছু হওয়া চাই, যাহা জিজ্ঞাসু, এবং যাহা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। আচার্য্য রামানুজ কর্ম্মজ্ঞানকেই যদি ঐ স্থানীয় করিতে চাহেন, তাহা হইলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে উহা সত্ত্বেও ব্রহ্মজ্ঞানে কাহারও কাহারও ইচ্ছা হয় না। কর্ম্মজ্ঞান, বেদজ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্মবিচারের কখন কখন পূর্ব্ববৃত্ত হইতে পারে

কিন্তু সে স্থলে উহা তাহার সাধারণ বা পরম্পরায় কারণ হইবে, অসাধারণ কিম্বা সাক্ষাৎ কারণ, হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত সাধন চতুষ্টয়ই ইহার অসাধারণ কারণ, এজন্য সূত্রার্থ হইতে ইহাই জ্ঞাতব্য। কর্ম্মজ্ঞান, পরম্পরা-সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে কারণ হয়, এজন্য উহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্ববৃত্ত, বা কারণ বলা ভুল। তাহার পর আর এক কথা, আচার্য্য রামানুজ যে ভাবের দৃষ্টান্ত দিয়া কর্ম্মজ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্ববৃত্ত বলিলেন, সে দৃষ্টান্ত ত সমুদয় উপনিষদে পাওয়া যায় না, সমুদয় উপনিষদেই যজ্ঞাঙ্গের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ নাই। এমন উপনিষদ আছে যাহাতে কর্ম্মাঙ্গের নামগন্ধও নাই, একটী যেমন মাণ্ডুক্য। যজ্ঞাঙ্গের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ মধ্যমাধিকারের সুবিধার জন্য, সকলের জন্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারী সকলের জন্যই উপদেশ থাকা উচিত, ইহা কেবল এক শ্রেণীর গ্রন্থ হইলে ইহার সংকীর্ণতা প্রমাণিত করে। কিন্তু তথাপি জানা উচিত, এরূপ মধ্যম অধিকারীরও যদি ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্যতা সাধক শমদমাদি গুণ না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও ব্রহ্মবিচার নিষ্ফল। ভোগের জন্য কর্ম্ম, ভোগ-বাসনা নিবৃত্তি না হইলে ব্রহ্মবিচার সে করিবে কেন? যদি করে তাহা হইলে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনার্থ বা অর্থাগমার্থ, এই জন্য বৈরাগ্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় উপকরণ বলিতে হয়। ব্রহ্মবিচার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য যে কর্ম্ম, তাহাকে আমরা কর্ম্ম বলি না, তাহাকে আমরা জ্ঞানানুষ্ঠান মধ্যে গণ্য করি। আর কর্ম্মের এই প্রকার অর্থ প্রাচীন কর্ম্ম মীমাংসক সম্প্রদায়ের সম্মত অর্থ। সুতরাং জীবন ধারণোপযোগী ক্রিয়া এবং ধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ম্ম নহে, উহাও জ্ঞানানুষ্ঠানের মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে।

চতুর্থ—জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব নিহিত আছে, নিষ্কাম-ভাবে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞানোদয় হয়, সুতরাং জ্ঞান—কার্য্য বা উৎপাদ্য এবং কর্ম্ম তাহার কারণ বা উৎপাদক। অতএব কর্ম্মপ্রতিপাদক কর্ম্মমীমাংসা পূর্ব্ববর্ত্তী এবং জ্ঞানপ্রতিপাদক ব্রহ্মমীমাংসা যে পরবর্ত্তী একথা বলা যাইতে পারে।

উত্তর—জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব আছে, একথা বড় অস্পষ্ট, এজন্য ইহা শুনিলে প্রথমে ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে অন্যথা প্রতীত হইবে। কারণ, রামানুজ সম্প্রদায়ের মতে

কর্ম্ম বলিতে স্বর্গাদি সাধক কর্ম্ম ও মোক্ষ সাধক উপাসনা রূপ এই দুইটাই বুঝায়, আমরা কিন্তু তাহা বলি না, আমরা কর্ম্ম বলিতে স্বর্গাদি সাধক যজ্ঞ-দান-হোম প্রভৃতি বুঝি, এবং যে উপাসনা ও ধ্যানাদির দ্বারা মোক্ষ হয়, তাহাকে জ্ঞানাঙ্গ ও ক্রিয়া বলি, তাহাকে কর্ম্ম বলি না। আচার্য্য রামানুজের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত আচার্য্য শঙ্কর, তিনি ইহার এই অর্থই বুঝিতেন। প্রাচীন কথায় প্রাচীনের অর্থ বলবৎ প্রমাণ, সুতরাং ক্রিয়া অর্থে কর্ম্ম যখন জ্ঞানজনক হয়, তখন কর্ম্মজ্ঞানের পূর্ব্ববৃত্ত হইলেও জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, কর্ম্ম অর্থে স্বর্গাদি সাধক কর্ম্ম ও স্বর্গাদি সাধক যজ্ঞাদি কর্ম্মও বুঝায়। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে আর কর্ম্মপদবাচ্য করা হয় না। কারণ নিষ্কাম হইয়া ইহাদের অনুষ্ঠান প্রবৃত্তি হওয়া বড় সম্ভব নহে। অবশ্য অর্দ্ধ অনুষ্ঠান সময়ে নিষ্কামভাবের উদয় সম্ভব বটে, কিন্তু ধ্যানাদির মাত্রা যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ওসকল কার্য্য আপনা আপনিই নিবৃত্ত হয়। তাহার পর ক্রিয়ানুষ্ঠান বা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয় এবং তৎপরে জ্ঞান হয় এই কথা বলিয়া যে, তাঁহারা কর্ম্মের জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণতা দেখান, তাহাও কিরূপ কারণ তাহা এক-বার ভাবিয়া দেখা ভাল। কারণ, চিত্ত মলিন থাকিলে জ্ঞান হয় না, এজন্য চিত্ত-মল নিবারণের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম প্রয়োজন হয় সত্য, কিন্তু চিত্তশুদ্ধ হইলেই কি জ্ঞান আপনি হয়, অথবা তখন আবার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞান জন্মে? চিত্তকে দর্পণের সহিত তুলনা করা হয়, সমল দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে না, তদ্রূপ মলিন চিত্তে ব্রহ্ম প্রতিভাত হয় না। কিন্তু তাঁহারা বলুন দেখি, সমল দর্পণকে নির্ম্মল করিলেই কি অভিলষিত দ্রব্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, কিম্বা সেই নির্ম্মল দর্পণকে সেই দিকে ফিরাইলে তবে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে? চিত্তশুদ্ধি মানে কি? ইহার মানে চিত্তে রাগদ্বেষাদি না থাকা, চাঞ্চল্য আয়ত্তাধিন হওয়া ইত্যাদি। ইহার মানে ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া বা অন্য কিছু নহে। এজন্য চিত্তশুদ্ধ হইলেও শ্রবণ মননাদি রূপ জ্ঞানসাধন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য জ্ঞানলাভার্থ ক্রিয়াই জ্ঞানের পূর্ব্ববৃত্ত হইতে বাধ্য, অন্য কর্ম্ম নহে। আমরা এই কর্ম্ম ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ও বেদান্ত মধ্যে পাইয়া থাকি, সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসা পড়িবার প্রয়োজন কি? তবে যদি কেহ পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়ন করেন, করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। তাহার পর নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান এবং শমদমাদি

সাধন চতুষ্টয় সাধন, ইহারা বস্তুতঃ একই জিনিষ। দেখা যায় কামনা ত্যাগ করিতে হইলেই "ইহামূত্রফলভোগবিরাগ" হইল। "নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক" না হইলে কামনা যায় না, কারণ অভিলষিত বিষয় অনিত্য জ্ঞান হইলে তাহার প্রতি কামনা স্বতই নিবৃত্ত হয়। "শমদমাদিও" কামনা ত্যাগের সহায়, কারণ ইন্দ্রিয় সুখই কামনার একটী হেতু। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্ম ও সাধনচতুষ্টয়—ইহারা বস্তুতঃ একই জিনিষ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আর এই জন্য নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ স্থাপন হয় না। তাহার পর আর একটা কথা, বলি, যাহাদের আজন্মই চিত্তশুদ্ধ তাহাদের পক্ষেও কি তাহা হইলে আচার্য্য রামানুজমতে অগ্নিহোত্রাদি এবং বিবাহাদি কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি বলা হয়, আজন্ম শুদ্ধচিত্তের দৃষ্টান্ত নাই, তাহা হইলে বলিব শুকদেব ও বামদেব তাহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং এরূপেও উভয় মীমাংসা এক গ্রন্থ ইহা প্রতিপন্ন করা দুরূহ।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করি প্রস্তাবিত যুক্তি দ্বারা আচার্য্য চাহেন কি? জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ স্থাপন, অথবা উভয় মীমাংসার একত্ব স্থাপন। যদি জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ স্থাপন জন্য উভয় মীমাংসার এক শাস্ত্রত্ব স্থাপন বাঞ্ছনীয় হয় তাহা হইলে, সমুচ্চয়বাদ সাহায্যে আর উভয় মীমাংসার এক শাস্ত্রত্ব সাধন যুক্তিসঙ্গত নহে। উপায় কখন উপেয় হইতে পারে না। সাধ্য কখন হেতু হইতে পারে না।

পঞ্চম যুক্তি—ব্রহ্মমীমাংসা পড়িতে পূর্ব্বমীমাংসার ন্যায় ও যুক্তি জানা-থাকা ভাল। কারণ, ইহা ব্রহ্মমীমাংসার অপেক্ষিত। সুতরাং উভয়ই একগ্রন্থ।

উত্তর—একথা বলিলে ন্যায় ও ব্যাকরণ জ্ঞানও ব্রহ্মমীমাংসা পড়িতে আবশ্যক হয়, সুতরাং উহারাও ব্রহ্মমীমাংসার সহিত একশাস্ত্র হইয়া যাউক। সুতরাং আচার্য্য রামানুজের এবিষয়ে এরূপ আগ্রহ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। যদি জীবন চরিতের সহিত দার্শনিক মতের সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে এস্থলে আচার্য্যদ্বয়ের জীবন আলোচনা করিলে, এরূপ মতভেদের কারণ বেশ একটা বুঝা যায়। আচার্য্য রামানুজ কর্ম্মী ভগবদ্দাস্য তাঁহার অভীষ্ট। আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানী ও যোগী ভগবানে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া যাওয়া তাঁহার লক্ষ্য। আচার্য্য রামানুজ বিবাহাদি করিয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্কর আজন্ম সন্ন্যাসী। আচার্য্য রামানুজ যত চেষ্টার ফলে যৌবনান্তে যত জ্ঞান

উপার্জ্জন করেন, আচার্য্য শঙ্কর ৭।৮ বৎসরেই তাহা অপেক্ষা অল্প চেষ্টার ফলে তাহা লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতিধর ও সমাধিমান, আচার্য্য রামানুজ শ্রুতিধর বা সমাধিমান ছিলেন না। সুতরাং এনমস্যাব মীমাংসা এদিক দিয়া একটা হইতে পারে। আচার্য্য রামানুজের যত কর্ম্ম করিয়া জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, আচার্য্য শঙ্করেরও যদি তত চেষ্টায় হইত তাহা হইলে হয়ত ইনিও কর্ম্মের সহকারিতার পক্ষপাতী হইতেন।

যাহা হউক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় আচার্য্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য যে যুক্তিকয়টী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আচার্য্যের অভিপ্রায় যেরূপ প্রকাশ করিতেছে তাহাতে মনে হয় আচার্য্যের উভয় মীমাংসাকে একশাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার আগ্রহ বৃথা। এইবার আচার্য্য তর্ক পূর্ব্বক জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদের যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাহার সঙ্গতি বিচার করিব।

ভারতের সাধনা।

(৮) শিক্ষা।

"আলোক, পূর্ণ জ্ঞানালোক, জগতে আনয়ন কর। প্রত্যেক মানুষের কাছে এই আলোক পৌঁছাইয়া দাও, যতদিন না প্রত্যেকে ভগবান্ লাভ করে, ততদিন এ কাজের সমাপ্তি নাই। দরিদ্রের নিকট এই আলোক পৌঁছাইয়া দাও, ধনীর নিকট আরো আলোক পৌঁছাইয়া দাও, কেন না তাহার পক্ষে এ আলোক আরও আবশ্যক, যে মূর্খ অজ্ঞানী তাহাকে আলোক দান কর, এবং যে বিদ্বান তাহাকেও আলোক দাও, কেন না বর্ত্তমান কালের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যর্থতা নিতান্তই সুগভীর। এই ভাবে সকলেরই নিকট জ্ঞানালোক আনয়ন কর এবং শেষ ফলাফল ভগবানের হস্তে সমর্পণ কর।" * * * "ভারতীয় জীবন ক্ষেত্রে বেদান্তের প্রয়োগ" নামক স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা।

"সত্য ও লোকাচারের মধ্যে আপোষ করিবার ভাব স্পষ্টই ঘোর কাপুরুষতার ফল। বীর হও! যারা আমার উত্তরসাধক, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। কোন মতে কোনও কারণে লেশমাত্র আপোষের ভাব থাকিবে না। পরম শ্রেষ্ঠ সত্য সমগ্র দেশে আচণ্ডালে বিতরণ কর। সম্মানের

হানি অথবা অপ্রিয় বিরোধের ভাবনায় ভীত হইওনা। শত প্রলোভনের বিপরীত আকর্ষণ জয় করিয়া যদি তুমি সত্যের সেবা করিতে পার তবে নিশ্চিত জানিও, তুমি এমন এক দিব্য তেজে পূর্ণ হইবে যে তাহার সম্মুখে, তুমি যাহা অসত্য জান তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া লোকে হটিয়া আসিবে। পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত, অবিচলিত হইয়া যদি তুমি চৌদ্দবৎসর সমান ভাবে সত্যের সেবা কর, তবে তুমি যাহা বলিবে তাহা শুনিতে ও বিশ্বাস করিতে লোক বাধ্য, তখন দেশের অশিক্ষিত সাধারণের উপর গভীর মঙ্গল বর্ষিত হইবে, তাহাদের সর্ব্ব-বন্ধন মুক্ত হইবে এবং সমগ্র দেশটী উন্নত হইবে।" কোনও প্রশ্নোত্তর সভায় স্বামীজির উক্তি।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা সমাজসংস্কারের কথা আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, যাহার মাথা নাই তাহার মাথা ব্যথার প্রসঙ্গ আসে না,—অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে প্রকৃতভাবে সমাজবদ্ধ হইতে হইবে, তারপর সমাজসংস্কারের কথা উত্থাপিত হইতে পারে। আমাদের সমাজবন্ধনের মূলসূত্র বা মূল প্রয়োজন যে পরমার্থসাধন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। এই প্রয়োজনকে সমষ্টির প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিয়া, পরমার্থের অনুশীলনে আমাদিগকে এক-যোগ হইতে হইবে। একযোগ হইবার প্ররোচক বা impulse কোথা হইতে আসিবে? উত্তর—তীব্র দায়িত্ববোধ, সনাতনধর্ম্মের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার-রূপ দায় স্বীকার করা *। এই দায়িত্ববোধ দেশের আপামরসাধারণে সঞ্চা-রিত করিবার প্রধানতম উপায়—উপযুক্ত শিক্ষাবিস্তার।

এই দায়িত্ববোধ বর্ত্তমানযুগের নূতন শিক্ষা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এক একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ঐরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ব্যষ্টির ভিতর দিয়া ঐ দায়ের পূরণ হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে সমষ্টির দ্বারাও ঐ দায় পূরণ করাইতে হইবে, সমষ্টিকেও ঐ ব্রত পালন করাইতে হইবে। সেই জন্য সমষ্টির শিক্ষার মধ্যে একটী নূতন অঙ্গ যোজনা করিতে হইবে।

যে যুগে আমাদের দেশে দুচারজন মনীষী কল্যাণের পথ নির্ণয় করিত এবং সর্ব্বসাধারণ একরূপ অন্ধভাবেই কল্যাণের পথে চালিত হইত, সে যুগ ভারত-বর্ষে চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়াছে। যে প্রাচীন ব্রহ্মণ্যশক্তি ও ক্ষত্রিয়-শক্তি দেশের লোককে কল্যাণের পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইত, তাহা

* "ভারতের সাধনা"—উদ্বোধনের বিগত ভাদ্রের সংখ্যা।

কালচক্রের আবর্ত্তনে অভিনয়মঞ্চের অন্তরালে অপনীত হইয়াছে। বেদে "বিশ্" শব্দে যে জনসাধারণকে ইঙ্গিত করা হইত, তাহারা আজও মঞ্চোপরি বিরাজমান, ঋষি ও ক্ষত্রিয়ের অর্জ্জিত সম্পদে যথাসম্ভব উত্তরাধিকারী হইয়া নানা পরিণাম ও বিপর্য্যয়ের পরে আজও তাহারা টিকিয়া আছে। যে সাধন-গঙ্গাকে শিবকল্প আর্য্য ঋষি আর্য্যসমাজে পতিত হইবার সময় মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, যে সাধন-গঙ্গাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মহাপুরুষগণ সুদৃঢ় শৈলমালার ন্যায়, বহু প্রপাত আবর্ত্ত ও ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া বৈচিত্র্যময় সুদীর্ঘ উত্তরণপথে অবতরণ করাইয়াছেন, আজ সেই সাধন-গঙ্গা গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ভারতের জনসাধারণরূপ বিশাল প্রান্তরের সমতল ভূমিকে প্লাবিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সেই পূর্ব্বাকৃতিতে আর দেখা দিবেন না, কিন্তু শৈলজাত পলির দ্বারা যেমন একটা দেশভাগ গড়িয়া উঠে, যেমন নদীর খাত নির্ম্মিত ও নির্দ্দিষ্ট হয়, যেমন জমি উর্ব্বরা ও ফলশস্যশালী হয়, তেমনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি, তাহাদের আদর্শ, তাহাদের উদ্যম, তাহাদের সিদ্ধি সনাতন সাধন-প্রবাহের সহিত প্রবাহিত হইয়া একটী অপর্ব্ব জনসমষ্টির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা সম্ভাবিত করিয়া দিয়াছে। এই সমষ্টিরূপ ভিত্তি গঠিত হইবার পর, বর্ণাশ্রম আবার নূতন আকারে নূতন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সেই ভিত্তির উপর সমুত্থিত হইবে *। অতএব সমষ্টিরূপ নূতন ভিত্তি নির্ম্মাণ করাই আমাদের পক্ষে সর্ব্ব প্রথম কার্য্য এবং এই কার্য্যে সর্ব্বপ্রধান সহায়—প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার।

ভারতীয় সনাতন লক্ষ্যসাধনরূপ ব্রত ধারণ করিয়া আমাদের দেশে যে সমষ্টি প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, তাহার নির্ম্মাণকল্পে যে শিক্ষার আবশ্যক, সে শিক্ষার নিমিত্ত কারণই বা কি এবং উপাদান কারণই বা কি, তাহাই এখন আমরা বিচার করিব। নিমিত্ত কারণ বলিতে এ স্থলে আমরা উপযুক্ত ক্ষেত্র বা আলম্বন নির্দ্দেশ করিতেছি, নিমিত্ত কারণরূপ আলোক না থাকিলে, যেমন আমাদের দর্শনকার্য্য চলে না, সেইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকিলে সমষ্টি গঠনোপযোগিনী শিক্ষার বিস্তার হয় না। প্রথমতঃ দেখা যা'ক, ঐরূপ উপযুক্ত শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে কি না, অর্থাৎ সেই শিক্ষার নিমিত্ত কারণ দেশে বিদ্যমান কিনা।

সমষ্টিগঠনমূলক শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্রনির্ম্মাণে পাশ্চাত্য জগৎ অদ্ভুত

* "ভারতের সাধনা" উদ্বোধনের বিগত ভাদ্র সংখ্যা।

পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্যের নিকট ঐ নির্ম্মাণকৌশল শিক্ষা করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর ছিল না। মনে হয়, ঐ শিক্ষা লাভ করিবার জন্যই বিধাতা পাশ্চাত্যের সহিত ভারতকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমষ্টিপ্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্ররচনাকে এককথায় Organisation of thought and activity বলে। ভাব (thought) ও শক্তির (activity) উৎস ভারতের পক্ষে সনাতন, উহাদিগকে উৎসারিত করিবার জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের সন্ধানে ও পাশ্চাত্য আদর্শের পশ্চাতে ছুটিবার আবশ্যক নাই, ছুটিলে পদে পদে প্রমাদ ও শক্তিক্ষয়, কিন্তু ভাব ও শক্তির প্রকাশ ও প্রয়োগের অভিনব প্রণালী পাশ্চাত্যের কাছে আমাদিগকে শিখিতে হইবে। যে সমস্ত কৌশলের দ্বারা বহুর ভাব ও কর্ম্মকে একটী কেন্দ্রে সংহত করিতে হয় এবং একযোগে চালাইতে বা কাজে লাগাইতে হয়, সে সমস্ত কৌশল পাশ্চাত্যের নিকট আমাদিগকে শিখিতে হইতেছে। দ্রুতগামী যান, ডাকটেলিগ্রাফ, মুদ্রাযন্ত্র, সাময়িক পত্র, সভাসমিতি প্রভৃতি সমষ্টির শক্তিসঞ্চারোপযোগী নানা কৌশলের সহিত সুপ্তপ্রায় বিশাল ভারতের চকিতদৃষ্টিকে অত্যল্পসময়ের মধ্যে, সর্ব্বত্র একভাবে ও একযোগে, সম্যকরূপে পরিচিত করিবার জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর দ্বারে বিধাতা পাশ্চাত্য রাজশক্তিকে আনয়ন করিয়াছিলেন। সমষ্টিশক্তির বিকাশ, প্রয়োগ ও সঞ্চালনের সহায়রূপে এই সমস্ত কৌশল আজ আমাদের দেশে স্বয়ং কালই প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেবল আমাদিগকে আজ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে পাশ্চাত্য রাজনীতিমূলক লক্ষ্যের আশ্রয়ে এই সমস্ত কৌশলের প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিশক্তির বিকাশ উপচয় ও উৎকর্ষ সাধন করে, তৎপরিবর্ত্তে আমাদিগকে পরমার্থমূলক লক্ষ্যের আশ্রয়ে সমষ্টিশক্তির বিকাশ, উপচয় ও উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য ঐ সমস্ত কৌশলের প্রয়োগ ও যথাযথ ব্যবহার করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ও ভারতের জীবনব্রত বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু উভয়েই সমষ্টিবদ্ধ হইয়া ব্রতপালন করিতে হইবে বলিয়া সমষ্টিবন্ধনের কৌশল এক প্রকারের। পাশ্চাত্যের ও ভারতের সমষ্টিবন্ধনের সূত্রটী সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু সমষ্টিবন্ধনের কৌশল একই, এই সূত্রটী যদি একরূপ হইত, অর্থাৎ রাজনীতিমূলক হইত, তাহা হইলে প্রথম হইতেই রাজনৈতিক বিরোধ বা সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িত, সমষ্টিবন্ধনের সূত্রটী পৃথক বলিয়া আমাদের বর্ত্তমান সাধনার মধ্যে ঐরূপ সংঘর্ষের অবসর বা প্রসঙ্গ নিহিত নাই।

সমষ্টিবন্ধনের পাশ্চাত্যবিজ্ঞানমূলক নানা কৌশলের প্রচলন, আমাদের দেশে সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষবিস্তারের একটী নিমিত্ত কারণ। এই সমস্ত কৌশলের প্রচলনে সমগ্র দেশের ভাব ও শক্তি সহজে উপযুক্ত কেন্দ্রের সাহায্য সুসংহত ও সুসম্বদ্ধ হইবার সুবিধা পাইবে, এবং ভাব ও শক্তির ঐরূপ সুসম্বদ্ধ, কেন্দ্রানুগত সঞ্চার, অর্থাৎ Organisation, পশ্চাতে বজায় থাকিলে, শিক্ষা বিস্তারকে সমষ্টিগঠনের উপযোগী করা সম্ভব হইবে।

সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের আর একটী নিমিত্ত কারণ—জ্ঞানানুশীলনে কোনরূপ একচেটিয়া বন্দোবস্ত না থাকা। এ বিষয়েও তোমার আমার মুখ না চাহিয়া কাল স্বয়ংই সর্ব্ববিধ জ্ঞানভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের নিকট উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে। বিশেষ কোনও শিক্ষা বা সাধনায় হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও সামর্থ্য থাকিতে পারে বা না থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টির সম্মুখে সর্ব্ববিধ শিক্ষা ও সাধনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখা সমষ্টি গড়িবার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। সমষ্টিকে যদি এ মর্য্যাদা না দেওয়া হয়, তবে সমষ্টিশক্তির বিকাশ বা প্রতিষ্ঠা হয় না।

প্রাচীনযুগে সমষ্টি প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রসঙ্গই উঠে নাই। যে আদর্শের অবলম্বনে সমষ্টি গড়িয়া উঠিবে, যে আদর্শের সাধনা ও রক্ষার ভার সমষ্টিকে গ্রহণ করিতে হইবে, সমগ্র ভারতক্ষেত্রে প্রাচীনযুগ নানা অবস্থার মধ্য দিয়া সেই আদর্শের সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তি করাইতেছিল। প্রাচীনযুগ আমাদের নিকট পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে ব্যক্ত করিয়াছে এবং আদর্শ স্থাপনার পীঠস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। সমষ্টি গড়িয়া দেওয়ার ভার প্রাচীনযুগ গ্রহণ করে নাই, সেইজন্য প্রাচীন যুগ যে ভাবে দেশে শিক্ষাবিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্যে সমষ্টির উপযুক্ত মর্য্যাদা স্থান পায় নাই। সে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা জ্ঞানানুশীলনে নানা রকম একচেটিয়া বন্দোবস্ত দেখিতে পাই, তবে বিস্মিত বা মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। বরং সমষ্টিশক্তির অভাবে আদর্শাভিব্যক্তি ও আদর্শরক্ষার জন্য একান্তভাবে ব্যষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করাতে, প্রাচীনযুগ জ্ঞান ও বিদ্যাকে বহুস্থলে সম্প্রদায়গত করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবী উত্তরাধিকারীদের জন্য স্বোপার্জ্জিত ধন পূর্ব্বপুরুষ যেমন কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রাখে, সেইরূপ প্রাচীন মহাপুরুষগণ আপনাদের সিদ্ধবিদ্যা অন্তরঙ্গ শিষ্যসম্প্রদায়ের নিকট গচ্ছিত রাখিতেন, সে কালে অনুগত, অন্তরঙ্গ শিষ্যবৃন্দব্যতীত সে অমূল্যরত্নের উপযুক্ত যত্ন ও সদ্ব্যবহার করিবার

অপর পাত্র সুনিশ্চিতরূপে নিরূপিত হয় নাই। সমষ্টিরূপ যে সাধারণ, সুরক্ষিত ভাণ্ডার সে সমস্ত রত্নের স্থায়ী তত্ত্বাবধান ও রক্ষণের শ্রেষ্ঠ পাত্র, তাহা সেকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল না,—প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সম্ভাবনাও ছিল না। ফলে বিদ্যা প্রাচীনকালে স্বভাবতঃই যেন সম্প্রদায়গত হইয়া পড়িত এবং ঐরূপ গণ্ডী দেওয়ার রীতি প্রচলিত থাকায়, জ্ঞানানুশীলনের নানা "একচেটে" ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিত।

আরও গোড়ার তত্ত্ব ভাবিয়া দেখিলে, কথাটা পরিষ্কার বুঝা যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি * যে দ্রষ্টা ঋষির প্রত্যক্ষলব্ধ সত্যকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় সমাজ আদিযুগে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ভারতে সামাজিক বিবর্ত্তনের মূল আশ্রয় ব্যষ্টিলব্ধ পরমার্থ জ্ঞান। জগতে অন্যত্র সমাজ বিবর্ত্তনের মূল আশ্রয়—ঐহিক বিবিধ প্রয়োজনের সাধনা, সেরূপ সাধনায় অতি সহজেই দশজনের অভিজ্ঞতা, দশজনের সমবেতচেষ্টা একজনের নেতৃত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করে। পাশ্চাত্য সমাজে সেইজন্য সমষ্টিগঠনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা অনেক পূর্ব্বযুগ হইতেই উপলব্ধ ও ব্যক্ত হইয়াছিল। অতএব সমষ্টির মর্য্যাদা বহু পূর্ব্ব হইতেই পাশ্চাত্যের সমাজে অনিবার্য্যরূপে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে সমাজবিবর্ত্তনের ধারা অন্যপ্রকার। এক্ষেত্রে মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রয়োজনের সাধনা করিতে করিতে সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। সাধারণ লোকব্যবহারের অতীত একটা অতিসূক্ষ্ম আদর্শ ভারতের বহুপ্রাচীনযুগে মানবসাধারণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তার পর যুগযুগক্রমে সেই আদর্শের ক্রমস্ফুরণ ও ক্রমসঞ্চার ঘটিয়া, ভারতীয় সমাজকে বিবর্ত্তিত করিয়া আসিয়াছে, সে ক্ষেত্রে সমাজের বহু যেন উপকরণস্থানীয়, এবং আদর্শসিদ্ধ এক এক জন বা কতিপয় মহাপুরুষ যেন নির্ম্মাতৃস্থানীয়। এরূপ সমাজের বিবর্ত্তনে আদর্শসিদ্ধ ব্যষ্টিই মুখ্য সহায়, সমষ্টির অভিজ্ঞতা সহায় নহে। যত দিন না অন্তর্নিহিত আদর্শ সমগ্র সমাজের মূলস্তরটী ব্যাপ্ত করিয়া উপযুক্ত প্রসারতা লাভ করিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত আদর্শের বিবিধ অঙ্গকে সমাজের মধ্যে নানা উপযুক্ত স্থানে গণ্ডীবদ্ধভাবে এবং সোৎকণ্ঠভাবে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। একদিকে এইরূপ সাগ্রহ সংরক্ষণের আবশ্যকতা ও অপরদিকে ক্রমসঞ্চরণের আবশ্যকতা,—এই উভয় অভিপ্রায়ের সংঘর্ষ—কখনও সামান্য আকারে এবং কখনও বা তুমুল আকারে—আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে। অতএব প্রাচীন

* "ভারতের সাধনা"—আষাঢ়ের সংখ্যা।

ইতিহাসে আমবা দুই প্রকারের লোকনেতা দেখিতে পাই,—এক রকমের নেতারা অধিকার ও পাত্রভেদ প্রভৃতির দোহাই দিয়া জ্ঞানচর্চ্চায় একচেটিয়া ব্যবস্থাব প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন, এবং আর এক রকমের নেতারা সাম্যনীতির দোহাই দিয়া সমাজের প্রচলিত গণ্ডীগুলি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। অবশ্য এমনও মহাপুরুষ নিতান্ত বিরল নহে, যাহাদের উপর বিশেষভাবে গণ্ডীরক্ষা বা গণ্ডীভঙ্গ কোন একটীর ভারই বিধাতার দ্বারা অর্পিত না হইয়া, উভয়বিধ সামাজিক অভিপ্রায়েব সামঞ্জস্যবিধানের ভারই অর্পিত হইয়াছে। যাহা হউক, আজ আমাদের নিকট এই সকল প্রকারের প্রাচীন লোকনেতাই সমান মান্য ও শ্রদ্ধার অধিকারী। আজ ইতিহাস আমাদিগকে এমন একটী স্থানে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে যে ঐ বিরুদ্ধবাদী উভয়পক্ষীয় লোকনেতাদের দ্বাবা ভারতের সনাতন সমাজ কিরূপে আপনার একই অভিপ্রায় সিদ্ধ কবিয়া লইয়াছে, তাহা আমবা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। একদিকে আদর্শের আত্মসংরক্ষণ, আর একদিকে আদর্শের আত্মপ্রসারণ, একদিকে আদর্শের শুদ্ধতা বজায় করিবার জন্য যথাযোগ্য ব্যষ্টিশক্তির স্থায়িত্ব-বিধান, অপরদিকে আদর্শের ক্রমসঞ্চার ঘটাইয়া ভবিষ্যতের জন্য সমষ্টিশক্তির বিকাশসাধন, একদিকে কেন্দ্রানুগা শক্তির লীলা, অপরদিকে কেন্দ্রাপগা শক্তিব লীলা।

আদর্শের আত্মসংরক্ষণরূপ প্রয়োজনের অঙ্গীভূত হইয়া প্রাচীন সমাজে অধিকারিবাদের প্রচুর প্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল। অধিকারিবাদের অন্তর্নিহিত সত্য এই যে যাহার সাধনসামর্থ্য যতদূর, সে ঠিক ততদূর পর্য্যন্ত সাধনতত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে। সাধনার দ্বারা সত্যের যতটুকু আয়ত্ত করা যায়, ঠিক ততটুকুর শুদ্ধতা ও মর্য্যাদা সাধকেব দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে। সত্য সাধনার বস্তু, বিচারাড়ম্বরের বিষয় নহে, অতএব যাহার সাধনসামর্থ্য নাই, কেবল বিচারবুদ্ধিতে তাহার দ্বারা সত্য গৃহীত হইলে, নানা বিকৃত মতের উদ্ভব ঘটিতে পারে। অতএব আমাদের দেশে বহুপ্রাচীন কাল হইতেই দেখা যায় যে কোনও উচ্চ তত্ত্ব বা কোনও বিদ্যা দান করিবার অগ্রে, গ্রহিতার সাধনসামর্থ্যের হিসাব করা হইত। আদর্শের অপ্রতিযোগী, প্রত্যক্ষ প্রভাবের দ্বারা যতকাল আর্য্যসমাজ অপেক্ষাকৃত অল্লায়তন হইয়াও পূর্ণ জীবনীশক্তিতে উদ্দীপ্ত ও সুস্থ ছিল, ততকাল সাধনসামর্থ্যের হিসাব করিতে যাইয়া সে প্রায়ই জন্মবংশজাতি প্রভৃতি গ্রাহ্য করে নাই, পরে যখন আপন

গৃহের চারিদিকে প্রবেশার্থী অনার্য্যের ভিড় ও কোলাহল বাড়িতে লাগিল এবং বিভিন্ন জীবনাদর্শের সংঘাত সেই গৃহের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত মুখরিত করিয়া তুলিল, তখন সশঙ্কদৃষ্টিতে অনার্য্য ও সঙ্কর জাতিদিগের লক্ষ্য করা সমাজের একটা অভ্যাস বা সংস্কারে পরিণত হইতে লাগিল এবং সনাতন আদর্শকে ও তৎসংরক্ষণমূলক অনেক সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য যেন প্রাচীর তুলিয়া নানা দুর্গের সৃষ্টি হইতে লাগিল। তারপর দুর্গরক্ষার ধুমধাম চলিতে লাগিল এবং সাধনতত্ত্ব ও বিদ্যা দান করিবার সময় সাধনসামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বংশ বা জাতির হিসাব করাও প্রচলিত নিয়মের মধ্যে গণ্য হইল,—এইরূপ স্থির হইল যে এমন কি সাধনসামর্থ্য থাকিলেও হীনজাতীয় বা অনার্য্যজাতীয় সাধনার্থীকে একজন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে, পরে সামর্থ্যানুযায়ী উচ্চ জন্ম লাভ করিয়া উচ্চাধিকাররূপ দুর্গমধ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে। এইরূপে অধিকারিবাদকে পল্লবিত করিয়া নূতন জঞ্জালের সৃষ্টি করা হইল, নচেৎ দুর্গরক্ষা হয় না। বাস্তবিক সমাজের মধ্যে সনাতন আদর্শের আসন এতদূর সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল যে যদি সমাজের বাহিরে উদারচরিত সন্ন্যাসীদের দ্বারা আদর্শের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার না চলিত, তবে সংগোপনে চেষ্টার বাড়াবাড়ির ফলে কোন যুগে ঐ ভারতীয় সনাতন আদর্শ ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

যাহা হউক, অধিকারিবাদের পশ্চাতে কেবলই ব্রাহ্মণদের স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষ না দেখিয়া প্রকৃত ইতিহাসজ্ঞ সাময়িক সামাজিক প্রয়োজনই প্রধানতঃ দেখিতে পাইবেন। সে সমস্ত সাময়িক প্রয়োজনের অস্তিত্ব বর্ত্তমান যুগে আর নাই, কারণ, আর্য্য-অনার্য্যের সে প্রাচীন ভেদ বুদ্ধাবির্ভাবের পরবর্ত্তী নানা সামাজিক পরিণামের সাহায্যে তিরোহিত হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগের হিন্দুসমাজ আপনার মধ্যে শ্রেণীগত ভেদমাত্র স্বীকার করে এবং আপনার বাহিরে যে মুসলমান বা খৃষ্টান সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহারাও প্রাচীন অনার্য্যদের মত সমাজের অঙ্গীভূত হইবার দাবী উপস্থিত করে না। * অতএব প্রাচীন অধিকারিবাদের মধ্যে যে সমস্ত জঞ্জাল জমিয়া গিয়াছে, তাহা পরিষ্কৃত করিবার সময় আসিয়াছে। কি ভাবে সে কাজ করা যাইতে পারে, তাহা পরে বলিতেছি।

* আমাদের সনাতন সমাজে সমষ্টিশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবন অতিক্রম করিয়া যে ধর্ম্মসাধনামূলক সমন্বয় গড়িয়া উঠিবে, সেই সমন্বয়ে (nation) মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ হইবে। ("ভারতের সাধনা"—আষাঢ়ের সংখ্যা)

কেহ কেহ মনে করেন যে অধিকারিবাদ জিনিষটাই অনাবশ্যকীয়, কারণ যাহা সত্য, তাহাকে সমর্থাসমর্থনির্ব্বিশেষে ব্যক্ত করায় তৎসম্বন্ধে স্থানে স্থানে বিকৃত ধারণার উদ্ভব হইলেও, আখেরে সেই সত্য আপনার প্রতিষ্ঠা আপনি করিয়া লইবেই লইবে। ইঁহারা বলেন যে যাহা সত্য, তাহা উচ্চকণ্ঠে প্রচার কর, ফলাফল চিন্তা করার দরকার নাই, কারণ সব সত্যই মানুষের হাতে বিকৃত আকার ধারণ করে, হাজার চেষ্টা করিলেও ঐরূপ বিকৃতির হাত হইতে নিস্তার নাই, কিন্তু—ঐরূপ বিকৃতির সঙ্গে সত্যের শুদ্ধপ্রকৃতির সংগ্রাম মানবসমাজে নিয়তই চলিয়াছে, কেবল যিনি সাধনদ্বারা সিদ্ধ হন, তাঁহার মধ্যেই আমরা সত্যের সেই শুদ্ধপ্রকৃতিকে জয়লাভ করিতে দেখিয়া থাকি। অতএব সত্যের স্বরূপ ও বিকারের মধ্যে যখন সংগ্রাম অনবরত চলিবেই, তখন বৃথা অধিকারিবাদের একটা গণ্ডী তুলিয়া সত্যপ্রচারের কেন ক্ষতি করি।

এরূপ মতবাদীকেও কিন্তু ইতিহাস বলিবে যে প্রাচীন আর্য্যসমাজকে এমন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল যে সত্যের প্রচারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতির হাত হইতে সত্যের স্বরূপকে রক্ষা করিবার জন্য সংকীর্ণ অধিকারিবাদকে প্রচলিত করিতে হইয়াছিল। সে অবস্থায় সত্যের বিকার ও স্বরূপের মধ্যে যে সর্ব্বকালব্যাপী সংগ্রাম চলে, সেই সংগ্রামকে স্বাভাবিক নিয়মে চলিতে না দিয়া একটা পক্ষকে, অর্থাৎ সত্যের স্বরূপকে, ক্ষতিস্বীকার করিয়াও, অর্থাৎ আত্মপ্রচাররূপ অঙ্গের হানি করিয়াও, অপর পক্ষের অর্থাৎ সত্যের বিকারসম্ভাবনার বিরুদ্ধে যুঝিতে হইয়াছিল। সত্যের স্বরূপ ও বিকারের চিরপ্রচলিত সংগ্রামকে যে অবস্থায় আপনার স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিহার করিয়া আপদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

যদি বল, বেশ কথা, সে পরবর্ত্তী যুগের সংকীর্ণ অধিকারিবাদের কথা ছাড়িয়া দাও, কিন্তু প্রশ্ন এই যে বৈদিক যুগের ঋষিরা পর্য্যন্ত অধিকারিবাদের ধুয়া তুলিলেন কেন,—একথা শাস্ত্র কেন বলিলেন যে "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং"?

"বুদ্ধিভেদ" কাহাকে বলে? আমার স্বভাব ও সামর্থ্য অনুসারে ধর্ম্ম-সাধনা সম্বন্ধে আমার কি কর্ত্তব্য তাহার একটা ধারণা, উপদেষ্টার সাহায্যেই হউক বা স্বতঃই হউক, গঠিত হইয়াছে। এইরূপ যথাসম্ভব নিশ্চয়াত্মিকা ধারণাকে বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই বুদ্ধি যদি অন্য কোনও বিপরীত ধারণার

সংঘর্ষের দ্বারা সংশয়ান্বিত ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে, তবে বুদ্ধিভেদ ঘটে। মনে কর একজন কর্ম্মসঙ্গী গৃহস্থ,—অর্থাৎ, কেবল ক্রিয়াকাণ্ডসংযোগেই যাহার আধ্যাত্মিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা হয়, এরূপ ব্যক্তি—অকস্মাৎ বেদান্তবাদীর জ্ঞানযোগমূলক ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন সাধনতত্ত্বের সন্ধান পাইল; অতঃপর সে ব্যক্তি জ্ঞানযোগের নিরালম্বভাব ও উহার শাস্ত্রীয় প্রশংসাবাদ লক্ষ্য করিয়া যদি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও উদাসীন হয়, তবে বলিতে হইবে, তাহার বুদ্ধিভেদ ঘটিয়াছে, সে "ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্টে"র পথে অগ্রসর। প্রাচীন শাস্ত্র বলেন যে ঐরূপ অনধিকারী কর্ম্মসঙ্গীর নিকট উচ্চ তত্ত্বের প্রচার করিও না, কারণ তাহার বুদ্ধিভেদ ঘটিতে পারে।

তাহা হইলে বুঝা গেল যে বুদ্ধিভেদ নিবারণার্থে অধিকারিবাদের প্রচলন হইয়াছিল। যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে ঐরূপ একটা প্রয়োজন বাস্তবিক ছিল না, উহা শাস্ত্রকারদিগের মস্তিষ্কে কল্পিতমাত্র হইয়াছিল, অথবা ঐরূপ প্রয়োজন থাকিলেও অধিকারিবাদের দ্বারা উহার নিষ্পত্তি হইতে পারে না, তবে স্বীকার করিব যে প্রাচীন অধিকারিবাদ অমূলক ও নিরর্থক, নচেৎ নহে।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে অধিকারিবাদের উদ্ভবকালে উহার মূলে যে একটা প্রয়োজন নিহিত ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে সমাজের শীর্ষে কতিপয় অসাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজনেতা অবস্থিত হইয়া বিচিত্রস্বভাব জনসমষ্টির মধ্যে আদর্শসঞ্চারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যে সমাজের শিক্ষণীয় আদর্শ নিতান্ত স্থূল দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানময় যজ্ঞ পর্য্যন্ত নানা সাধনস্তরকে সমন্বিত করিয়া আপনার মধ্যে ধারণ করে, সে সমাজে সাধারণ লোকদের মধ্যে বুদ্ধিভেদ ঘটিবার যেমন যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, তেমনি যাঁহারা সেই বুদ্ধিভেদের প্রতীকার যথাসময়ে করিতে পারেন, তাঁহারাও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উপস্থিত নহেন। সমাজ ও লোকশিক্ষা যে পরিমাণে কেন্দ্রসংহত ও সমষ্টিবদ্ধ (organised) হইলে, বুদ্ধিভেদ সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে না এবং তৎপ্রতীকারও সঙ্গে সঙ্গে বিহিত হইতে পারে, প্রাচীনযুগের আর্য্যসমাজের পক্ষে সেরূপভাবে সমষ্টিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এইজন্য বুদ্ধিভেদের সম্ভাবনা যথাসম্ভব কমাইয়া সমাজের স্থিতিকে সাহায্য করিবার জন্য, সত্যের বহুলপ্রচারকে

কতকটা ব্যাহত করিয়া সমাজের গতিকে অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত করা-ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। বাস্তবিকই সেই প্রাচীনযুগে সমাজের গতি অপেক্ষা স্থিতির দিকে লক্ষ্য অধিক রাখাই আবশ্যক ছিল, কারণ নানা ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া, নানা আদর্শের সংঘাতের ভিতর, একটা বিশেষ জীবনাদর্শের উপর সমাজ দাঁড়াইবার ও প্রতিষ্ঠালাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ সমাজের কেবল অপ্রতিহত গতিই সমাজনেতাদিগের লক্ষ্যীভূত হইতে পারে না। এইজন্য গ্রহিতার সাধনসামর্থ্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব সাবধানে সত্যের প্রচার করা বা বিদ্যাদান করাই প্রাচীন যুগের শিক্ষাদাতাগণ শ্রেয়স্কর বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহারা সমগ্র তত্ত্ব ও বিদ্যার ভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে পারেন নাই, রাখিলে সত্যের বিকৃতি সত্যের স্বরূপের বিরুদ্ধে সমাজের চতুর্দ্দিকে কেবলই এমন সংগ্রাম বাধাইয়া তুলিত, যে আর্য্যসমাজ স্থিতিলাভ করিবার সুযোগ পাইত না।

কিন্তু কালের পটপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। একমাত্র ব্যষ্টিগত সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র সেই প্রাচীন ভারত আজ অন্তর্হিত হইয়াছে, সমষ্টিগত সাধনার অভিনয়ক্ষেত্ররূপে নবীন ভারত আজ সমুত্থিত। তাই ভারতের নেতৃপুরুষ গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করিতেছেন,* "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূলভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। "বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্ব্বার সঞ্চারের জন্য, এ কথা যখন মনে থাকে না, যখন গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।"*

আদর্শের আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রসারণ—এই দ্বিবিধ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য প্রাচীনযুগের সমাজকে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভারতে যে সমষ্টি গঠিত হইবে, তাহা ঐ উভয়বিধ প্রয়োজনের একমাত্র অনুষ্ঠাতার আসন পরিগ্রহ করিবে। এই সমষ্টিশক্তির উন্মেষ অনুভূত হইয়াছে, সেইরূপ

* "বর্ত্তমান ভারত," ৩০পৃষ্ঠা।

* "বর্ত্তমান ভারত," ৩৪ পৃষ্ঠা।

অনুভব লক উদ্দীপনায় পূর্ণ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ সংকীর্ণ অধিকারিবাদের প্রাচীন জীর্ণ প্রাচীরগুলি শীঘ্র ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ভারতবাসীকে বারম্বার আহ্বান করিতেছেন।* আজ দেশের প্রতিষ্ঠোন্মুখ সমষ্টিশক্তি ভাব ও শক্তির পাশ্চাত্য সঞ্চারকৌশল আয়ত্ত করিয়া সমাজের জ্ঞানানুশীলনে অভিভাবকতা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন,—এখন সমষ্টির দৃষ্টি লোকালয়ের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে; এ অবস্থায় বুদ্ধিভেদ বা তত্ত্ববিপর্য্যয়ের সুযোগ প্রাচীন কালের মত আর মাথা তুলিতে পারিবে না; এ অবস্থায় আমাদের সনাতন আদর্শের সমন্বয়মূলক বিচার ও জ্ঞান দেশের সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে, এবং লোকশিক্ষার প্রকৃতি ও গতি নানা বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়াও সমষ্টির আয়ত্তাধীন হইতে চলিয়াছে। ভারতে সমষ্টিপ্রতিষ্ঠার সর্ব্বাঙ্গীন উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়কবলিত জ্ঞানভাণ্ডার সমষ্টির জন্য উন্মোচিত হইতেছে এবং আদর্শের যথাযথ সংরক্ষণরূপ যে প্রয়োজন প্রাচীন অধিকারিবাদের দ্বারা সংসাধিত হইত, এখন তাহাকে সমষ্টির দ্বারা সংসাধিত করিতে হইবে বলিয়া, অধিকারিবাদকে স্বয়ং কালই দেশ হইতে অল্পে অল্পে বিদায় দিতেছেন।

কিন্তু সাধকের সাধনসামর্থ্য অনুসারে সাধনপথ নির্দ্দেশ করিবার ভার চিরকালই ধর্ম্মোপদেষ্টাকে গ্রহণ করিতে হইবে; এই মূল অধিকারিবাদকে রহিত করা সম্ভব নহে। যে অধিকারিবাদের অর্থ কোনরূপ একচেটিয়া বন্দোবস্ত, সে অধিকারিবাদের যুগ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে অধিকারিবাদ বলিতে সামর্থ্যের হিসাব বুঝায় সে অধিকারিবাদ রহিত করা যায় না; সকল ক্ষেত্রেই উহা প্রচলিত থাকিবে। সমষ্টির সর্ব্ববিধ জ্ঞানভাণ্ডার বা সাধনাভাণ্ডার সকলেরই নিকট উন্মুক্ত, কিন্তু রত্নাহরণে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে যাহার সামর্থ্য জন্মিয়াছে, কেবল সে-ই উহাদের সম্বন্ধে অধিকার লাভ করিবে।

সমষ্টিগঠনোপযোগিনী শিক্ষার একটী প্রধান আলম্বন বা নিমিত্তকারণ—সমষ্টির জন্য সমষ্টির সম্মুখে সর্ব্ববিধ বিদ্যা ও সাধনার দ্বার উন্মুক্ত রাখা। আমরা দেখিলাম বর্ত্তমান যুগে সে দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে এবং হইতেছে অতএব সমষ্টিশক্তির লীলাক্ষেত্র নির্ম্মাণ অর্থাৎ Organisation of thought and activity এবং সমষ্টির উপযুক্ত মর্য্যাদাদান, অর্থাৎ উহাকে সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও সাধনার দখল দেওয়া বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাবিস্তারের মূলে এই উভয়বিধ নিমিত্ত কারণই স্থানলাভ করিতেছে। আগামী প্রবন্ধে আমরা বিচার করিব সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের মূল উপাদান কিরূপ।

* প্রবন্ধশীর্ষে-উদ্ধৃত দ্বিতীয় উক্তি এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত।

REGISTERED No. C 295.

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

সূচী।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।

মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সডাক ২৲ দুই টাকা।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

১৪শ বর্ষ—১২শ সংখ্যা। পৌষ, ১৩১৯।

IMPERIAL

The Sister Nivedita's New Book

"Civic and National Ideals"

(AUTHORISED EDITION.)

This is the first of a series of volumes to be published to comprise all the writings of Sister Nivedita as yet unavailable in book form. The persent volume deals with the problem of Indian Nationalism, its basis and the resources to be developed. People interested in the Indian problem should eagerly welcome this publication from the Sister's pen. The book with a handsome get-up and a nice portrait of the Sister is to be had at the price of Re.1 exclusive of postage of

The Udbodhan office.

SISTER NIVEDITA'S MASTERPIECE.

"The Master as I Saw Him"

The book can have no truer or better introduction to the public, than the following citations, one from Indian and the other from European appreciation :—

"How great Vivekananda was we can realise—as far as is now possible—in his very words as faithfully recorded by his desciple. Of his many words, his varied teachings and his yearnings and struggling, a full history is impossible. But in the volume before us, we can feel that he was a Master indeed, a living fountain of inspiration,"

PROF. JADUNATH SARKAR.

"* * it (this book) may be placed among the choicest religious classic, below the various scriptures, on the same shelf with *the Confessions of St. Augustine* and Sabatier's *Life of St. Francis.*"

PROF. T. K. CHEYNE.
Of Oxford University.

Price—paper Bound Rs. 2-8. Postage extra.

To be had of the Udbodhan office.
12, 13, Gopal Chandra Neogi's lane
BAGBAZAR, CALCUTTA.

উদ্বোধন।

20 JAN 1913
WRITERS' BUILDINGS

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত"

১৪শ বর্ষ।

১৩১৮ মাঘ হইতে ১৩১৯ পৌষ পর্য্যন্ত।

কলিকাতা।

উদ্বোধন অফিস—১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেন, বাগবাজার।

মাসিক পত্র অগ্রীম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

সূচীপত্র।

১৪শ বর্ষ।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র।

(শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল।)

গিরিশ চন্দ্রের শেষ জীবনে, আমার পরম সৌভাগ্য বশতঃ, আমি অনুমান ১৩।১৪ বৎসর কাল প্রায় প্রতিনিয়ত তাঁহার দুর্লভসঙ্গ লাভ করিয়াছি; বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতাম। তাঁহার অতীত জীবন সম্বন্ধে সময়ে সময়ে তিনি যে সকল গল্প বলিতেন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

কঙ্কাল যেমন মানুষ নহে, কাঠামো যেমন প্রতিমা নহে, কেবল মাত্র স্তূপীকৃত চূণ সুরকী ইট কাঠকে যেমন অট্টালিকা বলা যায় না, এই সংক্ষিপ্ত সঙ্কলনও তেমনই গিরিশ চন্দ্রের প্রকৃত জীবন-চরিত নহে। ইহাতে তাঁহার জীবনের মূল ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট রহিল। যদি কোন স্থানে কোন ঘটনা ভুল হইয়া থাকে, সংশোধন করিয়া দিলে অনুগৃহীত হইব। ভবিষ্যতে যাঁহারা তাঁহার জীবনী লিখিবার প্রয়াসী হইবেন, আমি তাঁহাদিগের সুবিধার্থ ভিত্তি করিয়া রাখিলাম।

বিখ্যাত হাফ্ আখ্ডাইয়ের জন্মভূমি বসুপাড়া পল্লীতে গিরিশ চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। গিরিশ চন্দ্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালীর জীবনে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব প্রভূত পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মার্জ্জিতরুচি জাতীয় যাত্রা-কবির আমোদকে অশ্রদ্ধা করিয়া ইংরাজের অনুকরণে থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইল। শ্যামবাজার নিবাসী নবীন চন্দ্র বসু তাহার পথপ্রদর্শক। নবীন চন্দ্রের থিয়েটারে বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হইত, তাহাও নির্দ্দোষ সুরুচি সম্পন্ন নহে। নাটকের অভাবে মার্জ্জিত সম্প্রদায় ইংরাজী নাটকের অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। গিরিশ চন্দ্র যখন বিদ্যাশিক্ষার্থ ওরিএণ্টাল সেমিনারীতে প্রথম প্রবিষ্ট হন, সে সময়ে এই বিদ্যালয়ের কতকগুলি ভূতপূর্ব্ব ছাত্র সম্মিলিত হইয়া বিদ্যালয়ের একটী গৃহে ওরিএণ্টাল থিয়েটার নামে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সেক্সপীয়র অভিনয় করিতেন। ক্রমে রাম নারায়ণ তর্করত্ন

নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তৎপরে পাইকপাড়ার রাজবাটীতে স্থায়ী নাট্য-শালা সংস্থাপিত হইল, কবিবর মধুসূদন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পরেই পাথুরিয়া ঘাটার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা। তাহার পর দেখাদেখি অনেক স্থলে সখের দল সংগঠন। কিন্তু ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়-প্রতিষ্ঠা কোনও দলই লাভ করিতে পারিলেন না। ঠাকুর বাড়ীর অভিনয় দেখিবার জন্য সমগ্র কলিকাতাবাসী অভিলাষী, কিন্তু টিকিট সংগ্রহ করা দুষ্কর, অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঠাকুর-বাড়ীর অভিনয় দেখিতে পাইতেন। শুনিয়াছি সাধারণের সেই অভিনয় দর্শন পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাট্যোদ্যম।

গিরিশ চন্দ্র ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাস হরিপালে ছিল। গিরিশের প্রপিতামহ রামলোচন প্রথম কলিকাতায় আসেন, এবং বাগবাজারে প্রসিদ্ধ নিয়োগীদিগের বাড়ীর নিকট বাস করেন। যে বাটীতে গিরিশ চন্দ্রের জন্ম হয়, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতামহ রামরতন তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন।

গিরিশের পিতা নীলকমল বুককিপার ছিলেন। ওয়াটেও ব্যাক্ হিলজার সাহেবের আফিস তাঁহার শেষ কর্ম্মস্থল। এই অফিসের বর্ত্তমান নাম হিলজার কোম্পানী। শুনিয়াছি নীলকমল কলিকাতায় সওদাগরী অফিসে ডবল এন্ট্রি একাউন্ট সিস্টেম্ প্রথম প্রচলিত করেন। সিমলার স্বনামখ্যাত চুণীরাম বসুর পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ বসুর কন্যার সহিত নীলকমলের বিবাহ হয়। কলি-কাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসু গিরিশ চন্দ্রের মাতুল।

মানবের চরিত্রগত দোষগুণ অনেক পরিমাণে বংশানুগত। এই জন্য মানব পিতৃমাতৃ উভয়কুলের দোষগুণ সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলিকাতায় তখন প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাটীতে শালগ্রাম সেবার প্রথা ছিল। চুণী-রামের বাটীতে গিরিধারীর নিত্য পূজা হইত ও চুণীরাম নিত্য তাঁহার প্রসাদ পাইতেন; তৎপরে কিছুকাল বিশ্রাম করিতেন। একদিন অপরাহ্নে চুণীরাম উদগার তুলিয়া দেখিলেন যে তাহার মুখে একটু জল উঠিল; এবং পার্শ্বস্থিত পাত্রে তাহা নিক্ষেপ করিতে দেখা গেল উদ্গারের সঙ্গে ভুক্ত প্রসাদের একটী অন্ন বহির হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ গঙ্গাজলে উহা ধৌত করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলেন। বলিলেন, এ দেহ যখন গিরিধারীর প্রসাদ জীর্ণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর ইহা টিঁকিবে না।

সংকীর্ত্তনের সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে বৃষ খাট ধরিয়া মহাপথে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই তাঁহার শরীর অবশ হইয়া পড়িল, তারপর খাটে শয়ন করিয়া চুণীরাম গঙ্গার কূলে উপনীত হন, এবং হরিধ্বনি করিতে করিতে জাহ্নবীজলে দেহ বিসর্জ্জন করেন।

চুণীরামের ন্যায় তাঁহার পৌত্রীও অসামান্যা হরিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। নীলকমলের গৃহে শ্রীধরের নিত্যসেবা হইত, গিরিশ চন্দ্রের জননী ঠাকুরসেবা লইয়া থাকিতেন। নীলকমলের বাড়ীতে একদিন একটী কাঁটাল আসে, গিরিশের জননী সেটী শ্রীধরকে নিবেদন করিবার মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে কে তাহার অগ্রভাগ ভক্ষণ করিয়াছিল, আর ঠাকুরকে নিবেদন করা হইল না; গিরিশের জননী অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। নিশাশেষে স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন বলিতেছে, "আমিও ছেলেপুলের মধ্যে, অগ্রভাগভুক্ত কাঁটাল আমায় দিলে কোন দোষ হবে না।" সেই অবধি এই পরিবারে দৈবাৎ যদি কোন দ্রব্যের অগ্রভাগ ভুক্ত হয়, তাহা শ্রীধর সেবায় দিতে কোন বাধা হয় না।

কোন সময়ে নবীন কৃষ্ণের চিকিৎসাধীনে দুইটী রোগী আসে; তন্মধ্যে একটী রোগীর সম্বন্ধে নবীনকৃষ্ণ অনুমান করিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনরক্ষা হইবে না; অপরটীর সম্বন্ধে তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হয় যে তাহার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু ফল, ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। তিনি যেটীকে ভাবিয়াছিলেন মারা যাইবে সেইটী বাঁচিল এবং যেটীর জীবন সম্বন্ধে তাঁহার কোন আশঙ্কাই ছিল না সেইটী মরিল। নবীনকৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন যে, চিকিৎসাকার্য্য যথাযথরূপে অনুসরণ করা অতীব কঠিন, সামান্য মানববুদ্ধির অতীত। চিকিৎসা চলিতে পারে বটে, কিন্তু ধর্ম্মতঃ সে ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জ্জন করা নীতিবিরুদ্ধ, পাপ। নবীনকৃষ্ণ চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন। পরে ইনি স্যার রিচার্ড টেম্পল কর্ত্তৃক নাগ পুরের Extra Assistant Commissioner এর পদে নিযুক্ত হন।

প্রসঙ্গতঃ আমরা গিরিশ চন্দ্রের মাতুলেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। নবীনকৃষ্ণ সে সময় একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় তিনি জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত অনুসরণ করেন নাই। চিকিৎসা পরিত্যাগ করিবার কারণ এইরূপ :—

নীলকমলের প্রথম এক পুত্র জন্মে। তারপর উপর্য্যুপরি ছয় কন্যা, ছয়

কন্যার পর অষ্টমগর্ভে গিরিশ চন্দ্রের জন্ম হয়, গিরিশের পর আর তিনটী পুত্র জন্মে। অবশেষে একটী মৃত কন্যা প্রসব করিয়া প্রসূতি পরলোক গমন করেন।

গিরিশ চন্দ্রের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে কন্যার জন্ম হয়, বালিকা বয়সেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। নীলকমলের বাটীতে একজন ভিখারী ভিক্ষা করিতে আসিত ও "জয় রাধা গোবিন্দ নাচে" বলিয়া গান করিত। বালিকা তখন সুস্পষ্ট কথা বলিতে শিখে নাই, ভিখারী আসিলে জয় রাধাগোবিন্দ নামের পরিবর্ত্তে বলিত, "ধেও নাধার গোবিন্দ" ও একটী পয়সা চাহিয়া ভিক্ষা দিত। কিছু দিনে বালিকা সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইল, শুনিয়াছি মৃত্যুর কিছু সময় পূর্ব্বে, তাহার গভীর মূর্চ্ছা হয়,এবং সেই মূর্চ্ছাকে মৃত্যুজ্ঞান করিয়া বাটীর সকলে সৎকারের জন্য তাহাকে গঙ্গাকূলে লইয়া যান। গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার পর বালিকার চৈতন্য হইল। সংবাদ পাইয়া নীলকমল ও অপরাপর লোক বালিকার নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু গিয়া দেখিলেন, বালিকা জীবিতা হইলেও তাহার আসন্ন সময়ের আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখিতে দেখিতেই বালিকার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বলিল, "ধেও নাধার গোবিন্দ এয়েচে, নথ (রথ) এয়েচে পয়সা দে"। সেই জয় রাধা-গোবিন্দ নাম শুনিতে শুনিতে দিব্যরথে চড়িয়া বালিকা দিব্যধামে চলিয়া গেল।

একে অষ্টম গর্ভের সন্তান, অতি শুভক্ষণে জন্মিয়াছে, তার উপর আবার শিশু সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত; গিরিশের জন্মে নীলকমলের গৃহে আনন্দের রোল উঠিল। বাদ্যভাণ্ডরবে গৃহ পূর্ণ হইল। শুনিয়াছি গিরিশ চন্দ্রের খুল্লপিতামহ গাত্র হইতে শাল খুলিয়া বাদ্যকারগণকে পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মুক্তহস্তে অর্থ বিলাইয়াছিলেন। পুরস্কারের লোভে বাদ্যকারগণ মাসাবধি নীলকমলের গৃহ বাদ্য-মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু হায়, সংসারে অমিশ্র আনন্দ কোথায়? গিরিশ চন্দ্রের জন্মের ছয়মাস পরে, তাঁহার জন্মে যাঁহারা এত আনন্দ করিয়াছিলেন, সেই খুল্লপিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়েই স্বর্গগমন করিলেন। প্রসূতিরও সূতিকার পীড়া হইল। নীলকমলের বাড়ীতে উমা নামে এক বাগ্দিনী বাসন মাজার কাজ করিত, গিরিশ মাতৃস্তন্য অভাবে তাহারই স্তনপান করিয়া পুষ্ট হইতে লাগিলেন। ক্রমে হাতেখড়ির কাল আসিল, গিরিশচন্দ্র পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন এবং সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত তথায় অতিবাহিত করিলেন। এই সময় তিনি সন্ধ্যার সময় তাঁহার খুল্লপিতামহীর নিকট বসিয়া রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ভাগবত প্রভৃতির গল্প শ্রবণ করিতেন। ভাবিজীবনে গিরিশচন্দ্র

পুরাণ-ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল নাটক রচনা করিয়াছিলেন, এই সময় হইতেই তাহার সূচনা। অষ্টম-বর্ষ বয়সে তিনি ওরিএন্ট্যাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি হন। ইহার অব্যবহিত পরে সংসারে একটী দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে, একবিংশতি বর্ষ বয়সে গিরিশ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃত্যগোপাল অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিশোর বয়সে নৃত্যগোপালের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল, ঊনবিংশতি বর্ষ বয়সে সে পত্নীর মৃত্যু হয়, এবং তাহার পরেই নৃত্যগোপাল বায়ুরোগে আক্রান্ত হন। রোগ অল্পদিনেই সাম্য হইল, নীলকমল পুত্রের আবার বিবাহ দিলেন। কিন্তু এই বিবাহের দেড় বৎসর পরে নৃত্যগোপালের মৃত্যু হইল। জননী এই ঘটনা অবধি গিরিশ চন্দ্রের মুখের পানে আর চাহিতেন না। মাতার আদর যত্ন না পাইয়া বালক ক্ষুন্ন হইত, কিন্তু পিতার আদরে ভুলিয়া থাকিত। কর্ণমূল ফুলিয়া গিরিশচন্দ্রের একদিন অত্যন্ত জ্বর হয়, জননী তাহাতে যারপর নাই কাতরা হন, গৃহিণীর অধৈর্য্যভাবদর্শনে নীলকমল বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন গিরিশের উপর গৃহিণীর তাদৃশ স্নেহ ছিল না, কিন্তু ভার্য্যাকে আপাততঃ শান্ত করিবার জন্য কহিলেন—"তুমি অধীর হইলে কি বালক শীঘ্র আরোগ্য হইবে?" জননী সে কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি রাক্ষসী, এক সন্তান খাইয়াছি, অষ্টম গর্ভের সন্তান, পাছে উহার কোন অমঙ্গল হয় এই আশঙ্কায় আমি উহার মুখের দিকে চাই নাই, কখন আদর-যত্ন করি নাই।" কথাগুলি গিরিশের কর্ণগোচর হইল এবং অমৃত ধারার ন্যায় তাহার হৃদয় শীতল করিল। গিরিশচন্দ্র মাতৃস্নেহ অনুভব করিলেন, কিন্তু অধিক দিনের জন্য নয়। তাঁহার যখন একাদশ বর্ষ বয়স, জননী একটী মৃতকন্যা প্রসব করেন। গিরিশ বহির্দ্দেশে খেলা করিতেছিলেন, সহসা শঙ্খরোল উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা রোদন রোলে মিশাইয়া গেল। গিরিশচন্দ্র মাতৃহারা হইলেন।

পুত্রবৎসল নীলকমল গিরিশকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তিনি এই অশান্ত বালককে কখন দমন করেন নাই। বিচক্ষণ নীলকমল বুঝিয়াছিলেন, প্রতিরোধে স্রোতস্বতী যেমন অধিকতর বেগবতী হয়, এ বালকের প্রকৃতিও সেইরূপ; নিষেধ ইহার প্রেরণার কার্য্য করে, যাহা বারণ করা যায় তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য বালকের উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। পরিবারবর্গের অসন্তোষভাজন হইয়াও নীলকমল অনেক সময় গিরিশের অন্যায় আব্দার পূর্ণ করিতেন। তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি:—গিরিশের বাল্যজীবনের কোন সময়,

নীলকমলের অন্দরবাটী সংলগ্ন বাগানে, গাছে একটী শসা হয়। গাছের নূতন ফল এবং একটীমাত্র ফল, শ্রীধরকে দিতে হইবে; গিরিশচন্দ্রের জ্যেঠাইমা বার বার সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন। জ্যেঠাই মা নিষেধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চক্ষে নিদ্রা নাই, অশান্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তৃষ্ণা পাইয়াছে কিন্তু জল দিলে জল পান করেন না। নীলকমল কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, শসা খাবার তৃষ্ণা হইয়াছে। তাও আবার বাজারের শসা নয়, শ্রীধরের জন্য যেটী রাখা হইয়াছে সেটী না খাইলে তৃষ্ণা ভাঙ্গিবে না। নীলকমল তৎক্ষণাৎ আলো জ্বালিয়া শসা পাড়িয়া আনিলেন। শসা খাইয়া বালক শান্ত হইয়া ঘুমাইল।

নীলকমল বিপত্নীক হইয়া আর বিবাহ করেন নাই। দুঃসহ পুত্রশোকের পর পত্নীবিয়োগ বেদনায় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ৫২ বৎসর বয়সে নীলকমল পুরাতন রক্ত আমাশয় পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠিলেন না।

তিনটী অপগণ্ড ভাই লইয়া, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে পিতা মাতা উভয়কেই হারাইয়া, গিরিশচন্দ্র সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। নীলকমলের বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি প্রখর বুদ্ধিশালিনী ছিলেন। মৃত্যুকালে নীলকমল তাঁহাকেই নাবালক পুত্রগণের অভিভাবিকারূপে রাখিয়া যান।

নৃত্যগোপালের মৃত্যুর পর ছয় সাত বৎসর মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে কিন্তু ইহারই মধ্যে কি পরিবর্ত্তন। কলহাস-কলিত সুখের সংসার কাল মেঘে আবৃত করিল, নন্দন কানন শ্মশানে পরিণত হইল। এ দুর্দ্দিনে একমাত্র সান্ত্বনা যে, সংসারে আসন্ন অন্নাভাবের আশঙ্কা ছিল না। বিভীষিকাময় এই সংসার চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বালক গিরিশ চন্দ্রের হৃদয়ে আর এক ভীষণ দৃশ্যের ছায়াপাত হইতেছিল, তাহা সিপাহি বিদ্রোহ। যে মৃত্যু এই ক্ষুদ্র পরিবারে হাহাকার তুলিয়াছে, তাহারই করাল কঙ্কাল সমগ্র ভারতে তখন তাণ্ডব-নর্ত্তন করিতেছে। এই দুই দারুণ ঘটনার অবিনাশী স্মৃতি লইয়া গিরিশচন্দ্র প্রথম সংসারে প্রবেশ করিলেন।

গিরিশচন্দ্র কোন সময় নীলকমলের সহিত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন, সহসা তুফান উঠিয়া তাঁহাদের জীবন বিপন্ন করে। ভীতিবিহ্বল বালক জলমগ্ন হইবার আশঙ্কায় পিতার হাত ধরিল; নীলকমল তখন কিছুই বলিলেন না,

কিন্তু নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াই বলিলেন, "তুই আমার হাত ধরিলি যে? তুই কি মনে করিস্, আমার নিজের জীবন যদি বিপন্ন হ'ত তাহ'লে তোকে বাঁচাতুম?" অতি কঠোর শিক্ষা! গিরিশ বলিতেন, বাবার কথায় অন্তরে অত্যন্ত আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু শিখিলাম বিপদের সময় হাত ধরিবার কেহ নাই।

পিতৃবিয়োগের ছয় মাস পরে গিরিশচন্দ্রের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মৃত্যু হইল। একে গিরিশচন্দ্র চিরদিন স্বেচ্ছাচালিত তার উপর সংসারে শাসন কর্ত্তা নাই, বিদ্যালয়ের বন্ধনেব ভিতর থাকিয়া সাধারণ বালকের ন্যায় পাঠাভ্যাস তাহাব প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহার রুচি প্রকৃতি কিছুই বুঝিতেন না। তারপর কখন ওরিএণ্ট্যাল, কখন হেয়ার, কখন হিন্দু, কখন পাইকপাড়া, কখন পেরেণ্ট্যাল একাডেমি এইরূপ নানা বিদ্যালয়ে পাঠ করায় গিরিশচন্দ্রেব বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদিত শিক্ষা-লাভের বিশেষ বিঘ্ন হইয়াছিল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে শ্যামপুকুর নিবাসী নবীনচন্দ্র সবকারের একমাত্র কন্যার সহিত গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়, বিবাহের দিন ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। নিমতলায় আরম্ভ হইয়া সে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড গিরিশচন্দ্রের বাটীর পার্শ্বস্থ ভূমিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

গিরিশচন্দ্রের বিবাহের কিছুদিন পরে সেই ভীষণ কার্ত্তিকে ঝড় হয়। তাঁহাব শ্বশুর নবীনচন্দ্র আফিস হইতে প্রত্যাগমনের সময় গিরিশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বাটী আসিতেন এবং কোন কোন দিন জামাতাকে স্বীয় বাটীতে জলযোগ করাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। ঝড়ের দিন গিরিশ শ্বশুর বাটীতে জলযোগ করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিন্তু বৃষ্টি বাদল কিছুতেই থামিল না। বাহিরে যে কি তুমুল কাণ্ড হইতেছে, গৃহে বসিয়া কেহ তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। গিরিশ বাটী ফিরিবার জন্য বাহির হইলেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে ঝড়ে চালের খোলা প্রভৃতি উড়িয়া আসিতেছে, কোথাও বাটী পড়িতেছে, অতি সন্তর্পণে প্রাণ বাঁচাইয়া তিনি অনেক রাত্রে বাটী পৌঁছিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে একবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া গিরিশচন্দ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই ইংরাজি সাহিত্যপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর

তাঁহার প্রতিবেশী ও সহাধ্যায়ী ব্রজবিহারী সোম এই সাহিত্যালোচনা সম্বন্ধে গিরিশকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন।

গিরীশচন্দ্রের জন্ম সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি। এই সময়েই গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বঙ্গে শতাধিক বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এই সময় ও ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে পুস্তক মাসিক পত্রিকা প্রচার ও বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া গিরিশচন্দ্রের মাতৃভাষায় বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। এই সকল কবির রচনা তিনি বৃদ্ধ বয়সেও অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এক্ষণে সাময়িক সাহিত্য আলোচনায় তিনি বিশেষ মনোযোগ করিলেন। সে সময় গুপ্ত কবির বড় আদর, লোকে তাঁহার কবিতার ছন্দোবন্ধবাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইত। গিরিশচন্দ্রও তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন। বাল্য হইতেই কবিতা লেখার সখ্, গিরিশচন্দ্র যত্ন সহকারে গুপ্ত কবির অনুকরণ করিতে লাগিলেন, এবং বাঙ্গালা ইংরাজি উভয় ভাষায় কৃতিত্বলাভ করিবার আশায় ইংরাজি কবিতার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিশোর যৌবনে গিরিশচন্দ্র অতি নির্ভীক ছিলেন। একদিকে মানীলোককে মান্য দিতে যেমন কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না, অন্যদিকে অত্যাচারীর দণ্ড দিতে তিনি তেমনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। সে সময় ভণ্ড সন্ন্যাসীর দল বড় প্রবল ছিল। দুপুর বেলা বাটীর পুরুষ অভিভাবকগণ যখন অনুপস্থিত, সেই সময় ইহারা গৃহস্থের বাটীতে আসিয়া নানারূপ ভয় প্রদর্শন ও অত্যাচার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। গিরিশ এই অত্যাচারীদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করিতেন যে তিনি থাকিতে আর তাহারা পাড়ায় আসিত না। এতদ্ব্যতীত পীড়িতের সেবা, মৃতের সৎকার, প্রভৃতি কার্য্যে গিরিশচন্দ্র সর্ব্বাগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু এ সকল সৎকার্য্য সত্বেও অভিভাবকশূন্য উচ্ছৃঙ্খল-যুবার পাড়ায় একটা দুর্দ্দান্ত বলিয়া খ্যাতি প্রচারিত হইল।

গিরিশ চন্দ্রের সঙ্গীতে বড় আকর্ষণ ছিল। যাত্রা, কবি, হাফ্ আখ্ড়া, রামায়ণ গান, কথকতা বা কলাবতী গান, সুযোগ পাইলেই শুনিতে যাইতেন। বাগ্বাজারে ভগবতী চরণ গাঙ্গুলীর বাটীতে একরাত্রে হাফ্ আখ্ড়াই হয়। এই সভায় গুপ্ত কবির উপর সাধারণের প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়া, গিরিশ চন্দ্রের হৃদয়ে কবি হইবার লালসা বলবতী হইয়া উঠে।

গিরিশচন্দ্রের শ্বশুর নবীনবাবু এট্‌কিন্‌সন্‌টিল্‌টন্ কোম্পানির বুক-কিপার ছিলেন। জামাতাকে সওদাগরী অফিসের কায কর্ম্ম শিখাইবার মানসে তিনি গিরিশচন্দ্রকে শিক্ষানবীশ্ রূপে অফিসে বাহির করিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতিবেশী দিগম্বর দে একজন ভাল বুক-কিপার ছিলেন, গিরিশচন্দ্র যেমন অফিসে কায কর্ম্ম শিখিতে লাগিলেন, তেমনই দিগম্বর দেব্র বাটী গিয়া তাঁহার কাছে বুক-কিপারের কার্য্যও শিখিতে লাগিলেন।

কিছু কাল শিক্ষানবিশী করিবার পর তিনি আর্জেন্টি সিলিজি কোম্পানির অফিসে সহকারী ক্যাসিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশ চন্দ্রের প্রধান উদ্যোগে বাগবাজারে একটী সখের যাত্রা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কবিবর মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা নাটক ইহাঁরা প্রথম অভিনয় করেন। গিরিশ চন্দ্র তাহাতে কয়েকখানি গীত রচনা করিয়া দেন এবং সাধারণে সুখ্যাতি লাভ করেন। এই বৎসরেই তাঁহার একটী কন্যা সন্তান জন্মে; কিন্তু এই কন্যা দুই তিন দিন মাত্র জীবিতা ছিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গিরিশ চন্দ্রের এক ভগিনী এবং তাহার কিছু পরে তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতা কানাই-লালের কাল হয়। কানাই লালের বিবাহ হইয়াছিল। কানাই গিরিশ অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের ছোট ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে গিরিশ চন্দ্র সহোদর সুহৃদ্ দুইই হারাইলেন। কানাইএর মৃত্যুর কিছুকাল পরে গিরিশ চন্দ্রের প্রথম পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথ (দানি বাবু) জন্মগ্রহণ করেন।

বলিয়াছি, সাধারণের অভিনয়দর্শনলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য গিরিশ চন্দ্রের প্রথম নাট্যোগম। ঠাকুর বাড়ীর থিয়েটারের তখন চারিদিকে সুখ্যাতি, সকলের মুখে এই থিয়েটারের কথা এবং টিকিট সংগ্রহ করিতে পারেন না বলিয়া অনেকেই ক্ষুন্ন। বাগবাজার সখের সম্প্রদায় হইতে অভিনেতা মনোনীত করিয়া গিরিশচন্দ্র একটী থিয়েটারের দল সংগঠন করেন। মুখুজ্জে পাড়ার অরুণ হালদারের বাটীতে রিহার্সাল বসিল, কিন্তু অভিনয় হয় কিরূপে, দৃশ্য সাজ-সরঞ্জাম সকলই অভাব। গিরিশচন্দ্র সধবার একাদশী অভিনয় করিবার জন্য মনোনীত করিলেন। এই পুস্তকে পোষাক পরিচ্ছদের কোন আবশ্যক নাই, সাধারণ ভদ্রলোকের বেশে কাপড় জামা চাদর পরিয়া অভিনয় হইতে পারে। গিরিশচন্দ্রকে ভাবি-জীবনে কখন কখন এরূপ সমস্যা পূরণ করিতে হইয়াছে। ষ্টার থিয়েটারের আর্থিক অবস্থা যখন অসচ্ছল

ছিল, তখন গিরিশচন্দ্র চৈতন্য-লীলা লিখিবার কল্পনা করেন, কেবল কয়েকখানি গেরুয়া ও কয়েকছড়া মালা এই পুস্তকের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে শারদীয়া পূজার সময় সধবার একাদশীর প্রথম অভিনয় হয়। গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদ, এই ভূমিকাই তাঁহার ভাবি অভিনয়-গৌরবের ভিত্তি। এই সময় গিরিশ চন্দ্রের উদ্যোগে বাগবাজার সম্প্রদায় উষাহরণ অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্র এই অভিনয়ের জন্য একরাত্রে ছাব্বিশ খানি সঙ্গীত রচনা করিয়া দেন। সধবার একাদশীর পর লীলাবতী। লীলাবতীর অভিনয় জন্য স্বয়ং দিনবন্ধুর অনুরোধ। কিন্তু দৃশ্য পটাদি প্রস্তুত হয় কিরূপে? গিরিশ চন্দ্রের শ্যালক ব্রজেন্দ্রনাথ এই সময় এট্‌কিন্‌সন্‌ টিলটন্‌ কোম্পানির বুক-কিপার ছিলেন। তিনি এই অভিনয় পটু অর্থহীন সম্প্রদায়কে সহায়তা করিবার জন্য স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শ্যামপুকুরে তাঁহারই বাটীতে প্রসিদ্ধ ষ্টেজ্‌ ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর কর্ত্তৃক একটী রঙ্গমঞ্চের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহা শেষ হইতে না হইতেই ব্রজেন্দ্র মারা গেলেন। গিরিশচন্দ্র এই অসম্পূর্ণ ষ্টেজের দ্রব্যসকল তাঁহার শ্বশুর বাটীর আত্মীয়গণের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য ধর্ম্মদাসকে দিলেন। ধর্ম্মদাস কতিপয় বন্ধু-সম্মিলিত হইয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সেই নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিলেন। শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বাটীতে ষ্টেজ্‌ বাঁধিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়া বাগবাজার সম্প্রদায় লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ করিলেন। অভিনয়ে আশাতীত সুখ্যাতি লাভ হইল, বিশেষতঃ ললিতের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের।

লীলাবতীর পর নীলদর্পণ। প্রসিদ্ধ গ্রেট্‌ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ভুবন মোহন নিয়োগীর সহিত বাগবাজার সম্প্রদায়ের এখন হইতে সংস্রব হয়। নীল দর্পণের বিহার্সালের জন্য ভুবন বাবু তাঁহার গঙ্গাতটস্থ বৈঠকখানা ছাড়িয়া দেন এবং সম্প্রদায়কে প্রয়োজনমত সাহায্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। দর্শকের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া সম্প্রদায় টিকিট বিক্রয় করিয়া নীলদর্পণ অভিনয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু গিরিশ চন্দ্র তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, আমাদের রঙ্গমঞ্চ দৃশ্য, পট, সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি এখনও এরূপ উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়া টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণে প্রকাশিত হওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রদায় তখন অভিনয় গৌরবে উন্মত্ত, গিরিশ চন্দ্রের

আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, যোড়াসাকোঁর মধু সান্যালের বাটীতে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নীলদর্পণ অভিনয় আরম্ভ করিলেন। টিকিট বিক্রয়ে আশাতীত লাভ হইতে লাগিল। কিন্তু গিরিশ চন্দ্রের সহিত সম্প্রদায়ের আর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিল না।

ইতিমধ্যে গিরিশ চন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবনে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তিনি আবজেণ্টি সিলিজির কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জন্ এট্কিন্সন্ সাহেবের অফিসে সহকারী বুক-কিপারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

থিয়াটারের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ না থাকিলেও বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে গিরিশচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে ভীমসিংহ প্রভৃতির ভূমিকা অভিনয় করিতে হইত। এই সময় সম্প্রদায়, বিখ্যাত অভিনেতা দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষকে এবং গিরিশ চন্দ্রকে ডাইরেক্টর নিযুক্ত করিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরেই আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়া দল ভাঙ্গিয়া গেল। কলহের কারণ আর কিছুই নহে, প্রভূত অর্থাগম হইতেছে, দলস্থ তিন চারি ব্যক্তি আপনাদিগকে দলের প্রোপ্রাইটার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পান, সেই চেষ্টায় যাঁহারা বাধা দেন তাঁহাদের পরস্পরের মনোভঙ্গ হইয়া দল-ভঙ্গ হয়। দুইটী দল হইল, একদল হিন্দু ন্যাশনাল নাম দিয়া অপেরা হাউসে এবং অপর দল স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে অভিনয় করিতে লাগিল। কিন্তু পরে দুই দলই উঠিয়া গেল।

অনুমান ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশ চন্দ্রের আর একটী কন্যা হইল। এই ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর হইতেই বঙ্গে বাঙ্গালীর পাবলিক থিয়েটারের সূচনা। এই বৎসর পূর্ব্ব কথিত ভুবন মোহন স্বত্বাধিকারী হইয়া ধর্ম্মদাসের যত্ন, শ্রম, ও কর্ত্তৃত্বে বীডন ষ্ট্রীটে স্বতন্ত্র থিয়েটার গৃহ নির্ম্মাণ করান, এবং গ্রেট ন্যাশনাল নাম দিয়া বাগবাজার সম্প্রদায়ের দুইদলকে একত্র করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন। গিরিশ চন্দ্র বঙ্কিম চন্দ্রের মৃণালিনী নাটকাকারে পরিণত করিয়া দিলেন এবং তদ্ব্যতীত মাউসি (Mousie) চারিটেবল্ ডিস্পেন্সারি (Charitable Dispensary) হগ্ এণ্ড বুল (Hog and Bull) যামিনীচন্দ্র-মাহিনা—গোপন চুম্বন (Kissin the dark) সহিষ্ হইল আজি কবিচূড়ামণি (The jockey the poet) প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঞ্চরংও তিনি লিখিয়া দেন। মাউসি পুস্তকখানি লিখিয়া

উঠিবার সময় হয় নাই। রঙ্গমঞ্চে গিরিশ অর্দ্ধেন্দু ও ক্ষেত্রমণি নাম্নী অভিনেত্রী তিনজনে পুস্তক খানি (extempore) মুখে মুখে অভিনয় করেন।

এট্‌কিন্‌সন্‌ গিরিশ চন্দ্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। অফিসের কাযে গিরিশকে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইত, তথাপি তিনি নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিতেন। কাব্য, সাহিত্য, নাটক, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির আলোচনা তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। সন্ধ্যার পর অধ্যয়নে বসিতেন, পাঠে দ্বিতীয় প্রহর, তৃতীয় প্রহর, কখন কখন সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত। থিয়েটারের দিন অবশ্য পড়া হইত না। বিংশতি বর্ষ বয়স হইতে জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত যতদিন না তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তিনি নিত্য নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিতেন।

অধ্যয়নের ন্যায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায়ও গিরিশ চন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল। গিরিশের শ্যালক ব্রজেন্দ্র তাঁহাকে এই সম্বন্ধে অনুরাগী করেন। গিরিশ চন্দ্র সাধারণতঃ দীন দরিদ্রগণেরই চিকিৎসা করিতেন। সকলকেই বিনামূল্যে ঔষধ এবং কোন কোন স্থলে পথ্য খরচ পর্য্যন্ত দিতেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সময়ে সময়ে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখা গিয়াছে। গিরিশ চন্দ্র তন্ময় হইয়া চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু নানা কার্য্য বশতঃ সকল সময় তাঁহার চিকিৎসাধীন সকল রোগীকে দেখিতে যাইতে পারিতেন না। তিনি যে সময়ে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঔষধে ফল হওয়া সম্ভব বিবেচনা করিতেন, রোগীর তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য পীড়িতের আত্মীয় স্বজনগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া আসিতেন। সে সংবাদ পাইবার জন্য গিরিশ চন্দ্র যে কিরূপ ব্যাকুল থাকিতেন, রোগীর আত্মীয়গণ তাহা সকল সময়ে ধারণা করিতে পারিত না। একদিকে রোগীর জন্য চিকিৎসকের ব্যাকুলতা ও ব্যস্তভাব, অপর দিকে রোগীর আত্মীয়গণের একরূপ নিশ্চিন্তভাব ও সংবাদদানে অবহেলা। এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য হইল না, গিরিশ-চন্দ্র ব্যথিত হইয়া চিকিৎসাকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। পরে ক্লাসিক থিয়েটারের আমলে তিনি একার্য্যে পুনরায় ব্রতী হন। আমরা সেই প্রসঙ্গে সে কথা বলিব।

গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত জানিতেন না; ধর্ম্মের যাহা কিছু জ্ঞান তাঁহাকে ইংরাজি পুস্তক হইতেই লাভ করিতে হইয়াছিল। তখন ইংরাজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ধর্ম্মালোচনায়, জড়বাদের প্রবলস্রোত বহিতেছে। জড় হইতে উদ্ভব এবং

জড়ে লয় হওয়া ব্যতীত জীবের অন্ত পরিণাম নাই; মন মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া মাত্র, জড়েরই শক্তি বিশেষ। ধর্ম্ম সমাজ-বন্ধন রক্ষার্থ কল্পনা। হিন্দুর বেদ-বিধি-ধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণগণের স্বার্থসাধন ও প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি রক্ষণের জন্য। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা রক্ষাও ক্রমে দুষ্কর হইয়া উঠিল। নব্য ব্রাহ্মগণের উত্থানে তেত্রিশ কোটী দেবতা একেশ্বরে পরিণত; আবার বিজ্ঞানের তর্কযুক্তি প্রভাবে তাঁহারও আসন টল-টলায়মান। গিরিশচন্দ্র দেখিলেন যে, যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের বিধানকর্ত্তা, তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণ কেবল মুখে; শৌচের গাড়ুর জলে দেওয়ালের মাটী গুলিয়া ফোঁটা কাটিয়া পুরোহিত পূজায় যাইতেছেন। এই সকল আচরণ দেখিয়া হিন্দুর ধর্ম্মে আর তাঁহার শ্রদ্ধা রহিল না। নবোদ্ভাবিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর কিছু আছে কি না, তাহা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে মিশিলেন, সেখানেও দেখিলেন অনেকেরই কথায় ও আচরণে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। অবশেষে হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও যে দিন তিনি গঙ্গাস্নানে যাইতেন রামতর্পণ পাঠ করিয়া তাঁহার পিতার উদ্দেশে তিন গণ্ডূষ জল দিতেন, ভাবিতেন, জল দি, কি জানি সত্যই যদি পিতার কোন কার্য্য হয়।

গিরিশচন্দ্রের হৃদয় যখন এইরূপ নানা দ্বন্দ্ব-সন্দেহে আন্দোলিত, তাঁহার সংসারে তখন নানা দুর্ঘটনা ঘটিতে লাগিল। সহসা তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর ক্ষীরোদচন্দ্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার কিছুকাল পরে গিরিশের এক ভগিনীর কাল হইল, এবং তাহার কিছুকাল পরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শিশু পুত্র-কন্যা রাখিয়া গিরিশচন্দ্রের পত্নী পরলোকগামিনী হইলেন। বিবাহের দিন যে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল সেই অগ্নি যেন আবার সহসা প্রজ্জলিত হইয়া গিরিশচন্দ্রের সংসার ভস্মীভূত করিয়া দিল।

পত্নী বিয়োগের কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মস্থলে গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। ব্যানক্রফ্‌ট্ সাহেব এট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের অংশীদার ছিলেন। উভয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় এট্‌কিন্‌সন্ অংশীদারের উপর সমস্ত কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ব্যানক্রফ্‌ট কারবার চালাইতে পারিলেন না। ব্যবসা নষ্ট হইল, অফিসের চেয়ার টেবিল প্রভৃতি নিলাম হইয়া গেল। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে গিরিশচন্দ্র ম্যাক্‌বেথ্ অনুবাদ করিতেছিলেন। এই অনুবাদে গিরিশ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামকরণ দেশীয় নামে করিয়াছিলেন, ভাষার অনুবাদ অবিকল ছিল। অনুবাদের পাণ্ডুলিপি অফিসের টেবিলের ভিতর থাকিত। টেবিল,চেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানিও নষ্ট হইয়া গেল।

ভার্য্যাবিয়োগ-শোকে গিরিশচন্দ্র প্রথম ততটা কাতর হন নাই, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অফিসের কর্ম্ম, থিয়েটার, অধ্যয়ন প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকিয়া তিনি সকল সময়ে পত্নীর মনের মত ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শোক তাঁহাকে নিরতিশয় ব্যথিত করিয়া তুলিল। আঁধার, শৈশব-বান্ধব প্রভৃতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা সেই সময়ের লেখা এবং সেই ব্যথিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। পত্নী বিয়োগের কিছুদিন পর গিরিশচন্দ্র ক্রাইবার্জার্ কোম্পানির অফিসে একটী কর্ম্ম পাইলেন, এবং মাল খরিদ করিবার জন্য তাঁহাকে ভাগলপুর যাইতে হইল। গিরিশ-চন্দ্র ভাগলপুরের গ্রামে গ্রামে মাল খরিদ করিয়া বেড়াইতেন এবং সেই সুদূর প্রবাসে, কার্য্যের অবকাশে, নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় বসিয়া কবিতা লিখিতেন। তাঁহার "ধুতুরা", "গিরি" প্রভৃতি কবিতা এই খানে লেখা। গিরিশের অশ্রুধারা কবিতায় প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সকল কবিতা যিনি পাঠ করিবেন, তিনি তাঁহার সাময়িক মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিচয় পাইবেন।

গিরিশচন্দ্র প্রায় পাঁচমাস কাল ভাগলপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি কলিকাতায় আসিবেন, সে দিন এক পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত তাঁহার সঙ্গের সকল জিনিষ পত্র অপহৃত হয়। গিরিশ দারুণ বিপদে পড়িলেন। প্রতিবেশী একটী ভদ্রলোক ভাগলপুরে আইন ব্যবসায় করিতেন, বিপন্ন গিরিশ তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কাছে দশটী টাকা ধার চাহিলেন। বাবুটী বলিলেন, "তোমাকে দশ টাকা ধার দিতে ইচ্ছা করি না, তবে পাঁচটা টাকা দান করিতে পারি।" সে অবস্থায় আর উপায় কি? গিরিশ বলিলেন, "দুঃসহ শোকেও আমার কখন চোখের জল পড়ে নাই, কিন্তু এই পাঁচটা টাকা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আমার চোখে জল আসিল। কি করি! হাত পাতিয়া ভিক্ষা লইলাম, এবং দাতাকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। পরে বাবুটী যখন বিদেশ হইতে বাটীতে আসেন, গিরিশ তখন সেই পাঁচ টাকা ফেরৎ দেন। ফেরৎ দিবার সময় বাবু বলিয়াছিলেন, "এই টাকা ফেরৎ দিবার আবশ্যকতা কি? আমি তোমায় উহা দান করিয়াছিলাম।" গিরিশ বলিতেন, "এই কথার উত্তরে আমার অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু উপকার পাইয়াছি, কিছু না বলিয়া বাবুর সামনে পাঁচটী টাকা রাখিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।"

অনুমান ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভুবন-মোহন ঋণদায়ে ন্যাশনালের সংস্রব ত্যাগ

করিতে বাধ্য হন। কতিপয় অভিনেতা থিয়েটার ভাড়া লইলেন, এবং গিরিশের হস্তে অধ্যক্ষতার ভার অর্পণ করিলেন। গিরিশচন্দ্র মেঘনাদ-বধ, পলাসির যুদ্ধ ও বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করাইতে লাগিলেন। এ সময় স্বয়ং নাটক লিখিবার কল্পনা গিরিশচন্দ্রের ছিল না। অভিনয়োপযোগী উৎকৃষ্ট নাটকের জন্ত তিনি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেন। কেবল রঙ্গালয়ের বিশেষ প্রয়োজন জন্ত তিনি অকালবোধন, দোললীলা, আগমনী প্রভৃতি কয়খানি গীতিনাট্য রচনা করিয়া দেন। ভাগলপুর হইতে প্রত্যাগত হইয়া গিরিশ ফ্রাই বারজার 'কোম্পানির কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। কর্ম্ম পরিত্যাগের পর শিশির কুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান্ লীগ নামক সভায় হেড ক্লার্কের পদে প্রায় এক বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই সভা উঠিয়া গেলে তিনি পার্কার সাহেবের অফিসে বুক কিপার নিযুক্ত হন।

অনুমান ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আত্মীয় বন্ধুগণের বিশেষ অনুরোধে গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। লাল-চাঁদ মিত্রের প্রপৌত্রী, বিহারীলাল মিত্রের কন্তা, গিরিশের দ্বিতীয়া ভার্য্যা।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের প্রায় ছয় মাস পরে গিরিশচন্দ্র বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন, এবং তাঁহার জীবন সংশয় হয়। ডাক্তার ঔষধ বন্ধ করিয়া জবাব দিয়া গিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের তখন মূর্চ্ছিতাবস্থা। মূর্চ্ছাভঙ্গে চৈতন্ত সঞ্চারের সময় গিরিশচন্দ্রের মনে হইল, যেন তাঁহার জননী আসিয়া তাঁহার মুখে মহাপ্রসাদ দিলেন। গিরিশ বলিতেন যখন তাঁহার সম্পূর্ণ চৈতন্তলাভ হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল ক্রিয়া করিতেছে, তখনও তাঁহার জিহ্বায় মহাপ্রসাদের স্বাদ সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় গিরিশচন্দ্র আরোগ্য লাভ করিলেন।

জীবনলাভ করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিক হইতে বিপজ্জাল তাঁহাকে বেষ্টন করিল। গিরিশচন্দ্রের সে সময়ের অবস্থা তাঁহারই কথায় বলি, "বন্ধু বান্ধবহীন, চারিদিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শত্রু সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে; এবং আমারই কার্য্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক, এ অকূলে কূল দাও। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, কেহ কেহ আর্ত্ত হইয়া আমায় ডাকে, তাহাকেও

আমি আশ্রয় দিই। দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয় অচিরে আশা সূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়ান্ধকার দূর করিল, বিপৎসাগরে কূল পাইলাম।"

ঈশ্বরানুগ্রহে বিসূচিকারোগে জীবন লাভ করিয়া এবং পরে বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখে গিরিশের হৃদয় আকর্ষিত হইল বটে, কিন্তু এতদিন যে সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহা কি সহজে যায়? কখন বিশ্বাস, কখন সন্দেহ আসিয়া তাঁহাকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিল। এই ঘোর সন্দেহ-আন্দোলিত অবস্থার কথা যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই বলে গুরু-উপদেশ ব্যতীত এ সন্দেহ দূর হইবে না। কিন্তু তাঁহার মন বলিল, মানুষকে গুরু বলি কিরূপে? "গুরুর্ব্রহ্মাঃ গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর" বলিয়া মানুষকে কিরূপে প্রণাম করিব? ঈশ্বর বলিয়া প্রত্যয় না করুন, মহাদেব চরিত্রের উপর গিরিশচন্দ্রের বড় ভক্তি ছিল। যিনি সকলকে সুধা দিয়া স্বয়ং হলাহল পান করিয়াছেন, সকলের ঘৃণ্য অস্থি ভস্ম যাঁর আদরের সামগ্রী, ত্রিভুবনত্যক্ত ভূত প্রেত পিশাচগণের যিনি আশ্রয়দাতা, তিনি সত্য থাকুন আর নাই থাকুন, ঈশ্বর বলিয়া তাঁহাকে কল্পনা করা যায়। হৃদয়দ্বন্দ্বে বিকলিত হইয়া গিরিশ ভাবিলেন তারকনাথের মানত করিয়া লোকে উৎকট দৈহিক ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করে, আমার এ দুশ্চিকিৎস্য মানসিক ব্যাধি কি আরাম হইবে না? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। মানস করিয়া গিরিশচন্দ্র কেশ-শ্মশ্রু রাখিলেন। নিত্য গঙ্গাস্নান, শিবপূজা, হবিষ্য আহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি পদব্রজে তারকেশ্বরে গিয়া শিবরাত্রি ব্রত পালন করিতেন। ক্রমে তাঁহার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

অনুমান ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ চাঁদ জহুরী গ্রেটন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্ব ক্রয় করেন। এই সময় হইতে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের বেতন ভোগী হন। ইতিপূর্ব্বে রঙ্গালয় হইতে তিনি বেতন গ্রহণ করেন নাই। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ফলে কোন পুস্তক আসিল না। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং পুস্তক লিখিতে ব্রতী হইলেন। অফিসের কর্ম্ম থাকিতে পুস্তক রচনা প্রভৃতি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, গিরিশচন্দ্র প্রতাপ জহুরীর অনুরোধে পার্কার সাহেবের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর পার্কার সাহেব গিরিশচন্দ্রকে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। সাহেব একবার

ঋণজালে জড়িত হন, এবং উত্তমর্ণদিগের কবল হইতে চিরকাল রক্ষা পাইবার জন্য গিরিশ তাঁহাকে যেরূপ পরামর্শ প্রদান করেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া সাহেব ফল পাইয়াছিলেন। কারবার তুলিয়া দিয়া বিলাত গমন করিবার সময় পার্কার স্মরণচিহ্নস্বরূপ গিরিশচন্দ্রকে একটী অঙ্গুরীয় দিয়া যান।

গিরিশ রচনায় ব্রতী হইয়া প্রথম "মায়াতরু" ও "মোহিনী প্রতিমা" রচনা করেন তারপর "আনন্দ রহো" এ নাটকে গুরুমন্ত্র সাধনা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার তাৎকালিক মানসিক ভাবের পরিচয় আছে। ইহার পর গিরিশচন্দ্র পুরাণ ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া রাবণ বধ প্রভৃতি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন।

গিরিশ চন্দ্র পাণ্ডুলিপি স্বয়ং লিখিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়া যাইতেন একজন লিখিত। তাঁহার চিন্তা যেরূপ দ্রুতবেগে চলিত, হস্ত সেরূপ পারিত না।

প্রতাপ চাঁদ উত্তম ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তাঁহার অর্থনীতি উদার ছিল না। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের বেতনবৃদ্ধি লইয়া মনোমালিন্য হওয়ায় গিরিশচন্দ্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

ইহার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রকে কর্ম্মাধ্যক্ষ করিয়া গুর্ম্মখরায়, বর্ত্তমান কোহিনুরের রঙ্গমঞ্চে, ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু স্বজাতির তাড়নায় অল্পকালের মধ্যে গুর্ম্মুখকে থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে হয়। গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে অমৃত লাল বসু, দাশু চরণ নিয়োগী, অমৃত লাল মিত্র ও হরি প্রসাদ বসু এই চারিজন গুর্ম্মুখ রায়ের স্বত্ব ক্রয় করেন। এই সময় গিরিশ চৈতন্যলীলা, নিমাই-সন্ন্যাস প্রভৃতি ভক্তিরসাশ্রিত নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র পরমহংস দেবের কৃপাপ্রাপ্ত হন। পরমহংস দেবের কৃপালাভের পর গিরিশচন্দ্র যে সকল নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিই পরমহংস দেবের জীবন্তভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিত। কখন কখন কোন কোন চরিত্র,—যেমন বিল্বমঙ্গলের সাধক—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ-চন্দ্রকে নকল করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তৎপরে প্রসিদ্ধ মতিলাল শীলের বংশীয় গোপাল লাল শীল অমৃত প্রভৃতির নিকট হইতে অনুমান ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ৩০০০০৲ টাকায় ষ্টার রঙ্গালয়ের স্বত্ব ক্রয় করিয়া এমারেল্ড থিয়েটার নামে একটী নূতন রঙ্গালয় খোলেন। অমৃত প্রভৃতি নবরঙ্গালয় নির্ম্মাণ

করিবার জন্য হাতীবাগানে জমি কিনিলেন। এই সময়ে গোপাল লাল গিরিশচন্দ্রকে ২০০০ ৲ টাকা বোনাশ্ দিয়া তাঁহার থিয়েটারে লইয়া যান। এই বিশ হাজার টাকার মধ্যে চারি হাজার নিজের প্রাপ্য বেতন কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট ষোল হাজার গিরিশচন্দ্র অমৃত প্রভৃতিকে নূতন ষ্টার নির্ম্মাণ জন্য দান করেন। এই টাকা দিবার সময় গিরিশচন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন:—তোমরা ভদ্র সন্তান নানা প্রোপাইটার কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া এক্ষণে ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বাধীন হইলে। আমার অনুরোধ, যে সকল ভদ্র সন্তান তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহারা যেন কোনরূপে লাঞ্ছিত না হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ষ্টার খোলা হইল। এমারেল্ডে গিরিশচন্দ্র দুইখানি পুস্তক লেখেন। ক্রমে গোপাল লালের সখ মিটিল, গিরিশও ষ্টারে আসিয়া যোগদান করিলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশ দ্বিতীয়বার বিপত্নীক হয়েন। এই সাধ্বী স্ত্রীর পতিভক্তি অতুলনীয়া ছিল। এই পত্নী হইতেই গিরিশচন্দ্রের অর্থ, যশঃ মান প্রভৃতি সর্ব্ব সৌভাগ্যের সূচনা। ইঁহার গর্ভে দুইটী কন্যা ও একটী পুত্রসন্তান হইয়াছিল। কিন্তু একটীও তিন বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকে নাই। কন্যা-দুইটী প্রসূতির জীবদ্দশাতেই গতাসু হয়, শিশুপুত্রটী রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। এই দ্বিতীয়পক্ষের পুত্র কন্যা যেরূপ ঐশীভক্তির পরিচয় প্রদান করে তাহা অতীব বিস্ময়কর পুত্রটী রুগ্ন ছিল, গিরিশচন্দ্র অবিশ্রান্ত যত্নে তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। চিকিৎসায় কোন ফলোদয় না দেখিয়া বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য পুত্রকে লইয়া মধুপুরে যান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পুত্রটী অকালে মারা গেল। গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের সংসারের কেবল স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট রহিল। *"সাজান বাগান শুকিয়ে গেল"*।

পুত্রের পীড়াহেতু গিরিশচন্দ্র যে সময় নিয়মিতরূপে রঙ্গালয়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না, সেই সময়ে ষ্টারের স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন।

উপর্য্যুপরি বিপদে গিরিশচন্দ্রের হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল। তিনি সংসারের কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। মস্তিষ্ক স্থির করিবার জন্য গিরিশ এই সময় অঙ্ক-শাস্ত্র চর্চ্চা ও বিজ্ঞানালোচনা করিতেন। বাগ্মীবর মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞান সভাতেও তিনি এই সময় নিয়মিত ছাত্র শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

ষ্টারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর গিরিশচন্দ্র ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপন করেন। স্বনামখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভার প্রথম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই থিয়েটারের জন্য গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার ম্যাকবেথ অনুবাদ করেন। থিয়েটার বেশ চলিল, কিন্তু যাহা কিছু লাভ হয়, ঋণ সমস্তই গ্রাস করে, তার উপর স্বত্বাধিকারীর অমিতব্যয়িতা। গিরিশ ক্যাসের ভার নিজ হস্তে লইলেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। স্বত্বাধিকারীর সহিত মনোবিবাদবশতঃ গিরিশচন্দ্র ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রঙ্গালয়ের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

মিনার্ভার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে ষ্টারের স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় ষ্টারে লইয়া গেলেন।

ইহার পর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্ল্যাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং গিরিশচন্দ্রকে তথায় লইয়া যান। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ক্ল্যাসিক থিয়েটারের আমলে গিরিশচন্দ্র পুনরায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়বার ব্রতী হইবার কারণ এই,—গিরিশ চন্দ্রের বাটীর সন্নিকটে সে সময়ে একটী গোযানের আড্ডা ছিল এবং অনেক গাড়োয়ান ঐখানে সামান্য খোলার ঘরে বাস করিত। কেহ কেহ বা মাঠে পড়িয়া রাত্রিযাপন করিত। এক রাত্রে রিহার্শাল হইতে বাটী ফিরিবার সময় গিরিশচন্দ্র শুনিলেন কে যেন যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। তখন শীতকাল, শীত ও হিম নিবারণের জন্য আর্ত্ত ব্যক্তি একখানি খাটিয়ার নীচে শুইয়া আছে। তাহার উপর তাহার দারুণ জ্বর। গিরিশচন্দ্র অনুসন্ধানে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া অতিশয় কাতর হইলেন। পীড়িতকে তাঁহার দেউড়িতে স্থান দিলেন, কিন্তু সে রাত্রে তাহার ঔষধ ও শীতবস্ত্রের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রভাত হইলেই একটী হোমিওপ্যাথি ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া আনাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীর জন্য কম্বল ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। গিরিশের অক্লান্ত যত্নে রোগী আরোগ্য লাভ করিল। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার বাটীর সন্নিকটে তাঁহার বেতনভোগী ক্ষৌরকারের কলেরা হয়। গিরিশচন্দ্র যখন তাহার পীড়ার কথা অবগত হইয়া তাহাকে দেখিতে যান, তখন রোগীর প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। অতি কাতরস্বরে হতভাগ্য রোগ যন্ত্রণায় "বাবু ঔষধ, বাবু ঔষধ" ক্রমান্বয়ে বলিতে থাকে। চিকিৎসা কার্য্য ছাড়িয়া অবধি গিরিশচন্দ্র কোনরূপ

হোমিওপ্যাথি ঔষধ নিজের কাছে রাখিতেন না। কিনিয়া আনিয়া দিবারও সময় নাই। গিরিশচন্দ্র সাময়িক একটা ব্যবস্থা করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু রোগীর আর্ত্তনাদ ও ঔষধের জন্য কাতর প্রার্থনা তাঁহার হৃদয়ে অতি তীব্রভাবে বিদ্ধ হইয়া রহিল। রোগীর প্রাণ শেষ হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের যন্ত্রণা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি এইরূপ অবস্থার দীন দরিদ্রগণকে ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্তির জন্য দ্বিতীয় বার ঔষধাদি ক্রয় করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী হইলেন। জীবনের শেষদিন অবধি তিনি আর সে ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র কিছুদিনের জন্য মিনার্ভায় আসিয়া কার্য্য করেন। মণিহরণ, নন্দদুলাল প্রভৃতি এই সময়ের রচনা। এই সময় তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠা কন্যার লোকান্তর হয়। মিনার্ভায় কয়েক মাস কায করিবার পর অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় ক্লাসিকে লইয়া গেলেন। দ্বিতীয়বার ক্লাসিকে আসিয়া মনের মতন, ভ্রান্তি, সৎনাম, আয়না প্রভৃতি রচনা করিয়া দেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশ পুনরায় মিনার্ভার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া হরগৌরী, বলিদান, প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক রচনা করেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কোহিনুর প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহার স্বত্বাধিকারী গিরিশ-চন্দ্রকে ১০,০০০৲ টাকা বোনাশ্ দিয়া নিজ থিয়েটারে নিযুক্ত করেন। পরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় মিনার্ভায় লইয়া আসেন। ইহাই গিরিশচন্দ্রের জীবনের শেষ রঙ্গস্থল।

জীবনের শেষ কয় বৎসর গিরিশচন্দ্র দুরন্ত হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে সামান্য জ্বর দেখা দেয়, কিন্তু এই সামান্য জ্বরই কালস্বরূপ হইয়া উঠিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত্রি ১।২০ মিঃ, গিরিশচন্দ্রের জীবনান্ত হয়। শেষ সময় যতই সন্নিকট হইতে লাগিল যন্ত্রণা ততই বাড়িতে লাগিল, এমন কি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইতেছিল। ক্ষণিক চৈতন্যের অবকাশে গিরিশচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন, "যদি এসেছ, নেশা কাটিয়ে দাও"। "জয় রামকৃষ্ণ—চল" ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কথা।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে, প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন ভারতের শাসনকর্ত্তা, সেই সময় গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন ভারতের রাজপ্রতিনিধি, সেই সময় গিরিশচন্দ্র পরমধাম প্রাপ্ত হন। এই সপ্তষষ্টি

বৎসরের যেমন বিচিত্র ইতিহাস, গিরিশচন্দ্রের জীবন-কাহিনীও তেমনি বৈচিত্র্যময়ী।

গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন, কর্ম্মজীবন ও গার্হস্থ্য জীবন, তিনই পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ। বাল্যকাল হইতে দুঃখ তাঁহার চির সহচর। মহাদুঃখে নিপতিত হইয়া তিনি সংসারে যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন সেই অভিজ্ঞতাই তাঁহার কর্ম্ম বা নাট্যজীবনের শিক্ষয়িত্রী, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রসূতি।

পঁয়ত্রিশ বর্ষ বয়সে আরম্ভ করিয়া ৩০ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে গিরিশচন্দ্র প্রহসন গীতিনাট্য ও নাটকে সর্ব্বসমেত ৭৯ খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি অনেক আছে।

বেঙ্গল থিয়েটার ব্যতীত কলিকাতায় আর যে কয়টী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার সকল গুলিই গিরিশচন্দ্রের দ্বারা স্থাপিত না হউক, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থায়িত্ব ও উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কঠিন জীবন সমস্যার দিনে, এই সকল রঙ্গালয় হইতে যাঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন, তাহারা যে গিরিশচন্দ্রের নিকট ঋণী, তাহা স্বীকার করিতে বোধ হয় কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না।

রঙ্গালয় সুসভ্য সমাজের অঙ্গ বিশেষ। গিরিশচন্দ্র সেই অঙ্গের গঠন ও সৌষ্ঠব সম্পাদন জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বিধাতা তাঁহাকে কবিপ্রতিভা, অভিনয় প্রতিভা, উভয়ই তুল্যরূপে দান করিয়াছিলেন। গিরিশ-চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী পুরুষ সময়ের প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বিধাতার কর্ম্মসাধন করিয়া গিরিশচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্র হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, বঙ্গের অদৃষ্টাকাশে আবার কতদিনে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবিভাদীপ্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হইবে তাহা বিধাতাই জানেন।

মহাভারত।

(স্বামীবিবেকানন্দ)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

মহাভারত এই সাবিত্রীর উপাখ্যানের মত শত শত মনোরম উপাখ্যানে পূর্ণ। আমি আপনাদিগকে প্রথমেই বলিয়াছি, জগতের মধ্যে মহাভারত একখানি বিপুল কলেবর গ্রন্থ। উহা অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত এবং উহা প্রায় লক্ষ শ্লোকাত্মক।

যাহা হউক, এক্ষণে মূল উপাখ্যানের সূত্র আবার ধরা যাউক। পাণ্ডবগণ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বনে বাস করিতেছেন—এই অবস্থায় আমরা পাণ্ডবদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছি। তথায়ও তাঁহারা দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণা প্রসূত নানাবিধ অত্যাচার হইতে একেবারে নির্মুক্ত হন নাই, কিন্তু দুর্য্যোধন অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধনে কখনই কৃতকার্য্য হয় নাই।

অরণ্যে বাসকালে পাণ্ডবগণের এক দিনের ঘটনা আমি আপনাদের নিকট বলিব। একদিন তাঁহারা বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুলকে জল অন্বেষণ করিয়া আনিবার অনুমতি করিলেন। তিনি দ্রুতপদে গমন করিয়া অনেক অন্বেষণ করিয়া একস্থানে অতি নির্ম্মলসলিল এক সরোবর দর্শন করিলেন। তিনি যেমন জলপানার্থ সরোবরে অবতরণ করিবেন, শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "বৎস, জলপান করিও না। অগ্রে মৎকৃত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান কর, পরে এই জল যথেচ্ছ পান করিও।" কিন্তু নকুল অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত থাকাতে উক্ত বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া ইচ্ছামত জলপান করিলেন, কিন্তু জলপান করিবামাত্র তিনি দেহত্যাগ করিলেন। নকুলকে অনেকক্ষণ ফিরিতে না দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সহদেবকে নকুলের অন্বেষণার্থ ও জলানয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। সহদেবও ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে উক্ত সরোবরসমীপে যাইয়া ভ্রাতা নকুলকে মৃত অবস্থায় নিশ্চেষ্টভাবে পতিত দেখিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুদর্শনে অতিশয় শোকার্ত্ত সহদেব অতিরিক্ত তৃষ্ণার্ত্ত থাকাতে জলাভিমুখে যেমন অগ্রসর হইলেন, অমনি তিনিও নকুলের মত শুনিলেন, "বৎস, অগ্রে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান কর,

পশ্চাৎ জলপান করিও।” তিনিও ঐ বাক্য অমান্য করিয়া জলপান করিলেন ও জলপানান্তেই নকুলের ন্যায় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পরে অর্জ্জুন ও ভীমও ঐরূপ ভ্রাতৃগণের অন্বেষণে ও জলানয়নার্থ প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারাও কেহ ফিরিলেন না। তাঁহাদেরও নকুল সহদেবের ন্যায় অবস্থা হইল। তাঁহারাও জলপান করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং উঠিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণের পর পরিশেষে সেই মনোহর সরোবরের সমীপদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে মৃত অবস্থায় ভূতলে শয়ান দেখিলেন। এই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণ শোকভারাক্রান্ত হইল—তিনি ভ্রাতৃগণের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি হঠাৎ শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, “বৎস, অতি সাহস করিওনা। আমি একজন যক্ষ—বকরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া এই সরোবরে বাস করি—এই সরোবর আমার অধিকৃত। আমাকর্ত্তৃকই তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ প্রেতাধিপপুরীতে নীত হইয়াছে। হে রাজন্, যদি তুমিও তোমার ভ্রাতৃগণের ন্যায় আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান না করিয়া জলপান কর, তবে তোমাকেও ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পার্শ্বে পঞ্চম শবরূপে শয়ন করিতে হইবে। হে কুরুনন্দন, প্রথমে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিয়া স্বয়ং যথেচ্ছ জলপান কর ও যত ইচ্ছা অন্যত্র লইয়া যাও।” যুধিষ্ঠির বলিলেন, “আমি যথাযথ আপনার প্রশ্নগুলির উত্তরদানে চেষ্টা করিব। আপনি আমাকে যথাভিরুচি প্রশ্ন করুন। তখন যক্ষ তাঁহাকে একে একে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, যুধিষ্ঠিরও সমুদয় প্রশ্নগুলিরই সদুত্তর প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে দুইটী প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক তাহাদের উত্তর আপনাদের নিকট বলিতেছি। যক্ষ জিজ্ঞাসিলেন, “কিমাশ্চর্য্যং” অর্থাৎ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার কি? যুধিষ্ঠির তদুত্তরে বলিলেন,—

“অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।”

ভাবার্থঃ—প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা দেখিতেছি, আমাদের চারিদিকে প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা এখনও মরে নাই, তাহারা ভাবিতেছে যে তাহারা কখনও মরিবে না। জগতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার—মৃত্যু অহরহঃ সম্মুখে থাকিলেও কেহ বিশ্বাস করে না যে, সে মরিবে।

যক্ষের আর একটী প্রশ্ন ছিল, "কঃ পন্থা"--অর্থাৎ কোন্ পথ অনুসরণ করিলে মানবের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হয়? যুধিষ্ঠির ঐ প্রশ্নের এই উত্তর প্রদান করেন :—

তর্কোঽ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্ন।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

ভাবার্থঃ—তর্কের দ্বারা কিছুই নিশ্চয় হইতে পারে না—কারণ, জগতে নানা মতমতান্তর রহিয়াছে। বেদও নানাবিধ—উহার একভাগে যাহা বলিতেছে, অপর ভাগ তাহারই প্রতিবাদ করিতেছে। এমন দুই জন মুনি বাহির করিতে পারা যায় না, যাঁহাদের পরস্পর মতভেদ নাই। ধর্ম্মের গুপ্ত রহস্য যেন তমোময় গুহায় নিহিত রহিয়াছে। অতএব মহাপুরুষগণ যে পথে চলিয়াছেন, সেই পথই অনুসরণীয়।"

যক্ষ যুধিষ্ঠিরের সমুদয় উত্তর শ্রবণ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "হে রাজন্, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি বকরূপী ধর্ম্ম। আমি তোমায় পরীক্ষার জন্যই এইরূপ করিয়াছি। তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহই মরে নাই। আমার মায়া বলেই তাহারা মৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হে ভারতবর্ষভ, তুমি যখন অর্থকামাপেক্ষা আনৃশংস্যকেই শ্রেষ্ঠতর স্থির করিয়াছ, তখন তোমার সকল ভ্রাতৃবর্গই জীবিত হউক।" যক্ষ এই কথা বলিবামাত্র ভীমাদি পাণ্ডবচতুষ্টয় জীবিত হইয়া উঠিলেন।

এই উপাখ্যান হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রকৃতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। যক্ষের প্রশ্নসমুদয়ের তৎকর্তৃক উত্তর হইতে আমরা দেখিতে পাই, রাজা অপেক্ষা তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ যোগীর ভাবই তাঁহার মধ্যে প্রবল ছিল।

এদিকে পাণ্ডবদিগের দ্বাদশবর্ষ বনবাসের কাল শেষ হইয়া অজ্ঞাতবাস করিবার ত্রয়োদশবর্ষ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। এই কারণে যক্ষ তাঁহাদিগকে বিরাটের রাজ্যে গমন করিয়া তথায় যাহার যেরূপ অভিরুচি, তদ্রূপ ছদ্মবেশে থাকিবার উপদেশ দিলেন।

এইরূপে দ্বাদশবর্ষ বনবাস সমাপনান্তে তাঁহারা বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতবাসের একবর্ষ যাপনার্থ বিরাটরাজ্যে গমন করিলেন ও তথায় বিরাট্ রাজার অধীনে সামান্য সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট

রাজার দ্যূতজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভাসদ হইলেন। ভীম পাচককর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। অর্জ্জুন নপুংসকবেশে রাজকন্যা উত্তরার নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার শিক্ষক হইয়া রাজার অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। নকুল রাজার অশ্বশালার অধ্যক্ষ হইলেন এবং সহদেব রাজার গোসমূহের তত্ত্বাবধানকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীবেশে রাজ্ঞীর অন্তঃপুরে তাঁহার পরিচারিকারূপে গৃহীত হইলেন। এইরূপে ছদ্মবেশে পাণ্ডব ভ্রাতৃগণ একবৎসর নিরাপদে অজ্ঞাতবাসের কাল অতিবাহিত করিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাদের অন্বেষণার্থ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। একবর্ষ শেষ হইবার ঠিক পরেই কৌরবগণ তাঁহাদের সন্ধান পাইলেন।

এইবার যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এক দূত পাঠাইলেন। দূত ধৃতরাষ্ট্র সমীপে যাইয়া যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারা ধর্ম্ম ও ন্যায়তঃ অর্দ্ধরাজ্যের অধিকারী। অতএব যেন তাঁহাদিগকে এক্ষণে অর্দ্ধ-রাজ্য প্রদান করা হয়। কিন্তু দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অতিশয় দ্বেষ করিত —সুতরাং সে কোন মতেই পাণ্ডবগণের এই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায় সম্মত হইল না। পাণ্ডবেরা, এমন কি, রাজ্যের অতি অল্পাংশস্বরূপ একটী প্রদেশ, এমন কি, পাঁচখানি গ্রাম পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন বলিলেন। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব দুর্য্যোধন বলিল, সে বিনা যুদ্ধে এক সূচ্যগ্র ভূমিও পাণ্ডবগণকে প্রদান করিবে না ধৃতরাষ্ট্র সন্ধি করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কৃষ্ণও কৌরব সভায় গিয়া এই আসন্ন যুদ্ধ ও জ্ঞাতিক্ষয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি কৌরব রাজসভার বৃদ্ধগণ দুর্য্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সন্ধির চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইল। সুতরাং উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে লাগিল এবং ভারতের সকল ক্ষত্রিয়গণই এই যুদ্ধে যোগদান করিলেন।

এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের প্রাচীন প্রথা ও নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইয়াছিল। একদিকে যুধিষ্ঠির, অপর দিকে দুর্য্যোধন। উভয়েই নিজ নিজ পক্ষে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ভারতের সকল রাজগণের নিকট দূত পাঠাইতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, এইরূপ যাঁহার অনুরোধ প্রথম পৌঁছিবে, ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়কে তাহারই পক্ষাবলম্বী হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে বিভিন্ন রাজা ও যোদ্ধৃবর্গ অনুরোধের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে পাণ্ডব বা কৌরবগণের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। পিতা

হয়ত একপক্ষে, পুত্র হয়ত অপর পক্ষে যোগ দিলেন। এক ভ্রাতা হয়ত এক পক্ষে, অপর ভ্রাতা হয়ত অপর পক্ষে যোগ দিলেন। তখনকার সমরনীতি বড়ই অদ্ভুত প্রকারের ছিল। সারাদিনের যুদ্ধের পর সন্ধ্যাসমাগত হইলে যখন যুদ্ধ শেষ হইত, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে আর বৈরভাব থাকিত না, এমন কি এক পক্ষ অপর পক্ষের শিবিরে পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। আবার প্রাতঃকাল হইলেই কিন্তু তাহারাই পরস্পর যুদ্ধ করিবে। মুসলমানগণের ভারত আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুগণ নিজেদের এই চরিত্রগত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। আবার সেই প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, অশ্বারোহী পদাতিককে আঘাত করিতে পারিবে না, বিষাক্ত অস্ত্রের দ্বারা কেহ কখন যুদ্ধ করিতে পারিবে না, নিজের যে সুবিধাগুলি আছে, শত্রুরও ঠিক সে গুলি না থাকিলে তাহাকে কখন পরাভূত করিতে পারিবে না, কোন প্রকার ছল প্রয়োগ করিতে পারিবে না, মোট কথা, কোন প্রকারে শত্রুর কোন ছিদ্র থাকিলে তাহার অবৈধ সহায়তা লইয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারিবে না ইত্যাদি। যদি কেহ এই সকল সমরনীতি উল্লঙ্ঘন করিতেন তবে তিনি ঘোর অযশের ভাগী হইতেন, তাঁহার আর সাধু সমাজে মুখ দেখাইবার যো থাকিত না। তখনকার ক্ষত্রিয়গণ এইরূপে শিক্ষিত হইতেন। যখন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতের উপর বহিরাক্রমণের তরঙ্গ আসিল, তখন হিন্দুরা তাঁহাদের আক্রমণকারিদের প্রতি সেই শিক্ষামতই ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বারবার পরাভূত করিয়াছিলেন এবং প্রতিবার পরাভবের পরই উপহারাদি দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধিই এই ছিল যে, অপরের দেশ কখন বলপূর্ব্বক অধিকার করিবে না আর কেহ পরাস্ত হইলে তাহার পদমর্য্যাদানুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুসলমান বিজেতৃগণ কিন্তু হিন্দু রাজগণের উপর অন্য প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা একবার তাঁহাদিগকে হাতে পাইলে বিনা বিচারে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেন।

এই যুদ্ধপ্রসঙ্গে আর একটী বিষয় আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। মহাভারত বলিতেছেন, যে সময়ে এই যুদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তখন কেবল যে সাধারণ ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহা নহে, তখন দৈবাস্ত্রের ব্যবহার ছিল—এই দৈবাস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইলে মন্ত্রশক্তি, চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন হইত। এইরূপ দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এক

ব্যক্তিই দশলক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ও তাহাদিগকে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া দগ্ধ করিতে পারিতেন। এই মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ করিয়া এক বাণ প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র বাণ বৃষ্টি হইবে—এই মন্ত্রশক্তিবলে, দৈবশক্তিবলে চারিদিকে বজ্রপাত হইবে, যে কোন জিনিষ দগ্ধ করিতে পারা যাইবে—ইত্যাদি নানাবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত দৈব ইন্দ্রজাল সৃষ্ট হইবে। রামায়ণ ও মহাভারত—এই উভয় মহাকাব্যের মধ্যে একটী বিশেষ বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়—এই সব অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কামানের ব্যবহারও দেখিতে পাই। কামান খুব প্রাচীন জিনিষ—চীনবাসী ও হিন্দুরা—উভয়ে উহার ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের নগরসমূহের প্রাচীরে লৌহনির্ম্মিত শূন্যগর্ভ নলনির্ম্মিত শত শত অদ্ভুত অস্ত্র থাকিত। লোকে বিশ্বাস করিত, চীনারা ইন্দ্রজালবিদ্যাদ্বারা শয়তানকে এক শূন্যগর্ভ লৌহনালীর ভিতর প্রবেশ করাইত—আর, একটী গর্ত্তে একটু অগ্নিসংযোগ করিলেই শয়তান ভয়ঙ্কর শব্দে উহা হইতে বাহির হইয়া অসংখ্য লোকের বিনাশ সাধন করিত।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৈবাস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া এক ব্যক্তির যেমন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার কথা পড়া যায়, তদ্রূপ তাঁহাদের যুদ্ধের জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন, ব্যূহরচনা, বিভিন্ন প্রকার সৈন্য-বিভাগ প্রভৃতির বিষয়ও পড়া যায়। চারি প্রকার যোদ্ধার কথা মহাভারতাদিতে বর্ণিত আছে—পদাতি, অশ্বারোহী, হস্তী ও রথ। ইহার মধ্যে আধুনিক যুদ্ধে শেষ দুইটীর ব্যবহার নাই। কিন্তু সে সময়ে উহাদের বিশেষ প্রচলন ছিল। শত সহস্র হস্তী, তাহাদের আরোহীর সহিত লৌহবর্ম্মাদিতে বিশেষ ভাবে রক্ষিত হইয়া সৈন্যশ্রেণীরূপে গঠিত হইত—এই হস্তিসৈন্যকে শত্রুসৈন্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তার পর অবশ্য রথের খুব প্রচলন ছিল। আপনারা সকলেই এই প্রাচীন রথের ছবি দেখিয়াছেন। সকল দেশেই প্রাচীন কালে এই রথের ব্যবহার ছিল।

কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষই কৃষ্ণ যাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ পক্ষে আসিয়া যুদ্ধে যোগ দেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তবে তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেন এবং যুদ্ধকালে পাণ্ডবগণকে পরামর্শদানে অঙ্গীকৃত হইলেন আর দুর্য্যোধনকে নিজ অজেয় নারায়ণী সেনা প্রদান করিলেন।

এইবার কুরুক্ষেত্রের সুবৃহৎ ভূভাগে অষ্টাদশদিবসব্যাপী মহাযুদ্ধ হইল এই যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ, উভয় পক্ষেরই আত্মীয় স্বজনগণ এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র বীর নিহত হইলেন। এমন কি, উভয় পক্ষের মিলিয়া যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, যুদ্ধাবসানে তাহার অতি অল্পই অবশিষ্ট রহিল। দুর্য্যোধনের দেহত্যাগের পর যুদ্ধের অবসান হইল—পাণ্ডবেরা—বিজয়শ্রীর অধিকারী হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, মহিষী গান্ধারী এবং অন্যান্য রমণীগণ পতিপুত্রাদির শোকে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন—যাহা হউক, অবশেষে সকলে কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে মৃত বীরগণের যথোচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইল।

এই যুদ্ধের প্রধানতম ঘটনা অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ—যাহা ভগবদ্গীতা নামক অপূর্ব্ব ও অমর কাব্যরূপে জগতে পরিচিত। ভারতের ইহাই সর্ব্বজন পরিচিত ও সর্ব্বজনপ্রিয় শাস্ত্র—আর ইহাতে যে উপদেশ আছে, তাহা সকল উপদেশের শ্রেষ্ঠতম উপদেশ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে কৃষ্ণার্জ্জুনে যে কথোপকথন হয়, তাহাই ভগবদ্গীতানামে পরিচিত। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ঐ গ্রন্থ পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে আমি উহা পড়িতে পরামর্শ দিই। ঐ গ্রন্থ আপনাদের দেশের উপরও কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা যদি আপনারা জানিতেন, তবে এতদিন উহা না পড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এমার্সন যে উচ্চ তত্ত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল যদি জানিতে চান, তবে শুনুন—তাহা এই গীতা। তিনি একবার ইংলণ্ডে কার্লাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, কার্লাইল তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দেন—কংকর্ডে যে উদার দার্শনিক তত্ত্বের আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার জন্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিই দায়ী। আমেরিকায় উদার ভাবের যত প্রকার আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায়, কোন না কোন রূপে সেগুলি উক্ত কংকর্ড আন্দোলনের নিকট ঋণী।

গীতার মূল নায়ক কৃষ্ণ। আপনারা যেমন নাজারথনিবাসী যীশুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া উপাসনা করেন, হিন্দুরা তেমনি ঈশ্বরের অনেক অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা শুধু যে একটী দুইটী অবতারে বিশ্বাস করেন, তাহা নহে, তাঁহারা জগতের প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম্মের রক্ষা ও অধর্ম্মের বিনাশার্থ সময়ে সময়ে সমাগত অনেক অবতারে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভারতের প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় এক এক অবতারের উপাসক।

কৃষ্ণের উপাসক এক সম্প্রদায়ও আছে। অন্যান্য অবতারের উপাসক অপেক্ষা বোধ হয় ভারতে কৃষ্ণোপাসকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কৃষ্ণভক্তগণ বলেন, কৃষ্ণই অবতারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারের কথা ভাবিয়া দেখ। তাঁহারা সব সন্ন্যাসী ছিলেন—সুতরাং গৃহীদের সুখে দুঃখে তাঁহাদের সহানুভূতি ছিলনা—কি করিয়াই বা থাকিবে? কিন্তু কৃষ্ণের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখ—তিনি কি পুত্ররূপে, কি পিতারূপে, কি রাজারূপে সর্ব্ববস্থায়ই আদর্শ চরিত্র দেখাইয়াছেন আর তিনি যে অপূর্ব্ব উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র জীবনে নিজে তাহা আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥"

ভাবার্থঃ—যিনি প্রবল কর্ম্মশীলতার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও নৈষ্কর্ম্যের মধুর শান্তি সম্ভোগ করেন, আবার যিনি মহা নিস্তব্ধতার মধ্যেও মহাকর্ম্মশীল, তিনিই জীবনের রহস্য যথার্থ বুঝিয়াছেন।

কৃষ্ণ ইহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন—ইহার উপায় অনাসক্তি। সমুদয় কর্ম্ম কর, কিন্তু কিছুর সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিও না। তুমি সর্ব্বদাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। কর্ম্ম আমাদের দুঃখের কারণ নহে, আসক্তিই দুঃখের কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থের কথা ধরুণ—ধনবান্ হওয়া খুব ভাল কথা। কৃষ্ণের উপদেশ এই:—অর্থ উপার্জ্জন কর, টাকার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, কিন্তু উহার প্রতি আসক্ত হইও না। পতিপত্নী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন, মানযশ সকলের সম্বন্ধেই এই কথা। আপনার উহাদিগকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিবেন যে, উহাদের প্রতি যেন আসক্ত হইয়া না পড়েন। আসক্তি বা অনুরাগের পাত্র কেবল একজন—স্বয়ং প্রভু ভগবান্—আর কেহ নহে। আত্মীয়স্বজনগণের জন্য কার্য্য করুন, তাহাদিগকে ভালবাসুন, তাহাদের হিতানুষ্ঠান করুন, যদি প্রয়োজন হয়, তাহাদের জন্য শত শত জীবন উৎসর্গ করুন, কিন্তু কখনও তাহাদের প্রতি আসক্ত হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে উক্ত উপদেশের উদাহরণস্বরূপ ছিল।

স্মরণ রাখিবেন যে, যে গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত বর্ণিত আছে, তাহা অনেক সহস্রবর্ষ প্রাচীন আর তাঁহার জীবনের কতক অংশ নাজারথ-নিবাসী যীশুর সহিত প্রায় সদৃশ। কৃষ্ণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কংস নামে একজন অত্যাচারী রাজা ছিল। আর কংস দৈববাণী শ্রবণে অবগত হইয়াছিল যে, শীঘ্রই তাহার নিধনকর্ত্তা জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা শুনিয়া সে নিজ অনুচরবর্গকে সমুদয় পুরুষ শিশুকে হত্যা করিবার আদেশ দিল। কৃষ্ণের পিতামাতাও কংস কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন—সেই কারাগারেই কৃষ্ণের জন্ম হইল। কৃষ্ণের জন্মগ্রহণমাত্র সমুদয় কারাগার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—নবজাত শিশু বলিয়া উঠিল—"আমিই সমগ্র জীবজগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, জগতের কল্যাণার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" আবার কৃষ্ণকে রূপকভাবে গোচারণশীল বলা হইয়াছে,—তাঁহার একটী নাম রাখালরাজ। ঋষিরা দূর হইতে জানিতে পারিয়া ছিলেন, সাক্ষাৎ ভগবান্ নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা তাঁহার পূজার জন্য উপস্থিত হইলেন। বাইবেলে যীশুর বিবরণেও পড়া যায়, তদানীন্তন হেরদ রাজা ঐরূপ কোন দৈববাণী শুনিয়া শিশু-হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন—তাঁহার পিতামাতার পথভ্রমণ কালে বেথলিহেমে একটী অশ্বের জাবপাত্রে তাঁহার জন্ম হয়। যাশুকে রূপকভাবে Shepherd বা মেষপালক বলা হয়। ভগবান্ যীশু শিশুরূপে জন্মিয়াছেন জানিতে পারিয়া প্রাচ্যদেশ হইতে কয়েকজন জ্ঞানী পুরুষ সেই শিশুকে দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের জীবনে এইরূপ কয়েকটী ঘটনার সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু উভয়ের জীবনলীলার অন্যান্য অংশে আর ঐ সাদৃশ্য নাই।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ এই অত্যাচারী কংসকে পরাভূত করিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং সিংহাসনাধিরোহণের কখন কল্পনাও করেন নাই। তিনি কর্ত্তব্য বলিয়াই ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন—উহার ফলাফল লইয়া—উহাতে নিজের কি স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে, এই বিষয়ে তাঁহার চিন্তাও উদয় হয় নাই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে মহারথী বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম—যিনি অষ্টাদশ-দিবসের মধ্যে দশদিন যুদ্ধ করিয়া তখনও মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া শরশয্যায় শয়ন ছিলেন—যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, বিবাহবিধি প্রভৃতি বিষয় প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশ অবলম্বন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট সাঙ্খ্য ও যোগতত্ত্ব এবং ঋষি, দেব ও প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা ও কিম্বদন্তী বিবৃত করিলেন। মহাভারতের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভীষ্মের এই উপদেশে পূর্ণ—উহা হিন্দুগণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ বিধান, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজপদে অভিষেকক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রক্তপাতে এবং আত্মীয়স্বজন ও কুলবৃদ্ধগণের নিধনে তাঁহার হৃদয় অতিশয় শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি ব্যাসের উপদেশানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

যুদ্ধাবসানে পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির ও তদীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সসম্মানে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিলেন। পরে সেই বৃদ্ধ ভূপতি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের সমুদয় ভারার্পণ করিয়া নিত্য পতিব্রতা মহিষী ও পাণ্ডবগণের মাতা কুন্তী সমভিব্যাহারে শেষ জীবন তপোনুষ্ঠানকামনায় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন

সিংহাসনে আরোহণের পর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ অতিবাহিত হইবার পর একদিন সংবাদ আসিল, তাঁহাদের পরম সুহৃৎ, পরম আত্মীয়, তাঁহাদের আচার্য্য, পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জ্জুন অনতিবিলম্বে দ্বারকায় গমন করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বশ্রুত শোক-সমচারেরই সমর্থন করিলেন। শুধু কৃষ্ণ কেন, যাদবগণের প্রায় কেহই জীবিত ছিল না। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের শোকে মুহ্যমান হইয়া ভাবিলেন, আর কেন, আমাদেরও যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া তাঁহারা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া মহাপ্রস্থানার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন। প্রাচীন কালে ভারতে রাজগণও অন্যান্য সকলের ন্যায় বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসী হইতেন। মহাপ্রস্থান এক প্রকার সন্ন্যাসবিশেষ। জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ মমতাত্যাগ হইলে মানব এইরূপ সন্ন্যাসের অধিকারী হইয়া থাকে। ইহাতে তাহাকে পানাহার বর্জ্জিত হইয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে হিমালয়ে চলিতে হয়। এইরূপ চলিতে চলিতে দেহত্যাগ হইয়া থাকে।

তখন দেবগণ ও ঋষিগণ আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে। স্বর্গে যাইতে হইলে হিমালয়ের উচ্চতম চূড়াসমূহ পার হইয়া যাইতে হয়। হিমালয়ের পরপারে সুমেরু পর্ব্বত।

সুমেরু পর্ব্বতের চূড়ায় স্বর্গলোক। তথায় দেবগণ বাস করেন। কেহ কখন এ পর্য্যন্ত তথায় সশরীরে যাইতে পারে নাই। দেবগণ যুধিষ্ঠিরকে এই স্বর্গে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

সুতরাং পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদী—স্বর্গগমনে কৃতসংকল্প হইয়া বল্কল পরিধানান্তর গন্তব্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একটী কুকুর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে তাঁহারা হিমালয়ে উপনীত হইলেন ও ক্লান্তপদে হিমালয়ের চূড়ার পর চূড়া লঙ্ঘন করিতে করিতে অবশেষে সম্মুখে সুবিশাল সুমেরু গিরী দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিস্তব্ধ ভাবে বরফ ভাঙ্গিয়া চলিতেছেন, এমন সময়ে দ্রৌপদী হঠাৎ অবসন্নদেহে পড়িয়া গেলেন, আর উঠিলেন না। সকলের অগ্রগামী যুধিষ্ঠিরকে ভীম বলিলেন, "রাজন্, দেখুন দেখুন, রাজ্ঞী দ্রৌপদী ভূমিতলে পতিত হইয়াছেন।" যুধিষ্ঠিরের চক্ষু দিয়া শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না কেবল বলিলেন, "আমরা কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি, এখন আর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবার সময় নাই। চল, অগ্রসর হও।" কিয়ৎক্ষণ পরে ভীম আবার বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন দেখুন, আমাদের ভ্রাতা সহদেব পড়িল।" রাজার শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি থামিলেন না। কেবল বলিলেন, "চল, চল, অগ্রসর হও।"

সহদেবের পতনের পর এই অতিরিক্ত শীত ও হিমানীতে নকুল, অর্জ্জুন, ও ভীমও একে একে পড়িলেন, কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির এক্ষণে একাকী হইলেও অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পশ্চাতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, যে কুকুরটী তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিল, সে এখনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও ঐ কুকুর হিমানীস্তূপের মধ্য দিয়া অনেক পর্ব্বত উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে উচ্চে আরোহণ করিতে লাগিলেন—এইরূপে অবশেষে তাঁহারা সুমেরু পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তখন স্বর্গের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল দেবগণ এই ধার্ম্মিক রাজার উপর স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইবার ইন্দ্র দেবরথে আরোহণ করিয়া তথায় অবতীর্ণ হইলেন ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে রাজন্, তুমি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, এ পর্য্যন্ত তুমি ব্যতীত সশরীরে স্বর্গারোহণের অধিকার আর কেহ পায় নাই।" কিন্তু যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে বলিলেন, "আমি আমার একান্ত অনুগত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে

না লইয়া স্বর্গে গমন করিতে প্রস্তুত নহি।” তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, তাহারা পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছেন।

এখন যুধিষ্ঠির তাহার পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহার অনুসরণকারি সেই কুক্কুরটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বৎস, এস, রথে আরোহণ কর।” ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, “রাজন্, আপনি একি বলিতেছেন। কুক্কুর রথে আরোহণ করিবে! এই অশুচি কুক্কুরটাকে আপনি এখনই পরিত্যাগ করুন। কুক্কুর কখন স্বর্গে যায় না। আপনার মনের ভাবটা কি? আপনি কি উন্মত্ত হইয়াছেন? মনুষ্যগণের মধ্যে আপনি ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ, আপনিই কেবল সশরীরে স্বর্গগমনের অধিকারী।” তখন রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, “হে ইন্দ্র, হে দেবরাজ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সমুদয় সত্য, কিন্তু এই কুক্কুরটী হিমানীস্তূপ লঙ্ঘনের সময় প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত বরাবর আমার সঙ্গে আসিয়াছে, একবারও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। আমার ভ্রাতৃগণ একে একে দেহত্যাগ করিল, মহিষী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল—সকলেই একে একে আমায় ত্যাগ করিল, কেবল এই একমাত্র আমায় ত্যাগ করে নাই। আমি এখন উহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি?” ইন্দ্র বলিলেন, “কুক্কুর সঙ্গী মানবের স্বর্গলোকে স্থান নাই। অতএব কুক্কুরটীকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে ইহাতে আপনার কোন অধর্ম্ম হইবে না।” যুধিষ্ঠির কহিলেন, “কুক্কুরটী আমার সঙ্গে যাইতে না পাইলে আমি স্বর্গে যাইতে চাহি না। যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ আমি শরণাগতকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি জীবন থাকিতে স্বর্গসুখসম্ভোগের জন্য অথবা দেবতার অনুরোধেও ধর্ম্মপথ কখন পরিত্যাগ করিব না।” তখন ইন্দ্র কহিলেন, “রাজন্, আপনার শরণাগত কুক্কুরটী স্বর্গে গমন করে, ইহাই যদি আপনার একান্ত অভিপ্রেত হয়, তবে আপনি এক কর্ম্ম করুন। আপনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, আর ও অশুচি প্রাণিহত্যাকারী, জীবমাংসভোজী, হিংসাবৃত্তিপরায়ণ কুক্কুর। ও পাপী, আপনি পুণ্যাত্মা। আপনি পুণ্যবলে যে স্বর্গলোক অর্জ্জন করিয়াছেন, আপনি উহার সহিত তাহা বিনিময় করিতে পারেন।” রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, “আমি ইহাতে সম্মত আছি। কুক্কুর আমার সমুদয় পুণ্য লইয়া স্বর্গ গমন করুক।”

যুধিষ্ঠির এই বাক্য বলিবামাত্র যেন পটপরিবর্ত্তন হইল। যুধিষ্ঠির

দেখিলেন, তথায় কুক্কুর নাই, তৎস্থলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম বর্ত্তমান। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রাজন্, আমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম, আপনার ধর্ম্ম পরীক্ষার্থ কুক্কুররূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। আপনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আপনি যখন একটা ক্ষুদ্র কুক্কুরকে আপনার পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গ প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহার জন্য নরকে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন আপনার ন্যায় নিঃস্বার্থ ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই। হে মহারাজ, আপনার জন্মে বসুধাতল ধন্য হইয়াছে। আপনি সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অতিশয় অনুকম্পাসম্পন্ন—এই মাত্র তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম। অতএব আপনি অক্ষয় সুখকর লোকসমূহ লাভ করুন। হে রাজন্ আপনি নিজধর্ম্মবলে ঐ সকল লোক উপার্জ্জন করিয়াছেন—আপনার প্রকৃষ্ট স্বর্গপদ লাভ হইবে।"

তখন যুধিষ্ঠির স্বর্গীয় বিমানারোহণে ইন্দ্র, ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় প্রথমে তাঁহার নরকদর্শনাদি কিছু পরীক্ষা আবার হইল, পরে স্বর্গস্থ মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া তিনি দিব্যদেহ লাভ করিলেন। অবশেষে অমর দেবদেহ প্রাপ্ত ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তখন সকল দুঃখের অবসান হইল—তাঁহারা সকলে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন।

এইরূপে মহাভারত উচ্চভাবাত্মক কবিতায় ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় বর্ণনা করিয়া এইখানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

উপসংহারে বলি, আপনাদের নিকট মহাভারতের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র দিলাম। কিন্তু মহাপ্রতিভা ও মনীষাসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস ইহাতে যে অসংখ্য মহাপুরুষগণের উন্নত ও মহিমাময় চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয়ও দিতে পারিলাম না। ধর্ম্মভীরু অথচ দুর্ব্বলচিত্ত বৃদ্ধ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনে একদিকে ধর্ম্ম ও ন্যায় এবং অপর দিকে পুত্রবাৎসল্যে আন্তরিক দ্বন্দ্ব, পিতামহ ভীষ্মের উন্নত চরিত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের উন্নত ধর্ম্মভাব, অপর চারি পাণ্ডবের উন্নত চরিত্রে, যাহাতে একদিকে মহাশৌর্য্যবীর্য্য, অপর দিকে সর্ব্বাবস্থায় জ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি অগাধ ভক্তি ও অপূর্ব্ব আজ্ঞাবহতার সমাবেশ, মানবীয় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় চরিত্র, এবং তপস্বিনী রাজ্ঞী গান্ধারী, পাণ্ডবগণের পরম স্নেহময়ী জননী কুন্তী, সদা পতিভক্তিপরায়ণা, সহিষ্ণুতার বিগ্রহস্বরূপিণী

দ্রৌপদী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র (যাহা পুরুষগণের চরিত্রের তুলনায় কোন অংশে অনুজ্জ্বল নহে)—এই কাব্যের এই সকল এবং অন্যান্য শত শত চরিত্র এবং রামায়ণের চরিত্রসমূহ বিগত সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমগ্র হিন্দু জগতের যত্নসঞ্চিত জাতীয় সম্পত্তি এবং তাহাদের চিন্তারাশি ও চারিত্র্যনীতির ভিত্তিস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন আর্য্যগণের জীবনচরিত ও জ্ঞানরাজির সুবৃহৎ বিশ্বকোষস্বরূপ। উহাতে যে সভ্যতার আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে, সমগ্র মানবজাতিকে তাহা লাভ করিবার উদ্দেশে এখনও বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তি-খণ্ডন।

(৪)

ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থের প্রথম সূত্রের প্রথম পদ "অথ" শব্দ। এই "অথ" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আচার্য্য রামানুজ যে-ভাবে অদ্বৈতমতের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে তিনি নিজে জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদ মতটী যতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈতবাদীর যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে এক্ষণে তিনি জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদই সত্য প্রমাণ করিবার জন্য প্রথমতঃ বিপক্ষ মত বর্ণনা করিয়া পরে তাহার খণ্ডন পূর্ব্বক নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। ইহা আচার্য্য রামানুজের শ্রীভাষ্যে লঘুপূর্ব্বপক্ষ ও লঘুসিদ্ধান্তপক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। আমরা এক্ষণে এই লঘুসিদ্ধান্ত পক্ষের যুক্তির গতি বিচার করিব এবং অদ্বৈতবাদিগণ আচার্য্যের এই আপত্তির কি উত্তর দিতে পারেন, তাহা দেখিব। লঘুপূর্ব্বপক্ষের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে তৎসম্বন্ধে এস্থলে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, এই লঘুপূর্ব্বপক্ষে আচার্য্য রামানুজ যে, কেবল জ্ঞানকর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদীর মতটী বর্ণনামাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে তিনি, প্রথম যেন অদ্বৈতবাদীর নিকট তর্ক করিতে করিতে পরাজিত হইয়া অদ্বৈতবাদীর মতটী স্থাপন করিয়াছেন, এবং একার্য্যে আচার্য্য এরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন যে, অনেক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত-

ধ্রুবষ্কর এভাবে তাঁহার নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়, জ্ঞানকর্ম্মের' সমুচ্চয়বাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা ভাস্কর মতাবলম্বী, আচার্য্য তাঁহাদের মতটীও খণ্ডন করিয়াছেন। এই ভাস্কর একজন অসাধারণ পণ্ডিত, তিনি এককালে কর্ণাট উজ্জয়িণীব শোভা সম্বর্দ্ধিত কবিয়াছিলেন। তাঁহার যজুর্ব্বেদভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য এক্ষণও পাওয়া যায়। কোন মতে তিনি শঙ্করের সমসাময়িক, কোন মতে তিনি ১০ম শতাব্দীর লোক। তাঁহার মত—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। মাধবীয় শঙ্করবিজয়ে ভাস্করের সহিত আচার্য্য শঙ্করের তুমুল বিচার হইতেছে দেখা যায়। আচার্য্য এই লঘুসিদ্ধান্তপক্ষে ইঁহার মতও খণ্ডন করিয়াছেন। পরন্তু ইহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং ইহা হইতে ভাস্কব মত ভাল বুঝা যায় না।

যাহা হউক উক্ত সিদ্ধান্তপক্ষে আচায্য যাহা বলিয়াছেন তাহা এই— প্রথম, যুক্তিপ্রদর্শন কবিয়া অদ্বৈতমতখণ্ডন, দ্বিতীয়, শ্রুতি সাহায্যে উহা খণ্ডন, তৃতীয়, শ্রুতির ব্যাখ্যা, চতুর্থ, এই ব্যাখ্যার জন্য বাক্যকারেব মত উল্লেখ এবং পঞ্চম, নিজ অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে একে একে উহা উদ্ধৃত কবিয়া অদ্বৈতবাদীর পক্ষ অবলম্বন কবিয়া উহার উত্তর প্রদান করিব। এক্ষণে যে অংশে যুক্তি সাহায্যে অদ্বৈতমত খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচ্য। ইহা আচায্যের শ্রীভাষ্যে এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যথা :—

অত্রোচ্যতে, যদুক্তমবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ, সা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ভবতীতি তদভ্যুপগম্যতে। অবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে বেদান্তবাক্যৈঃ বিধিৎসিতং জ্ঞানং কিং রূপমিতি বিবেচনীয়ম্। কিং বাক্যাদ্বাক্যার্থ-জ্ঞানমাত্রম? উত তন্মূলমুপাসনাত্মকং জ্ঞানমিতি? ন তাবদ্বাক্যজন্যং, তস্য বিধানমন্তরেণাপি বাক্যাদেব সিদ্ধেঃ, তাবন্মাত্রেণাবিদ্যানিবৃত্ত্যনুপলব্ধেশ্চ।

ন চ বাচ্যং—ভেদ-বাসনায়ামনিরস্তায়াং বাক্যমবিদ্যা নিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি, জাতেঽপি সর্ব্বস্য সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তি র্ন দোষায়, চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞাতেঽপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ। অনিবৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি। সত্যাং সামগ্র্যাং জ্ঞানানুৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ সত্যামপি বিপরীতবাসনায়ামাপ্তোপদেশ-লিঙ্গা দির্ব্বাধকজ্ঞানোৎপত্তি দর্শনাৎ। সত্যপি বাক্যার্থ জ্ঞানেঽনাদিবাসনয়া মাত্রয়া ভেদজ্ঞানমনুবর্ত্তত ইতি ভবতা ন শক্যতে বক্তুম্, ভেদজ্ঞানসামগ্র্যা অপি বাসনায়া মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোৎপত্তৈব নিবৃত্তত্বাৎ। জ্ঞানোৎপত্তাবপি মিথ্যারূপায়াস্তস্যা অনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তকান্তরাভাবাৎ কদাচিদপি নাস্যা বাসনায়া নিবৃত্তিঃ॥

বাসনা-কার্য্যং ভেদজ্ঞানং ছিন্নমূলং অথচানুবর্ত্তত-ইতি বালিশ-ভাষিতম্। দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদৌ তু-বাধক-সন্নিধাবপি মিথ্যাজ্ঞানহেতোঃ পরমার্থ-তিমিরাদি দোষস জ্ঞানবাধ্যত্বাভাবেনাবিনষ্টত্বাদ্মিথ্যাজ্ঞানানিবৃত্তিরবিরুদ্ধা, প্রবল-প্রমাণবাধিতত্বেন ভয়াদি কার্য্যং তু নিবর্ত্ততে।

অপিচ, ভেদবাসনানিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং কদাচিদপি জ্ঞানোৎপত্তির্ন সেৎস্যতি, ভেদবাসনায়া অনাদি কালোপচিতত্বেনাপরিমিতত্বাৎ তদ্বিরুদ্ধভাবনায়াশ্চাল্পত্বাদনয়া তন্নিরাসানুপপত্তেঃ। অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদি শব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতম্॥

"অর্থাৎ এই বিষয়ে বলা যাইতেছে যে, অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ এবং সেই নিবৃত্তিও ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই হয়, (শঙ্করমতে) এই যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা অঙ্গীকার করিতেছি, (কিন্তু) বেদান্তবাক্য সকল অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য যে জ্ঞানের বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই জ্ঞান কিরূপ, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। (সেই জ্ঞান) কি বাক্য জন্য বাক্যার্থ জ্ঞানমাত্র? অথবা সেই বাক্যার্থ-জ্ঞান-মূলক-উপাসনা? (এখানে) বাক্যজন্য (জ্ঞান) অর্থ হইতে পারে না, কারণ, (জ্ঞানের) বিধান ব্যতীত কেবল বাক্য হইতেই উহা সিদ্ধ হইতে পারে এবং কেবল বাক্যার্থ-জ্ঞানেও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না।"

"এ কথাও বলিতে পার না যে, ভেদসংস্কার নিবৃত্ত না হইলে (তত্ত্বমসি প্রভৃতি) বাক্যনিচয়-অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞান উৎপাদন করে না। আর যেমন চন্দ্র এক, এইরূপ জ্ঞানসত্ত্বেও দ্বিচন্দ্রজ্ঞান অর্থাৎ 'চন্দ্র দুইটী' এইরূপ ভ্রম-জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, তেমন একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, ভেদজ্ঞান তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয় না, তাহাও দোষাবহ নহে, মূল অবিদ্যা ছিন্ন অর্থাৎ বাধিত হওয়ায় ভেদজ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেও আর বন্ধন জন্মাইতে পারে না। (এ কথা বলিতে পার না)। কারণ, সমস্ত কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও যে, জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই। যেহেতু বিরুদ্ধ সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও আপ্তোপদেশ ও অন্যান্য কারণ বশতঃ (বিরুদ্ধধারণার) বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।"

"আর, বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, অনাদি বাসনা বশতঃ কিয়ৎ পরিমাণে ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়, ইহাও তুমি বলিতে পার না, কারণ, ভেদজ্ঞান যখন মিথ্যা, (তখন) জ্ঞানের উৎপত্তি মাত্রেই তৎকারণ ভেদ-বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। (বিশেষতঃ) তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও

(যদি) মিথ্যাময়ী সেই ভেদ-বাসনা নিবৃত্ত না হয় (তবে) জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও নিবারক উপায় না থাকায় কখনও সেই বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাসনা, সেই বাসনা, বিনষ্ট হইল, অথচ তৎকার্য্য ভেদজ্ঞান চলিতে থাকিল, ইহা মূঢ়ের কথা। দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন স্থলে কিন্তু ভ্রমের বাধক (জ্ঞান) সন্নিহিত থাকিলেও ঐ ভ্রমের যথার্থ কারণ তিমিরাদি (অর্থাৎ রোগ বিশেষ দোষ বিনষ্ট হয় না, কারণ উহা সত্য, সুতরাং সে ভ্রম, তাদৃশ জ্ঞানের নিবার্য্য নহে. সুতরাংই সে স্থানে মিথ্যা জ্ঞানের অনিবৃত্তি বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে, পরন্তু (সে স্থলেও আপ্তোপদেশাদি) প্রবল (নিঃসংশয়) প্রমাণদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, অর্থাৎ 'ইহা সত্য নহে—মিথ্যা' এইরূপ নিশ্চয় বশতঃ ভ্রমসম্ভূত ভয়াদি কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া যায়।"

"আরও এক কথা,—যাহারা ভেদ-বাসনা অপনয়নের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ইচ্ছা করেন, (তাহাদের মতে) কখনও জ্ঞানোৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ ভেদ-বাসনা অনন্তকাল সঞ্চিত, সুতরাং অপরিমিত, আর তাহার বিপক্ষ জ্ঞান বাসনা (অল্পকালের বলিয়াই) অল্প, সুতরাং তাহাদ্বারা সেই (প্রবল) ভেদ-বাসনার নিরাস হইতে পারে না। অতএব নিশ্চয়ই ধ্যান ও উপাসনাদি-শব্দগম্য জ্ঞানই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের বিধিৎসিত, অর্থাৎ বিধান করিতে অভীপ্সিত অর্থ—বাক্যার্থ-জ্ঞান নহে।"*

আচার্য্য রামানুজের এই সিদ্ধান্তপক্ষের প্রতি দৃষ্টি করিলেই দেখা-যায় যে, তিনি বিচারের খাতিরে অদ্বৈতবাদীর সঙ্গে "অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ" এই বিষয়ে একমত হইতেছেন, কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে ভিন্নমতা-বলম্বী। যে অংশে ভিন্ন তাহা এই—আচার্য্য শঙ্করমতে উক্ত উপায়—বেদান্তবাক্যজন্য বাক্যার্থজ্ঞান, এবং আচার্য্য রামানুজ মতে উহা বাক্যার্থজ্ঞান-মূলক-উপাসনা। আচার্য্য রামানুজ এই উপাসনা মধ্যে কর্ম্মের স্থান প্রদান করিবেন এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ স্থাপন করিবেন। আচার্য্য শঙ্কর উক্ত জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানসাধন ক্রিয়ার স্থল প্রদান করেন এবং বলেন জ্ঞানসাধন ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞান সংশয়াদিপরিশূন্য হইলে এবং জ্ঞানের প্রতি-বন্ধকগুলি বিনষ্ট হইলে সে ক্রিয়া স্বতঃই নিবৃত্ত হয়, সুতরাং জ্ঞানকর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদই সত্য। আচার্য্য রামানুজ বলেন সে জ্ঞানকে স্থায়ী করিবার

* অনুবাদটী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের শ্রীভাষ্য হইতে উদ্ধৃত হইল।

জন্য কর্ম্ম সততই আবশ্যক, কারণ জীবন থাকিতে প্রতিবন্ধকের আত্যন্তিক অপসারণ বা বিনাশ অসম্ভব। অধিক কি মুক্তপুরুষেরও মুক্তির স্থায়ীত্বের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক। (কিন্তু ইহার ফলে অবিদ্যা ও অবিদ্যাভীতি মুক্তেরও থাকে, তাহা তাঁহাকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল কি না ভাবিবার বিষয়) বৈকুণ্ঠের দ্বারী "জয় ও বিজয়ের" সংসারে পতন ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদী বলেন জ্ঞানকে স্থায়ী করিবার জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই, জ্ঞান সংশয়াদি পরিশূন্য হইলে সমাধিসিদ্ধব্যক্তি বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বেই অবস্থান করিতে সমর্থ হইতে পারেন। লোকমধ্যেও দেখা যায়—একটা কিছু জানিবার পর সেই জ্ঞানধারা স্বভাববশে যদি বহিতে থাকে, তাহা হইলে সেই জ্ঞানজনক কর্ম্মের আর প্রয়োজন হয় না। এ জন্য সমাধিসিদ্ধব্যক্তির জ্ঞানের পর আর ক্রিয়ারও আবশ্যকতা নাই, যাগযজ্ঞাদিরূপ কর্ম্ম ত দূরের কথা। আচার্য্য রামানুজের মতে এই জ্ঞানধারা নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য স্বীকার করা হয়, এ জন্য তাঁহার মতে জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের আবশ্যকতা হইল। মোটামুটী আচার্য্য-দ্বয়ের মতভেদ এইরূপ।

যাহা হউক এক্ষণে আচার্য্য রামানুজের কথার উত্তর দেওয়া যাউক। আচার্য্য রামানুজের প্রথম কথা এই যে, শ্রুতির অর্থ অবগত হইয়া যে জ্ঞান হয় তাহা কখন অবিদ্যার নিবর্ত্তক হইতে পারে না। তাহার কারণ দুইটী, প্রথম কেবল বেদান্ত বাক্যার্থজ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। দ্বিতীয়, তাহা হইলে উপনিষদে "ইহা জ্ঞান" ইত্যাদি বলিয়া জ্ঞানের বিধান থাকিত না।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, আচার্য্যের এই প্রথম যুক্তিটী ব্যর্থ। কারণ আমরা দেখিতে পাই বেদান্তের বাক্যার্থজ্ঞান হইতেই অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়। ইহার দৃষ্টান্তও আছে। নাম করিতে হইলে আমরা শুকদেব ও বাম-দেবের নাম করিব। শুকদেব আজন্মজ্ঞানী। তিনি পক্ষীরূপে যখন বৃক্ষোপরি ছিলেন তখন হরগৌরীর ব্রহ্মজ্ঞানকথা শুনিয়া জ্ঞানলাভ করেন, পরে তিনি ব্যাসের পুত্রকামনায় তপস্যার ফলরূপে আবির্ভাব হন। বামদেবও আজন্ম জ্ঞানী। যদি বলা হয়, তাঁহারা বেদান্ত বাক্যার্থ শ্রবণ করিয়া যে ধ্যান ও জীবন রক্ষার জন্য শাস্ত্র অনুসারে বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদের জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণ, তাহা হইলে বলিব

আমরা যে বর্ণাশ্রম লঙ্ঘন করিয়া জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা করি, তাহা নহে, তবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মধ্যে যতটুকু জ্ঞানোপযোগী ততটুকু লইয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিলে জ্ঞান হয় বলি। যদি কেহ উক্ত কর্ম্ম করিয়াও জ্ঞানচর্চ্চা না করে তাহা হইলে তাহার জ্ঞান হয় না। একর্ম্ম জ্ঞানহেতু নহে, ইহ জীবনধারণের হেতু। জ্ঞানের হেতু—জ্ঞানচর্চ্চা। এইজন্য ঐ জীবনধারণোপযোগী কর্ম্মকে আমরা কর্ম্মই বলি না, উহাকে আমরা জ্ঞানানুষ্ঠানের অনুকূল ক্রিয়া বলি। কারণ ইহাতে সেই জ্ঞানেরই অভ্যাস করা হয়, অর্থাৎ তাহার আবৃত্তি, অর্থ-বোধ, সংশয়-ছেদন প্রভৃতি করিতে হয়, অন্যকিছু করিতে হয় না। কিন্তু কর্ম্ম শব্দে যাগ-হোম-দান প্রভৃতি বুঝায় এবং তাহার ফলে ইহ পরলোকে সুখভোগ হয়। আর ইহাতে জীব-ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞানোৎপাদক চিন্তা প্রভৃতির একান্ত আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মশব্দের এই অর্থ লইয়াই কর্ম্মমীমাংসা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং সে সম্প্রদায় আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান। ইহারা জ্ঞানানুষ্ঠান স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম-ধ্যান প্রভৃতি যাহা কিছু, বেদ-বেদান্তে স্থলে স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহা যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ। অর্থাৎ ঐরূপ ধ্যান করিলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয় মাত্র। ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞানের জন্য ও-রূপ ধ্যানাদি বিহিত হয় নাই। কর্ম্মই বেদের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মজ্ঞান বেদের প্রতিপাদ্য নহে—ইহাই তাহাদের মত।

তাহার পর, বাক্যার্থজ্ঞানে অবিদ্যানিবৃত্তির কথা অন্য রকমেও বুঝা যায়। যেমন, দড়ীটাকে সাপ মনে করিয়াছিলাম, পরে একজন বিশ্বাস্যব্যক্তির মুখে শুনিলাম—উহা সাপ নহে—দড়ী, তখন যেমন দড়ী সম্বন্ধীয় অবিদ্যা নিবৃত্তি হইল, তদ্রূপ জীবজগৎ যাহা কিছু—সবই ব্রহ্ম, ইহা যদি শ্রুতি বলিয়া দেয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ অবিদ্যা নিবৃত্তি হইল না, কেন বলিব না? যদি বল, রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত মোক্ষপক্ষে খাটে না, অর্থাৎ জগতের ভেদজ্ঞান নিবৃত্তির পক্ষে সঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে, ব্যবহার অচল হয়, জীবনধারণ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বলিব, না, তাহা হয় না। নাট্যশালায় নটের আচরণের ন্যায় তাহাদেরও জীবনযাত্রানির্ব্বাহ হয়। তাঁহারা জগৎ মিথ্যা জানিয়াও জগতে মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারেন। আর যদি সাধক সমাধি সিদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনধারণাদির জন্যও কোন চিন্তা হয় না। আমাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবনধারণ তাঁহাদের নিকট একটা একান্ত বাঞ্ছনীয় বিষয় নহে। অবশ্য এস্থলে একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, যদি বাক্যার্থজ্ঞানে

অবিদ্যানিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে কত লোকে ত বেদান্ত পড়িয়া থাকে, তাহাদের তবে, অবিদ্যানিবৃত্তি হয় না কেন? সুতরাং নিশ্চয়ই ইহার অন্য হেতু আছে, ইত্যাদি। কিন্তু এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন যে, বাক্য হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা দ্বিবিধ, যথা—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। পরোক্ষজ্ঞান প্রথমে হয়, অপরোক্ষজ্ঞান পরে হয়। যে জ্ঞানটী পরোক্ষ হয়, তাহাই পরে অপরোক্ষ হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীভাষ্যের অনুবাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় যে একটী উত্তম টিপ্পনী দিয়াছেন, নিম্নে আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

"সত্যজ্ঞানের ন্যায় ভ্রমজ্ঞানও দুইপ্রকার—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। তন্মধ্যে, পরোক্ষ সত্যজ্ঞানের দ্বারা পরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়, এবং অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম নষ্ট হয়। 'আমি অমুক, আমার' ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্ঞান, বিভ্রান্ত বা মিথ্যা হইলেও প্রত্যক্ষজ্ঞান, এই কারণে, যতদিন আত্মৈকত্ব-বিষয়ে প্রত্যক্ষ না হইবে, ততদিন ঐ ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইবে না। 'তত্ত্বমসি' বাক্যদ্বারা আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহা যতদিন পরোক্ষভাবে থাকে—প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন ঐ বাক্যজনিত জ্ঞান কিছুতেই ভেদ-জ্ঞানকে অপনীত করিতে পারে না। এইজন্যই কখনও দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হইলে যতক্ষণ সেই দিক্‌টী নিজের প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ সহস্র উপদেশেও সেই দিগ্‌ভ্রম বিদূরিত হয় না। কপিল বলিয়াছেন "যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢবদ্‌অপরোক্ষাদৃতে॥" (সাংখ্যদর্শন ১।৫১ সূত্র।) অর্থাৎ দিঙ্‌মোহের ন্যায় অপরোক্ষজ্ঞান ব্যতীত যুক্তিদ্বারাও আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বাধিত হয় না।"

তবে এস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, আচার্য্য বেদান্তবাক্য হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে পরোক্ষজ্ঞানই বলেন না, তাঁহার মতে উক্ত জ্ঞান একেবারেই অপরোক্ষ হয়। একথা তিনি পরে বিচার করিবেন, সুতরাং ইহার উত্তর আমরা অদ্বৈতবাদীর পক্ষ হইতে তথায় প্রদান করিব। অবশ্য আচার্য্যের এ কথাটী শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদসম্প্রদায়ের কথা, সুরেশ্বর বা বাচস্পতিমিশ্রসম্প্রদায়ের কথা নহে। সুতরাং বেদান্তের বাক্যার্থজ্ঞানে অবিদ্যানিবৃত্তি হয় না, একথা আমরা মানিতে পারি না।

তাহার পর দ্বিতীয় কথার উত্তর এই যে, জ্ঞানের বিধান হইতেই উহাকে কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করা সঙ্গত হয় না। কারণ, প্রথমতঃ এমন উপনিষদ আছে যাহাতে জ্ঞানের বিধান পর্য্যন্তও নাই। ইহার দৃষ্টান্ত মাণ্ডুক্য;

ইহাতে 'তুমি জ্ঞান' এ কথাও বলা হয় নাই, কেবলই স্বরূপ কথন, কেবলই যেন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বর্ণন। আর অন্যান্য উপনিষদে "ইহা জ্ঞান" বলিয়া বিধান থাকিলেও সে বিধান কর্ম্মের বিধানের মত বিধান নহে। "এ জিনিষটাকে এই বলিয়া জ্ঞান" আর "এই কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, তোমার স্বর্গ সুখ, বা পুত্র হইবে" এই দুইটী বিধান একরূপ নহে। প্রথম স্থলে জিনিষটা বর্ত্তমান। দ্বিতীয় স্থলে আমাদের স্বর্গ সুখ বা পুত্র বর্ত্তমান নাই, উহা তখন ভবিষ্যতের গর্ভে, উহা পরে উৎপন্ন হইবে। সুতরাং জ্ঞানের বিধান থাকায় উহাকে কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত করা ঠিক নহে। যাহা হউক, ইহার পর আচার্য্য আর বিধি-সংক্রান্ত তর্ক উত্থাপন করিলেন না, পরন্তু তিনি উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি-সংক্রান্ত অদ্বৈতবাদীর উত্তরটীকে পুনরাক্রমণ করিলেন।

এক্ষণে আমরা এই আক্রমণটীর উত্তরপ্রদান করিব এবং তজ্জন্য ইহাকে নানা-স্তরে বিভক্ত করিলাম। তন্মধ্যে প্রথম স্তরটী এই—ন চ বাচ্যং ভেদবাসনায়াং অনিরস্তায়াং বাক্যং অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি ন বন্ধায় ভবতীতি। "অর্থাৎ—ভেদসংস্কার নিবৃত্ত না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান হইতে অবিদ্যানিবৃত্তি হয় না, যদি বল, তাহাও তুমি বলিতে পার না। আর অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান হইলেও যদি তৎক্ষণাৎ ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি না হয়, তাহাতেও কোন দোষ হয় না। কারণ 'চন্দ্র এক' এ জ্ঞান সত্ত্বেও অনেক সময় দ্বিচন্দ্র জ্ঞান নিবৃত্তি হয় না, তবে কি এই জ্ঞান নিষ্ফল? না তাহাও নহে। কারণ, ভেদজ্ঞানের মূল অবিদ্যা ছিন্ন হয় বলিয়া তখন ভেদজ্ঞান আর বন্ধন উৎপাদন করিতে পারে না।" ইত্যাদি। আচার্য্য এইরূপে অদ্বৈতবাদীর মুখ দিয়া এই কথা বলাইয়া লইয়া বলিতেছেন যে, একথা ঠিক নহে, যেহেতু "সত্যাং সামগ্র্যাং জ্ঞানোৎপত্তি-দর্শনাৎ" অর্থাৎ কারণ বর্ত্তমান থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হইবে না একথা বলা চলে না। দেখ বিপরীত বাসনা থাকিলেও আপ্তোপদেশ ও যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা তাহার হৃদয়ে উহার বাধকজ্ঞান উৎপন্ন হয়।" ইত্যাদি। আচার্য্যের উক্ত কথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে—

১। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যের কথা মানিয়া লইলেন যে, বাক্যার্থজ্ঞানে অবিদ্যানিবৃত্তি হয় না।

২। উহার কারণ তিনি এই নির্দ্দেশ করিলেন যে, ভেদবাসনা তখনও থাকে।

৩। ভেদবাসনা থাকিতে থাকিতে যে জ্ঞান হয় তাহা নিষ্ফল নহে, কারণ তদ্দ্বারা বন্ধন হয় না।

৪। ভেদজ্ঞানের মূল — ভেদসংস্কার বা ভেদবাসনা।

৫। ভেদজ্ঞানের মূল—অবিদ্যা।

৬। অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু কখন কখন ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না, যেমন চন্দ্র এক, ইহা জানা থাকিলেও দ্বিচন্দ্র জ্ঞান হয়।

৭। অদ্বৈতবাদী প্রথমে বলিলেন — ভেদসংস্কার থাকিতে বাক্যার্থ অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, পরে নিজের কথারই প্রতিবাদ করিয়া, তাহা স্থলবিশেষে হয়, ইহা স্বীকার করিলেন।

৮। আচার্য্যের উত্তর, অদ্বৈতবাদীর প্রথম কথাটীর, অর্থাৎ "ভেদবাসনায়াং অনিবস্তায়াং বাক্যং অবিদ্যনিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি" (ভেদ সংস্কার থাকিলে বেদান্তবাক্যে অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান হয় না) "এই অংশের। দ্বিতীয় অংশের উত্তর তিনি পরে দিবেন। দ্বিতীয় অংশটী এই কথা—"জাতেঽপি সর্ব্বস্য সহসৈব ন বন্ধায় ভবতীতি" অর্থাৎ আর জ্ঞান হইলেও বন্ধের কারণ হয় না, ইত্যাদি।

এই কয়টী কথার প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় আচার্য্য অদ্বৈতবাদীর বক্তব্য যে ভাবে সাজাইলেন তাহা কোন অদ্বৈতবাদী করিবেন না। তিনি অদ্বৈত-বাদীর মুখ দিয়া এমন কথা বাহির করাইলেন, যাহা পরক্ষণেই তাহারা প্রত্যা-হার করিতে বাধ্য হইল। যেহেতু তিনি অদ্বৈতবাদীর মুখ দিয়া বলাইলেন — "ভেদসংস্কার থাকে বলিয়া বেদান্তবাক্যার্থ অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মায় না।" কিন্তু ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আবার তিনি তাহাদের মুখ দিয়া বাহির করাইলেন।—

"আর অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মিলেও সহসা ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে কোন দোষ হয় না," । ইত্যাদি। এরূপভাবে প্রতিপক্ষের কথা সাজান দেখিলে মনে হয়, বাদী প্রতিপক্ষকে একটু উপহাস করিবার মতলব করিতেছেন মাত্র।

তাহার পর তিনি ভেদজ্ঞানের কারণ কি তাহা লইয়া সত্যান্বেষী পাঠককে একটু গোলে ফেলিয়া দিলেন। কারণ "ভেদবাসনায়াং অনিবস্তায়াং বাক্যং অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি।" অর্থাৎ "ভেদবাসনা নিরস্ত না হইলে বাক্য, অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না।" এই বাক্যে ভেদবাসনা অর্থাৎ ভেদসংস্কারকে তিনি অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক বলিলেন, আর প্রতিবন্ধক বলায় প্রকারন্তরে উহার অভাবকে জ্ঞানের কারণই বলা হইল। অধিক কি তিনি একটু পরেই একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যথা—"বাসনা-কার্য্যং ভেদজ্ঞানং" অর্থাৎ বাসনার কার্য্য ভেদজ্ঞান ইত্যাদি। সুতরাং এই

বাক্যে আচার্য্য ভেদজ্ঞানের কারণ ভেদসংস্কার বলিলেন, আবার "অনিত্যমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতি" অর্থাৎ "ভেদজ্ঞান অনিবৃত্ত হইলেও ছিন্নমূল বলিয়া বন্ধের নিমিত্ত হয় না" এই বাক্যে তিনি ভেদজ্ঞানের কারণকে অবিদ্যা বলিলেন। সুতরাং একটা জিনিষের দুইটা কারণ নির্দ্দেশ করা হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই কারণ দুইটীর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা বলা হইল না। ইহা না বলায় লেখার জটিলতাই বৃদ্ধি পাইল এবং ইহার সাহায্যে তিনি পাঠকের বুদ্ধিমোহ ঘটাইলেন কিনা, তাহা পাঠকবর্গই ক্রমে বুঝিতে পারিবেন।

তাহার পর এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আচার্য্য যাহা করিলেন তাহাও প্রশংসাযোগ্য নহে। আচার্য্য ধরিয়া লইলেন যে, অদ্বৈতবাদী যেন তাঁহার কথাতেই মানিয়া লইয়াছেন যে, বেদান্তের বাক্যার্থে অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান হয় না, কারণ তিনি অদ্বৈতবাদীর কথার উত্তরে "তাবন্মাত্রেণ অবিদ্যানিবৃত্তিঃ অনুপলব্ধে" অর্থাৎ "কেবল বাক্যার্থজ্ঞানে অবিদ্যানিবৃত্তি হয় না" এই কথা বলিয়াই বলিতেছেন "ন চ বাচ্যং ভেদবাসনায়াম্ অনিবৃত্তায়াং বাক্যম্ অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি" অর্থাৎ "ভেদবাসনা নিবৃত্ত না হইলে বাক্য অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না।" ইত্যাদি। আমরা বলি আচার্য্য এভাবে তাঁহার কথায় আমাদের যে সম্মতি আছে, তাহা ধরিয়া লইলেন কিরূপে? তাঁহার "তাবন্মাত্রেণ অবিদ্যানিবৃত্তিঃ অনুপলব্ধেঃ" এ কথা ত আমরা স্বীকার করি নাই। এবং এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদী বলেন আচার্য্য আমাদের সে সব কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্যটীকে এমন সুরে বলিলেন যে, আমরা যেন পদে পদে তাঁহার নিকট নিরস্ত হইয়া যাইতেছি। অবশ্য নিজের শরণাপন্ন ব্যক্তিগণের বুদ্ধি দৃঢ় করিবার জন্য এসুরে কথা বলায় সুফল ফলিতে পারে এবং তাঁহার নিজ বক্তব্যকে এসুরে বলিতে পারাও তাঁহার অসাধারণ শক্তিরই পরিচয় হয়, কিন্তু যাহারা বিচার করিয়া সত্য বুঝিয়া সাধন করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে এসুর যে বুদ্ধিমোহের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাউক এসব কথা, আচার্য্যকৃত প্রতিপক্ষের প্রতি অবিচারের কথায় আর কাজ নাই। এবার আচার্য্যের কথার উত্তর কি হইতে পারে দেখা যাউক। আচার্য্য বলিতেছেন "বেদান্তবাক্য অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মায় ইহা দেখা যায় না," কিন্তু ইহার উত্তরে যদি অদ্বৈতবাদী বলেন যে, "ভেদবাসনা থাকিতে বাক্য অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান উৎপন্ন করে

না" তাহা হইলে তিনি বলিবেন যে,না তাহা হইতে পারে না, "কারণ, জ্ঞানের কারণ বর্ত্তমান থাকিলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না একথার প্রমাণ নাই। যেহেতু বিরুদ্ধসংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও আপ্তোপদেশাদিদ্বারা বাধকজ্ঞান জন্মিতে দেখা যায়, ইত্যাদি। অদ্বৈতবাদী বলেন যে আচার্য্যের এ উত্তরে আমাদের মত খণ্ডিত হয় নাই। কারণ, "ভেদবাসনা থাকিলে বেদান্ত-বাক্য অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, অর্থাৎ তখন আত্মার সাক্ষাৎ-কার হয় না, নচেৎ উহা পরোক্ষজ্ঞান জন্মাইতে পারে। যেহেতু পরোক্ষ-জ্ঞান জন্মিলে যদি প্রতিবন্ধক ক্ষয় পর্য্যন্ত উক্ত জ্ঞানের প্রবাহ রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আত্মসাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, এস্থলে যে জ্ঞান পরোক্ষ হয়, তাহাই পরে অপরোক্ষ হয় বলিয়া জ্ঞানের কারণ বর্ত্তমান থাকিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়—ইহাই বলা হইল। পরন্তু জ্ঞান উৎপন্ন হয় না একথা বলা হইল না। অগত্যা আচার্য্য আমাদের মত খণ্ডন করিতে পারিলেন না। তাহার পর "কারণকূট বিদ্যমান থাকিলে যে, কার্য্য উৎপন্ন হইতে বাধা, আচার্য্যের এই কথাটী বিচার্য্য। এ কথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু এই নিয়ম-টীর দোহাই দিয়া তিনি যাহার দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয় বলিতেছেন, আমরা কেবল তাহারই দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয়, একথা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি উক্ত নিয়মের দোহাই দিয়া আপ্তোপদেশ ও যুক্তি প্রভৃতিকেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি আপ্তোপদেশাদিই কি সমুদায় কারণ? কি উহা কতিপয় কারণ? সমুদয় কারণ থাকিলে কার্য্য হইতে বাধ্য বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণ থাকিলে কি সে বাধ্য-বাধকতা থাকে? কখনই নহে। এজন্য অদ্বৈতবাদী বলেন, জ্ঞানোৎপত্তির কারণরূপে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধকের অভাবকেও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ প্রতিবন্ধকাভাব কার্য্যোৎপত্তির প্রতি একটী নিয়ত নিমিত্ত কারণ, ইহা ন্যায়ের সিদ্ধান্ত। আর যদি বলা হয়, আচার্য্য "আপ্তোপদেশলিঙ্গাদিভিঃ" এই পদের মধ্যস্থ আদিপদে উহাকে গ্রহণ করিলেন না, তাহা তোমায় কে বলিল? তাহা হইলে বলিব আচ্ছা বেশ, তাহা হইলে আমাদের কথার খণ্ডনটা হইল কোথায়? আমরা ভেদবাসনাকে প্রতিবন্ধক বলিয়াছি, আর সেইজন্যই বলিয়াছি, যে, ভেদবাসনা থাকিতে বেদান্তবাক্য "অপরোক্ষজ্ঞান" জন্মাইতে পারে না, পরন্তু সাধারণভাবে জ্ঞান জন্মাইতে পারে না এ কথা ত বলি না। আচার্য্য কিন্তু আমাদের এই কথাটীকে বিকৃত করিয়া বলিলেন "ভেদবাসনা থাকিতে

বেদান্তবাক্য "অবিদ্যানিবর্ত্তকজ্ঞান" জন্মাইতে পারে না, একথা যদি বল, তাহাও ঠিক নহে" ইত্যাদি। সুতরাং আচার্য্যের এ যুক্তির মূল্য কতটুকু তাহা বেশ বুঝা গেল। আর যদি বলা হয়, আচার্য্য যে বাসনার অভাবকে উক্ত জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহা হইলে ন্যায়তঃ যে দোষ হয়, সে দোষ ব্যতীত তাঁহার নিজের কথার প্রতিবাদ ঘটিয়া যায়। কারণ, তিনি কিছু পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে "তাবন্মাত্রেণ অবিদ্যানিবৃত্তিঃ অনুপলব্ধেঃ" অর্থাৎ বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানে অবিদ্যা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না, ইত্যাদি, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই বেদান্তবাক্য ও আপ্তোপদেশ মধ্যে যে ভিন্নতা তাহা কি? বস্তুতঃ ইহারা অভিন্ন, তাহা আচার্য্যকেও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আচার্য্যের এ কথায় আমাদের মত খণ্ডিত হইল না। তবে এই সঙ্গে এই কথাও আমাদের স্মরণ করা উচিৎ যে, হয় ত আচার্য্যের সময় অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে উক্ত বিকৃত অদ্বৈত মতাবলম্বী কেহ কেহ ছিলেন, আচার্য্য এস্থলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল ইহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহা হউক এই পর্য্যন্ত আচার্য্যের যুক্তির প্রথম অংশের বিচার, ইহার পর তিনি তাঁহার বিচারের দ্বিতীয় অংশটী অবলম্বনে খণ্ডন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং আগামী বারে আমরা এই দ্বিতীয়াংশের বিষয় আলোচনা করিব।

স্বর্গীয় মহাত্মা প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী।

(শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।)

যে মহাত্মার জীবন-কথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া আজ আমরা এই বিদ্বজ্জন সমাজে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি, তিনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক না হইলেও, বঙ্গের সাহিত্য ভাণ্ডারে অন্ততঃ এমন একটী মহোজ্জ্বল রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন যাহার সৌন্দর্য্য আচির বর্ত্তমান থাকিবে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি Thomas Grey (টমাস্ গ্রে)

'Elegy written on a Country Churchyard' (পল্লীগ্রামের গোরস্থানে লিখিত একটি শোকগাথা) নামক কবিতাটি মাত্র লিখিয়াই চিরযশস্বী হইয়াছেন। জন্ বনিয়ান্ (John Bunyan) নামক ইংলণ্ডীয় সুবিখ্যাত লেখক "Pilgri s Progress"(তীর্থযাত্রীর যাত্রা বিবরণ) নামধেয় সন্দর্ভ রচনা করিয়া ইংরাজী ভাষায় একখানি মাত্র শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ রাখিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছেন। আমাদের ধারণা বঙ্গের এই চিন্তাশীল সারস্বত প্রেমিকও তদ্রূপ "জীবন পরীক্ষা" নামক মানবীয় মনস্তত্ত্বের একখানি মাত্র রূপকেতিহাস মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া উচ্চ সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন এবং বাঙ্গালীর ও বঙ্গীয় পাঠকবর্গের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইঁহার "জীবন-পরীক্ষা", 'আনন্দ-তুফান", "মদখাও নেশা ছুটিবে না" প্রভৃতি সন্দর্ভগুলির ভাবসৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্য হইতেই আমরা ভাবুক ও রসিক প্রিয়নাথকে চিনিতে পারি এবং তাঁহার প্রকৃত জীবন-কথা জানিতে পারি। প্রিয়নাথকে চিনিবার এই একটা দিক। আর একদিকে তাঁহার পূত আচার ব্যবহার। এই দুই দিক্ হইতে অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি যে লেখক হিসাবে তিনি যেমন ভাবুক ও প্রেমিক ছিলেন, জীবনে অনুষ্ঠিত কার্য্য-কলাপেও প্রিয়নাথ তেমনি চরিত্রবান্, বন্ধুবৎসল, পিতৃমাতৃভক্ত, দীন, পরহিতচিকীর্ষু, আদর্শ মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান কথাগুলি আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত গোকর্ণী নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে ১২৭০ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক দীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন নৈষ্ঠিক সেকালের ব্রাহ্মণ, নাম ৺ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাতার নাম শ্রীমতী বরদায়িনী দেবী। পিতার সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। গ্রামের সামান্য আয় বিহীন জমা জমি মাত্র সম্বল ছিল। এই দরিদ্র নিঃস্ব পরিবার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আজকালকার শিক্ষা যাহাকে বলে, প্রিয়নাথের ভাগ্যে সেরূপ শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে নাই। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সামান্য শিক্ষা মাত্র আয়ত্ত করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় গুণে সৎশাস্ত্রাদির আলোচনা ও ভগবৎপ্রসঙ্গে নিত্য নিযুক্ত থাকিয়া প্রিয়নাথ কালে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সংসারী হইয়াও যোগীর পদবী অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পিতামাতার পরমভক্ত এবং পরিজনবর্গের উপর অত্যধিক প্রেমশীল ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বলিষ্ঠ ও সুগঠিত অবয়বযুক্ত বলিয়া বোধ

হইত। কিন্তু আকৈশোর শ্বাস ব্যাধি কবলিত হইয়া প্রিয়নাথের সুঠাম ও বলবান দেহ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিত। ঐ ব্যাধির দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাই প্রিয়নাথের ইচ্ছানুরূপ সারস্বত সেবার ও ইষ্ট-সাধনের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিল। অপর কোন ব্যাধি প্রিয়নাথের পূত কলেবরকে কখনও স্পর্শ করে নাই, তবে তাঁহার আর এক সময়ের অসুস্থতার কথা আমরা অবগত আছি। তখন কিছু কালের জন্য তিনি বায়ুরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ৪৫ বৎসর মাত্র ব্যাপী সামান্য জীবনকাল যদি ঐরূপভাবে ব্যাধিকবলিত না হইত তাহা হইলে আমরা আরও কতই না উচ্চভাবোদ্দীপক সৎগ্রন্থ তাঁহার লেখনী হইতে প্রাপ্ত হইতাম।

কলিকাতার অনেকগুলি গণ্য মান্য ধনাঢ্য ও কৃতবিদ্য মনীষী প্রিয়নাথের চরিত্র মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা দান করিতেন। *পরমার্থভাব-ভাণ্ডারস্বরূপ তাঁহার গ্রন্থনিচয় পাঠেই ইঁহারা তাঁহার প্রতি* আকৃষ্ট হন। শ্যামবাজারের স্বর্গীয় লোকপ্রিয় জমিদার রায় বিপিন বিহারি মিত্র, জোড়াসাঁকোর বদান্য সুধী ৺শ্যামলাল মল্লিক, বাগবাজারের রায় নীরদ কৃষ্ণ দত্ত, পানিহাটীর ৺প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের ইনি সম্মানিত বন্ধু ছিলেন। শোভাবাজার রাজ-বংশের দৌহিত্র, পণ্ডিত ও ভগবৎ-প্রেমিক স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু, 'অপূর্ব্ব কাবাবাসাদি' গ্রন্থ প্রণেতা সুপণ্ডিত ৺ কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন বহুদর্শী ৺ রাজ নারায়ণ বসু ও দেশবিশ্রুত, অধুনা অবসর প্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বহু দেশ-পূজ্য ও মহামান্য সুধীবৃন্দ এই মহাত্মার গ্রন্থ পাঠে ইঁহার সহিত পরিচিত হইয়া ইঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা, সম্মান ও স্নেহ দান করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার সময়ে সময়ে এই দীন গ্রন্থকারকে গ্রন্থ মুদ্রনে, এবং ইঁহার পারিবারিক অভাব মোচনে সাধ্যমত অর্থাদি দানে ইঁহার উপর তাঁহাদের প্রকৃত শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মহাত্মা প্রিয়নাথের সাধনেতিহাস অনেকেরই নিকট অজ্ঞাত আছে। কারণ গোপনে ভগবৎ-সাধনে নিরত থাকিয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। নতুবা সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহাকে কেহ কখনও দশ জনের অনুষ্ঠিত তথা কথিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইতে দেখেন নাই। 'জীবন-পরীক্ষা'দি গ্রন্থরচনার বহুকাল পরে তিনি স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কেহ কেহমনে করেন, 'জীবন-পরীক্ষা'দি গ্রন্থ-নিবদ্ধ প্রেম-

পীযূষ-পরিপূরিত পরমার্থ-তত্ত্ব সকল গ্রন্থকর্ত্তার কল্পনা-শক্তিপ্রসূত কয়েকটী জ্ঞানগর্ভ পারলৌকিক উপদেশ-বাক্য মাত্র। কিন্তু আমাদের ধারণা, যে কল্পনা ভাবরাজ্যের গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করিয়া এই সকল মানব কল্যাণকর মহাতত্ত্বরাশি তুলিয়া আনে—সে কল্পনা সামান্য কল্পনা নহে। প্রকৃত-শান্তি-সুধান্বেষী, প্রিয়নাথ যে কেবল মাত্র একজন প্রগাঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে অনুরাগ বিহীন হইয়াও পরাভক্তিলিপ্সু, অধ্যাত্ম-তত্ত্বান্বেষী সাধক ছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিরাশির ফলে ভগবৎ কৃপা সহজে প্রাপ্ত হওয়ায় ধর্ম্মরাজের বাহ্যিক অনুষ্ঠান সকলের আবশ্যকতা তিনি অনুভব করেন নাই এবং ঐ কৃপা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই জীবন-পরীক্ষার ন্যায় উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রণয়নে সক্ষম হইয়াছিলেন।

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী মতামত হইতে আমাদের ঐ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে :—

শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিতেছেন—(জীবন-পরীক্ষা), "এখানি উচ্চ দরের পুস্তক, উচ্চকথায় পরিপূর্ণ। কার্য্য দেখিয়া ইহার রচয়িতাকে চিন্তাশীল ও সাধনপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের রচনায় গ্রন্থকারের ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়। সে ধাতু সাধুলোকের ধাতু। রচনা বুঝি সেই জন্যই এত সাধু হইয়াছে"।

অপূর্ব্ব কারাবাসাদি গ্রন্থরচয়িতা পণ্ডিত ৺কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"দৈববৃত্তি আছে বলিয়াই মানব উন্নত, দৈববৃত্তি আছে বলিয়াই মানব ধার্ম্মিক। তবে ঐ বৃত্তির অল্পাধিক্যানুসারেই মানবের জাতি ভেদ। বহু চেষ্টাতেও কাহারও ঐ বৃত্তি স্ফুরিত হয় না আবার বিনা চেষ্টাতেও কোন কোন স্থানে ঐ ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। 'জীবন-পরীক্ষার' গ্রন্থকার এই শেষোক্ত ভাবেরই ভাবুক শেষোক্ত ভাবেরই প্রেমিক, দৈব ভাবই ইহাঁর জীবনের স্থায়ীভাব। তাদৃশ পঠন সাধনাদির অভাবেও এই গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়ে যেরূপ অসাধারণ ভক্তি ও প্রগাঢ় প্রেম লক্ষিত হইল তাহা অতীব আনন্দজনক। গ্রন্থকারের শাস্ত্রে তাদৃশ শিক্ষা অভাবেও গ্রন্থে শাস্ত্র বিরুদ্ধ মত লক্ষিত হয় না। জ্ঞানের অভাব যে শিক্ষার অভাবকেও পরাভূত করে 'জীবন-পরীক্ষা' তাহার একটী নিদর্শন স্থল।"

বাস্তবিক সাধু প্রিয়নাথ যে উচ্চদরের সাধক ও ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত

পরম ভক্ত ছিলেন একথা তাঁহার গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। বুঝা যায় যে তিনি আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে জীবনপাতী পরিশ্রম করিয়াছেন। বুঝা যায়, 'জীবন পরীক্ষা' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য—'কে আমরা'? "কেন আমরা এখানে আসিয়াছি?" "এখানে আসিয়া আমরা কি করিতেছি"?—এই সকল তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতেই তিনি আত্মজ্ঞানের আভাষ লাভ করিয়াছিলেন এবং সে জন্যই লিখিয়াছিলেন—'সাধ নিজের মঙ্গল, নিজময় এ বিশ্বমণ্ডলী' ঐ জ্ঞানের ফলেই তিনি তৎকৃত 'আনন্দ-তুফানে' আত্মবিস্মৃত সাধারণ মানবকে উচ্চৈস্বরে বলিতেছেন —

"পেয়েছ দুর্লভ দেহ, মনুষ্য আকার,
চাহ ভাই আপনার পানে, 'তুমি' ভিন্ন
নাহি বিশ্বে কিছু আর"।

ঐ সকল রচনা হইতে বুঝা যায় প্রিয়নাথ তথাকথিত নীরস, তার্কিক, বেদান্তবাদী ছিলেন না, কিন্তু যে অদ্বৈত জ্ঞানে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলিত করিয়া মানব মনে পরম প্রেমের অস্তিত্ব সদা সর্ব্বদা জাগরূক রাখে প্রিয়নাথ সেইরূপ আত্মজ্ঞানের আভাষই পাইয়াছিলেন। সেজন্যই প্রিয়নাথ আত্মজ্ঞানের আভাষ পাইয়াও প্রেমিক, ভগবৎ-ভক্ত। অথবা ভক্তি তত্ত্বের উচ্চ সোপানে উন্নীত হইয়া সাধক যেমন পূজক ও পূজ্যে অভেদের আভাষ পায় প্রিয়নাথের আত্মাভাষও সেইভাবের ছিল। সাধক কবি পূজ্যপাদ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব "ব্রহ্মময়ীর সকল ব্রহ্মময়" শীর্ষক গানে লিখিয়াছেন—

"প্রেম জাগে যখন, আর কি তখন,
তোমায় আমায় সাধন হয়।
(তখন) অভেদ সম্বন্ধে মাতি প্রেমানন্দে,
ব্রহ্মময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময়॥"—

প্রিয়নাথের আত্মজ্ঞানের আভাষও ঠিক ঐ ভাবের ছিল।

প্রিয়নাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত 'ছোট আমি' বা 'কাঁচা আমি' ত্যাগ করিয়া 'পাকা আমি' অবলম্বনে অবস্থান করিতে চিরযত্নশীল ছিলেন জীবন-পরীক্ষা গ্রন্থের উপসংহারে তিনি "জীবন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি?"—প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন—'ভগবদুপাসনা'। আবার মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া 'মনুষ্যত্ব' লাভই যে একমাত্র ভগবদুপাসনা—ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি সেই মনুষ্যত্ব লাভ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—(জীবন পরীক্ষা ৪র্থ প্রচার)

৩২৭ পৃষ্ঠা) "ভগবদুপাসনা হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গভীরতম ব্যাপার। ভগবানের উপাসনা বা অর্চ্চনা করিতে হইলে প্রথমতঃ হৃদয়কে অনিত্য চিন্তা সমূহ হইতে বিরত ও প্রশান্ত ভাব সম্পন্ন করা বিশেষ প্রয়োজন, অনিত্য চিন্তা বিবর্জ্জিত, শান্ত মনের সাহায্যে, উপাসক যদি বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বরচনাপ্রণালী ও সৃষ্ট জীব সমূহের প্রতি অপরিসীম করুণার কথা আলোচনা করে তাহা হইলে এক অপূর্ব্ব ভাবামৃতের আস্বাদ পায়। এই ভাবরসামৃতই অনিত্য বিষয়ে বিরাগী করিয়া সনাতন শাশ্বত আনন্দ দানে ঈশ্বরাভিমুখে তাহাকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণ তাহাকে পবিত্র ও তাহার মোহাবরণ বিমুক্ত করতঃ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করে।" প্রিয়নাথ বলেন এই জ্ঞান সাহায্যেই 'ভেদজ্ঞান বা অসমদৃষ্টি' নাশ হইয়া উপাসককে সমদর্শী করিয়া তুলে, এবং "এতাদৃশ সমদৃষ্টিই" প্রিয়নাথ লিখিতেছেন,—"মানবশরীরধারী জন্তুর অহংকার বা দেহাত্মাভিমানকে ধ্বংস করিয়া প্রকৃত 'অহংজ্ঞান' বা 'আত্মজ্ঞান' প্রদান করে। এই অহংজ্ঞানের অপর নাম 'মনুষ্যত্ব'। অর্থাৎ অহংজ্ঞান লাভ করিলেই মানব-শরীরধারী জীব প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হন, এবং স্বীয় মনুষ্যত্ব বা অহংজ্ঞান প্রভাবে সর্ব্বোহং (সমস্তই আমি) বা ব্রহ্মাহং (ব্রহ্মই আমি) বুঝিতে পারিয়া তিনি বিশ্বেশ্বরের সহিত সমগ্র বিশ্ব রাজ্যকেই একরূপে দর্শন এবং এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে পূজোপাসনা করিয়া থাকেন।—ইহারই নাম প্রকৃত 'ঈশ্বরোপাসনা'"। তবে একটা কথা, উপরি উক্ত ভাব সকল হইতে একথা কেহ না বুঝেন যে প্রিয়নাথ মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। মিত্র দেবালয়ে সর্ব্বদা বসবাস, নানা তীর্থ ভ্রমণ ও তীর্থস্থ দেব দেবী সমূহের পূজা-দর্শনাদি, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবী-মন্দিরে সদা সর্ব্বদা যাতায়াত প্রভৃতি করিয়া তিনি মূর্ত্তি পূজার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রিয়নাথের গৃহে অনেকগুলি দেবদেবী মূর্ত্তির ছবিও ছিল। তিনি এই সকল ছবিকে বেশ সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিতেন ও পুষ্প মাল্যাদি দানে তাহাদের নিত্য শোভাবর্দ্ধন করিতেন।

প্রত্যেক বিষয়েই প্রিয়নাথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন ও যেখানে যে দ্রব্যটী রাখিলে গৃহের যথার্থ শোভাবর্দ্ধিত হইবে ও আবশ্যক মত কার্য্যে আসিবে সেটী সেই ভাবে ও সেই স্থানে রাখিতেন। সিদ্ধ কবি গাহিয়াছেন,— 'গৃহ দেখে বুঝা যায় গৃহস্থ কেমন'—প্রিয়নাথের সেই ক্ষুদ্র সুসজ্জিত শান্তিপূর্ণ

আবাস গৃহে প্রবেশ করিলেই বেশ বুঝা যাইত যে সেই গৃহবাসী গৃহী কেমন প্রকৃতির লোক। প্রিয়নাথের বাসগৃহে তাঁহার বসিবার চৌকীর এক পার্শ্বে কয়েকটী প্রস্তরখণ্ড বা 'নুড়ি' সকল সময়েই সযত্ন রক্ষিতভাবে দেখা যাইত। দেব দেবী মূর্ত্তির প্রতিকৃতিগুলিকে যেমন তিনি নিত্য পুষ্প বা তদ্রূপ মাল্য-দান করিতেন তাঁহার সযত্ন সঞ্চিত ঐ প্রস্তরখণ্ড গুলিকেও তদ্রূপ পুষ্প সম্ভারে সজ্জিত রাখিতেন। উহা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন 'মহাশয় এ নুড়িগুলিকে কেন অমন ভাবে রাখিয়াছেন?' প্রিয়নাথ অবশেষে বুঝিলেন যে এই শীলাখণ্ডগুলিকে এই ভাবে রাখিতে হইলে ঐ প্রশ্নের উত্তর দান করা তাঁহার একটী নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইবে। অগত্যা তিনি একখানি সুন্দর আসন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সূচী কার্য্যে এই কবিতাটী লিখিয়া নুড়িগুলি সেই আসনে রাখিয়া দিলেন,—

"যে ভাবে যে জন মোরে করে দরশন,
সেইরূপে করি তার বাসনা পূরণ।
'শীলা' 'শিব' সবি আমি, যে করে প্রত্যয়,
নির্ম্মল মানসে তার না পশে সংশয়।"

প্রিয়নাথের রচিত 'আহ্নিক ক্রিয়া' নামক পুস্তক খানি পাঠেও তাঁহার হৃদয়ের ঐ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, বুঝা যায় যে, তিনি "ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে। ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাৎ ভাবো হি কারনম্॥" শ্লোকোক্ত ভাবের ভাবুক হইয়া সর্ব্বভূতেই সমভক্তিভাবে ভগবানকে পূজোপাসনাদি করিতেন।

উপসংহারে আমাদের একটী কথা বলিবার আছে। সেটী প্রিয়নাথ সন্ন্যাসী কি সংসারী তাহা নির্ণয় করা। সাধু প্রিয়নাথ সদা সর্ব্বদা সংসার বিরাগীর ন্যায় একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ও একখানি উত্তরীয় বা মোটা চাদরে গাত্র আবরণ করিয়া থাকিতেন, যথা সময়ে সংযতভাবে সামান্য আহারেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। দারুণ শীতে বা প্রাবৃটের ঝঞ্জাবাতে কখনও তিনি জামা ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার ব্যাধির জ্বালা নিরন্তর উপস্থিত থাকিয়াও তাঁহাকে কোনও রূপে অপরের সেবা ভোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে রত থাকিয়া তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায়ই জীবন যাপন করিতেন। অনেকে এই জন্য সময় সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "মহাশয় আপনি কি সন্ন্যাসী?" শান্ত প্রিয়নাথ প্রফুল্ল মনে উত্তর দিতেন,—"মহাশয়! আমি

সংসারী। সংসারের সেবাই আমার জীবনব্রত"। জীবনান্ত কালের অল্প-দিন পূর্ব্বে প্রৌঢ়ত্বের শেষভাগে তিনি পরিণীত হয়েন। অনেকে এই জন্ম তাঁহাকে অনুযোগ করেন, শুনা গিয়াছে। কিন্তু মহাত্মা প্রিয়নাথ জানিতেন যে, "বিধিলিপি সত্যসত্যই অখণ্ডনীয়"। তাঁহার পরম শ্রদ্ধাস্পদা জননী ও ইষ্টমন্ত্র-দাত্রী নিজ কনিষ্ট পুত্রগণের বিবাহ হইয়া যাইবার পর, 'প্রিয়নাথ বিবাহ না করিলে অনশনে দেহত্যাগ করিব' বলিয়া এইরূপ ভীষণ সঙ্কল্প করেন। সঙ্কল্প করিয়া প্রিয়নাথ-জননী মিত্র দেবালয়ে প্রিয়নাথের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং এক দশমী তিথির রাত্রে তাঁহার সহিত অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন,"আজ প্রতিজ্ঞা করিয়া এইখানে শয়ন করিলাম, যতক্ষণ না তুমি মুখে বলিবে বিবাহ করিব ততক্ষণ পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করিব না"। নির্জ্জলা উপবাস করিয়া দশমী ও একাদশীর রাত্রি কাটিয়া গেল। দ্বাদশীর উষাকালে বিচলিত প্রিয়নাথ অনেক সাধ্য সাধনা দ্বারা মাতাকে স্নানাহার করাইবার চেষ্টা করিলেন, বিনতি করিয়া বলিলেন, 'মা। এইরূপ শ্বাসব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় ও প্রৌঢ়ত্বের শেষভাগে বিবাহ করিলে আমি আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিব বলিয়া বোধ হয় না।' কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মাতার দৃঢ় পণ—প্রিয়নাথ একবার মুখে বলিবেন, তিনি বিবাহ করিবেন। দ্বাদশীর দিবাভাগ অবসানপ্রায় দেখিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পা অনশনক্লিষ্টা গর্ভধারিণীর নিদারুণ দুঃখোৎপত্তির কারণ হওয়া সুপুত্রের কর্ত্তব্য নহে বুঝিয়া প্রিয়নাথ মাতৃতৃপ্তির জন্য নানা সর্ত্ত উত্থাপন পূর্ব্বক বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়! সেই সকল অসম্ভব সর্ত্ত সম্ভব হইল এবং জীবনের শেষভাগে প্রিয়নাথ পরিণীত হইলেন। মাতৃ-আজ্ঞা-পালন রূপ মহাযজ্ঞের হোমানলে প্রিয়নাথ আপনাকে আহুতি প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর তিনি দুই বৎসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন*, এবং সর্ব্বদাই বলিতেন "বিধিলিপি অখণ্ডনীয়"। কিন্তু পরিণয়ে প্রিয়নাথের কিছুই আসিয়া যায় নাই। কুমার প্রিয়নাথ ও পরিণীত প্রিয়নাথকে আমরা একরূপই দেখিয়াছি। পরিণীত অবস্থা তাঁহার স্ত্রীর ভরণপোষণ রূপ আর একটি কর্ত্তব্যের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছিল মাত্র। কিন্তু বিবাহ করিয়া তিনি যে কখনও স্খলিত-পদ বা ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হয়েন নাই, তাহা আমরা সবিশেষ জানি। বর্ত্তমান লেখক তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অন্যূন বিশ বৎসর কাল

* ২১শে আশ্বিন ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রিয়নাথের দেহান্তর হয়।

প্রিয়নাথের সহিত পরিচিত ছিল। তথাপি মহাত্মা প্রিয়নাথের মহাপ্রাণতা সম্যক্ উপলব্ধি করার অভিমান সে রাখে না। তাঁহার পূত চরিত্রের সংক্ষেপ পরিচয় এইরূপে দিতে বসিয়া সে ভাবিতেছে, শিব গড়িতে বাঁদর গড়িতেছে কি না! কালের প্রভাবে হয়ত আমরা প্রিয়নাথকে বিস্মৃত হইব, কিন্তু তাঁহার অমূল্য তত্ত্বোপদেশ পূর্ণ গ্রন্থরাজি বাঙ্গালী পাঠকের স্মৃতি মন্দিরে তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি চির উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। নীরবে, নিভৃতে, এই দীন ভূদেবতনয় আমাদের জন্য—মদ খাও নেশা ছুটিবে না, আনন্দতুফান, জীবন-পরীক্ষা, আহ্নিক ক্রিয়া, কুমাররঞ্জন, জীবন কুমার, ও দুঃখীর ইতিহাস বা জীবন্ত-পিতৃদায়, প্রভৃতি যে সকল সাহিত্য কুসুম রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সামান্য নহে। সচন্দন তুলসী ও বিল্বদল যেমন শ্রীভগবানের পূজায় প্রযুক্ত হইয়া নির্ম্মাল্যরূপে ভক্ত সাধকগণের শিরশোভনকারী হয়, বীণাপাণীর অর্চ্চনায় উৎসর্গীকৃত ভিখারী প্রিয়নাথের মধু-গন্ধ-কান্তি বিশিষ্ট এই সকল সাহিত্য কুসুম ও তদ্রূপ ভক্তি ও তত্ত্ব-পিপাসু পাঠকবর্গের মনে ভাব-রসামৃত ঢালিয়া তাঁহাদিগের নিকট চিরকাল অমূল্য বস্তু রূপে পরিগণিত থাকিবে। *

-:•:

জৈনসম্প্রদায়।

(১)

জৈনাচার্য্যেরা বলেন, "জৈনধর্ম্ম অনাদিজ্ঞানোৎপন্নঃ কৃতাদিযুগেপ্যবস্থিত ইদানীমপ্যস্তি ভাবিকালেঽপি স্থাস্যতি"। কথাটা কিন্তু জৈনধর্ম্মের সারভাগ যে মোক্ষতত্ত্ব তাহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কারণ আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব হইতে মহাবীর স্বামী পর্য্যন্ত "সর্ব্বেঽপি তীর্থকরাঃ স্বয়ং সম্বুদ্ধা ভবন্তি। এবঞ্চ ক্রমেণ চতুর্ব্বিংশতিঃ তীর্থকরাঃ মোক্ষমার্গস্বরূপকাঃ বভুবুঃ। এষাং ধর্ম্মপ্ররূপণায়াং পরস্পরং বিসংবাদো নাস্তি, ইত্যেবং সর্ব্বেঽপি মন্যন্তে।†" সকল তীর্থঙ্করই মোক্ষমার্গপ্রদর্শক ছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মমতে কেবল এই একটী সাধারণ লক্ষণ সুনিশ্চিতরূপে পাওয়া যাইতেছে। তদাচরিত মোক্ষধর্ম্ম পরে জৈনমত-

* প্রিয়নাথের স্মৃতিসভা উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

† ভাষ্যসারজৈনসিদ্ধান্তসূত্রং— ৫৯ পৃঃ।

বাদ বা জৈনদর্শনরূপে পল্লবিত হইয়াছে। অতএব এক হিসাবে পূর্ব্বোক্ত জৈনাচার্য্যদিগের বাক্যটী সত্য, সন্দেহ নাই।

সনাতন ধর্ম্ম উর্দ্ধমূল অধঃশাখ একটী অশ্বত্থ। এই অশ্বত্থের কাণ্ড কি? না, "সর্ব্বে বেদাঃ যৎপদমামনন্তি" সেই পরমপদ ও তাহার বেদোক্ত দ্বিবিধ সাধন—নিবৃত্তিমূলক ও প্রবৃত্তিমূলক। এই মূলকাণ্ডটীর মধ্যে বহুশাখাপল্লবাদি যুক্ত বৃক্ষটী অন্তর্নিহিত ছিল। গাছের সকল শাখার সহিতই এই কাণ্ডটীর আত্মীয়তা রহিয়াছে, অতএব সনাতন-ধর্ম্মরূপ বৃক্ষের এই মূলকাণ্ডটীর অপেক্ষায় সমস্ত শাখাগুলিই সনাতনত্বের দাবী করিতে পারে। মূলকাণ্ডের সংযোগে সকল শাখাই একভাবে সনাতন, কিন্তু কোন্ শাখাটী কোন্ সময় কিরূপে মূলকাণ্ড হইতে উদ্ভিন্ন হইল, ঐতিহাসিককে সে বিচার করিতেই হইবে। জৈনধর্ম্মসম্বন্ধেও সেই কথা।

বৈদিক দেবতাবাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবহমান কাল বৈদিক ব্রহ্মবাদও প্রচলিত ছিল। যজ্ঞক্রিয়ায় প্রযুক্ত বেদমন্ত্রগুলির মধ্যে মোক্ষপদ ও তৎসাধনার কথা প্রাসঙ্গিক নহে, কিন্তু তথাপি সেই মন্ত্রগুলির মধ্যে অনেক স্থলে সেই পরমপদের ও দ্রব্যময় যজ্ঞাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভাবনাত্মক যজ্ঞের উল্লেখ কেমন অনিবার্য্যরূপে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহা ধীর, বিচারকুশল পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারেন।* কিন্তু সেই আদিযুগ হইতে আর্য্যসমাজ প্রণালীবদ্ধ, সুনিরূপিত বাক্যাবলীর সাহায্যে যেমন "অপরাবিদ্যা"কে সাধারণ আর্য্য শিক্ষার্থীর আয়ত্তীভূত করিয়া দিয়াছিল, পরাবিদ্যাকে ঠিক সে ভাবে আয়ত্তীভূত করিয়া দেওয়া হয় নাই। ব্রহ্মবিদ্যার্থী গুরুমুখে উপনিষৎ শুনিত সত্য, কিন্তু সাধনই লক্ষ্য ছিল, শব্দ বা অধ্যয়ন নহে। সেই সমস্ত উপনিষৎ বা ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বচন কেবল বৈরাগ্যবান সাধকদের মধ্যে রহস্য-কথার আকারে প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তী যুগে ঐ সমস্ত বাক্য যথাসম্ভব সঙ্কলিত হইয়া বেদের শেষভাগে স্থান পাইয়াছিল। উপনিষৎ পড়িলেও বুঝা যায় যে ব্রহ্মবিদ্যা বৈদিক কোনও বিদ্যা অপেক্ষা অপ্রাচীন নহে। "ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে"—এই পূর্ব্বাচার্য্যগণের ধারা যে কোন অংশে বৈদিক ঋষিদিগের ধারা অপেক্ষা অপ্রাচীন, তাহা কেহই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। সমগ্র বৈদিক যুগেই

* বঙ্গসাহিত্যের পাঠক এসম্বন্ধে সুপণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "উপনিষদের উপদেশ" ও তাহার অবতরণিকা দেখিবেন।

ইহাদের প্রভাব সামাজিক যজ্ঞক্রিয়াদির পশ্চাতে বিদ্যমান ছিল। † পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক যে কেবল ঋগ্বেদের শেষাশেষি ইহাদের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা অল্পদর্শিতার ফল, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন আর্য্যসমাজ ও তৎপ্রবর্ত্তিত সাহিত্যে আমরা কিরূপ সাক্ষ্য পাইতেছি? পুরাণ ও উপনিষদাদি বলিতেছেন যে সৃষ্টির আদিতেই স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকে জানিয়াই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, যমরাজের রাজবৈভব। প্রবৃত্তিমার্গে যে সমস্ত দুর্ল্লভ সম্পদ সৃষ্টিলীলায় বিলসিত হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যার আশ্রয়ে সে সকলের অধিকারী হইবার উপদেশে ও দৃষ্টান্তে বৈদিক সমাজবিবর্ত্তনের আদিস্তরটী যেন পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্মবিদ্যাই সমাজের সকল শক্তি ও বৈভবের একমাত্র আকরস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত। সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও বিশ্বাস ছিল এই যে—য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ। (৭ম খণ্ড, ৮ম প্রপাঠক, ছান্দোগ্য)। এই শিক্ষারই আনুষঙ্গিকরূপে বিশেষ বিশেষ লোক বা বিশেষ বিশেষ কামনার প্রাপ্তিকল্পে নানা যজ্ঞ ও তপস্যার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক—উভয়বিধ ধর্ম্মই ব্রহ্মবিদ্যা হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মবিদ্যা স্বয়ং যদি প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের বিধান না দিতেন, ব্রহ্মবিদ্যা স্বয়ং যদি সে ধর্ম্মের মূলরক্ষা ও শেষরক্ষা না করিতেন, তবে ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যাইত,—সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া একটা কথাও লোপ পাইত। যাহারা বলেন, ভারতে বৈদিককালের ইতিহাসে স্থূল প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির স্তুতিগানই প্রথম স্তর এবং সেই স্তুতিগান হইতে একেশ্বরবাদের আভাস দ্বিতীয় স্তর ইত্যাদি ইত্যাদি, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারতীয় সমাজ রহস্যের কোনও সন্ধান পান নাই।

আর্য্যসমাজের চিরপ্রচলিত বিশ্বাস এই যে, প্রবৃত্তিমূলক সংসারের বিস্তার হইবার অগ্রেই সনকসনন্দনাদির দ্বারা নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম বা মোক্ষধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই আদিম ঋষিসঙ্ঘ হইতে মোক্ষসাধনার একটী ধারা আর্য্যসমাজের অন্তঃস্তরে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সে ধারা কখনও বা লোকালয়ের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছে, কখনও বা লোকালয় ও সমাজ

† ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশু"।

হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু সময়ে সময়ে সে ধারার অভিষিঞ্চন না পাইলে, অথবা সর্ব্বদাই সে ধাবার অমৃতস্পর্শ না পাইলে, সমাজ বাঁচিত না, সমাজেব কোনও সাধনাই অভিব্যক্তি ও উৎকর্ষ লাভ করিত না।

এই মোক্ষসাধনার ধাবা প্রাচীন বৈদিক যুগে আশ্রমী ঋষি ও অত্যাশ্রমী যতি উভয়েব দ্বারাই সংরক্ষিত হইত। বেশ অনুমান হয় যে, আশ্রমী ও অত্যাশ্রমীর মধ্যে সাধারণতঃ বিদ্যার আদানপ্রদান চলিত। শ্বেতাশ্বতর ঋষির কথা এইরূপ পাওয়া যায় যে, "তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্, অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষি-সঙ্ঘজুষ্টং।" আশ্রমী ঋষি গৃহস্থ ও যতির মধ্যে যেন যোগসেতুস্বরূপ ছিলেন, তিনি, ঋষি থাকিয়াই, ঐ উভয়দিকেই অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিতেন। তাঁহার এই বিশেষত্ব থাকাতে, সমাজের পক্ষে যেমন একটা সুবিধাও ছিল, তাঁহার নিজেব পক্ষে তেমনই একটা আশঙ্কাও ছিল। সুবিধা এই যে আশ্রমী ঋষির দ্বাবা নিবৃত্তির ভাব ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমাজের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সঞ্চারিত হইতে পারিত এবং সমাজের নিয়ন্তৃত্ব উপযুক্ত ও প্রকৃত নিয়ন্তার হাতেই সংন্যস্ত থাকিত। কিন্তু আশঙ্কাও এই ছিল যে সামাজিক জীবনচক্রেব সহিত জড়িত থাকায় ঋষিরাও তাঁহাদের বিশুদ্ধ জীবনাদর্শ হইতে স্খলিত হইতে পারিতেন। উপনিষৎ প্রভৃতি হইতে আমরা দেখিতে পাই যে এক সময় যজ্ঞযাজক ঋষিগণ ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে নিম্নস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের নিকট আন্তর অগ্নিহোত্রাদি নানা সাধনতত্ত্বের সন্ধান পাইতেছেন। ঐ সমস্ত সাধন-রহস্যের প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে উহারা নিশ্চিতই যতিদিগের দ্বারাই অভিব্যক্ত ও উদ্ভাবিত হইতে পারে, যাহাদিগকে রাজ্যপালন করিতে হয়, অথবা যাহারা কেবল যজ্ঞক্রিয়াদিতে লিপ্ত থাকেন, তাহাদের দ্বারা ঐ সমস্ত বিদ্যা উদ্ভাবিত হওয়া অধিক সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ যাজক ঋষিগণের নিকট ঐ সমস্ত বিদ্যা যখন নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, তখন ক্ষত্রিয় রাজা ও মোক্ষসাধক যতির মধ্যেই উহাদের উদ্ভব অনুমান করিতে হয় এবং ইহাই অধিক সম্ভব মনে হয় যে সর্ব্বত্র বিচরণশীল যতিদিগের নিকটই রাজারা ঐ সমস্ত রহস্যবিদ্যা শ্রবণ করিতেন। এই ভাবে রহস্যবিদ্যা শ্রবণ করিবার দৃষ্টান্তও পুরাণাদি শাস্ত্রে অনেক রহিয়াছে।

উপনিষদে মোক্ষসাধনার যেরূপ ধারা আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার

বিশেষত্ব এই যে প্রায় সর্ব্বত্রই নিম্নতন যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও উচ্চতন মোক্ষসাধনার মধ্যে একটা সোপানপরম্পরা বা সাধনক্রম রক্ষা করা হইয়াছে। যজ্ঞকর্ম্মশীল আর্য্যসমাজের সহিত উপনিষদ্‌মূলক মোক্ষসাধকদিগের বিরোধ নাই, বরং উভয়ের সাধনের মধ্যে একটা পারম্পর্য্য বা ক্রম রহিয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রাচীনতম যুগ হইতেই আশ্রমী ঋষিসমাজের উপকণ্ঠে এক শ্রেণীর যতি ছিল. যাঁহারা বৈদিক অনুষ্ঠানাদির সহিত যথাসম্ভব একটা পারম্পর্য্য বা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিত।* এই প্রাচীন যতিদিগের ঠিক অনুরূপ সম্প্রদায় আমরা পরে শঙ্করাচার্য্যের গুরুসম্প্রদায়ে লক্ষ্য করিতে পারি। ইহাদের মধ্যেও আমরা বেদমূলক সর্ব্ববিধ সাধনতত্ত্বের একটা সমন্বয় দেখিতে পাই।

মোক্ষসাধনার এই উপনিষদ্‌মূলক ধারাব্যতীত প্রধানতঃ আরও তিনটী যতিসম্প্রদায়ের কথা আমরা প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই। তন্মধ্যে মহর্ষি কপিলের সম্প্রদায়ই প্রাচীনতম, দত্তাত্রেয়ের সম্প্রদায় ও অর্হৎ সম্প্রদায় তৎপরবর্ত্তী। এই তিনটী সম্প্রদায়ের মধ্যে কপিলের সাঙ্খ্যসম্প্রদায়ের নিকটই প্রাচীন সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী।

কিন্তু সেই প্রাচীনযুগে কোনও যতিসম্প্রদায়ই আর্য্যসমাজের ব্যূহভেদ করিয়া তদাচরিত মোক্ষধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিত না, এই কথাটী সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। যখন সমাজের বাহিরে মোক্ষসাধকদিগের মধ্যে সাধন ও তত্ত্ব লইয়া পৃথক পৃথক কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। তখনও সেই সাম্প্রদায়িক পার্থক্য লক্ষ্য করিবার সুবিধা বা অবকাশ সমাজ পায় নাই। সমাজ বহুবিধ যতি লক্ষ্য করিতেছে বটে, এবং কখনও তাহাদিগকে অবধূত, কখনও কপিল, কখনও বা "মুনয়ঃ বাতবসনাঃ।" কখনও বা নগ্নকাঃ, কখনও বা তাপসাঃ, কখনও বা শ্রমনাঃ ইত্যাদি নানা ভাবে অভিহিত করিতেছে, কিন্তু তাহাদিগের ভিতরকার বৈষম্য কি প্রকার, তাহার সন্ধান সমাজ সাধারণতঃ পাইতেছে না। বিশেষতঃ দত্তাত্রেয়, কপিল ও অর্হৎসম্প্রদায়ের যতিদিগের সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্যবিচার না করিয়া উল্লেখ করার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে অনেক রহিয়াছে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া মনে হয় যে, এমন কি দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত মোক্ষসাধকদিগের মধ্যে কোনরূপ দলাদলির উচ্চরোল উঠে নাই। তাঁহাদের মধ্যে তত্ত্ব ও সাধনার ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র যে যুগপরম্পরাক্রমে গড়িয়া

* শারীরক মীমাংসাসূত্রাদি ইহাদেরই কীর্ত্তি বলা যায়।

উঠিতেছিল, তাহা অনুমান করা যায়, কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হয় যে সেই সমস্ত চিন্তাকেন্দ্রের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদানও যথেষ্ট চলিত, কারণ, চিন্তাপ্রণালীর সাদৃশ্য অনেকস্থলে দেখা যাইতেছে।

দ্বাপরশেষে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন যখন গীতোপদেশ লাভ করিতেছেন, তখন দেখা যাইতেছে, কতকগুলি বিষয়ে সমাজের অভ্যন্তরেও মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ বাসুদেবোক্ত উপদেশের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, যে ব্রহ্মসাধনা সমাজের বাহিরে যতি বা ঋষিদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহাকে তিনি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়ামূলক সাংসারিক জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। অনুমান হয় যে, সে সময় সমাজের মধ্যে নিরগ্নি, অক্রিয় যতির জীবনের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ বা প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; সেই জন্য এবম্বিধ উক্তির মধ্যে বেশ একটা জোর আমরা অনুভব করি, যথা— অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্মকরোতি যঃ, স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ। মহাযুদ্ধের সম্মুখীন অর্জ্জুনের যে ক্ষণিক ক্লৈব্য, তাহার মধ্যে তদানীন্তন সমাজের অনেক ক্ষাত্রজীবনের একটা ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিকই হয়ত অহিংসামূলক যতিজীবনের আদর্শ সমাজের অনেক তমোবিডম্বিত কর্ম্মীর হৃদয়কে সে কালে প্রলোভিত করিত। শুধুই যে কর্ম্মত্যাগের প্রতি তমউদ্ভূত আকর্ষণ সমাজে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা নহে, আর একটা ব্যাপারের প্রতিধ্বনিও গীতোক্তির মধ্যে শুনা যাইতেছে। বেদবাদরত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যজ্ঞকর্ম্মাদির অযথা প্রশংসাও সমাজে অনেকের নিকট তিক্ত বোধ হইত। ফলে বেদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাবও সমাজে বিদ্যমান ছিল। এমন কি অনেকে বৈরাগ্যমূলক যতিধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া বৈদিক সংস্রবও ত্যাগ করিত। ভগবান্ বাসুদেব গীতায় এ ব্যাধিরও প্রতীকার করিতেছেন; বৈদিক ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে যে ঔপনিষৎধর্ম্ম প্রাচীন সমাজেরই উপকণ্ঠে অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, পার্থসারথি সেই উন্নত জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, রাজযোগ ও কর্ম্মযোগের সাধনায় সমাজকে ব্রতী করিতে চাহিতেছেন। ইহা একরূপ নিশ্চিত যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ঔপনিষৎধর্ম্মকে সমাজের মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা কেহ করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী ইতিহাস দেখিলে বুঝা যায় যে, আর্য্যসমাজের বৈদিক যজনযাজনার সহিত সমাজের নেপথ্য হইতে মোক্ষসাধনার ধারা আনিয়া সংযুক্ত করিবার পথ গীতায় উদ্ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়াই,

জৈন বা বৌদ্ধ মোক্ষতত্ত্ব আর্য্যসমাজকে পরবর্ত্তীকালে বেদসংশ্রব হইতে একেবারে ছিনাইয়া লইতে পারে নাই।

কুরুক্ষেত্র ভারতেতিহাসের যেন একটা বিপুল বিরামকেন্দ্র বা ষ্টেশন; ভারতীয় সর্ব্ববিধ চিন্তা ও সাধনার ধারা ঐ কেন্দ্রের পরবর্ত্তী কালে সুস্পষ্টরূপে একটা অভিনব পরিণাম লাভ করিয়াছে। আমরাও ঐ কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া জৈনসম্প্রদায়ের একটা পূর্ব্ববর্ত্তী ও একটা পরবর্ত্তী ইতিহাস অনুমান করিবার চেষ্টা করিব।

জৈনমতে ঋষভদেব আদিজিন ছিলেন। তাঁহার পর আরও ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন, অর্থাৎ জিনমোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ঋষভরাজার কথা আমাদের পুরাণেও আছে। সত্যযুগে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে পঞ্চম কি সপ্তম পুরুষ নাভিরাজার পুত্র ঋষভ। ঋষভরাজার ১০০ শত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ১১ জন ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াছিলেন, ৯ জন মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাকি ৮০ জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ঋষভ ও তৎপুত্র ভরত সেই প্রাচীন আর্য্যসমাজে আদর্শনৃপতিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহিনী পৌরাণিক আকারে গ্রথিত হইবার বহুপূর্ব্বে আর্য্যসমাজে গাথার আকারে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন সমাজ ভরতরাজার চরিত্রে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিত, সন্দেহ নাই। ঋষভদেবও আর্য্যসমাজের নিকট কম সম্মান লাভ করেন নাই। তাহা না হইলে ভাগবতপুরাণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া গণ্য করিতে পারিত না। মোক্ষধর্ম্মের একটী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থলরূপেও তিনি প্রাচীন সমাজের পূজা পাইয়াছেন। উপনিষদে ঐরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু সহজেই অনুমান হয় যে প্রাচীন বৈদিক সমাজ যে উচ্চসম্মানের দৃষ্টিতে ঋষভচরিত্র অনুধাবন করিত, সে দৃষ্টিতে ঐ চরিত্রে বেদবিরোধী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনরূপ কোনও লক্ষণ প্রকাশিত ছিল না। বৈদিক সমাজ সেরূপ দৃষ্টিতে ঋষভচরিত্র যে দেখিত না তাহার প্রমাণ ভাগবতেই রহিয়া গিয়াছে। ভাগবত বলিতেছেন যে ঋষভদেবের চরিত্রে মুগ্ধ কোনও রাজা বেদবিরুদ্ধ মত ও আচার কলিযুগে প্রচার করিয়াছিলেন। অতএব ঋষভ বা কোনও জিনদেবের পূজার্চ্চনার আভাস যদি আমরা কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজের কোথাও দেখিতে পাই, তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে বেদবিরুদ্ধ অনেক জৈনগৃহস্থ আর্য্যসমাজে স্থানাধিকার করিয়া অবস্থিত ছিল। কলিযুগে যখন সমাজের ভিতর সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন হইতে ঋষভাদি জিন-

দিগের প্রতি বৈদিকসমাজের শ্রদ্ধাদৃষ্টি কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অন্ততঃ ভাগবতপুরাণের কথককে নূতন সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিতে হইল যে জৈনগণ ঋষভকে যেরূপ দৃষ্টিতে দেখেন, ভক্তিশ্রদ্ধার হিসাবে ন্যূন না হইলেও, ঠিক সেরূপ দৃষ্টিতে বৈদিক গৃহস্থ তাঁহাকে দেখেন না।

আসল কথা এই যে কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েই হয়ত সমাজের বাহিরে মোক্ষসাধকদের মধ্যে জিনমতাবলম্বী একটা যতিসম্প্রদায়ের বিশেষত্ব স্পষ্টীকৃত হইতেছিল, কিন্তু সমাজ তখনও মোটামুটি দু একটা বাহ্যিক ভেদলক্ষণ ছাড়া যতিদিগের সাম্প্রদায়িক বিশেষ মতভেদ বা আচারভেদের সন্ধান পাইত না, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজের ব্যূহভেদ করিয়া স্বমত প্রচার করিবার উদ্যোগে তখনও যতিগণ প্রকৃতরূপে উদ্যোগী হন নাই। তখনও সমাজের মধ্যে সেরূপ দল ভাঙ্গাভাঙ্গি আরম্ভ হয় নাই। বৈদিক আচারই তখন সমাজের মধ্যে অবাধআধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, কেবল ইতর নির্ব্বিশেষ সকল প্রকার যতিদিগেরই মধ্যে যে কর্ম্মত্যাগ ও মোক্ষসাধনা পরিলক্ষিত হইত, তাহারই প্রতি একটা আকর্ষণের আভাস গীতোক্তির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে।

অতএব অনুমান এই যে কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক সমাজের ভিতরে অবৈদিক জৈনমত বিরোধের স্পষ্ট কোনও রেখাপাত করে নাই। সমাজ আচারসম্বন্ধে বহুপরিমাণে যতিদিগের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিত। আদিযুগ হইতেই যতিরা নিরগ্নি ছিল, সমাজ তাহাতে বিরোধী হয় নাই; যতিগণ এষণামূলক ও হিংসামূলক যজ্ঞকর্ম্মের নিন্দা অল্পাধিক সকলেই করিয়াছে,—ঔপনিষৎ সম্প্রদায়ও করিয়াছে। কাপিলসম্প্রদায়ও করিয়াছে, দিগম্বরসম্প্রদায়ও করিয়াছে—কিন্তু সে নিন্দা সমাজের গায়ে পড়িয়া করা হয় নাই, প্রকাশ্যে ঘোষণা বা সাধারণ্যে প্রচার করা হয় নাই। সে ভাবে মতবাদ প্রচার করিবার রীতি যতিগণ আরও পরবর্ত্তী যুগে অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে রীতির প্রচলন কিরূপে অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

এতাবৎ আমরা যে "বৈদিক সমাজ" বা "আর্য্যসমাজ" কথাটা ব্যবহার করিয়াছি, তদর্থে ভারতব্যাপী একটা বিস্তৃত সমাজ বুঝায় না। বৈদিক ঋষিদের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে পরিচালিত সমাজকেই বৈদিক সমাজ বলা হইয়াছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশভাগ লইয়া এই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে কখনও এই সমাজের কলেবর

বৃদ্ধি পাইয়াছে, কখনও বা কমিয়া গিয়াছে। কোনও যুগে এই সমাজবিগ্রহের সহিত যে ভারতবর্ষের একেবারেই সংস্পর্শ ছিল না, এরূপ সাক্ষ্য শাস্ত্র দেয় না, তবে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভারতের উত্তরাংশেই এককালে যে সংযোগ একরূপ সীমাবদ্ধ ছিল, উত্তরোত্তর কালে সে সংযোগ বর্দ্ধিতায়তন হইতে হইতে ভারতেতর দেশ হইতে অপসৃত হইয়া ভারতমধ্যে আত্মবিস্তার করিতেছিল। আবার প্রাচীন ভারতখণ্ডের ভিতরে অবস্থিত থাকিয়া, আশ্রমী ঋষির উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজবিগ্রহ আয়তনে বাড়িয়া গিয়াছে এবং কখনও বা ঋষিদিগের আবাসভূমির বিলোপ বা সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া গিয়াছে, কখনও বা অত্যন্ত বিভক্ত বা খণ্ডিত হইয়া প্রাচীনতর কেন্দ্রগুলির সহিত সংযোগ হারাইয়াছে, কখনও বা আবার চক্রবর্ত্তী রাজার সাহায্যে বা ঋষি-সঙ্ঘের উৎকর্ষ ও প্রতিপত্তির ফলে অখণ্ডতা লাভ করিয়াছে। ঐরূপ খণ্ডিত সমাজভাগে বৈদিক ক্রিয়া লোপ হওয়ায় অথবা ঋষির নেতৃত্ব না থাকায়, সামাজিক প্রকৃতি অবৈদিক আকার ধারণ করিয়াছে। আবার অনেকস্থলে বৈদিকতা হইতে বিচ্যুত সমাজভাগ ক্রমশঃ বৈদিকসমাজকেন্দ্রের সংস্পর্শে ও ব্রাত্যযজ্ঞাদির সাহায্যে সুসংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপে দেখা যায় যে প্রাচীন যুগে বৈদিক আর্য্যসমাজ ব্যতীত ভারতখণ্ডে ছোট বড় অনেক অবৈদিক সমাজও বিদ্যমান ছিল। এই সকল খণ্ড খণ্ড সমাজকে বৈদিক আর্য্যসমাজ ঋষিদিগের সাহায্যে আত্মসাৎ করিতে পারিত। নূতন নূতন দেশভাগে আশ্রমস্থাপনার দ্বারা এবং অনুগত ক্ষত্রিয়দিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ও বিরোধী ক্ষত্রিয়দিগকে আর্য্যক্ষত্রিয়ের দ্বারা আবশ্যকস্থলে পরাজিত করাইয়া, ঋষিগণ এক এক সময়ে আর্য্যসমাজের বিস্তার সাধন করিয়াছেন। এই কারণে ক্রমশঃ পরে দেখা যায় যে এমন অবৈদিক সমাজ ভারতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অতি অল্পই ছিল, যাহা কোনও না কোনও কালে বৈদিক আর্য্যসভ্যতার তরঙ্গে একবারও প্লাবিত হয় নাই। প্রায় পরবর্ত্তী সমুদয় ক্ষুদ্র সমাজ গুলিতে ঐরূপ প্লাবনের নানা নিদর্শন থাকিয়া যাইত। তাহাদের মধ্যে অনেক গুলিই সম্যকবেদাচার হইতে স্খলিত হইলেও ধর্ম্ম বা চরিত্রের সাধনায় একেবারে নিম্নসোপানে অবস্থিত ছিল না। ভারতেতিহাসে যতই আমরা প্রাচীনতর যুগ হইতে কলিযুগের দিকে অগ্রসর হই, ততই দেখিতে পাই যে ভারতে আর্য্যসমাজের বাহিরে পূর্ব্বাবস্থিত ও নবাগত অনার্য্য ও ম্লেচ্ছদিগের অপেক্ষা ব্রাত্যদিগের ও সঙ্করজাতিদের সমাজগুলির সংখ্যাই বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব

মোটামুটি এইরূপ বলা যায় যে খুব প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতীয় লোক সমষ্টির মধ্যে ত্রিবিধ সমাজস্তর বিদ্যমান ছিল,—যথা, শীর্ষস্থানে সাক্ষাৎভাবে ঋষিপরিচালিত বৈদিক সমাজ; দ্বিতীয়স্তরে, ব্রাত্য বা পতিত সঙ্করজাতি-দিগের সমাজ; তৃতীয়স্তরে ম্লেচ্ছ ও অনার্য্যদিগের সমাজ। বৈদিক যজ্ঞাচার ব্যতীত আর যত প্রকার সাধনপদ্ধতি, যথা জৈনাচার, পঞ্চোপাসনা ইত্যাদি সেই প্রাচীন যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সবগুলির সহিত উক্ত প্রথমস্তরের অতি-রিক্ত সমাজস্তরগুলির সহিত বিশেষ সংস্রব ছিল। অতএব জৈনাচার যতি-দিগেব গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কিরূপে একটা সামাজিক ধর্ম্মসম্প্রদায়রূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে ভারতীয় লোকসমাজের বৈচিত্র্যের প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে জিন বা জৈন-সাধুকে পূজার্চ্চনা করিত এরূপ গৃহস্থ হয়ত বৈদিক এবং অবৈদিক উভয়বিধ সমাজেই পাওয়া যাইত, হয়ত স্থানে স্থানে অবৈদিক সমাজে অনেকের ধর্ম্মজীবন জৈন সাধুর উপদেশের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু জৈনধর্ম্ম তখনও প্রকৃতপক্ষে সমাজের আসরে নামিয়া আসে নাই, কিরূপে ক্রমে উহা সমাজের আসরে নামিল, তাহাই অনুমান করিবার চেষ্টা আগামীবারে করা যাইবে।

৺সুরেশচন্দ্র দত্তের মহাসমাধি।

বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ১৮ই নভেম্বর তারিখে রাত্রিকালে শ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত ভক্ত শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অভয়-ধামে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন।

দত্তজা মহাশয় সাধারণের নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কয়েকটি উক্তি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কিছুকাল পরেই সুরেশ বাবুর 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি' নামক পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তাকে সাধারণের পরিচিত করিয়া তুলে। সে আজ উনত্রিশ বৎসরের অর্থাৎ সন ১২৯১ সালের কথা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক উপদেশাবলী তখন কলিকাতার জনসাধারণের নিকট একেবারে অপরিচিত না থাকিলেও কেহই উহা ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান নাই।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রকাশিত করিয়াই সুরেশবাবু ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু সাধক-সহচর, নারদসূত্র বা ভক্তিজিজ্ঞাসা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমালোচনা, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তিকা উত্তরোত্তর প্রকাশিত করিয়া ভগবদ্ভক্তিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে সাধারণের নয়ন-মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যদর্শন লাভের পূর্ব্বে দত্তজা মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে আসিয়া উক্ত সমাজানুষ্ঠিত সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং কিশোরকাল হইতে সত্যানুরাগ সরলতা, অমায়িকতা, বন্ধু-প্রীতি, পরোপকারিতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের জন্য আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের কেবল যে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু যথার্থ সম্মান ভাজন হইয়াছিলেন। সাধু দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় পঠদ্দশা হইতে সুরেশ বাবুকে প্রিয় সহচর রূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বহুকাল পর্য্যন্ত বিশেষভাবে জানিবার অবসর পাইয়াছিলেন এবং আমাদের জনৈক বন্ধুর নিকটে সুরেশ বাবুর সম্বন্ধে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, নিজ চরিত্র একেবারে সাদা (বিশুদ্ধ) রাখিতে তিনি সুরেশের ন্যায় বিরল ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন। নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইলেও সুরেশবাবু আপন স্বাভাবিক আভিজাত্য ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় সর্ব্বদা প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা হাটখোলা পল্লীর বিখ্যাত দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি নিজগুণে উহাকে সমধিক গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

কাম-কাঞ্চনাসক্তি ত্যাগই যদি প্রকৃত সন্ন্যাসের লক্ষণ হয়, তবে সুরেশ বাবুকে সন্ন্যাসী বলিতে পারা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র সঙ্গগুণে সুরেশ বাবুর ভগবল্লাভেচ্ছা ও সাধনানুরাগ উত্তরকালে এত পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নিজ পরিবারবর্গের জন্য কয়েক মাসের অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া সংসারের সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক নির্জ্জনে ঈশ্বরারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। চাকরি নাই, গৃহে অন্নের সংস্থান নাই, পাগল হইল ভাবিয়া আত্মীয়বর্গ নিরন্তর তাড়না করিতেছে অথচ হৃষ্টচিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া স্থির নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে;—এরূপ ভাবে কাল কাটাইতেও আমরা সুরেশ বাবুকে অনেক দিন দেখিয়াছি।

সুরেশ বাবুর জীবনের একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক

বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার চরিত্র-বল কিরূপ অসাধারণ ছিল। বিগত কাবুল যুদ্ধের কালে সুরেশ বাবু সামরিক বিভাগের একটি চাকরি দুই শত টাকা বেতনে স্বীকার করিয়া কোয়েটা যাত্রা করেন। যুদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর তখন মুক্তহস্ত; কর্ম্মচারীরা যাহাই ব্যয় হইয়াছে বলিয়া বিল করিয়া পাঠাইতেছেন তাহাই মঞ্জুর করিয়া লইতেছেন। সুযোগ বুঝিয়া সুরেশ বাবুর উপরিস্থন কর্ম্মচারী যথার্থ ব্যয় অপেক্ষা অনেক অধিক টাকার ব্যয় দেখাইয়া বিল পেশ্ করিয়া নিজের উদর পূরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং সুরেশ বাবুকে লাভের কিঞ্চিদংশ না দিলে ভবিষ্যতে গোলযোগের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাকে উহার এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সুরেশ বাবু তদ্গ্রহণে অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঐ কর্ম্মে জবাব দিয়া বসিলেন। কিন্তু জবাব দিয়াই নিষ্কৃতি কোথায়? অপমানিত কর্ম্মচারী সমর বিভাগের কঠোর আইনানুসারে বিনানুমতিতে কর্ম্মত্যাগে প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে নজরবন্দি করিয়া রাখিলেন এবং বলপূর্ব্বক আপন অভিমত কার্য্য করাইতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপে গত হইলে অনন্যোপায় সুরেশ বাবু পল্টনের ডাক্তার সাহেবকে নিজের দুঃখের কথা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিলেন এবং যাহাতে কর্ম্মত্যাগ করিয়া তিনি স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে ধরিয়া বসিলেন। সদয় হৃদয় ডাক্তার সুরেশের উচ্চান্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া "ব্যাধিগ্রস্তবিধায় চাকরি করিতে অক্ষম" (unfit for service) এই মর্ম্মে নিজ অভিমতজ্ঞাপক এক পত্র তাঁহাকে দিলেন এবং উহা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীকে দেখাইতে কহিলেন। ডাক্তারের ঐরূপ সুপারিষে সুরেশ বাবু কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমনের অনুমতি পাইলেও যতদিন পর্য্যন্ত আর এক ব্যক্তি যাইয়া ঐ কর্ম্মের ভার গ্রহণ না করিলেন ততদিন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ঐকার্য্য চালাইতে হইল। সে যাহা হউক অল্প দিনেই ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং সুরেশ বাবুও হৃষ্টচিত্তে কাশীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

চাকরী ছাড়িবার কালে সুরেশ বাবুর হস্তে কুড়িটি টাকা মাত্র ছিল। কাশী পৌঁছাইয়া অল্পদিনেই উহা ব্যয় হইয়া গেল। অগত্যা পদব্রজেই তিনি কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন। চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে তিনি [illegible] নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে বসিয়া সঙ্গের সাথী 'গীতা'খানি খুলিয়া পাঠ

করিতে থাকিতেন এবং যাচ্ঞা না করিলেও দরিদ্র পথিক ভাবিয়া গ্রামবাসীরা দয়াপরবশ হইয়া যাহা কিছু স্বেচ্ছায় আনিয়া দিত তাহাই ভোজন করিতেন। ভাগলপুরপর্য্যন্ত ঐরূপে আসিবার পর জনৈক ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে রেলভাড়া দিয়া কলিকাতায় পৌছাইয়া দিয়া ছিলেন।

কিন্তু গৃহে আসিয়াই বা নিষ্কৃতি কোথায়? গৃহে অন্ন নাই, নিজের চাকরি নাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পঁচিশটি টাকা মাত্র মাসে অর্জ্জন করে, তাহার স্কন্ধে স্ত্রী কন্যা ও আপনার ভারার্পণ করিয়া আর কতদিন থাকা চলে? এখন উপায়? অনেক চিন্তার পর সুরেশ মনুষ্যোচিৎ উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন করিলেন। কোন রূপে সামান্য টাকার যোগাড় হইলে সুরেশ একখানি জীর্ণ মলিন বসনে উহা বাঁধিয়া লইয়া বড়বাজারের আলু-পোস্তায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অর্দ্ধ মন আলু কিনিয়া মুটের মস্তকে দিয়া উল্টাডিঙ্গির পোল পার হইলেন এবং একটি জনশূন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া মুটেকে তাহার প্রাপ্য দিয়া বিদায় করিলেন। পরে জীর্ণ বস্ত্রখানি পরিয়া পূর্ব্ব পরিধেয় বস্ত্র ও পিরাণ প্রভৃতির একটি পুঁটুলি করিয়া উহা আলুর বস্তার নিম্নে লুক্কায়িত করিলেন এবং আলুর মোট মাথায় করিয়া গ্রাম মধ্যে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঐরূপে নিত্য সাত আট আনা লাভ হইতে লাগিল। সুরেশ উহাতেই কোন ক্রমে কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকরিরও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কয়েক সপ্তাহ ঐরূপে অতীত হইবার পরে পুনরায় তাঁহার ৬০৲ টাকা বেতনের একটি চাকরি জুটিয়াছিল।

ঈশ্বরে নির্ভরশীল কর্ম্মদক্ষ সুরেশ বাবু ঈশ্বরারাধনায় কিছুকাল কাটাইবার জন্য অনেকবার স্বেচ্ছায় চাকরী ত্যাগ করিয়াছেন, পরে ঐ কালের অবসানে পরিবারবর্গের অভাব দেখিয়া পুনরায় স্বল্পদিনেই অন্য চাকরী জুটাইয়া লইয়াছেন। ঐরূপে 'মোটা ভাত কাপড়' মাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিয়া কামকাঞ্চনময় সংসারের সাদরাহ্বান সর্ব্বদা উপেক্ষা করিয়া এই গৃহী-উদাসীন নিজ জীবনের গতি সর্ব্বদা ঈশ্বরাভিমুখে রাখিয়াছিলেন। লোক-নয়নের অন্তরালে অনুষ্ঠিত তাঁহার এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন সাধনানুরাগ আজ সফলীকৃত হইয়া তাঁহাকে দিব্যধামে পৌছাইয়া দিয়াছে এবং নির্ভরশীল ভক্তি-বিশ্বাস সমন্বিত নিষ্কাম কর্ম্মজীবনের একটি জলন্ত ছবি আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের জন্য ইহলোকে রাখিয়া দিয়া আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছে।

উদ্বোধন গ্রন্থাবলীর

নূতন পুস্তক।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

পূজ্যপাদাচার্য্য স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ আজ কাল ভারতের কোথাও অপরিচিত নহেন। কিন্তু স্বধর্ম্ম, স্বদেশ, স্বজাতি ও সমাজের ভাবী কল্যাণ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কূট বিষয়ের তৎকৃত মীমাংসার সহিত বঙ্গের অনেকে এখনও সুপরিচিত হন নাই। স্বামিজীর ঐ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বাক্যগুলির অধিকাংশ বক্তৃতাকালে ইংরাজিতে উচ্চারিত হওয়ায় সাধারণ বঙ্গীয় পাঠক ঐ সকলকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন না; অনুবাদ পড়িয়াও তেমন রসগ্রহণ হয় না। বর্ত্তমান পুস্তকখানি পড়িতে বসিলে কিন্তু পাঠক দেখিবেন, স্বামিজী যেন সাক্ষাৎ তাঁহার সহিত ঐ সকল বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতেছেন এবং সকল প্রকার কঠিন বিষয়ের যথাযথ মীমাংসা-গুলি বঙ্গভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেছেন! স্বামিজীও তাঁহার মতামত জানিবার এমন সুযোগ পাঠক ইতিপূর্ব্বে আর কখন পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। বেলুড়-রামকৃষ্ণ-মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীবর্গের অন্যতম শ্রীসারদানন্দ স্বামি পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন। সুবৃহৎ পুস্তকখানি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথম খণ্ড যন্ত্রস্থ, আগামী মাঘ মাসেই যাহাতে উহা পাঠকের করগত করিতে পারি তজ্জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

পুস্তকখানির প্রত্যেক খণ্ডে স্বামিজীর ছায়া চিত্র সন্নিবেশিত হইবে। ইতি—

বিনীত

উদ্বোধন কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীরামানুজ-চরিত

শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত।

শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এমন তদ্ভাব-ভাবিত ও রসগ্রাহী হইয়া তুলিকা ধরিয়াছেন ও চিত্র আঁকিয়াছেন যে বঙ্গসাহিত্যে আচার্য্যের যোগ্য পরিচয় দিবার জন্য যে আমরা যোগ্য লেখক পাইয়াছিলাম তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

গ্রন্থের মলাট সুন্দর কাপড়ে বাঁধান এবং প্রাচীন দ্রাবিড়ী পুঁথির পাটার মত নানা বর্ণে চিত্রিত। আচার্য্য রামানুজের জীবদ্দশার খোদিত প্রতিমূর্ত্তি ও গ্রন্থকারের প্রতিমূর্ত্তি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

বাগবাজার, কলিকাতা।

সাধু

নাগমহাশয়

৺শ্রীদুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের জীবনী প্রকাশিত হইল। যে অকলঙ্ক মহাজ্যোতিষ্কের আবির্ভাবে পূর্ব্ববঙ্গ নব-গৌরবে উদ্ভাসিত,—ত্যাগ, আকিঞ্চন, শুদ্ধভাব ও ভক্তির পরাকাষ্ঠায় যিনি জগৎগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ অনুচর ছিলেন—যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না,"—পাঠক! তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন।

মূল্য—১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন আফিস।

উদ্বোধনের নিয়মাবলী।

১। ১৩১৮ মাঘ মাস হইতে উদ্বোধনের চতুর্দ্দশ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৩১৯ পৌষ মাসে শেষ হইবে। এই বর্ষের যে কোন সময়েই কেহ গ্রাহক হউন, তাঁহাকে ১৩১৮ মাঘ মাস হইতে পত্র লইতে হইবে।

২। সহরের গ্রাহকগণ কার্য্যাধ্যক্ষের নামের রবারষ্ট্যাম্পমারা বিল ব্যতীত কাহাকেও ১৪শ বর্ষ উদ্বোধনের মূল্য দিবেন না। মূল্য দিবার সময় বিল-বাহকের সহি করাইয়া লইবেন।

৩। উদ্বোধন প্রতি মাসের **প্রথম সপ্তাহে** বাহির হয়। কোন গ্রাহক কোন মাসের কাগজ না পাইলে **সেই** মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পত্র না লিখিলে আমরা উহা বিনামূল্যে দিতে বাধ্য নহি।

৪। কোন বিষয়ের উত্তর প্রার্থনা করিলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হয়। তাহা না করিলে আমরা উত্তর দিতে বাধ্য নহি।

৫। তিন মাস কালের কম সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সে বিষয় আমাদিগকে না লিখিয়া স্থানীয় ডাকঘরে জানাইতে হয়। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সময় গ্রাহকগণ তাঁহাদের পুরাতন ঠিকানাও আমাদিগকে জানাইবেন।

৬। উদ্বোধনে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ উদ্বোধন-সত্বাধিকারীর বিনা অনুমতিতে কেহ অনুবাদ করিতে বা পুস্তকাকারে ছাপাইতে পারিবেন না।

৭। উদ্বোধনে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ সম্পাদকের মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়া যাইবে না এবং প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধ সকল স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লেখা প্রার্থনীয়।

৮। উদ্বোধনে বিজ্ঞাপন দিবার হার—মাসে প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ টাকা। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জানিতে হইবে।

৯। উদ্বোধন-গ্রাহকদিগের পক্ষে উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সমস্ত গ্রন্থাবলী (বৎসরে ১ সেট মাত্র) কম মূল্যে। বিজ্ঞাপনের ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কমমূল্যে পুস্তকের অর্ডার দিবার কালে গ্রাহকগণ "উদ্বোধন-গ্রাহক" কথাটী লিখিতে ভুলিবেন না।

১০। উদ্বোধনে গ্রাহক-নম্বর নামের পূর্ব্বেই থাকে। গ্রাহকমহোদয়গণ পত্র লিখিবার সময় তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এবং "গ্রাহক নম্বর" লিখিলেই হইবে।

ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ—ম্যানেজার।

শ্রমজীবিসমবায়

লিমিটেড

৯০।২A হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

মূলধন ১ লক্ষ টাকা

৫৲ হিঃ ২০,০০০ অংশে

বিভক্ত

অংশীদারদিগের বিশেষ সুবিধা

খাঁটী স্বদেশী দ্রব্যের একমাত্র

সম্মিলন স্থান

স্বদেশজাত পরিধেয় ও নিত্য ব্যবহার্য্য যাহা কিছু

চাহিবেন তাহাই সুলভে পাইবেন।

সেক্রেটরী ও ম্যানেজিং এজেণ্ট

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য পুস্তক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ।—(পকেট এডিশন) স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত. মূল্য ।০ আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত—শ্রীগুরুদাস বর্ম্মণ প্রণীত, ১ম ভাগ—মূল্য ১।০ আনা।

The UNIVERSE AND MAN—by Swami Ramakrishnananda. Price Rupee One and anna One only.

THE CONVENTION OF RELIGIONS IN INDIA, 1909, VOL. — Price Rs. 2 only, Vol. II—price Rs. 2 only.

জল সরবরাহের কারখানা—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রণীত। ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় এই নূতন পুস্তক। চিত্রাবলী সহিত; মূল্য ৫৲ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম—লিখিত—বাঁধান—১ম ভাগ, মূল্য ১।০; ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ভাগ, প্রত্যেকের মূল্য ১।৵০।

গীতা—শাঙ্করভাষ্যানুবাদ—পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুদিত। উত্তরার্দ্ধ, মূল্য ১।০ সিকা।

পাণিনীয় মহাভাষ্য—পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কৃত বঙ্গানুবাদ ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ লিখিত সুবিস্তৃত ভূমিকা সমেত, মূল্য ৩॥০ টাকা। পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ, স্বামী সারদানন্দ প্রণীত। মূল্য—১।০ আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—১৲ টাকা। গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ মূল্য—১৷০ টাকা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে ১৵০ আনা।

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ প্রণীত। মূল্য ৷০ আনা; উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে—।৵০ আনা।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ—শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রণীত মূল্য—২৲ টাকা।

পুরাতন বাঁধান উদ্বোধন।

অর্দ্ধ মুল্য।

বাঁধান উদ্বোধন—৫ম, ৬ষ্ঠ, ১২শ বর্ষের কয়েকখানি মাত্র আছে, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য—১৵০ পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

৮ম, ৯ম ও ১৩শ বর্ষের প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২।০, পোষ্টেজ স্বতন্ত্র

উৎসব—মাসিক পত্র—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম,এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৬২নং বহুবাজার হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১॥০, সৎশাস্ত্র ও সাধনার উপদেশ পূর্ণ। ৭ম বর্ষ চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ কর্ত্তৃক আলোচিত।

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট উৎসব-আফিস হইতে প্রকাশিত।

মূল, সমস্ত ভাষ্য ও টীকার আবশ্যকীয় প্রতিশব্দ লইয়া নূতন সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ; এবং প্রতিশ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নোত্তর ছলে লেখা। গীতার এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা আর নাই—ইহা সকলেই বলিতেছেন।

প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্র এই একখানি পুস্তকের সুখপাঠ্য ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। সহজ-বোধ্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মনোহর ভাষায় গীতার তত্ত্ব-সমূহের এমন সুন্দর প্রণালীতে আলোচনা এখন পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় নাই। কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান পথের সাধনা দ্বারা জীবন গঠন করার এরূপ সুবিধা অন্য কোথাও এখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ষট্‌ক (৬২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) মূল্য ৪।০; দ্বিতীয় ষট্‌ক মূল্য ৪।০; তৃতীয় ষট্‌ক যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা সুলভ মূল্যে তৃতীয় ষট্‌ক পাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা উৎসব আফিসে লিখুন।

ভক্তের অপূর্ব্ব সুযোগ কেবল ভারতের সম্পূর্ণ নূতন আমদানী নহে—পৃথিবীতে নূতন সৃষ্টি!



"বিবেকানন্দ" ঘড়ি।

ভক্তির আধারে মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তির অভ্যন্তরে ঘড়ি! যাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্যাগী মনীষি-প্রবরের ভক্ত, তাঁহাদের পূজনীয় অলঙ্কার;—স্বামিজীর মহাভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই অজস্র ব্যয়ে অপূর্ব্ব সৃষ্টি; দেশবাসীর উৎসাহই ভরসা;—ভক্তের আগ্রহ—ভাবপ্রচার; মাহাত্ম্যই সার্থকতা এ দিকে সস্তার চূড়ান্ত, সুদৃশ্য, সঠিক সময়রক্ষক, সুদৃঢ়, জুয়েল সন্নিবেশিত;—হান্টিং ওয়াচ মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

এস, মুখার্জী এণ্ড কোং
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটী মহা সমস্যার মীমাংসা ।

অনেকে বলিয়া থাকেন, একবার খালিত বা টাক রোগ সঞ্চার হইলে, তাহা আর আরাম হয় না। সত্যই এটী একটী মহা সমস্যা। টাক রোগে মস্তকের সৌন্দর্য্য, মুখের সৌন্দর্য্য, শরীরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। যদি টাক রোগের বা কেশস্খলনের প্রথম সূত্রপাত হইতে আপনি আমাদের মহাসুগন্ধি, ভৈষজ্য-গুণ-সম্পন্ন, স্বদেশী উপাদানে প্রস্তুত "কেশরঞ্জন তৈল" নিয়মিতরূপে আমাদের ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমরা দর্প করিয়া বলিতে পারি, আপনাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে না। খালি টাক রোগ নহে—মস্তকের মরামাস, খুস্কি, কেশের বিরলতা ও মূলশৈথিল্য দূর করিতে আমাদের "কেশরঞ্জন তৈল" অদ্বিতীয়। খালি তাই নহে—সুগন্ধে ইহা অতুলনীয়। একটু মাথায় মাখিয়া স্নান করিলে দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও মাথা ঠাণ্ডা থাকে—দিন রাত, বেলা মল্লিকা চামেলির মিশ্র সুরভি সম্ভার চিত্তকে প্রফুল্লিত ও উত্তেজিত করে। মহিলাকুল যদি নিত্য এই মহাসুগন্ধি তৈল কেশরচনার সময় ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশরাশি কোমল, মসৃণ হইয়া আরও সুকৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

এক শিশির মূল্য ... ১৲ এক টাকা। মাশুলাদি ... ।/০ আনা।
তিনশিশির মূল্য ... ২॥০ আড়াই টাকা। মাশুলাদি ... ॥৶০ আনা।

আগুনে জল !

আগুনে জল পড়িলে আগুন যেমন তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যায়, শূলের ব্যথার সময়ে শূলনির্ব্বাণ চূর্ণ সেবন করিলে তেমনি তাহা সহসা নিবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ, আমাদের "শূলনির্ব্বাণ-চূর্ণ" অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, ও অম্লোদ্গার, এবং যাবতীয় শূলরোগে ধন্বন্তরির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অম্লোদ্গার, অন্নশূল, বুকজ্বালা, উদরাধ্মান, আহারান্তে উদরে ভারবোধ বা ভেদ, মুখে তিক্তাস্বাদ, শিরোঘূর্ণন, ও পেটব্যথা প্রভৃতি যাবতীয় শূলরোগ নিবারণ করিয়া রোগীর শরীরকে দিন দিন সবল ও সঞ্জীবনী শক্তিপূর্ণ করিয়া তুলে।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।/০ আনা।

হতাশের আশার কথা—

বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

অৰ্দ্ধ আনার টিকিটসহ মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মনই কর্ম্মের নিয়ন্তা, মনকে প্রফুল্ল রাখুন।

মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র বলে মনই কর্ম্মের নিয়ন্তা। মন খারাপ হইয়া থাকিলে কোন কাজই ভাল লাগে না। যদি কর্ম্ম-জনয়িতা মনকে প্রফুল্ল রাখিতে চান—তাহা হইলে নিত্য আমাদের মহা-সুগন্ধি ভেষজ-গুণান্বিত চিত্ত-শান্তিকর সুরমা ব্যবহার করুন। "সুরমা" আপনার মনকে সদা প্রফুল্ল রাখিবে, মাথা ঠাণ্ডা করিবে। সুরমার মনঃপ্রাণহারী সুগন্ধে আপনি দিনরাত বিভোর হইয়া থাকিবেন। খালি তাই নয়, কেশবৃদ্ধি ও রক্ষা করিতে মহা-সুগন্ধি "সুরমা" অদ্বিতীয়।

মূল্যাদি,—এক শিশি সুরমার মূল্য ৸০ বার আনা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৵০ আনা মাত্র।

মহিলাকুলের সর্ব্বরোগে

বিশেষতঃ প্রদর, বাধক, কষ্টরজঃ, স্বল্পরজঃ প্রভৃতিতে আমাদের— "অশোকাসব" অদ্বিতীয়। জরায়ুবিকার-ঘটিত রোগসমূহের প্রতিকারে ইহা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। গুল্ম, রক্তগুল্ম, অষ্ঠীলা প্রভৃতি রোগে অস্ত্রব্যবহারে কোন প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক স্ত্রীধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া রোগিণীকে সুস্থ সবল ও কান্তিময়ী করে। সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীগণকে অতটা উপেক্ষার চক্ষে দেখিবেন না। এই উপেক্ষায় অনেক সোণার সংসার ভাসিয়া গিয়াছে। প্রতি শিশি অশোকাসবের মূল্য ১৷০ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৵০ সাত আনা।

নেত্রবন্ধু।

নেত্র, জীবদেহের পরম বন্ধু। এই নেত্রের সকল উপসর্গ দূর করে বলিয়া, এই ঔষধের নাম "নেত্রবন্ধু।" চোক উঠিলে, পাকিলে, লাল হইলে, কর কর করিলে, অথবা চক্ষু হইতে জল পিচুটী প্রভৃতি নিঃসৃত হইলে, 'নেত্রবন্ধু' অকপট-বন্ধুর মতই তাহা শীঘ্র নিবারণ করে। চক্ষুর পাতলা ছানি এবং জালবৎ পদার্থও ইহাদ্বারা সত্বর দূরীভূত হয়। এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র। মাশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটী ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।
১৯।২নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

৮

দুইটী চিত্রের তুলনায় সমালোচনা।

স্বাস্থ্যহীনতার চিত্র।

মলিন মুখ, বিশীর্ণ দেহ, এক একখানি করিয়া যেন পঞ্জর দেখা দিতেছে। আহারে রুচি নাই, ক্ষুধা নাই, কাজে মন লাগে না, সর্ব্বদা মনের ভিতর দুশ্চিন্তা, রাত্রে নিদ্রা হয় না। শারীরিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এত বেশী যে আধপোয়া পথ চলিলে খুব ক্লান্ত হইতে হয়। কিন্তু যদি আমাদের অশ্বগন্ধারিষ্ট কিছুদিন সেবন করেন—তাহা হইলে নবজীবন লাভ করিবেন।

স্বাস্থ্যপূর্ণতার চিত্র।

তখন দেখিবেন—আপনার বিশীর্ণ গণ্ডে লোহিতাভা সঞ্চার হইয়াছে, আহারে রুচি হইয়াছে। শারীরিক ও মানসিক শ্রম করিতে আর আপনি অপারক নন। সম্মুখে ইউনিভারসিটী পরীক্ষা। নব উৎসাহে, নবজীবনে আপনি দিনরাত খাটিতেছেন—একটুও ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। এজন্য জানিয়া রাখুন—সর্ব্ববিধ স্নায়বিক ও দৈহিক দুর্ব্বলতার জন্য আমাদের অশ্বগন্ধারিষ্ট দেশপ্রসিদ্ধ মহৌষধ!

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি।৶৹ সাত আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নিবেদিতা

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত।

বৈশাখের উদ্বোধনে প্রকাশিত—"নিবেদিতা"-নামক প্রবন্ধটী পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা সহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় তথ্যপূর্ণ এমন পুস্তক আর নাই। এই পুস্তকের সমস্ত লাভ সিষ্টার নিবেদিতা-প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রদত্ত। বিদ্যালয়ে নিবেদিতা কি ভাবে মিশিতেন ও কাজ করিতেন তাহার একটী মনোজ্ঞ ও বিশদ চিত্র এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকে সিষ্টারের একখানি সুন্দর হাফটোন ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা প্রভৃতি সুন্দর। মূল্য ৷৹ আট আনা।

বসুমতী বলেন—* * * * সুকবি শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর রচিত "নিবেদিতা"-নামক নব-প্রকাশিত উপাদেয় পুস্তিকা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে আমরা যতগুলি রচনা পাঠ করিয়াছি, শ্রীমতী সরলাবালার "নিবেদিতা"তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি।

সর্ব্বপ্রথমে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় নিবেদিতার ধর্ম্মজীবনের মূলমন্ত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা সরলাবালার গঠিত নিবেদিতা-প্রতিমার পুণ্যপ্রদীপ্ত মানসমন্দির ললাটে কহিনূরের মত জ্বলিতেছে। * * সুতরাং আমরা আশা করি, সহৃদয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বাঙ্গালীমাত্রই অন্ততঃ এক এক খণ্ড "নিবেদিতা" কিনিয়া আত্মীয়-স্বজনকে পড়িতে দিবেন।—"নিবেদিতা"র ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। নিবেদিতার হাফটোন ছবিখানিও সুন্দর হইয়াছে।

* * * *

আশ্বিনের সাহিত্যে বিস্তারিত সমালোচনা বাহির হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন আফিস।

জ্যোতিঃপথ

প্রথম খণ্ড ।৷• দ্বিতীয় খণ্ড ৸• ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

নূতন ধরণের ধর্ম্মগ্রন্থ ইহাতে ধর্ম্মের সার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

প্রথম খণ্ডে কি কি বিষয় আছে দেখুন।

'ব্রহ্ম বা বিরাট,' 'জ্যোতি ও জ্যোতির ধারণা' 'প্রাণ ও প্রাণায়াম' প্রভৃতি ১১টি বিষয় আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে—'আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা,' ব্রহ্ম-গায়ত্রী ; 'ব্রহ্মপ্রকাশ,' 'মূর্ত্তিপূজা,' 'ঈশ্বর,' 'মুক্তি ও স্বর্গলাভ' প্রভৃতি ৪৬টি বিষয় আছে।

বিশেষত্ব এই—অতি দুরূহ বিষয় সুন্দর, সহজ ভাষায় ও ভাবে সাধারণের বুঝিবার উপযোগী করা হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—লোটাস লাইব্রেরী ২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তোষিণী।

শিশুপাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী।

তোষিণী ছবির মাণিক, ছাপার সেরা, গল্পের ফোয়ারা। তোষিণী পাঠ করিয়া সকলেই বলিতেছেন,—'সখা ও সাথী' উঠিয়া যাওয়ার পর, এমন সুন্দর শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা আর একখানাও হয় নাই।

সুদৃশ্য চক্‌চকে আইভরি ফিনিস্ কাগজে সুন্দর পাইকা অক্ষরে পরিপাটী মুদ্রিত।

তোষিণীর বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল দেড় টাকা মাত্র। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। প্রতিসংখ্যা নমুনার মূল্য তিন আনা মাত্র।

গত বৎসরের তোষিণী।

গত ১৩১৮ সনের পুরুকাগজের মলাটে একত্র বাঁধাই তোষিণী দেড় টাকা স্থলে মায় ডাকমাশুল ভিঃ পিঃ তে আঠারো আনায় দেওয়া হইতেছে। প্রাইজ দিবার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী। বাঁধাই সংখ্যা। তোষিণীতে ছোট বড় সুন্দর সুন্দর শতাধিক ছবি আছে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন,
৩ নং অশোক লেন, ঢাকা।

জ্যোতিষ ভাণ্ডার।

গত বিশ বৎসর ধরিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চ্চায় আমার বড়ই আনন্দ হইত। কিন্তু এতাবৎকাল সকল সময়ে গণনায় ফল ফলিত না। অবশেষে এক্ষণে এমন কতকগুলি গুপ্ত তথ্য অবগত হইয়াছি, যদ্দ্বারা যে সকল ব্যক্তি এই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তাঁহারাও ইহার যাথার্থ্য অবগত হইবেন। প্রশ্নকর্ত্তাকে—(১) প্রশ্নকর্ত্তার কোষ্ঠি (২) অথবা ঠিক ঠিক জন্ম-তারিখ (৩) অথবা স্ত্রী বা পুত্রের কোষ্ঠি পাঠাইতে হইবে।

সমগ্র জীবনের প্রধান প্রধান ফলাফল ভূত ও ভবিষ্যৎ ৫৲। যে কোন দশ বৎসরের প্রধান প্রধান ফলাফল ২৲। সমগ্র জীবনের প্রতিবর্ষের বিস্তারিত ফলাফল ২৫৲। সমগ্র জীবনের প্রতি মাসের বিস্তারিত ফলাফল ১০০৲। যে কোন দুইটী প্রশ্ন গণনা ১৲। নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার ৫৲। এই ফলাফল বিচার প্রশ্নকর্ত্তার নিকট ভিঃ পিতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ঠিকানা—প্রোফেসর এন্, সি, মুখোপাধ্যায় এম্, এ। 'জ্যোতিষ-প্রদর্শক' প্রণেতা। করমাটার। ই, আই, রেলওয়ে।

অর্ডার দিবার সময় 'উদ্বোধনে'র নাম করিতে ভুলিবেন না।

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা।

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড্। হেড্ আফিস্—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট্—ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—৪২ নং ষ্ট্রাণ্ডরোড্।
(হাওড়া পুলের মোড়)। রঙ্গপুর ব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। ক্যাটালগে হিসাব দেখুন।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের।	মকরধ্বজ—৪৲ তোলা।
পঞ্চতিক্ত ঘৃত—৩৷০ সের।	সারিবাদি সালসা—৩৲ সের।
অমৃতপ্রাশ ঘৃত—১০৲ সের।	সর্ব্বজ্বর-কুলান্তক অমৃতারিষ্ট—২৲ সের।
বৃঃ ছাগলাদ্য ঘৃত—১০৲ সের।	অশ্বগন্ধারিষ্ট—৩৲ সের।
ব্রাহ্মী ঘৃত—৬৲ সের।	দাদ্‌মার—৵০ কৌটা।
অশোক ঘৃত—৮৲ সের।	(একদিনে দদ্রু ছলি নিশ্চয় আরোগ্য)।

অধ্যক্ষ—মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ,
হিন্দু কেমিষ্ট ও রোয়াইলহাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার।

ওরিয়েণ্টাল নার্শারি।

আগড়পাড়া—পোঃ কামারহাটী।

অভাবনীয় সংগ্রহ। অতুলনীয় সুযোগ।

পৃথিবীর নানা দেশ হইতে আমরা বীজাদি আনাইয়া ও নিজেদের পরীক্ষা-ক্ষেত্রে আবাদ করিয়া যে সব বীজ এদেশের জল বায়ুর উপযোগী বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছি, সেই সকল বীজের প্রচারার্থ ওজন ও প্যাকেট হিসাবে বিক্রয় করিতেছি। আমরা বহুস্থানের দুই শত রকম উৎকৃষ্ট আম, ষোল রকম লিচু, দশ রকম পেয়ারা, হরেক রকম লেবু, গোলাপ জাম, জামরুল, পাতিলেবু, কাগজিলেবু, কামরাঙ্গা, সপেটা, তুঁত, পীচ প্রভৃতির কলম আমাদের নিজ নার্শারিতে প্রস্তুত করিয়াছি। বাটী সাজাইবার গ্রাণ্ডিফ্লোরা, চীনের চাঁপা, তিন শত রকম গোলাপ ফুল, বেল, যুঁই, যাতি, মল্লিকা, মালতী, নানাপ্রকার লতানে ফুলগাছ, ক্রোটন, পাম প্রভৃতি নানাবিধ বাহারে গাছ আমরা সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিয়াছি। প্রসিদ্ধ স্থানের সুমিষ্ট আম্র বৃক্ষের প্রায় ৩০০০ সতেজ কলম বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার যে কোন বীজ বা গাছের প্রয়োজন হইবে আমাদের নার্শারির ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন। ক্যাটালগ দেখিলেই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

ম্যানেজার—**ওরিয়েণ্টাল নার্শারি।**

পোঃ কামারহাটী, আগড়পাড়া ষ্টেশন—ই,বি,এস, রেলওয়ে।

বটকৃষ্ণ পালের
এডওয়ার্ডস টনিক
য়্যান্টি-ম্যালেরিয়্যাল স্পেসিফিক।

অর্থাৎ

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু শান্তিকারক
মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲
" ছোট বোতল ৸০, " " ৸০ আনা

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমারে পার্শেল লইলে দর অতি সুলভ হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন

বা জোলাপের বরফি।

ইহা একটি অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আকৃতি ও আস্বাদে ইহা একটী অতি উপাদেয় মিষ্টান্ন অথচ বয়সানুসারে একটী দুইটী বা তিনটী সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার অনিবার্য্য। মূল্য ৷৶০ আনা শিশি।

যমানিজলসার

অজীর্ণ ও অম্লরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবিকার, সূতিকা ও শিশুদিগের উদরাধ্মান এবং সর্ব্ববিধ উদরশূল রোগে আশু ফলপ্রদ। মূল্য ।৶০ আনা শিশি।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।
৭।১২ ও ১৩ নং বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা।
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

গোল্ড সার্সাপ্যারিলা

বা

স্বর্ণ-ঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত করিতে উপদংশের বিষ বিনষ্ট করিতে শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহার সমতুল্য মহৌষধ নাই।

মূল্য ২৷৷০ টাকা।

জার্মিনা ও লেকসোটি

নবযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "টনিক ওয়াইন।"

অজীর্ণতা, সাধারণ দৌর্ব্বল্য ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বলকারক তেজস্কর ঔষধ আর নাই, শত শত রোগীতে পরীক্ষিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷০ টাকা

প্রি শ্রেষ্ঠ উপহার।

উপকারিতায় ও স্নিগ্ধ সৌরভে চিরবাঞ্ছিত কেশ তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে ও মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ইহা অদ্বিতীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০ বার আনা মাত্র।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

৭ ও ১২ বনফিল্ডস্‌ লেন, কলিকাতা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

"পুনরাগমন"

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। ধারাবাহিক রূপে "অলৌকিক রহস্য" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দু পারিবারিক ধর্ম্ম রহস্য এই উপন্যাসের অবলম্বন। ডবল ক্রাউন সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার উপর, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা, উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

৫৬। নং কলেজ ষ্ট্রীট ইউনিভার্স্যাল লাইব্রেরী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "অলৌকিক রহস্য" কার্য্যালয়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বামী বিবেকানন্দের

নূতন ফটো।

বিলাত হইতে সম্প্রতি কয়েক প্রকারের ফটো আনাইয়া তাহা হইতে প্রস্তুত করান হইয়াছে। (১) ধ্যানমূর্ত্তি (২) ভারতে বক্তৃতাবেশে (৩) তুর্কী টুপি মাথায় দাঁড়ান (৪) ঐ বসা সিধাভাবে (৫) ঐ ঐ ডানদিকে হেলা (৬) ঐ ঐ বামদিকে ঈষৎ হেলা (৭) পুস্তক হস্তে দাঁড়ান (৮) কলিকাতা বালক বেশে (৯) পাগ্‌ড়ি মাথায় অর্দ্ধ-শরীর (১০) বক্তৃতাবেশ—চেয়ার ধরিয়া দাঁড়ান। ক্যাবিনেট সাইজ, সিলভার, প্রত্যেকখানি ॥০ আনা; ব্রোমাইড ৮০ আনা। অর্ডার দিবার সময় ফটোর নম্বর এবং সিলভার বা ব্রোমাইড লিখিতে ভুলিবেন না, প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা। পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

পাথরের উৎকৃষ্ট ব্রেজিল চসমা।

যথানিয়মে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অথবা চক্ষু পরীক্ষক ডাক্তারদিগের ব্যবস্থানুসারে চসমা বিক্রয় করি। ইহাতে কোন ত্রুটি লক্ষিত হইলে ১ মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিই, ষ্টীল চসমা ৬৲, রূপার ১০৲, সোণার ২৫৲ হইতে ৩৬৲ টাকা। আইপ্রিসারভার ১৲।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স ও দিবালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান, লিখিলে ঠিক চক্ষের উপযোগী চসমা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান যায়

রায় মিত্র এণ্ড কোং,

১৮ নং ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ব্র্যাঞ্চ দোকান, পাটুয়াটুলি,ঢাকা।

সাহিত্য !

পূজার সাহিত্যে

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের—

বাঙ্গালায় অপ্রকাশিত পূর্ব্ব রচনা,—

‘হিন্দুর উৎসব’ !—

এতদ্ভিন্ন গল্পে, কবিতায়, রসরবসায় পরিপূর্ণ।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত বিবিধ

পাষাণ মূর্ত্তির অসংখ্য ছবি !—বাঙ্গালীর কীর্ত্তি !

বিবিধবর্ণে মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন

ছবির বৃষ্টি !

গ্রাহকগণের এত আগ্রহ যে, ইতি মধ্যেই জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ফুরাইয়াছে।—আবার ছাপা হইতেছে। এখন গ্রাহক হইলে বৈশাখ হইতে পাইবেন। এই সময়ে গ্রাহক হউন। বার্ষিক তিন টাকা মূল্যে প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পাঠ ও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণের ছবির হাট ! সস্তার চূড়ান্ত নহে কি ? ভি-পি ডাকে পাঠাই। নমুনার মূল্য নয় আনা।

ম্যানেজার, সাহিত্য। ৫।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

আর, কে, মুখার্জ্জী কোম্পানীর

প্রস্তুত অতি উৎকৃষ্ট কালি ! সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

২২৮নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।